খগেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

।। প্রথম খণ্ড ।।

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র



শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থা

এম. টি. ৭৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :

শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

শিশু সাহিত্য প্রচার সংস্থার পক্ষে শ্রীশিবায়ন বেরা কর্তৃক এম. টি. ৭৩, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক দীপালী প্রেস ১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

গল্প

ডাকাতের ডুলি	....	১
স্বপ্নে পাওয়া গল্প	....	১১
কর্তাবাবুর পেত্নী দেখা	...	১৭
চাঙড়ীপোতার চণ্ডী ভূত	....	২১
বদনপুর বাংলোর সেই রাত	....	৩৪
চোরেরও অধম	...	৪০
ঠাকুরদার গল্প	....	৪৪
নদীর চরের দৈত্য	...	৪৯
মৌটুস্‌কী	....	৫৬
গণেশচন্দ্রের অশুভ যাত্রা	...	৬১
কপালের লেখা	....	৭১
কাঁটাখালি ও কোদালচাঁচি	....	৮১
মিণ্টুর ছবি	....	৮৮
চন্দনপুরে	....	৯১

উপন্যাস

সুমন্ত	....	৯৭
ঠাকুরদার বুনো গল্প	...	১৬১
পাথরের ফুল	....	২০৩
গড়-জঙ্গলের কাহিনী	....	২৩২
ভোম্বোল সর্দার (১ম পর্ব)	....	৩৩৩

(বাংলাদেশ সংস্করণ)



খগেন্দ্রনাথ মিত্র
জন্ম ২রা জানুয়ারী ১৮৯৬

গল্প

ডাকাতের ডুলি

চাল্‌দাপুরের জঙ্গলের কাছে যখন পাল্কি এসে পৌঁছলো, তখন ভর-সন্ধ্যা।

বেহারারা পথের ধারে পাল্কি নামিয়ে বল্‌লে—"হুজুর, আর এগোতে সাহস হয় না ; 'ছাম্‌নে তিন কোশের' মধ্যে গাঁ নেই—"

হরি ডাক্তার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন। বেহারাদের একটানা "হুঁ হুঁ হো হো—ও—ও" সুরে, বর্ষার মেঠো ভিজে বাতাসে তাঁর চোখ দুটো একটু বুজে এসেছিল। অবস্থাটা হঠাৎ বদ্‌লে যাওয়ায় তন্দ্রাটুকু ছুটে গেল। চোখ মেলে তাকিয়ে বল্‌লেন—"কি বল্‌লি ?"

"—হুজুর, ছাম্‌নে চাল্‌দাপুরের জঙ্গল। সাঁঝও লাগ্‌লো। জল-কাদায় পা ব'সে যায়। দেয়ার বুঝি 'নামে'—"

—"তাই ব'লে একটা লোক মারা যাবে ?"

—"কি করবো হুজুর ? আমাদেরও তো জান—"

"হুঁ !"—ব'লেই ডাক্তারবাবু উঠে বস্‌লেন ; তার পর পাল্কির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বাঁ-দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"ঐ চাঁদখালির আলো দেখা যায় না ?"

—হেঁ।"

এমন সময় দূরে একপাল শেয়াল তারস্বরে ডেকে উঠ্‌লো।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"ওখানে যেতে পারবি ?"

—"না হুজুর ! ওদিকে যেতে হ'লেও জঙ্গলটার পূব দিক ভাঙ্গতে হবে—"

—"বটে ! জঙ্গলে আছে কি ?"

—"হুজুর, রাতের বেলা যেনাদের নাম করতে নেই, পূব দিকে আছেন তেনারা ; আর মাঝ বরাবর হলো টিয়ের আড্ডা। আমরা যাব না—"

—"তাই ব'লে একটা লোক বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ?"

গায়ের ঘাম মুছ্‌তে মুছ্‌তে একজন বেহারা বল্‌লে—"কি করব হুজুর ? ঘরে ছেলে-পুলে ছেড়ে এসেছি—"

হরি ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন—"মিছে কথা! কোন বেটার ছেলে নেই। ঐ যে, কে যায়.না? এই—কে যায়?"

অন্ধকার ততক্ষণে আরও গাঢ় হ'য়ে এসেছে। যা স্পষ্ট ছিল, তা হ'য়ে গেছে ছায়া, যা ছায়া ছিল তা গ'লে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে! যে যাচ্ছিল, সে ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়ালো। তার হাতে একখানা লাঠি।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"হারিকেন জ্বাল্‌। ঐ লোকটাকে এদিকে ডাক্‌—"

পাল্কির লোহার টানার সঙ্গে বাইরে একটা হারিকেন বাঁধা ছিল। একজন সেটা খুলে নিয়ে জ্বালতে লাগ্‌লো।

এদিকে ডাক্তারবাবুর আর ডাকের দেরি সইছিল না; নিজেই হাঁক্‌লেন—"এই—কে তুমি? এদিকে এস—"

লোকটা কাছে আস্‌তেই তিনি জিগ্যেস কর্‌লেন—"তুমি যাচ্ছ কোন্‌ দিকে? বাড়ি কোথায়?"

সে লাঠি দিয়ে দেখিয়ে বল্‌লে—"জঙ্গলের ওপারে—"

—"তা তো বুঝ্‌লাম। জঙ্গলের ওপারে কোথায়?"

—"আজ্ঞে কর্তা, তুলসীপুরই বটেন, তবে—"

ভাল ডাক্তার পুরনো হ'লে একটুতেই চটেন। হরি রায় তার ওপর খুব ভাল ডাক্তার ও বুড়ো মানুষ। ধমক দিয়ে বল্‌লেন—"আহাম্মক কোথাকার!"

ধমক খেয়ে লোকটা.যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—"এখন যাচ্ছিস্‌ কোথায়?"

—"আজ্ঞে, জঙ্গলের ওপারে—"

—"হুঁঃ। আমায় চিনতে পারিস্‌? সাতগড়ের হরি ডাক্তারের নাম শুনেছিস্‌?"

লোকটা এবার যাত জোড় ক'রে নিচু হ'য়ে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—"আজ্ঞে কর্তা, নাম শুনেছি, কিন্তু তেনার ওষুধ খাই নি।"

—"আমিই সাতগড়ের হরি ডাক্তার। আমার ওষুধের বাক্‌সটা মাথায় ক'রে তুলসীপুরের সতীশ মণ্ডলের বাড়ি পৌঁছে দিতে পারবি? দু' টাকা বক্‌শিস দেব—"

হারিকেনটা ততক্ষণে জ্বালা হয়ে গেছে। তার ম্লান আলোয় হরি ডাক্তার দেখ্‌লেন, লোকটার চেহারা চোয়াড়ের মতো, কিন্তু শরীর বেশ মজবুৎ ও লম্বা। তার চোখের দৃষ্টি সরল নয়, বাঁকা ও রুক্ষ এবং মাথায় লম্বা চুল, পরনের কাপড়, গায়ের চাদরখানা ময়লা।

ডাক্তারবাবু আবার জিগ্যেস করলেন—"পারবি ?"

সে বললে—"আজ্ঞে তা পারি—"

বেহারারা বললে—"হুজুর ! এই জঙ্গল ভেঙ্গে রাতের বেলা আপনি—"

ডাক্তারবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন—"চুপ !" তারপর "আমার ছাতি, লাঠি, স্টেথস্কোপ আর ওষুধের বাক্সটা বা'র কর্" বলতে বলতে তিনি জুতো পায়ে দিয়ে আস্তে আস্তে পাল্কি থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালেন।

পাল্কির ভেতর তোষকের নিচে দু'পাশে ছিল ছাতি ও লাঠি; পায়ের দিকে দেওয়ালের গায়ে তাকের ওপর ছিল স্টেথস্কোপ ও ওষুধের বাক্স। বেহারারা সেগুলো ব'র করতেই ডাক্তারবাবু স্টেথস্কোপটা পকেটে পুরে ছাতি ও লাঠিখানা হাতে নিতে নিতে লোকটাকে বললেন—"এই ! শুনছিস্ ওরে ! বাক্সটা মাথায় নে। খবরদার ! ওর তলায় তেলের দাগ লাগে না যেন—"

লোকটা গায়ের চাদরখানা দিয়ে মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললে,—"কর্তা ! আমরা গরীব মানুষ, । তেল পাব কোথায় ?"

তারপর বাক্সটা মাথায় তুলে নিতে, ডাক্তারবাবু লাঠি দিয়ে লণ্ঠনটা দেখিয়ে একজন বেহারাকে বললেন—'ওটা ওর হাতে দে। চল্—"

বেহারারা বললে—"হুজুর ! আমরা—?"

—"তোরা বাড়ি গিয়ে ছেলে-পুলেকে কোলে বসিয়ে নাড়ু খাওয়া গে—"

—"হুজুর, আমাদের ওপর মিছে রাগ করলেন। এই আঁধার রাতে একেবারে যমের মুখে—"

ডাক্তারবাবু কয়েক পা গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন—"যেতে পারবি নে, একথা আছে বললি নে কেন ? যা—যা—বেটারা ! আমার ভয় নেই। যম আমার স্যাঙাৎ !"

বেহারারা উত্তর না দিয়ে শূন্য পাল্কি কাঁধে তুলে সাতগড়ের দিকে ফিরে চললো। কিন্তু তাদের পা আর চলে না। ভয়ে বুক দুরু-দুরু করছে। মনে মনে বলতে লাগলো,—"আজকের রাতে এক মহা সব্বনাশ হবে। জয় মা কালী !—"

সেদিন সকাল থেকে সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়েছে; বিকেলের দিকে কিছু-কালের জন্যে ধরেছিল, আবার ঝুর-ঝুর ক'রে নামলো। হরি ডাক্তার ছাতা খুলে মাথায় দিলেন। বাক্সটার ওপর ছিল একখানা অয়েলক্লথের ঢাকনি।

যেতে যেতে ডাক্তারবাবু একবার ঘাড় ফিরিয়ে এদিক্-ওদিক তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। অন্ধকারে ও বৃষ্টিতে সব চুপ্সে, মুছে,

খেব্‌ড়ে কালো হ'য়ে আছে। হারিকেনের আলোয় যেটুকুও দেখা যায়, সেটুকুর দৃশ্যও বিশ্রী। কেবল জল-কাদা, ঝোপ-জঙ্গল, মাঝে মাঝে দুটি-একটি বড় গাছ। এর ওপর দিয়ে বাহকের কোমর থেকে পা দু'খানার সুদীর্ঘ কালো ও মোটা ছায়া নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে। বাতাস উঠেছিল। চারধার থেকে বৃষ্টিবিন্দুর টুপ্‌-টাপ্‌ শব্দ, ভিজে ডালপালার দীর্ঘশ্বাস এবং ব্যাঙ ও ঝিঁঝিঁর সরু-মোটা নানা রকমের ডাক ও শব্দ এক সঙ্গে জোট পাকিয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু অনুমান করলেন, দু'জনে চালদাপুরের জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়েছেন। তবুও জিগ্যেস করলেন—"কোথায় এলাম রে ?"

—"কর্তা ! চালদাপুরের জঙ্গলে। ঐ বাঁয়ে শিবকালীর পাট—" বললে লোকটা।

ডাক্তারবাবু সেদিক ফিরে তাকালেন ; কিন্তু অন্ধকারে দেখ্‌বেন কি ? হঠাৎ তাঁর মনে পড়্‌লো, এতক্ষণ লোকটার নাম জিগোস করা হয় নি ; বললেন—"তোর নাম কিরে ?"

—"কর্তা ! আমরা গরীব লোক ; আমাদের আবার নাম কি ?"

ডাক্তারবাবু মনে মনে বল্‌লেন "বেটা আচ্ছা আহাম্মক তো ! প্রকাশ্যে বললেন,—"তবুও—"

"আজ্ঞে, বুনো। কর্তা, একটু ডানদিক ঘেঁষে আস্‌বেন। বাঁয়ে গর্ত—"

ডানধার ঘেঁষে যেতে যেতে ডাক্তারবাবু থম্‌কে দাঁড়ালেন ; বল্‌লেন—"বুনো, ও কিসের শব্দ রে ? কে কাঁদ্‌ছে না ?"

সত্যই একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিল। কে যেন দূরে কোথায় কাঁদছে—'আহা—হা—হা , আহা—হা—হা !"

বুনো সমানে চল্‌তে লাগ্‌লো ; ডাক্তারবাবুর কথার জবাব দিলে না।

"হাঁ—হাঁ—নিশ্চয়ই কাঁদ্‌ছে। এই দাঁড়া ! ঐ শোন, এ যে আর্তনাদ !"

লোকটা বল্‌লে,—"কর্তা ! চুপ্‌-চাপ্‌ চ'লে আসুন। এখনও শিবকালীর পাট ছাড়াই নি—"

বাতাসের সজল সুরে শব্দটা প্রায় মিশে গিয়েছিল। ডাক্তারবাবু ভাব্‌লেন, 'তবে কি সত্যই চালদাপুরের জঙ্গলের পুবে—"

তিনি মাথা নিচু ক'রে চলেছেন। কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ বার দুই পেঁচার ডাক শুনতে পেলেন ; একটা কাছে, আর একটা তার একটু দূরে। পেঁচা রাতের বেলাতেই ডাকে। এতে আর ভয়ের কি ?

তারপর আরও কিছুদূর গিয়েই একটা সুতীক্ষ্ণ শিসের শব্দে ডাক্তারবাবু

চম্‌কে উঠ্‌লেন। শব্দটা বাতাসে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে, ডালের ফাঁক দিয়ে, বনের তলা দিয়ে, গাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। ঐ দূর থেকেও শিস্‌ ভেসে আসছে। আবার একটা পেঁচা ডেকে উঠ্‌লো।

ডাক্তারবাবু হাঁক্‌লেন—"এই বুনো, দাঁড়া—"

বুনো ফিরে দাঁড়ালো।

—"কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌?"

—"না কর্তা—"

আবার দূর থেকে শিস্‌ ভেসে এলো। ডাক্তারবাবুর এবার আর সন্দেহ রইলো না। তিনি বত্রিশ বছর ডাক্তারী কর্‌ছেন। এ পথেও বার কয়েক এসেছেন, তবে দিনের বেলা। কিন্তু এরকমটা কখনও হয় নি। নিশ্চয়ই আজ তিনি টিয়ার হাতে পড়েছেন! বল্‌লেন,—"এই বুনো—"

কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হ'তেই পাশের ভিজে জঙ্গল থেকে দুটি ছায়া-মূর্তি এসে সজোরে তাঁর হাত দু'খানা চেপে ধর্‌লো।

বুনো তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে উঠলো—"খবরদার! স'রে দাঁড়া। কেউ ওঁর গা ছুঁবি নে—"

লোক দুটো চট্‌ ক'রে স'রে দাঁড়ালো।

বুনো হারিকেনটা ওপর দিকে তুলে বল্‌লে,—"কর্তা, সঙ্গে কি আছে?"

ডাক্তারবাবু বুনোর মুখের দিকে চোখ তুলে বললেন—"একটা ঘড়ি আর রূপোর চেন, কয়েক আনা পয়সা, চশমা জোড়া—"

বুনোর মাথায় তখনও ওষুধের বাক্‌সটা ছিল। সে তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"আর কিছু নেই?"

—"হরি ডাক্তার মিছে কথা কয় না—"

—"এই বিচ্ছু, বাক্‌সটা ধর্‌। বুড়োটার কাপড়-চোপড় তালাস কর্‌বো।"

বিচ্ছু বাক্‌সটা বুনোর মাথা থেকে নিজের মাথায় তুলে নিতেই, বুনো ডাক্তারবাবুর সামনে এগিয়ে এলো।

হরি ডাক্তার বল্‌লেন,—"তুই বুঝি টিয়া?

—"হ্যাঁ গো মশায়। এইবার দাও তো সঙ্গে কি আছে?"

হরি ডাক্তার চেনটা বুক থেকে খুলে, ঘড়িটা বুক-পকেট থেকে বা'র ক'রে, টিয়ার হাতে দিতে দিতে বল্‌লেন,—"এ সবে তোর কি হবে? বেচ্‌লে দশটা টাকাও পাবি নে।

—"ঐ সঙ্গে তোমার জানটাও খাব—"

—"তাতে কি লাভ হবে? যে লোকটার চিকিৎসার জন্যে যাচ্ছি

মাথা থেকে; সে-ই মারা যাবে। তার চেয়ে এক কাজ কর্। আমি রোগী দেখে ফিরে আসি। সেখানে যে টাকাগুলো পাব সেগুলো, আর এই সব তোকে দিয়ে যাবো—"

—"ওরে বংশী, বুড়োটার রগড়ের কথা শোন্। প্রাণ দিতে কেউ ফিরে আসে? ঐ ক'রে পালাতে চাও যাদু?"

"পালাবার হ'লে এ জঙ্গলে রাতের বেলা ঢুকতাম না। ছাপান্ন বছর বেঁচেছি, আরও দু'চার বছর না বাঁচ্‌লে ক্ষতি কি? ছেলেটা ছিল সেটাও তো মারা গেছে—"

"তবে আর দেরী কেন? এখনই মর" ব'লেই টিয়া তার হাতের মোটা লাঠিছানা তুল্‌লো।

—"দেখ্, টিয়া, যমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার বড় আনন্দ হয় রে। ওটা আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে। একবার রোগীটাকে দেখবো। যদি আমার কথা কিছু শুনে থাকিস্, তা হ'লে এটাও নিশ্চয়ই শুন্‌তে পেয়েছিস্, হরি ডাক্তারের যে কথা সেই কাজ। আমি ঠিক ফিরে আস্‌ব।"

টিয়া কি যেন একটু ভাব্‌লে; তারপর বল্‌লে—"আচ্ছা, আমি তোমায় এখান থেকে ডুলিতে চড়িয়ে তুলসীপুর নে যাব। সেই ডুলিতেই আবার ফিরে আস্‌বে। কিন্তু খবরদার! আমার যদি কোন ক্ষেতি হয়, আর যদি ফিরে না আস, তা' হ'লে তোমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে, তোমায় খুন ক'রে গাছে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌বো। কেউ ঠেকাতে পার্‌বে না।"

হরি ডাক্তার খুব সহজ সুরে বল্‌লেন—"আচ্ছা।"

বুনো বললে, "ওরে বংশী, ডুলি আন্। হীরু আর মদ্দাকেও ডেকে আন্‌বি—" মিনিট দশেকের মধ্যেই একখানা ডুলি এলো। ডাক্তারবাবু তাতে উঠে বস্‌লেন। বেহারা হলো বিচ্ছু, বংশী, হীরু আর মদ্দা; টিয়া নিলে হাতে হারিকেন, মাথায় ওষুধের বাক্সটা।

জল-কাদা ভেঙ্গে ডাক্তারবাবুকে কাঁধে নিয়ে বাহকরা ছুটে চল্‌লো তাদের গলা থেকে একটানা শব্দ বা'র হচ্ছে—"উহু হুঁ-হুঁ-উহু হুঁ-হুঁ।"

আবার বৃষ্টি পড়্‌ছে; দূরে শিয়াল ডেকে উঠলো। ডাক্তারবাবু চুপ ক'রে ব'সে ভাবছেন, এ মন্দ নয়। গল্প শুনেছি, ভূতের ওঝারা ভূতের পাল্কি চ'ড়ে বেড়ায়। আমি চলেছি ডাকাতের ডুলিতে।

রাত তখন বারোটা হবে। জঙ্গলটা শেষ হয় আর কি। এমন সময় হঠাৎ চারধার থেকে মশাল ও বন্দুক হাতে একদল লোক ডাক্তারবাবুর ডুলি ঘিরে হেঁকে উঠলো—"এই! খাড়া রহো—"

বাহকরা স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো। হরি ডাক্তার ডুলি থেকে মুখ বা'র ক'রে দেখেন, সাম্‌নে দারোগা সাহেব; হাতে পিস্তল।

দারোগা সাহেব হরি ডাক্তারকে দেখেই বল্‌লেন—"তাজ্জব ব্যাপার! ভেবেছিলাম, ডুলিতে টিয়া বেটা বউ সেজে পালাচ্ছে, তার বদলে আপনি!"

হরি ডাক্তার বললেন—"হাঁক শুনে আর মশালের আলো দেখে আমারও বুক কাঁপ্‌ছিল—বুঝি ডাকাতটার হাতে পড়্‌লাম! এখন দেখ্‌ছি আপনি—"

—"আপনার সাহস আছে তো ডাক্তারবাবু! এই রাত্রে জঙ্গল ভেঙ্গে চলেছেন কোথায়?"

—"কি আর করি বলুন? যাচ্ছি তুলসীপুর সতীশ মণ্ডলের বাড়ি। তার ছেলের কলেরা। জানেন তো আমরা ডাক্তার মানুষ যমের স্যাঙাৎ; আমাদের সময়-অসময় কিছু নেই। আপনি এমন অসময়ে এই জঙ্গলে?"

—"খবর পেয়েছি, বেটা এখন এই জঙ্গলে আছে। আপনার ডুলি কোথাকার।"

—"সাতগড়ের—"

—"পাল্কিতে এলেন না কেন?"

—"পাওয়া গেল না।"

—"বটে! আপনার ডুলির বেহারাগুলোর চেহারা কিন্তু ভাল নয়। যেটার মাথায় বাক্‌সটা আছে সেটা ঠিক—"

ডাক্তারবাবু দারোগা সাহেবের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"কোন্ দিন হয়তো বল্‌বেন, আমার চেহারাটাও খুনীর মতো—"

দারোগা সাহেব হাঁক্‌লেন—"এই জমাদার! ডাক্তারবাবুকো যানে দেও।—নমস্কার।"

"নমস্কার!" ডাক্তারবাবু হাঁকলেন—'ওরে শশী! পা চালিয়ে চল্। বেটারা এখানেই রাত কাবার কর্‌বি।"

বেহারারা এবার আরও জোরে শব্দ করতে লাগলো—"উঁহু—হুঁ—হুঁ—ও; উঁহু—হুঁ—হুঁ—ও!"

তাদের পা আরও জোরে চল্‌ছে।

তারপর তা'রা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে যখন তুলসীপুরে সতীশ মণ্ডলের বাড়ী গিয়ে পৌঁছল তখন রাত ঠিক একটা। চারধার নিঝুম, কেবল দূর থেকে চৌকীদারের হাঁক ভেসে আস্‌ছে। মণ্ডল মশায়ের বৈঠকখানার

বারান্দায় ব'সে কে যেন 'ফুড়ুৎ' 'ফুড়ুৎ' শব্দে হুঁকো টান্‌ছিল। তার পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। বারান্দার এক কোণে একটা কুকুর শুয়ে ছিল। বেহারারা ডুলিখানা অন্ধকার উঠোনে নামাতেই কুকুরটা 'ঘেউ ঘেউ' করতে কর্‌তে উঠে দাঁড়ালো। যে লোকটা হুঁকো টান্‌ছিল, সে বল্‌লে—"কে এল।"

বংশী বল্‌লে—"সাতগড়ের ডাক্তারবাবু—"

লোকটা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সে ভিতর বাড়ির দিকে চ'লে যেতেই ডাক্তারবাবু ডুলি থেকে বেরিয়ে এলেন।

টিয়া হঠাৎ তাঁর কাদামাখা পা দু'খানা জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—"কর্তা, আপনি আমার মা-বাপ। এই পা ছুঁয়ে কিরে ক'রে গেলাম, আমার জান থাক্‌তে কেউ আপনার ক্ষেতি করতে পারবে না। ওরে বংশী, এই মদ্দা, তোরা দেবতার পায়ের ধুলো জিভে, মাথায় ঠেকা—"

ইতিমধ্যে মণ্ডল মশায় বেরিয়ে এলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টিয়ার দলও হাওয়া।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারবাবু সাতগড়ের নিজের বৈঠকখানার বারান্দায় জলচৌকির ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছেন। দুপুরে তুলসীপুর থেকে আসবার পথে শুনেছিলেন, পুলিশ চালদাপুরের জঙ্গলে টিয়ার আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; কিন্তু কারুকে ধরতে বা কিছুই উদ্ধার করতে পারে নি। তিনি নিজের মনে ব'লে উঠলেন—"বেটা বাহাদুর!"

এমন সময় একটা ছায়ামূর্তি অন্ধকার উঠোনের ওপর দিয়ে এসে তাঁর চৌকীর সামনে একজোড়া মস্ত ইলিশমাছ ও চারটে আনারস রেখে মাটিতে টিপ্‌ ক'রে মাথা ঠুকেই মিলিয়ে গেল।

এটা পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। এখন সে ডাক্তারবাবু ও টিয়া কেউ-ই নেই, আছি শুধু আমি, আর চালদাপুরের জঙ্গলের খানিকটা। সেখানে গেলে শিবকালীর পাট আজও দেখা যায়।

স্বপ্নে পাওয়া গল্প

সেদিন সকাল থেকে এমন দু-চারটে কাজের ঠেলায় পড়েছিলান যে, অন্তুতঃ চারমাইল না হেঁটে উপায় ছিল না। ফলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুটা বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হোত। কিন্তু অর্থাভাব, অর্থাভাব না বলে বলা উচিত ক্ষুধা, সে কথা শুনতেই চায় না। কাজেই সন্ধ্যেবেলায় গল্পটা লিখতে বসলাম। বেশ একটা প্লটও মাথায় এসে গিয়েছিল। গল্পটা লিখে পত্রিকা সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছে দিলেই দক্ষিণা। লোকটি লেখক-দরদী কিনা! আর, তাই দিয়ে পরের দিন সকালে উঠেই থলি হাতে র‍্যাশনের দোকানে গিয়ে লাইন দেবো।

জ্বলন্ত সিগারেটটা ছাইদানীতে রেখে সবে একটি বাক্যের দুটি কথা লিখেছি, এমন সময়ে লোকটা মূর্তিমান বিরক্তির মতো ঘরে ঢুকেই আমার বিনা অনুমতিতে সামনের চেয়ারে বসে পড়লো। তাতে যেমন বিরক্ত তেমনি অবাক হলাম। তাকে আগে কখন দেখিনি।

বিরক্তির সঙ্গে প্রশ্ন করলাম,—'কী চাই?'

সে ততক্ষণে পকেট থেকে রুমাল বার করেছিল। ঘাম মুছতে মুছতে বললে—'চাই আপনার উপকার করতে। তার আগে চাই এক কাপ চা।'

তার কথায় হতভম্ব হয়ে আস্তে আস্তে বললাম,—আ-মা-র-উ-প-কা-র? কিন্তু আপনি কে?

—'যাদুকর, মানে, জাগ্‌লার—ম্যাজিসিয়ানও বলতে পারেন? প্রফেসরও বলা যায়।'

শ্লেষের সঙ্গে বললাম,—'এই গরিবের প্রতি এত দয়া যে! আপনি ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন।'

—'কিসসু ভুল জায়গায় আসিনি, স্যার।'

হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনে শূন্যে একটা ডাণ্ডা। তারপরই একটা রক্তমাখা বল্লম ঝুলছে। বুঝলাম লোকটা ম্যাজিসিয়ানই বটে।

লোকটি বললে,—'চা আনতে বললেন না?'

ব্যঙ্গ করে বললাম,—'উপকারের দাম নাকি? আপনি তো জাগ্‌লার। না করতে পারেন কী? একটা তুড়ি দিন। চা কেন, সেই সঙ্গে কেকও এসে পড়বে।'

ডাণ্ডা ও বল্লম দেখেও আমার একটুও ভয় হলো না। বরং খুব কৌতুক বোধ করলাম। আবার বললাম,—'আমি বড় ব্যস্ত। ম্যাজিক দেখবার সময় আমার নেই। দুঃখিত যে আপনাকে চা খাওয়াতে অক্ষম।'

—"মশায়! আজকালকার উপকারীকে এত সহজে এড়ানো যায় না। আপনাকে আমার উপকার স্বীকার, আর, আমাকে আপনার উপকার করতেই হবে। বুঝতে পারছেন না, এমন কলে পড়েছেন যে বেরোবার উপায় নেই। আপনি বলছেন ব্যস্ত। কেন ব্যস্ত আমি জানি। আপনার গল্পের প্লটও আমার জানা। ঐ দেখুন—"

চোখ তুলে দেখি, আমার চারধারে বন্যার জল; অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে, ঘূর্ণি-ঝড় অট্টহাস্যে ঘুরপাক দিচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে ঘর, ভাসছে মানুষ-গরু-ছাগল-কুকুর। শোনা যাচ্ছে আর্তের বুকফাটা কান্না। জলস্রোতের আতঙ্ককর কল্‌কল্ শব্দ। আকাশের ও পৃথিবীর সব আলো, সবটুকু আনন্দ ও আশা ধুয়ে মুছে ভেসে চলে গেছে। উঃ কী অন্ধকার!

—'হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন আপনার গল্পটির পটভূমি এই নয়কি?' বললে লোকটা।

কানে এলো পেয়ালা-পিরিচের চির পরিচিত ঠুং-ঠাং আওয়াজ। দেখলাম, দু-পেয়ালা চা আর সেই সঙ্গে দুখানা বাটার কেক শূন্য পথে এসে ঠক করে টেবিলের ওপর কে যেন রাখলো।

লোকটা বললে,--'নিন। খান। এবার বুঝতে পারছেন আমি জাগলার কিনা?'

বললাম—'বুঝতে পারছি। আরও ভাল করে বুঝব ঐ পেয়ালাটার দিকে হাত বাড়ালেই যদি দেখি, ওখানে কিছুই নেই। স্বীকার করি, আপনারা সব পারেন। কেবল একটা জায়গায় একেবারে ফেলিওর।'

—'কখনও না।'

—'নিশ্চয়। আমার গল্পের প্লট যা বললেন, তার ত্রি-সীমানায় যেতে পারেন নি। আমার গল্পটা, সেবার পূজোর ছুটিতে বিদেশ থেকে বাড়ি আসবার পথে কি রকম সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছিলাম, আর তিনটে দুর্বৃত্ত আমার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে এসে কিভাবে আমার উপকার করেছিল, এই প্লটের ওপর রচনা করবো।'

—'হাঃ হাঃ হাঃ। দেখলেন তো আমরা কেমন লোকের মনের কথাও টেনে বার করি? সুতরাং ফেলিওর হইনি। কিন্তু এটাও আপনার গল্পের প্লট নয়। পরে বলছি, সেটা কি।'

ভয়ঙ্কর রাগ হলো ; বললাম,—'আমারই ঘরে বসে আমাকেই মিথ্যাবাদী বলে অপমান ! বেরিয়ে যান—বেরোন বল্‌ছি— ।'

—'মনে রাখবেন, এমনি দিন এসেছে যে কাউকে ঘর থেকে বার করে দিতে গেলে সে আপনাকে ধরাধাম থেকে পেটে এক খোঁচায় বার করে দিতে পারে। না গেলে কি করবেন বললেন না তো ?' বলে লোকটা ধীরে-সুস্থে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে চেপে দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাঁতড়াতে লাগলো। না পেয়ে দুবার পকেট চাপড়ে দেশলাই জ্বালাবার ভঙ্গীতে হাত দুটো ঘষতেই আগুন জ্বলে উঠলো। লোকটা সেই আগুনে সিগারেট ধরিয়ে বার কয়েক জোর টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। ধোঁয়ায় ঘর এমন ভরে গেল যে, সেই লোকটা তো দূরের কথা আমার নিজেরই হাত-পা পর্যন্ত অদৃশ্য হলো। ধোঁয়ার পটভূমিতে যা ফুটে উঠতে লাগলো—তা হলো—

'একখানি ছোট নৌকোয় চেপে পাথার পার হচ্ছে কয়েকটি পুরুষ, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ও কয়েকটি স্ত্রীলোক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছে, একজন, কপাল চাপড়াচ্ছে। একটা বড় গাছ ঘুরতে ঘুরতে ভেসে আসছিল। সেটা নৌকোর কাছে আসতেই যে লোকটার হাতে লগি ছিল সে লগি দিয়ে গাছটাকে ঠেলা দিতেই নৌকোখানা কাৎ হলো। টাল সামলাতে না পেরে একটি ছোট মেয়ে ঝপ্ করে পড়ে গেল জলে ! দুরন্ত স্রোত যেন এরই অপেক্ষায় ছিল। সে অমনি ক্ষুধার্ত কুমীরের মতো তাকে মুখে করে নিয়ে একদিকে ছুটতে লাগলো।

নৌকোয় কান্নার রোল উঠলো "ওগো, আমার কুমুকে বাঁচাও।"

মেয়েটিরই নাম বোধ হয় কুমু ; আর যে স্ত্রীলোকটি কেঁদে উঠলো সে বোধ হয় ওর মা, কি মাসী ! ওদের বাড়ী ছিল বোধ হয় কোন গাঁয়ে যেখানে ছিল বড় দীঘি, সায়র বা পুকুর যার জলে নাইতে গিয়ে ও সাঁতার কাটতো। তাই ডুবলো না। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভেসে চললো। ওকে বাঁচাতে কেউ জলে লাফিয়ে পড়লো না। যে পড়বে তাকেও যে মরতে হবে। কাছেই দেখা গেল, একখানা নারকোল গুঁড়ির ভেলা। তাতে রয়েছে কয়েকটি স্ত্রী-পুরুষ ও একটি মেয়ে। তারা কুমুর দিকে লগি বাড়িয়ে দিলে। কুমু ধরতে পারলো না এবং একবারে ডুবে গেল। বোধ হয় স্রোতের সঙ্গে, না, মৃত্যুর সঙ্গে আর লড়াই করতে পারছে না। ভেলার মেয়েটা কাউকে কিছু না বলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দিকে সাঁতরে যেতে লাগলো। তার কাছে গিয়ে পৌছলো কিন্তু

—না, সেই ওপড়ানো গাছটাও ঘুরপাক দিয়ে কংকালের মতো একটি ডাল বা হাত বাড়িয়ে দিলে। মেয়ে দুটো গলা জড়াজড়ি করে ডালটা ধরলো। ওপড়ানো, ভাসমান, প্রাণহীন গাছটা ওদের সাহায্য না করলে ওরা গলা জড়াজড়ি করেই ডুবতো। অথচ ওরা কেউ কাউকে চেনে না। ওদের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হোত কে? বন্যার জন্যে দায়ী করা যাবে কাকে? দুর্ভিক্ষের জন্যে না হয় কাউকে না কাউকে আঙুল দিয়ে দেখানো যায়।

তার পরই দেখি শুকনো ডাঙ্গা। একদল লোক ছুটছে, যেন পালাচ্ছে। আর চারধার থেকে কতকগুলো লোক তাদের পিছু নিয়েছে। তারা ছুটতে ছুটতে বল্‌ছে, 'ভয় নেই—ভয় নেই। শুধু তোমাদের উপকার করবো—দাঁড়াও—দাঁড়াও—'

অমনি কোথা থেকে কি হয়ে গেল। দু-তিনটে লোককে সেই পিছনে ছোটার দল খপ্ করে ধরে টানাটানি করে বল্‌তে লাগলো—'উপকার করবো—উপকার। উপকার করতে না দিলে—'

তার মধ্যে থেকে কে যেন ধমক দিলে,—'এই! আমি ওর উপকার করবো—'

তার প্রতি ধমক দিয়ে একজন বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠলো,—'খবরদার! ওকে ছেড়ে দাও। ওর উপকার করবো আমি। এ আমার লোক।

দেখতে দেখতে উপকারীদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব বাধলো। দুম-দাম, ধুপ-ধাপ শব্দ হতে লাগলো। সেই ফাঁকে লোকগুলো প্রাণ নিয়ে হাওয়া।

কানে এলো,—'কেমন এটাও কী আপনার গল্পের প্লট নয়?'

তাকিয়ে দেখি, ধোঁয়া-টোয়া কিছুই নেই, সেই জাগ্‌লার ও আমি সামনাসামনি বসে আছি। বল্‌লাম,—'বুঝতে পারলাম, আপনি জাগলার বটে কিন্তু আমার প্লট সম্বন্ধে আপনার ধারণা ভুল। গল্পের কোন প্লটই আমার মাথায় আসে নি, আসছে না। মনে হচ্ছে, আসবেও না; ফলে আমার র‍্যাশন—'

—'মশায়! সে সব না জেনে কি আপনার এখানে এসেছি? অনর্থক মাথা গরম করে আমাকে ঘর থেকে বার করে দিতে গিয়েছিলেন? এতক্ষণ যা দেখিয়েছি তা ভুলে গিয়ে যা বলছি তা লিখুন।'

'আপনার লেখা 'জুয়াড়ি' গল্পের কিশোর নায়ক বিল্লীকে মনে পড়ে? মনে পড়ে না কি তার জুয়াখেলার ঘটনা? মনে করিয়ে দিচ্ছি—সে ছিল এক পিতৃহীন দরিদ্র কিশোর, পর-গৃহে মানুষ হচ্ছিল। জুয়াখেলে সে পয়সা

অর্জনের আশায় তার মামা-মামীর কাছ থেকে অনেক কান্নাকাটি করে চারটি পয়সা। জোগাড় করে। আর তুলসীতলার মাটি খুঁড়ে পায় তিনটি পয়সা। মনে রাখবেন, এ হচ্ছে চল্লিশ বছর আগেকার ঘটনা। তখন পয়সা ছিল তামার, দাম ছিল অনেক, আকার ছিল বড়। সেই সাতটি পয়সা নিয়ে সে গাঁয়ের মেলায় যায় জুয়া খেলতে। মনে পড়েছে নাকি সে খেলায় জিততে. তো পারেই নি, বাড়ি এসে তার সেজ মামার কাছে বেদম মার খেয়েছিল ? কারণ, জুয়াখেলা দোষের, খেলাটাই বে-আইনী। জুয়া খেলে মন্দ লোকে। সেদিন সমাজবাদ নিয়ে বড়রা মাথা ঘামাতো না। সকলেই বড়লোক হতে চাইতো। আমি সেই বিল্লী।'

অবাক হয়ে বললাম,—'আপনি—তুমি আমারই বিল্লী ? একটু আগেই না বললে, তুমি জাগলার।'

—'ঐটে এখন বৃত্তি করেছি, কিন্তু দেখছি এ বৃত্তিতে বড়লোক হওয়া যায় না।'

—'বল কি হে ? যাদুর খেলা দেখিয়ে বাড়ি, গাড়ি, মান সবই যে পাওয়া যায়! এই শহরেই তার প্রমাণও আছে। যাদুকর যে দেশের গৌরব! বিদেশে সে দেশের গৌরব বাড়ায় এমন কথাও—'

. 'আপনার কথা ঠিক। হাতসাফাইয়ের খেলা দেখিয়ে বিদেশে দেশের গৌরব আর শ্রেষ্ঠত্ব বাড়ানো যায় তা দেখছি বটে! আবার ডুগডুগি বাজিয়ে পথে পথে যাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, খেলা শেষে একটা পয়সার জন্যে তারই মতো একটা বিত্তহীন দর্শকের কাছে হাত পাতে যারা তাদেরকেও কি দেখেন নি ? এই যেমন আপনি। আপনার মতো লেখকদের গাড়ি-বাড়ি তো দূরের কথা, ভদ্রসমাজের কোথাও কেউ পোঁছে না। যদি আপনার কোন বইয়ের গল্প, বায়োস্কোপ, মানে বায়-স্কোপের সঙ্গে যদি আপনার যোগ থাকতো, যেমন খবরের কাগজের—না থাক্, কথাগুলো বড় কড়া হচ্ছে—'

—'বল—বলে যাও—থেমো না—কিছু খারাপ লাগছে না—'

—'না না। আপনি আমার স্রষ্টা। আপনাকে অপমান করে মনে আঘাত দেবো না, আপনার উপকার করবো। আপনাকে বড়লোক করে দিতে চাই। কি উপায়ে জানেন ? জুয়াখেলার মধ্য দিয়ে। সেকালে জুয়াখেলা ছিল দোষের, বে-আইনী। আজ. দিন পাল্টেছে। আজ আইনী. বে-আইনী দু'রকমেরই জুয়াখেলা চলছে—রাজ্যে রাজ্যে এই বিচিত্র কাণ্ড। এখন চারধারে মুখে মুখে সমাজবাদের কথা। তারই

মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় আইনী জুয়ার রাশি রাশি টিকিট বিক্রী হচ্ছে। গরীবের মনে বিপুল আশা জেগে উঠছে—এক টাকায় সে রাতারাতি বড়লোক হয়ে সমাজবাদের কচুবনে ভ্যারেণ্ডা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়বে। সেদিন যেন কার মানতের তিনটে পয়সা তুলসীতলা থেকে চুরি করে জুয়া খেলে টাকা কামাতে চেয়েছিলাম, আজ একজনের একটা হাতঘড়ি চুরি করে মানে, ব্ল্যাক-আর্টের খেলায় যা পেয়েছি তাই দিয়ে যত রাজ্যের আইনী জুয়ার টিকিট কিনেছি। তারই একখানা আপনাকে দেবো। দেবো সেই টিকিট যাতে পাওয়া যায়, তিন লক্ষ টাকা। কারণ, এই জুয়াড়ীটির জন্ম আপনার কলমের মুখে, তারই কালিতে। আর যার ঘড়িটি হাতসাফাই করেছি তাকে গোপনে পাঠিয়ে দেবো একশোটা ঘড়ির দাম। দেখুন, যেমন ডাকাতদের মধ্যে মহৎ আছে, তেমনি চোরও মহৎ হয়। হয় না কী? কত মন্দির, মঠ, ধর্মশালা চোরেরই কীর্তি। কিন্তু আপনাকে আমি বিনামূল্যে টিকিটখানা দেবো। কেন জানেন? আমাকে সৃষ্টি করে, আমাকে বেচে আপনি দাম নিয়ে বলছিলেন—দক্ষিণা। আমিও চা খেয়ে টিকিটখানা দিয়ে বলছি, আপনার স্নেহের দান। নিন—ধরুন। ও কি? হাত সরিয়ে নিচ্ছেন কেন?'

তার স্পর্শে চমকে উঠলাম। দেখলাম, সামনে আমার নাতি দাঁড়িয়ে হাত ধরে টানতে টানতে বলছে,—'দাদু, তুমি এখনও চা খাওনি? মা কখন তোমায় চা দিয়ে গেছে! লিখতে বসে কলম হাতে করে ঘুমোচ্ছো?

—'ঘুমুই নি—ঘুমুই নি—। দেখ তো ভাই, আমার হাত-ঘড়িটা কোথায় গেল। টেবিলের ওপর খুলে রেখেছিলাম। সেই লোকটা নিয়ে গেলো নাকি? পাচ্ছি না তো।'

—'ঐ তো ঘড়িটা তোমার হাতে বাঁধা। কোন্ লোকটার কথা বলছো? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখছিলে। আমি চা নিয়ে যাচ্ছি গরম করতে। ঐ দেখ, তোমার সিগারেট ছাইদানির ওপর পুড়ে ছাইয়ের সিগারেট হয়ে আছে—'বলে সে হাসতে হাসতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ঘড়ি দেখে বুঝলাম, মাত্র দশ মিনিট আগে লিখতে বসেছিলাম। একটা লাইনও না লিখে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন ,দখছিলাম। নাতিটি না জাগালে আরও কত কি দেখতাম! আর সময় না থাকায় সেই স্বপ্নে পাওয়া গল্পটিই হুবহু লিখে সদাশয় সম্পাদক মহোদয়ের দপ্তরে দিলাম। দেখা যাক্ ফল কি হয় ও পাঠকেরা কি বলে।

কর্তাবাবুর পেত্নী দেখা

কর্তাবাবুর অনেক সম্পত্তি, বয়সও অনেক, পাড়ার লোকে খাতিরও করে খুব। বাড়িতে চাকর-বাকর, ঝি-রাঁধুনিও কম নয়। তারা থাকে মস্ত তেতলা বাড়িখানার নিচুতলার অন্ধকার দিকটাতে। আর, তিনি তাঁর পরিবারবর্গসহ থাকেন, মানে ছেলে-মেয়ে, পুত্র-পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী প্রভৃতিদের নিয়ে দোতালা-তেতলা জুড়ে।

সব কালেরই পয়সাওয়ালাদের নাতি-নাতনীরা হয় এক একটা ক্ষুদে নবাবজাদা ও নবাবজাদী। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শখ্ ক'রে গরিবী চালও চালে। যেমন কর্তাবাবুর নাতি তরু, নাতনী অরু। ওরা দু'জনে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই-বোন। ওদের অনেক বন্ধু-বান্ধবী। তারা কেউ পয়সাওয়ালা, কেউ আধা-পয়সাওয়ালা, কেউ আধা-গরীব, কেউ পুরো গরীব। তরু-অরুদের বাড়িতে তিনখানা মোটর, চার খানা স্কুটার ও তিনখানা বাইসিক্ল। তবু ওরা তাতে চড়ে না, চড়ে ট্রামে-বাসে, ট্যাকসিতে, রিক্সয়। দরকার হলে হাঁটতেও পিছ্পা হয় না। ওরা সবে কলেজে ঢুকেছে। সুতরাং পোশাক-আসাক, চুল-জুলপি যে স্কুলের খোকা-খুকুদের মতো হতে পারে না, তা কী বিশেষ ক'রে বলার দরকার? তাই কখন কখন দু'ভাই-বোন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে পিছন থেকে অরুকে মনে হয় তরু, তরুকে অরু। সকলেরই একটা না একটায় বেশী টান থাকে। ওদের শখ সিনেমা দেখায়, বিশেষ করে হিন্দী সিনেমায়, সিনেমার হিন্দী টপ্পা গানে। এতে দোষের কী থাকতে পারে? দোষের হলে ভারত জুড়ে এমন কাণ্ডই হতো না। গান মানেই হিন্দী টপ্পা!

আর, বুড়ো কর্তাবাবুর হয়েছে খাবার দিকে টান। বুড়ো হ'লে আর পয়সা থাকলে এমনটা হয়েই থাকে। রোজ রকম রকম ব্যঞ্জন, দুধ-ঘি'র খাবার তাঁর চাই-ই। তাঁর জন্যে একটা আলাদা রাঁধুনী আছে। তার তিন কুলে কেউ নেই। গিন্নীমা তিন বছর আগে গঙ্গার ঘাট থেকে তাকে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার' মতো একদিন কুড়িয়ে এনেছেন। মানুষটির মুখে কথা নেই, রাঁধেও ভাল, জানে ও শিখেছেও অনেক। কিন্তু সব দিন টক-নুন-ঝাল সমান হয় না। কর্তা সেদিন ক্ষেপে যান; বলেন—'দূর ক'রে দাও। আমার পয়সা সস্তা?'

সত্যি তো! পয়সা খরচ ক'রে শখের খাবার যদি খাওয়া না গেল তবে রাগ হবারই তো কথা। বেচারী রাঁধুনী রান্না ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে নীরবে কাঁদে।

গিন্নীমা কর্তাকে ঠাণ্ডা করেন। তার চাকরি যায় না।

এখন, কর্তাবাবু বাড়ির মধ্যে দুটি প্রাণীকে বেশী ভালবাসেন। একটি তাঁর শখের কাব্‌লি বেড়াল,—শের খাঁ, ; অপরটি তাঁর নাতনী অরু। বেড়ালটা দু'বেলা তাঁর খাবার টেবিলের এক কোণে দেখেও না দেখার ভাণ ক'রে বসে থাকে ; আর দু'টি বেলা তিনি ভাল খাবারের খানিকটা তাকে দেন ও খানিকটা অরুর জন্যে রাখেন। বেড়ালটার রুচি থাকলেও রাত্রে অরুর প্রায়ই খাবারে অনিচ্ছা হয়। শুনে কর্তাবাবু চিন্তায় পড়েন ; বলেন—'ডাক্তার দেখাও। নির্ঘাত ওর অসুখ করেছে।'

কর্তাবাবু তো সিনেমা দেখেন না! দেখলে, চোখে পড়তো সিনেমার মতো তার পাশে রেস্তোরাঁও 'ফুল।' যেখানে যত রেস্তোরাঁ-হোটেল আছে সে সব চলে, আধা-গরীব আর গরীবের পয়সায়। সে পয়সার জোগাড় হয়—না থাক। আর, বড় বড় হোটেল চলে পয়সাওয়ালাদের টাকায়। অরু পয়সাওয়ালার নাতনী হলেও আগেই বলেছি, তার গরিবী চাল, যে গরিবী হঠাতে বহু তক্‌লিফ সইতে ও কথা শুনতে হচ্ছে। তাছাড়া, রেস্তোরাঁর চপ-কাটলেট, কষা মাংসের কাছে বাড়ির তৈরী যে কোন খানা মনে হয়, ভূষিমাল বা গরুর খাদ্য।

কর্তাবাবু যে রাতে পেত্নী দেখলেন, তার আগে রাঁধুনীটা পর পর তিন রাত রান্নায়, পরিবেশনে গড়বড় ক'রে দারুণ ধমক তো খেলই, বেচারীর চাকরিটিও গেল। পরদিন ভোরেই কাউকে কিছু না বলে, এবং মাইনে-পত্তর না নিয়েই সে চলে গেল। সকালে উঠে সবাই দেখলো, তার খুপ্‌রির দরজা হাট, কেবল একটা ছোট পুঁটলি পড়ে আছে! কর্তা বললেন—'দেখ, কিছু নিয়ে সটকেছে কিনা। পুলিশে ডাইরি করো। ওর ছবি—'

গিন্নীমা বললেন—'তোমার যেমন আদিখ্যেতার কথা! যার ঘর-দোরআছে পুলিশ তারই কিছু করতে পারে না, ওর তো তিনকুলে কেউ নেই। ওর ছবি কী হবে? খবরের কাগজে ছাপাবে? ওই তো পেত্নীর মতো ছিরি। কে ওর ছবি তুলে রেখেছে?'

কর্তা আর কিছু বললেন না।

তার চারদিন পরে সকালের দিকে এক গ্রাম্য কিশোর এসে বললে—'মাসী পরশু রেতে কলেরায় মরেছে। মরবার সময় বলেছে, তার তিন মাসের মাইনে বাকি। ট্যাকাগুলো দেন। তাই দে তেনার ছেরাদ্দ-শান্তি করতে বলে গেছে।'

শুনে সবাই অবাক! যার তিনকূলে কেউ নেই তার বোনপো এলো কোথা থেকে?

বাড়ির একজন বললে—'তিনকুল মানে, বাপের, মায়ের, শ্বশুরের কুল।'

একজন রসিকতা করে বললে—'আর বোনপো মানে বুনোকুল—ষ্যা ষ্যা—'

কর্তাবাবুর কানে কথাটা উঠতেই তিনি সরকারকে ডেকে জিগোস করলেন,-'বামনী কদ্দিনের মাইনে পাবে?'

সরকার বললে—'আজ্ঞে, এই মাসে মরেছে। এই মাসের সাত দিনের যদি সত্যিই মরে থাকে। গাঁয়ের লোক ভারি মিছে কথা কয়—'

—'তোমার বাড়ি কোতা?'

—'গাঁয়ে। তবে আমি ঐ সবের জন্যে আর গাঁয়ে যাই নে।'

—'ব-টে! ছোঁড়াটাকে সাতদিনের মাইনে চুকিয়ে বিদেয় করে দাও—

—'যে আজ্ঞে।'

কিন্তু ছেলেটা একটা পায়সাও না নিয়ে চলে গেল।

শুনে গিন্নীমা বললেন—'বিষ নেই কুলোপনা চক্কর।' না নিবি তো বয়েই গেল!'

পরদিন শনিবার। তিনি গেলেন তারকেশ্বরে বোন-ঝির বিয়েতে। ফিরবেন পরদিন।

রাত্রে কর্তাবাবু খেয়ে-দেয়ে শুয়েছেন। একতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানধারে তাঁর ঘর। আর সিঁড়ির বাঁধারের ঘরে শোয় তাঁর দুই নাতনী অরু ও সরু।

গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণে বাতাস হুহু ক'রে ঘরগুলোতে ঢুকে উত্তরের জানলাগুলো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণে বাতাসকে কে না ভালবাসে? এমন কি কর্তাবাবুও। তাই শিলিং ফ্যান ঘুরতে থাকা সত্বেও তাঁর ঘরের দরজা-জানলা খোলা। রাত তখন বারোটার কাছাকাছি—সিনেমার 'নাইট-শো' থেকে দর্শকেরা বাড়ি পৌঁচচ্ছে আর কী!

হঠাৎ কর্তাবাবুর ঘর থেকে রব উঠলো—আঁ-আঁ-আঁ—।'

কর্তাবাবু বিছানায় উঠে বসে ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে

তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাত দু'খানা ছড়িয়ে দারুণ ভয়ে চীৎকার করবার চেষ্টা করছেন—কিন্তু স্বর গলাতেই আটকে গিয়ে কেবল বার হতে লাগলো,—বা-ম-ইঁ-ইঁ-পেঁ-ৎ-হেঁ-হেঁ-ইঁ-আঁ-আঁ-আঁ—'।

এই শব্দ ক্রমেই উচ্চগ্রামে চড়তে লাগলো। তারই সঙ্গে একটি মেয়েলী গলা শোনা যেতে লাগলো, 'ও দাদু, আমি—আমি এসেছি'—

কিন্তু দাদুর মানে কর্তাবাবুর ভয়ার্ত চীৎকার বা গলার স্বর তবু থামে না, বরং আরও বাড়ে। শেষে তা যেন চিরে গেল।

ততক্ষণে বাড়ির প্রায় সকলেই ছুটে এসেছে—ঘরে-বারান্দার আলো। তারা দেখলো কর্তাবাবু বিছানায় বসে দু-হাত ছড়িয়ে হাঁ ক'রে কাঁপছেন, চোখ দুটো কপালে উঠেছে; আর তাঁর সামনে কাঁচের গেলাস হাতে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে অরু।

হৈচৈতে কর্তাবাবুর সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন!

অরুর বাবা জিগ্যেস করলেন—'বাবা, আপনার কী হয়েছে?'

কর্তাবাবু ব'লেন,—দেখলুম বামনীটা এসে মাইনে চাইছে—

অরু বললে—'দাদু, বামনী কোথায়? আমি সিনেমা দেখে ফিরে আপনার কুঁজোর ঠাণ্ডা জল খাবো বলে যেই গড়াতে গেছি অমনি আপনি উঠে বসে গোঙাতে লাগলেন—এ ঘরে তো আর কাউকে দেখিনি। আপনি কী আমাকে পেত্নী ঠাউরেছেন?'

কর্তাবাবু উত্তর দিলেন না।

তারপর মনে মনে হাসতে হাসতে যে যার মতো নিজ নিজ জায়গায় ফিরে গেল। আলো নিভলো, জ্বলতে লাগলো কেবল কর্তাবাবুর ঘরের আলোটি। তিনি ভূত-পেত্নীতে বিশ্বাসী, তাঁর আহ্লাদী জীবন্ত নাতনীটিও বিশ্বাসী নয়। সেজন্যে তার কথায় বিশ্বাস হোলো না।

রাঁধুনীর বোনের বাড়ীর ঠিকানা না জানায় সরকারকে তার শ্রাদ্ধের দিনে, কালীঘাটে গিয়ে তিন মাসের মাইনের পুজো দেবার হুকুম দিলেন।

সরকার মনে মনে খুশী হয়ে বললে,—'যে আজ্ঞে,' এবং নির্দিষ্ট দিনে কালীঘাটে গিয়ে নিজের নামে পাঁচ সিকের পুজো দিয়ে এসে কর্তাবাবুকে প্রসাদ দিলে। কর্তাবাবু নিজের ও নাতনীর মাথায় প্রসাদ ঠেকিয়ে তার ও নিজের মুখে কিছু দিলেন। তারপর থেকে কর্তাবাবুর ঘরে আর কখন পেত্নী ঢুকেছে, এমন কথা শোনা যায় না।

চাওড়ীপোতার চণ্ডীভূত

রাত তখন আটটা হবে—

আসরটা খুব জমাট। বৃষ্টিও ঝেঁকে এলো। শচীন হাত তুলে চেঁচিয়ে বল্‌লে—"এই সব! শোন আমার কথা। এটা সত্যিকারের ভূতের গল্প। ভূতটাকে একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

ফণী বল্‌লে—"তোর চোখে তো মাইনাস আট পাওয়ারের চশমা। তুই যতটা দেখিস তার চেয়ে দশগুণ করিস্ কল্পনা।"

পূর্ণ গল্প ভালবাসে, বল্‌লে—"আহা! শোনই না। সবটাই কি আর মিছে কথা হবে?

শচীনের মুখ লাল হয়ে উঠলো; বললে—মিছে "কথা বলতে ওস্তাদ তুমি। ওতে যদি কোন প্রাইজ থাক্‌তো তাহলে তুমি পেতে প্রথম পুরস্কার; এবং ঐ সঙ্গে একটা এক্‌সট্রা মেডেলও। আমি যা বল্‌ছি, এর শতকরা একশ' ভাগই সত্যি—"

বরদা বল্‌লে—"চট কেন? আমরা কেউ কিছু তো বল্‌ছি না। তবে ভূত-টুথ—!"

শচীন হাত নেড়ে বললে,—"বল্‌ছি তো একেবারে আমার নিজের চোখে দেখা—"

—"ভূত?"

—হাঁ। রিয়াল গোস্ট্! আমাদের বাড়িতে সেই যে চাওড়ীপোতার চণ্ডী আসতো, দেখেছ তো? সেই যে কালো রোগা, ঢ্যাঙা, চোখ দুটো বড়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ডান পা-খানা একটু ছোট বলে নেঙচে চল্‌তো—"

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—"হাঁ—হাঁ—সেই—সেই—যে খুব কাঁঠাল খেতে পারতো?"

—"ধ্যেৎ! কাঁঠালের সময় সে কোনদিন আসেই নি। আস্‌তো পৌষমাসে—''

পূর্ণ খাটো গলায় বল্‌লে—"পিঠে খেতে!"

কিন্তু স্বর খাটো হলেও তার হুলটুকু গিয়ে বিঁধলো শচীনের মনে। সে কট্‌মট্ করে পূর্ণর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—"ও খুব মাছ ধরতে ভাল-

বাসতো। গ্রীষ্মের পর একটু বর্ষা পড়লেই চারের পোঁট্‌লা আর ছিপ হাতে চণ্ডী সেই কোথায় তিন ক্রোশ দূরে ষষ্ঠীডাঙার ঘোষেদের পুকুরে, সাত মাইল দূরে কুমীরখালীর জোড়াদিঘীতে, দু'ক্রোশ দক্ষিণে বাবুহাটির বিলে, তার এধারে শঙ্খপুরের ঝিলে—"

পূর্ণ বল্‌লে—"চাঙড়ীপোতার ঝোপে, বারুইপুরের জঙ্গলে—"

শচীন তাতে কান না দিয়ে বলে উঠলো—"মাছ ধরতে যেত। ওর সঙ্গে মাছের কেমন একটা যোগ ছিল। যেখানেই যাক্, যে দিনই ধরুক, ওর হাতে মাছ উঠতোই। আমরা যে পুকুরে চার দিয়ে ছিপ ফেলে তিন দিন বৃথা বসে থাকবো একটা মাছও বড়সী টানবে না, ও সেখানে মাত্র এক ঘণ্টা বসেই হয়তো দশ সের এক রুই, কি পনেরো সের এক কাৎলা তুলে ফেলতো। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!'

পূর্ণ বল্‌লে—"এই থেকে প্রমাণ করা যায়, ও গত জন্মে বেড়াল বা ভোঁদড় ছিল—"

নারাণ ডাক্তারী পড়ছে; সে জন্যে তার ধারণা প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। সে বল্‌লে—"সীল, শ্বেত-ভাল্লুকও হতে পারে। আবার কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়।

পূর্ণ ও নারাণের দিকে শচীন একবার ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে—"তা, সেবারও গ্রীষ্মের পর রীতিমত বর্ষা এলো। জলাগুলো উঠলো জলে ভরে, মাঠে মাঠে ঘাস উঠলো গজিয়ে, ঝোপ-জঙ্গল ঘন হলো, গাছ-পালা হলো শ্যামল, সতেজ। আকাশে সারা দিনরাতই মেঘের মেলা। সেই সঙ্গে চণ্ডীটাও উঠলো ক্ষেপে। রাঙা পিঁপড়ের বাসা ভেঙ্গে, বোলতার চাক পেড়ে, মেদি গুঁড়িয়ে, সুজি ভেজে সে শিকারের আয়োজন করতে লাগলো। ঘরের চালের বাতায় ছিপ, কাঠের বাক্সে হুইল, সুতো আর ছটা বঁড়সি ছিল। সে সব পেড়ে, বার করে, ঘোষেদের একটা রাজহাঁসের পালখ ছিঁড়ে তাই দিয়ে ফাৎনা তৈরি করে, চায়ের মোড়কের রাংতা গলিয়ে তার ভার লাগিয়ে তিন দিনে তৈরী হয়ে নিল। কিন্তু কোথায় যে মাছ ধরতে যাবে তা কারুকে বল্‌লে না।

সেদিন ভরা অমাবস্যা। সকাল থেকেই আকাশভরা কালো মেঘ। মাঠের শেষে দূরে তাল-নারকোলের শ্রেণী। সেগুলোও কালো দেখাচ্ছে। মাঠখানাকেও লাগছে কালো মতো! বাতাসও বইছে ভিজে, এলোমেলো। ভোরের দিকে তো এক পশ্‌লা বৃষ্টিই হয়ে গেল। চাঙড়ীপোতায় আমার মামার বাড়ি। কলকাতা থেকে সেখানে আম খেতে গিয়ে দেখি, মামাদের

বাগান ফাঁকা। আম তো ফলেই নি, যে ক'টা ফল ছিল সেগুলোও বাঁদরে খেয়ে গেছে তবুও সকালে উঠেই আঁকষি হাতে বেরিয়ে পড়লাম।

'বাগানের পাশ দিয়ে মাঠে যাবার পথ। গাছের তলায় তলায় বৃথা ঘুরে, বাগান থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি চণ্ডী। তার একহাতে ছিপ, আর এক হাতে গামছায় পোঁট্‌লা করে বাঁধা চার, টোপ, বগলে হাঁশের বাঁটওয়ালা ছাতা, গায়ে আধময়লা লঙ্‌ক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের কালো জুতো। আমাকে দেখেই সে একগাল হেসে বললে—'শচীদা! সকালে উঠেই গাছ ঠেঙাতে বেরিয়েছ?'

"চণ্ডীটা আমাকে বারবরই বড় ভক্তি করতো। আমি ওর ঠিক আড়াই বছরের বড়।"

নায়াণ বললে—"হাঁ। তার ঐ কথাগুলো ভক্তেরই উপযুক্ত বটে।"

পূর্ণ বললে—"এবার আমি কিন্তু কিছু বলি নি—"

বরদা বললে—"আহা-হা! বাধা দাও কেন? তারপর বল—"

শচীন বললে—"তার উত্তরে বললাম—আমি তো ভোরে উঠেই গাছ ঠেঙাচ্ছি, তুই-ই বা কেন এখনই ছিপ হতে বেরিয়েছিস্? কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?

"সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাত তুলে বললে—'সেই পোড়ো-দীঘিতে।"

"কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠলাম। বললাম—'বলিস কিরে! সে যে ভূতের আড্ডা। ওখানে কত লোক যে অপঘাতে মরেছে তার হিসেব নেই! আজ পর্যন্ত ও পুকুরে কেউ—ফিরে যা, ফিরে যা—

চণ্ডী হেসে বললে—'ভূত বলে কিছু নেই শচীদা! একেবারেই কিছুই নেই। তুমি দেখো, আমি নির্বিঘ্নে ফিরে আসবো, খালি হাতে নয়, অন্ততঃ দশ সের ওজনের দু'টো রুই ঝুলিয়ে। এই ব'লে রাখছি, সকলের প্রথমেই যে মাছটা ধরবো, সেটা তোমার।

বললাম—'না রে চণ্ডী, এমন কাজও করিস্ নি। ওখানে কি মানুষ যায়?

চণ্ডী অবশ্য শুনলে না; একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে গেল। আমি তার বিলীয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে চুপ্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো, ছোঁড়াটা পাগল হয়ে গেছে! 'পোড়ো দীঘিটার' এক ক্রোশের মধ্যে কোন মানুষ যেতে সাহস করে না। কোন গরুও সেদিকে ঘাস খেতে যায় না; এমন কি, রাতের বেলা শেয়াল-কুকুও সেদিক থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে আসে। কেবল চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচারাই

সেখানে রাত কাটায়। আর ও কিনা একা সেখানে মাছ ধরতে যাবে!

ফণী বললে—"কেন?"

—এ প্রশ্নের কি উত্তর দেব? দীঘিটা যে কত কালের এর হিসেব ও অঞ্চলের কোন জমীদারেরই সেরেস্তায় নেই! কেউ বলে, আলাউদ্দিন খিলজির সময়ের, কেউ বলে আকবর বাদশার আমলের, আবার কেউ বলে, ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন ছিল তখনকার। ওখানে নাকি এক সাহেব থাক্‌তো। কিন্তু আমার দাদামশায় বলেন, ওটার বয়স মাত্র একশ' দশ বছর। ওখানে রতনা ডাকাতের আড্ডা ছিল!

রতনা ছিল, আবার তাঁর দাদামশায়ের সাঙাৎ। ডাকাতি করতো রতনা, কিন্তু তাতে ভাগ বসাতেন আমার দাদামশায়ের দাদামশায়। সে পয়সায় তিনি জমীদারী কিনেছিলেন। তবে সে জমিদারী, আর জমিদার-বাড়ি এখন নেই। কেবল দাদামশাইয়ের ঘরে একটা পেল্লাই কাঠের সিন্ধুক, একখানা মরচে ধরা ভোজালী, আর একখানা পোকায় কাটা জামিয়ার পড়ে আছে। যাক্;—নিজেদের ঘরের কথা না বলাই ভাল!

রতনা পথিকদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের গলায় পাথর বেঁধে ঐ দীঘিটাতে ডুবিয়ে মারতো।

দ্বিজেন বললে—"এত পাথর সে পেত কোথায়? চাওড়ীপোতা তো পাথুরে জায়গা নয় "

বরদা বললে—"আরে বাপু! গল্পটা শোনই না।"

শচীন বললে—"'একবার এক বুড়ী আর তার ছেলেকে রতনা তো ধরে নিয়ে এল। তাদের সঙ্গে ছিল, খান দুই সোনার গয়না, গোটা দশেক টাকা। বুড়ীর ছেলেটা ছিল বেশ ষণ্ডা গোছের। রতনার লোকের সঙ্গে তার বেশ একটু লাঠি-বাজি হলো। ফলে, রতনারলোকটার নাকটা একদম মুখের ওপরে গেল বসে। রতনা এই অপমান আর ক্ষতির শোধ নেবার জন্যে বুড়ীর চোখের সামনে ছেলেটাকে দীঘিতে ডুবিয়ে মারলো।"

"বুড়ী তখন আকাশের দিকে হাত তুলে চীৎকার করে বললে—রতনা যদি ভগবান থাকে, তুই-ও একদিন দম আটকে মরবি। তোর সদ্গতি কোন কালেই হবে না—!"

দাদামশায় বলেন, তাঁর দাদামশাই নাকি বলছিলেন, বুড়ীর শাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। রতনা একদিন ঐ দীঘির ধারে দালানটার

মধ্যে দম আটকে মরে। কি ক'রে, তা আর বলেন নি। সেই থেকে নাকি রতনা ওখানে ভূত হয়ে আছে! চামচিকে, বাদুড় আর পেঁচা ছাড়া রাতের বেলা যে ওদিকে যায়, রতনা তারই গলা টিপে মারে। বেঁচে থাকতে বেটার যে অভ্যাস ছিল, মরবার পরেও সে স্বভাব ঘুচলো না! ঐ যে কথাই বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'—এ তারই ভৌতিক প্রমাণ। যাক্।

দাদামশাই তখন ছোট। একবার দিঘিটার ধারে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্যাঙাতের নাতি বলে রতনা তাঁকে কিছু বলে নি। তবে দাদামশাইকে স্বপ্ন দেখিয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিল—ওদিকে আর কখনও মাড়াস নি!

সত্যি কথা বল্‌তে কি দাদামশায়ের শেষের কাহিনী আমি বিশ্বাস করি নি। কেননা তিনি ডেলা ডেলা আফিং খান!

চণ্ডীটার জন্যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। কি যে করা যায়, ভাবতে ভাবতে তার দাদার কাছে গিয়ে খবরটা জানালাম। শুনেই তিনি জ্বলে উঠ্‌লেন; বললেন—ভূতের কিল খেয়ে আজ ওর শিক্ষা হোক। আমরা তো কিছুতেই ওকে সায়েস্তা করতে পারলাম না।

"বললাম—ভূষণ্ডীদা, শিক্ষা তো পরে: তার আগে যে প্রাণহানির—"

"ভূষণ্ডীদা জিভ দিয়ে তালুতে চক্ করে একটা শব্দ করে বললেন—চণ্ডের প্রাণ নেবে ভূতে? এমন বাহাদুর ভূত আজও প্রেতলোকে জন্মায় নি—!"

"এর ওপর আর কি বল্‌বো? বাড়ি এসে চুপ্ করে বসলাম।—" বলে শচীন থাম্‌লো।

বাইরে তখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দূরে কোন্ অট্টালিকার মাথায় যেন বাজ পড়লো। বৃষ্টি ও বাতাস মেতে উঠেছে। শার্সিগুলোর গায়ে এসে দুটোতেই মাঝে মাঝে ধাক্কা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

সকলে সমস্বরে বলে উঠলো—"তারপর—তারপর?"

শচীন বললে—"চণ্ডী তো চলেছে—

পূর্ণ বললে—"তুমি কি করে জানলে?"

শচীন হাত নেড়ে, ভ্রূ কুঁচকে বল্‌লে—"আরে, এটা তো আস্ত 'ইডিয়ট' দেখছি। চণ্ডী যে তখন চলেছে, এ কথা কে না জানে?"

সকলে বলে উঠ্‌লো—"ঠিক—ঠিক। বলে যাও, বলে যাও—"

চণ্ডী আলের ওপর দিয়ে চলছে। তার দুধারে শস্যশূন্য ভিজে ক্ষেত।

চাষীরা কোন কোন ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছে। ক্ষেতের এখানে সেখানে একটি দুটি তাল গাছ। বিশ্বনাথের মন্তরভরা মাদুলীর মতো তাদের মাথায় জটার মধ্যে একটি করে কলসী বাঁধা। ক্ষেতের শেষ প্রান্তে গ্রাম। কালো মেঘের গাঢ় ছায়ায় সেগুলো ঝাপসা হয়ে আকাশের তলে মিশে আছে। চাণ্ডড়ীপোতা থেকে 'পোড়ো দীঘি' পুরো আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে, আর সেখান থেকে সয়লা গাঁয়ের নদীটা এক ক্রোশ দূরে।

চণ্ডী মাঠ ভেঙে দীঘিটার কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলো তখন বেলা ন'টা হবে।

দীঘির চারধারে ঝোপ-ঝাড়। তার মাঝে মাঝে তাল, নারকল আর কয়েকটা আম-কাঁঠালের গাছ। চণ্ডী শুনেছিল, সেখানে একটা বাড়ি আছে। কিন্তু কৈ—কিছুই তো—ঐ যে একটা দালান! চণ্ডী সেখানে থেকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। দালানটার ছাদ ভেঙে পড়েছে, একধারে দেওয়াল ধ্বসে খান কয়েক কড়িকাঠ বেরিয়ে আছে। ছাদের ভাঙা আলসেয় কয়েকটা অশ্বত্থ গাছ, নিচে চারধারে ঘন ঝোপ-জঙ্গল। তার মাঝ থেকে কি একটা লতা যেন ওপর দিকে উঠে দালানটার এক দিকে ঢেকে রেখেছে। দালানটার দিকে তাকিয়েই চণ্ডীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠ্‌লো। কিন্তু দিনের বেলায় কিসের ভয়?

সে জঙ্গল ঠেলে দীঘিটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। জঙ্গলের জলে যে তার কাপড়-জামা ভিজে গেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই। তার সামনে প্রকাণ্ড দীঘি। তার প্রায় অর্ধেকটা পদ্মবন, বাকীটুকু কলমী, হেলঞ্চ ও পানায় ভরা। হঠাৎ একটা বড় মাছ ঘাই দিয়ে উঠ্‌লো। সেই সময় চণ্ডী দেখলে, দীঘিটার জলের রঙ একটু লাল। কিছুদূরে এক জোড়া বক বসেছিল। চণ্ডীর সাড়া পেয়ে তারা মোটা গলায় বকর্‌ করে ডেকে সেখান থেকে উড়ে গিয়ে ওপারে শেওড়াগাছটার মাথায় বসলো।

ফণী বলে উঠলো—"এই যে বললে, সেখানে যা যায় রতনা তারই গলা টিপে মারে?"

শচীন বল্‌লে—"তোর শরীরটা যেমন মোটা, বুদ্ধিটাও তেমনই ভোঁতা। কাক-চিল-বক অর্থাৎ কোন রকম খেচরকেই মারে এমন সাধ্য ভূতের বাপেরও নেই।"

ক্ষিতীশ রোগা মানুষ; এতক্ষণ চুপ করে শুয়েছিল। পা দুখানা দোলাতে দোলাতে বল্‌লে—"এরোপ্লেনও তো খেচর। তাকেও—?"

শচীন বল্‌লে—"চুপ কর্‌ উইচিংড়ি! তোকে আর চিড়িং চিড়িং

করতে হবে না। বেশ, তোমাদের যদি শুনতে ইচ্ছে না হয়, আমি আর—"

সকলে বলে উ্ঠলো—"বল—বল। চণ্ডী তার পরে কি করলে?"

—চণ্ডী দীঘির ধারে একটু পরিষ্কার জায়গা বেছে নিয়ে তার ছাতা, ছিপ আর পোঁটলাটা সেখানে রাখলো। তারপর পোঁটলাটার ভেতর থেকে, ছোট কাটারিখানা বার করে খানিকটা জায়গার জঙ্গল কেটে জল থেকে কলমী, হেলঞ্চ ছিঁড়ে পরিষ্কার করে, চার ফেলে, টোপ গেঁথে বঁড়সীটা হাতে ঢুলিয়ে জলে ফেলবার সময় একবার বাড়িটার দিকে তাকালো। তার মনে হলো, ডান দিকের ঘরখানার মধ্যে কে যেন শাদা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে; আর তার চোখ জোড়া আগুনের ফুলকীর মতো জ্বলছে। দেখেই চণ্ডীর বুকটা একটু কেঁপে উঠ্লো। তবুও সে খুব ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো—সত্যি কেউ সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। মিনিট খানেক পরে লক্ষ্য করে আর কিছুই দেখ্তে পেল না। ওটা মনের ভুল ভেবে চণ্ডী ছিপ ফেলে খান কয়েক কচু আর ভাঁটপাতা বিছিয়ে তার ওপর বস্লো।

"চণ্ডী তো ছিপের বাঁটটা পা দিয়ে চেপে চুপ করে বসে আছে।"

"চারধার নিস্তব্ধ নির্জন। ভিজে মাটি, পচা ডালপালার গন্ধ নাকে লাগছে। কচুবনে মশার ঝাক করছে—"পোঁ, পোঁ।" দীঘির ওপারে একটা তালগাছের মাথায় বসে একটা দাঁড়কাক থেকে থেকে ডেকে উঠ্ছে —"আহা—কাহা; আহা—কাহা।" মাঝ দীঘিতে একটা মাছ ঘাই দিয়ে উঠ্লো; পদ্মবনের আড়ালে একটা ভীড়ভীড়ে পাখি শিষ দিলে— "টিটির্র্র্—চিট্।"

"চণ্ডীর মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এমন নিস্তব্ধতা সে আগেও অনেক দিন অনুভব করেছে। কিন্তু আজকের স্তব্ধতাকে বোধ হতে লাগ্লো—যেন পাষাণের মতো বিষম ভারী। কিছুতেই এটা নড়ানো বা সরানো যাবে না। ক্রমেই যেন তা তার বুকের ওপর চেপে বসছে। বাতাস স্থির; আকাশে মেঘভার স্থির হয়ে আছে; একটি ছোট পাতা পর্যন্ত নড়ছে না, জলও শান্ত। কেবল একটা মোটা খড়কের মতো হলদে ফড়িং আধডোবা ফাৎনাটার ওপর বার বার উড়ে বসছে।

"চণ্ডী আন্দাজে ঠিক করলে, বেলা তখন বারোটা। সে প্রায় তিন ঘণ্টা ছিপ ফেলে বসে আছে। অথচ একটা মাছও— কথাটা শেষ না হতেই সে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো।"

জলের মাঝ থেকে পানা ঠেলে ভেসে উঠছে ওটা কি? জিনিষটার রঙ কালো; দেখ্‌তে কতকটা পোড়া কাঠের মতো। সেটা তার দিকেই ধীরে এগিয়ে আসছে দেখে চণ্ডীর বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠলো। সে এত কাল মাছ ধরছে, এমন তো কখন হয় নি। সে নিজের অজ্ঞাতেই উঠে দাঁড়িয়ে জিনিষটাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগলো। কিন্তু সেটা একেবারে কূলের কাছে এলো না, মাত্র কিছুদূর এসে হঠাৎ পদ্মবনের দিকে ঘুরে গেল। ঐ যে পিঠের কাঁটা, ঐ যে লেজ, ঐ হাতীর কানের মতো কান্‌কো নড়ছে। ওটা রুই মাছ। এত বড় রুই মাছ! চণ্ডী বিস্ময়ে, আনন্দে দু পা এগিয়ে যেতেই দেখলো তার ফাৎনাটা একটু নড়ে উঠলো। সে চট্ করে একবার পদ্মবনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, মাছটা কোথায়? কিন্তু সেটাকে আর দেখতে পেল না, ভাবলে ঐ মাছটাই কি ঘুরে এসে তার বঁড়সী টানছে?

ফাৎনাটা ক্রমেই জোরে ডুবছে-ভাসছে। চণ্ডী সে দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি রেখে, ছিপটা দুহাতে শক্ত ক'রে ধ'রে কাঠ হ'য়ে বসে আছে। তার বাঁ গালে, ডান কানে যে দুটো কালো রঙের মশা বসে রক্ত চুষতে চুষতে ফুলে উঠছে, দীঘিপারে তালবনের মাথায় মেঘে মেঘে অন্ধকার করে এসেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই–

ক্ষিতীশ মুচকি হেসে বললে—"সে এক মনে ফাৎনা দোলা দেখছে—"

শচীন এতক্ষণ তার দিকে মুখ করে গল্প বলছিল; এবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—"এটা দেখছি, পূর্ণর স্যাঙাৎ—"

পূর্ণও তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র একটি দংশন করলে; মিহি গলায় বল্‌লে—"যেমন তোর দাদামশায়ের দাদামশায় ছিল রতনার স্যাঙাৎ—"

শচীনের সারা গা যেন জ্বালা করতে লাগ্‌লো। সে চোখ-মুখ রাঙা করে বললে—"তার মানে?

বরদা বললে—"আহা! কি ছেলেমানুষী করছো? হাঁ—হাঁ খেয়ালই নেই চণ্ডীর—বল—"

"এ রকম করলে বলা অসম্ভব। যদি শুন্‌তে চাও, কেউ একটি কথাও কইতে পাবে না।"

"বেশ এই আমরা মুখে চাবি দিলাম।"

তবুও শচীন একটু চুপ করে রইলো; তারপর আবার বলতে আরম্ভ করলে—"ফাৎনা তো ডুবছে-ভাসছে। শেষে যেই একবার তল হলো, চণ্ডীও মারলে সজোরে টান। সঙ্গে সঙ্গে 'কর্‌র্‌র্‌' শব্দে হুইলের সুতো

খুলে নিয়ে মাঝ দীঘিতে মাছ ছুটে গেল। আর সেই মুহূর্তেই একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে তালবনের ওপর থেকে সোঁ সোঁ শব্দে বৃষ্টি এল ছুটে। দেখতে দেখতে বৃষ্টিধারায় সব মুছে গেল। ওদিকে মাছও ছুট্‌ছে।— একবার ডানধারে, একবার বাঁ ধারে, কখন-কখন সোজা মাঝ দীঘিতে। ছিপের মাথা বেঁকে বঁড়সীর মতো হয়ে গেছে। মাছটা থেকে থেকে পদ্মবনের সেঁধবার চেষ্টা করছে। চণ্ডীরও জেদ তাকে কুলের কাছে আন্‌বেই। এক একবার তার মনে হয়, বুঝি ছিপখানা ভেঙে গেল।

"এই টানাটানিতে প্রায় ঘন্টা চারেক কেটে গেল। এর মধ্যে বৃষ্টি একবারও থামেনি বরং আরও ঝেঁকে এসেছে। চণ্ডীর অবস্থা তখন—

—"ভিজে বেরালের মতো—"

কিন্তু টিপ্পনীটা যে কে কাটলে, শচীন তা ধরতে পারলো না। সকলেরই মুখ গম্ভীর। তবুও তার সন্দেহ হতে লাগ্‌লো এ পূর্ণ কিংবা ক্ষিতীশের কাজ। যাই হোক, না থেমে সে বলে চললো—"একে মাছের সঙ্গে টানাটানি করে সে ক্লান্ত, তার উপর মুষলধারে বৃষ্টি, আর সেই রকম ভূতুড়ে জায়গা। সে মাঝে মাঝে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু মাছটার লেজ বা পিঠের কাঁটা যেই ভেসে উঠতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে শরীরে বল, মনে স্ফূর্তি পায়। এমনই করে বেলা যখন যায় যায় তখন সে মাছটা ডাঙায় তুললে কিন্তু এমন একটা শিকার লাভ করেও তার মনে আনন্দ হলো না। সে যা আশা করেছিল, মাছটা তার কিছুই না। একটা সাড়ে পনের সের ওজনের কাৎলা মাত্র। তার প্রকাণ্ড মাথা, মস্ত মুখ দেখে মনে হতে লাগলো, যেন একটা রাক্ষসের ছানা।—" বলে শচীন চুপ করলে। বাইরে তখনও ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়ছে।

তারপর আবার বল্‌তে আরম্ভ করলে—"ঝর ঝর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। চণ্ডী এতক্ষণ দেখে নি, ওপারে দীঘির ডান কোণে একটি সরু নালা ছিল। সেটা দিয়ে হুহুশব্দে মাঠের জল এসে দীঘিতে পড়ছে। তাতে দীঘিটা ভরে উঠছে। চণ্ডী ছিপ গুটিয়ে বাকি টোপ আর চারগুলো দীঘিতে ফেলে, মাছটাকে গামছায় বেঁধে বহু কষ্টে দীঘির পাড়ে উঠেই দেখে, চারধারের মাঠ জলে ডুবে গেছে। কিছুদূরে যে জঙ্গলটা ছিল সেটাও আর দেখা যায় না। চণ্ডীর বুক কেঁপে উঠলো। সর্বনাশ! সয়লা নদীতে বান এসেছে নাকি! ছেলেবেলায় আমি আর চণ্ডী একবার সয়লা নদীর বান দেখেছিলাম। সেবার চাণ্ডড়ীপোতার অবস্থা হয়েছিল একটা প্রবালদ্বীপের মতো। সেই স্মৃতি চণ্ডীকে বিচলিত করলো। এই

জলস্রোত ঠেলে আড়াই ক্রোশ যাওয়া একেবারে অসম্ভব। হয়ত পথের মাঝে মাঝে জল আরও বাড়বে। সে যে কি করবে ঠিক করতে পারলো না। সেই সময় একবার ভয়ঙ্কর শব্দ করে দূরে একটা তালগাছের মাথায় বাজ পড়লো।

শব্দ আর আলোর ঝোঁকটা কাটিয়ে সে একবার পোড়ো বাড়িটার দিকে তাকাতেই দেখ্‌লো, তার বারান্দার সামনে ঘরখানার দরজায় দাঁড়িয়ে একটা লোক তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। প্রথমটা সে ভাবলে মনের ভুল। তারপর আবার সেদিকে তাকাতেই দেখলে, সত্যিই একটা লোক। ঐ যে সে হাতছানি দিতে দিতে ঘরের ভেতর দিকে চলে গেল। তবে কি এখানে লোক বাস করে? ভূতের গল্পটা একদম বাজে? সম্ভবতঃ লোকটা তার দুর্দশা দেখে, তাকে আশ্রয় দিতে চাইছে। কিন্তু লোকটার স্বভাব ভাল তো? যদি ডাকাত হয়? অবশ্য ডাকাত হলেও তার তখন কিছু করবার ছিল না। তার কাছে মাছটি ছাড়া মূল্যবান্ আর কিছুই নেই। সে আর দেরি না করে বাঁ-হাতে মাছ, ডান হাতে দা, বগলে ছিপ, আর কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে ছাতাটা চেপে ধরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগলো।

'জঙ্গল ঠেলে মিনিট পাঁচেক চলে ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে চণ্ডী উঠোনে গিয়ে পড়লো। সামনেই বারান্দা আর সেই ঘরখানা। কিন্তু কৈ কাউকে তো সেখানে দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়িগুলো ভেঙে পড়েছে; বারান্দায় জঙ্গল। এ রকম জায়গায় কি করে মানুষ থাকে? এবার তার মনে একটু ভয় হলো; ততক্ষণে আর একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাতাস যেন আরও মেতে উঠেছে। সে আর না এগিয়ে সেখান থেকে চীৎকার করে ডাকলো—'কে আছেন? ভেতরে আছেন কে?'

"চণ্ডীর মনে হয়, ভেতর থেকে যেন উত্তর এলো—'চলে আসুন!'

"চণ্ডী তৎক্ষণাৎ ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে ওপরে উঠে বারান্দা পার হয়ে ঘরের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বললে,—'আমি এসেছি।'

"চণ্ডীর মনে হলো, তৎক্ষণাৎ ঘরের অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর রেখা যেন এধার থেকে ওধারে সরে গেল আর ঘরের মধ্যে কে যেন কাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলছে।

"চণ্ডী আবার বললে—'কে আছেন মশায়? কে আছেন?

"আবার উত্তর হলো—'চলে আসুন।'"

"সামনে অন্ধকার ঘর, বাইরেও অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে সজল বাতাসের হাহাকারে চণ্ডীর মন যেন কেমন হয়ে গেল। যে ডাক্‌ছে সে তো কৈ এগিয়ে আস্‌ছে না; ভেতরে কোথাও একটু আলোও ত দেখা যায় না। সে আবার বল্‌লে—'মশায়, বড় অন্ধকার! একটা আলো।'

"ভেতর থেকে উত্তর হলো—'এগিয়ে আসুন।'

"চণ্ডী সাহসে ভর করে চৌকাঠ পার হয়ে ঘরের মধ্যে হাত কয়েক এগিয়ে যেতেই তার মনে হলো, কারা যেন অন্ধকারের মধ্যে খিল খিল করে হেসে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে চণ্ডীর পায়ের নিচে মেজেটা একবারে হাত পাঁচ-ছয় গেল বসে। চণ্ডীও সেই সঙ্গে গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল। এমন আচম্বিত দুর্ঘটনার জন্যে সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তবুও তৎক্ষণাৎ উঠবার চেষ্টা করতেই সে দেখলো, একটা কঙ্কাল তাকে দুহাতে বুকের ওপর জড়িয়ে ধরেছে। দেখেই সে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।"

ফণী বললে—"নিশ্চয়ই 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল?"

শচীন বললে—চণ্ডীর মা নেই। ইয়ারকি রেখে শোন্। তারপর সন্ধ্যা হইতেই আমরা তো ভেবে অস্থির। কিন্তু তখন চণ্ডীর সন্ধানে সেই ভূতুড়ে বাড়ির দিকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। জলটা আবার বাড়ছে। তবুও সকলে আশা করতে লাগলাম, চণ্ডী এল বলে। কিন্তু ক্রমে রাত বেশি হতে লাগলো, তবুও চণ্ডীর দেখা নেই! শেষে রাত যখন বারোটা, জলটা তখন একদম ধরে এল, কিন্তু বাতাস শান্ত হলো না। সে চারধার থেকে বন্যার কল্লোল বয়ে পাগলের মতো গ্রামের শূন্য অন্ধকার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। আমরা আর কি করবো? চণ্ডীদের বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বসে ভোরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ক্রমে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। আমরাও চণ্ডীর খোঁজে বার হলাম, সংখ্যায় সতেরো জন।

ক্ষিতীশ আস্তে জিগ্যেস করলে—"কিসে?"

শচীন বললে—"ডোঙায়—"

পূর্ণ বললে—"তালগাছ বুঝি কাটাই ছিল?"

শচীন বললে—"সকলেই তোর মতো মিছে কথা বলে না। চাঙড়ী-পোতার ব্যাপার তুই কি জানবি? থাকিস্ তো বস্তিবাটিতে। তোরা শোন্। চারধারে জল—যতদূর দেখা যায়—জল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। তার ওপর দিয়ে টরপেডো-বোটের মতো আমাদের

সতেরখানা ডোঙা চলেছে। বল্‌লে বড়াই করা হবে, সেই সার্চপার্টির ক্যাপ্টেন ছিলাম আমিই।

বরদা লাঠি খেলে ; বললে—"সাবাস্‌!"

আমি জানতাম, কোথায় চণ্ডীর খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই সকলকে সেই দীঘির দিকে নিয়ে যেতে লাগলাম। স্রোত ঠেলে জল কেটে যখন সেখানে গিয়ে পৌছলাম, তখন মেঘের ফাঁক দিয়ে একটু রোদ উঠেছে, আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কিন্তু সেখানকার দৃশ্য দেখে আমার বুক দমে গেল। এর মধ্যে চণ্ডীকে পাব কোথায়? মনের ভাব গোপন করে সকলকে বললাম—'ঐ বাড়িটার ভেতর চণ্ডের খোঁজ করা যাক্ চল—'

হরি চক্কোর্তিটা চিরকালের ফাজিল ; বল্‌লে—'চণ্ডে ওখানে এতক্ষণ বসে আছে! সে আর কোথাও গেছে! আপনার যেমন কথা—।'

"বলা বাহুল্য তাকে তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে থামিয়ে সকলকে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে পাঁচিলের কাছে গিয়ে হাঁক দিলাম—'চণ্ডী আছ? চণ্ডী?'

"চণ্ডীর দাদা ছিলেন, আমার পিছনে। বল্‌লেন—'একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে—না? ঐ শোন—ঐ—।'

"সকলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রইলাম। হাঁ—ঐ যে—মনে হচ্ছে সামনের ঘরখানার মধ্যে কে যেন গোঙাচ্ছে!

"বল্‌লাম—'দাদা, চলুন সকলে।'

"আমি রইলাম সকলের আগে। সকলের আগেই উঠোন পার হয়ে বারান্দার কাছে পৌছলাম। এবার শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগ্‌ল। গোঙানির মাঝে মাঝে কে যেন কথা বল্‌ছে—না?

"চণ্ডীর দাদা বললেন—হাঁ, তাই তো। চণ্ডীর গলা বলে মনে হচ্ছে। চণ্ডে—চণ্ডে—।'

"কিন্তু সে ডাকের কেউ সাড়া দিলে না, আওয়াজও থামলো না। এতে রহস্যটা আরও ঘোর বলে বোধ হতে লাগলো। আমারও জেদ চাপলো শেষ দেখতেই হবে।

"আমি ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে, বারান্দাটা পার হয়ে ঘরখানার চৌকাঠের ধারে পৌছতেই কে যেন ভেতর থেকে বলে উঠ্‌ল—'এস—এস—বড় অন্ধকার—ওঃ—ছেড়ে দাও—।"

চীৎকার করে বললাম—'চণ্ডীকে পাওয়া গেছে—ঐ যে কথা বল্‌ছে।'

আমার কথা শুনে সকলে পিছনে এসে দাঁড়ালো। আমি সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না, কয়েক পা গিয়েই সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠ্‌লাম। দেখি, গর্তের ভেতর একটা লম্বা কঙ্কালের, বুকের ওপর চণ্ডী কাৎ হায় পড়ে ভুল বকছে, আর কঙ্কালটা, তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। সকলে ইতিমধ্যে এসে গর্তটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। কঙ্কালটার মস্ত মাথা, চক্ষুহীন কোটর, বত্রিশটি দাঁত, বড় চোয়াল—কিন্তু আর বল্‌তে ইচ্ছা হয় না।

সকলে বলে উঠ্‌লো—"বল, বল, থেম না—তারপর কি হোলো ?"

শচীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—"সেই কঙ্কালের বুক থেকে বহু কষ্টে চণ্ডীকে উদ্ধার করে নিয়ে আমরা চাঙড়ীপোতায় ফিরে এলাম !"

নারাণ জিজ্ঞাসা করলে—"সেই কাৎলা মাছটা ?"

শচীন সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—"আমি সেইদিনই দুপুরে কলকাতায় চলে আসি। রাতের বেলা তেতলার ঘরে দরজা ভেজিয়ে একা বসে চণ্ডীর কথা ভাবছি। জানলার বাইরে নারকোল গাছটা বাতাসে সর্ সর্ করছে। হঠাৎ হুস্ করে দরজাটা খুলে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে চণ্ডী ! তার হাতে প্রকাণ্ড একটা কাৎলা মাছ। মাছটা তখনও খাবি খাচ্ছে ! বুঝলাম, চণ্ডী আর নেই ! আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।" বলে শচীন চুপ করলে। নিস্তব্ধ ঘর ; বাইরেও তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। হঠাৎ ঘরের দরজাটা খুলে গেল। সকলে সে দিকে তাকিয়েই চীৎকার করে উঠলো—"চণ্ডী —চণ্ডী এসেছে—চণ্ডী !"

চণ্ডী ঘরে ঢুকেই বললে—"শচীদা, তোমাকে খুঁজতে এখানে—"

শচীন ততক্ষণে স্প্রীংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে ফরাস থেকে নিচে নেমে দাঁড়িয়েছিল। চণ্ডীকে আর না এগোতে দিয়ে একজোড়া স্যান্যাণ্ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে চণ্ডীকে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে, "শীগগির বেরিয়ে আয়—"

ক্ষিতীশও তৎক্ষণাৎ চীৎকার করে উঠলো—"আরে ! আমার এক পাটি স্যানডাল্ নিয়ে গেল। এ যে দুটোই বাঁ পায়ের—"

পূর্ণ বল্‌লে—"ব্যস্ত হয়ো না, ও আবার আসবার পথ করে গেল।"

রাস্তা দিয়ে একখানা ছ্যাকরা গাড়ি যাচ্ছিল। সকলে শুনতে পেল শচীন চীৎকার করে বল্‌ছে—"এই রোখ। বাগবাজার—হাঁ—হাঁ—

তারপরই গাড়োয়ানের গলার ও চাকার আওয়াজ পাওয়া গেল— "টি—টি—গড়্—গড়্—গড়্ !"

বদনপুর বাংলোর সেই রাত

গল্পটি আমার নয়, চোরাইও নয়, আমার এক 'মেডিক্যাল ফারম রিপ্রেজেনটেটিভ' বন্ধুর মুখে শোনা। গল্পটির নামকরণও করেছেন তিনিই —'বদনপুর বাংলোর সেই রাত।'

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে, প্রত্যেক গল্পের উৎস, হয় কল্পনা অথবা বাস্তব জীবন। আমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে শেষেরটি। তাই সেদিন তাকে বলি, "তুমি তো কাজের ফেরে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি কর। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করোনি কি ?"

সে জবাব দেয়, "অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সত্যি, তবে তা অঢেল নয়। আর একটি মাত্রকে ছাড়া কোনটিকেই বিচিত্র বলা যায় না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করি। উদয়াস্ত সেই সম্বন্ধেই কথার জাল ফেলে ডাক্তারদের চেম্বারে চেম্বারে ঘুরি। এর ত্রিসীমানায় সাহিত্য-ফাহিত্য নেই, বাপু! দু-চারটে ওষুধের গুণব্যাখ্যা শুনতে চাওতো এখনই শুরু করি কলের গানের মতো।"

বলি, "এই যে বললে, একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। আমার খুপরিতে যখন আষাঢ় সন্ধ্যায় ঢুকেছো তখন এক পেয়ালা কফি আর একটা সিগরেটের বিনিময়ে সেটিকেই ছাড়ো। আমি মোমবাতিটা জ্বালছি। ওর অক্ষম আলোয় লোড-শেডিংয়ের অন্ধকার মুড়ি দিয়ে বসে শোনা যাক্। এই নাও সিগ্রেট ; কফি আসছে—"

বন্ধু বলে, "গত বছর আমার কর্মক্ষেত্র ছিল বিহারের দক্ষিণ এলাকা। জনো ত ঐ অঞ্চলে কতকগুলো শিল্প-কারখানা আর খনি ছড়িয়ে আছে ? তারই মধ্যে এখানে-সেখানে পাহাড়-বনের বিস্তার। একটা কারখানা আছে রেল-লাইন থেকে পাকা পনেরো কিলোমিটার তফাতে এক দঙ্গল জংলা পাহাড়ের কাছাকাছি। একটা পাথুরে রাজপথ রেল-স্টেশন থেকে বেরিয়ে চড়াইয়ে উঠে, উৎরাইয়ে নেমে ঘুরে-ফিরে কারখানাটার সামনে দিয়ে, শ্রমিক-বস্তি বাঁয়ে রেখে, ছোট-বড় কর্মচারীদের কোয়াটারসগুলোর মাঝ দিয়ে চলে গেছে সেই পাহাড়গুলোর দিকে ; সেখান থেকে দূরে বহুদূরে—কোথায় তার হদিশ পাইনি। ঐ পথটার একপাশে, বসতি থেকে আধ মাইলটাক হবে,—একটি ছোট টিলার মাথায় কারখানাটা

স্‌টহাউস, একটি সুদৃশ্য বাংলো। সেখান থেকে আরও আধ মাইল র পাহাড়ে নদীটি, একটি বাঁধ আর মোটা মোটা টিউবওয়েল। সেই টির জল গোটা কারখানার প্রাণ-শক্তি। ঐ কারখানাটার বাইরে ধারে একটা ছোট হাসপাতাল আছে। কারখানার কর্মীদের তো ই, দেহাতী লোকদেরও সেখানে চিকিৎসা করা হয়। কাজেই ওষুধ-সায়ীদের একটা লাভের জায়গা। তাদের যখন লাভের জায়গা, মাদের মতো লোকেরও তখন কর্মক্ষেত্র, গন্তব্য-স্থান। তাই আমার ম্‌পানির ওষুধ-পত্র নিয়ে সেখানে একদিন গেলাম। রেলগাড়ির -মর্যাদার গুণে পৌঁছতে বেশ কিছু দেরী হয়ে গেল। ফলে যেভাবে টা কাজ সারার পরিকল্পনা ছিল ততটা হলো না। আবার জায়গাটাও ন যে কাছে-কিনারে কোন হোটেল বা সরকারি ডাক-বাংলোও নেই ানে রাতখানা পার করে দেওয়া যায়। তার ওপর শীতকাল। ছি কি করি ? এমন সময়ে কারখানার এক কর্তা-ব্যক্তির বদান্যতায় ুশ্‌কিলেরও আসান হয়ে গেল। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হোলো, টিলার ায় গেস্‌ট্‌-হাউসটিতে, খাদ্য জুটলো ক্যানটিনের বাইরে রেস্তোরাঁয়। তোরাঁ-মালিক বললে, সন্ধ্যার আগেই সে 'হুজুর'কে শালপাতায় মুড়ে -তরকারি পাঠিয়ে দেবে। তবে চা দিতে পারবে না। কারণ, 'জাগা ী।' বললাম 'বহুৎ আচ্ছা, দামটা তখনই দেব।' সে বলে 'আপকা ।' রাতে গরম খানা দিতে পারলেই ভাল হতো। কিন্তু 'সাঁঝ লাগলে' আর ওদিকে যেতে রাজী হয় না। জিজ্ঞেস করি' কেন ?' সে য়ে যায়।

তখনও পশ্চিমে জংলাপাহাড়গুলোর একটার মাথার আড়ালে র সোনালী কপাল চিক চিক করছে! পাখীগুলো ঝাঁকে বা একা য় ফিরছে, রাখালেরা গরু-মোষ তাড়িয়ে নদীপরে গাঁয়ের পথ ধরেছে, ানা যাত্রী-বাস ধুলো উড়িয়ে স্টেসনের দিকে ছুটছে। কীপারের নে পিছনে টিলার মাথায় উঠছি আর দৃশ্যটার তারিফ করছি।

একেবারে মাথায় উঠে বাংলোর চত্বরে দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে হয়ে গেলাম। কী দৃশ্য! কী নিঝুমতা! দূরে আলো ঝলমল খানা, তার চিমনির ধোঁয়া বিজয় নিশানের মতো আকাশে উড়ছে, মে সাঁঝের তারা জ্বলজ্বল করছে, ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি মাঠ-জঙ্গল-ালায় ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর চুপে চুপে অন্ধকার ছ।

কীপার বাংলোর একটা ঘর খুলে আলো জেলে বারান্দা থেকে আমায় ডাকলো, "আসুন হুজুর।"

গিয়ে দেখি সাজান-গোছান চমৎকার ঘর। দেয়াল ঘেঁষে খাটে ডানলপিলো গদিপাতা। তবে তার ওপর চাদর-বালিশ নেই।

লোকটি ফসেটে কাঁচের ডিক্যানটারে জল ভরে টেবিলে রাখতে রাখতে বললে, 'হুজুর, বিস্তারার চাদর-বালিশ নেহী।'

জবাবে বলি, 'সঙ্গে নিউম্যমেটিক বালিশ, আর এই রাগ্—একটা রাত বেশ কাটবে। তুমি তো থাকবে?"

সে বলে, "না। যে লোকের থাকার কথা তার বেমার। ঐ আপনার খানা এল।"

রেস্তোরাঁ-বয় ঘরে ঢুকে টেবিলে খাবারের মোড়কটা রাখতেই কীপার বলে, 'এক মিনিট ঠার যা।' তারপর হিন্দী-বাঙলা মিশিয়ে বলে, 'হুজুর' রাতে জানলা খোলবেন না। বারান্দায় বার হোবেন না। ক'দিন থেকে একটা 'শের' ভারি হুজ্জুৎ লাগিয়েছে। তার উৎপাতে সাঁঝের পর গাড়ি চলাচল বন্ধ। কোন আওয়াজ-টাওয়াজ শুনলে ডরাবেন না। রাতে অমন হয়। এই বাংলো ছিল এক সাহেবের। কারখানাটাও ছিল তার। তখন আমরা বাচ্চা ছিলাম। ঐ পাহাড়গুলোর উধারে হামারা ঘর। আমার বাবা চৌকিদার ছিল। কোতো সাহেব-মেম আসতো। এক রাতে কী জানি কী হয়, কারখানার মালিক সেই সাহেব পাশের ঘরে তার মেমকে গুলি করে মারে, নিজেও মরে। তার এক বছর বাদ এই কোম্পানি কারখানা, বাংলো, জমি-জায়গা সোব কিনে ভোল একদম বদলে দেয়। হামার বাবা তেমনি নোকর থাকে। চার সাল পর সে মারা গেলে তার জাগায় হামি বহাল হই। যাই হুজুর, ডরাইয়ে মৎ। ভোরে আবার আসবো। আপনার টরচ্ আছে? তবে আর কী? এই কামরায় বিজলীর বোলটা পুরনো। যদি ফুটে যায়। তাই বলছি!,'

জিজ্ঞেস করি, 'হালে কোন গেস্ট্ এখানে এসেছে?'

সে বলে 'তিনমাস আগে এসেছিল চার সাইকিল দৌড়বাজ।'

বলি, 'একা কেউ থাকে নি?'

সে বলে, 'কী জানেন হুজুর! এখানে একা থাকলে ডর লাগে।'

বলি 'তা সত্যি। তবে ভয়ের কিছু নেই বলছো?'

সে বলে, 'ডর্? চল্ বে জিতানিয়া। সালাম হুজুর।"

তারা দুজনে চলে যেতেই দরজা-জানলা বন্ধ করে সিগরেট ধরিয়ে

ধরিয়ে আরাম চেয়ারে বসে সেদিনকার খবরের কাগজখানা পড়তে শুরু করি। বাইরে থেকে শীতের বাতাসের জানলার সার্সিতে মাঝে মাঝে ধাক্কা, অবিরাম ঝিঁঝির ঝংকার, দূরে নদী কিনারে শিয়ালের ব্যাকুল কোলাহল, একটা উড়ন্ত পেঁচার ডাক—সব মিলে আমাকে মাঝে মাঝে উন্মনা করে। কান পেতে থাকি বাঘের ডাক শুনতে পাই যদি। তার বদলে একবার কারখানার ফটক থেকে সাতটা বাজার ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। সিগরেটের প্যাকেট খুলে দেখি, আর মাত্র তিনটি বাকি। ভাবি, রাত কাটবে কী করে? পরক্ষণেই শালপাতার মোড়কটার দিকে চোখ পড়ে। আটটায় ওটাকে শূন্য করে রাতের মতো শুয়ে পড়বো! আর সিগরেটের কী দরকার? বালিশটা ফুঁ দিয়ে ফোলাই। হাত ঘড়িতে দেখি আটটা বাজতে পঁচিশ। আবার কাগজ পড়ি।

সময় যে এত ধীরে চলে এর আগে কখনও বুঝিনি। মনে হয়, কাঁটা একশ' কুড়ি সেকেণ্ডে মিনিট পার হতে হতে একটু করে ঝিমোচ্ছে! নাঃ! আটটার আগেই খেয়ে শুয়ে পড়বো। আটটা বাজতে তখনও বারো মিনিট; ডিক্যানট্যার থেকে কাচের গ্লাসে জল ভরে, চেয়ারখানা টেবিলের ধারে টেনে নিয়ে বসে শালপাতার মোড়কটা খুলতে যেতেই পাশের ঘরে কে যেন ধপ্ ধপ্ শব্দে ঢোকে, তারপর আবার একজন; তারও পরে আরও একজন। একটি স্ত্রীলোক হেসে ওঠে, কী যেন বলে। একটি পুরুষ তার কী জবাব দেয়। তাদের ভাষা বুঝিনা। ভাবি কোন নতুন গেস্ট্ হয়তো, সস্ত্রীক বা সদলে এসে থাকবে। আমি যে সে ঘরে আছি, জানাবার উদ্দেশ্যে গলা খাঁকাড়ি দি। কান পেতে থাকি। সব চুপচাপ। খট্‌কা লাগে। অতগুলো লোক, বিশেষ করে স্ত্রীলোক, হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল? দেখেছি, ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীলোকেরা চুপচাপ থাকতে পারে না। আমি আবার খাবার উদ্যোগ করতেই একটা মোটা গলায় ধমক—'ডোন্ট্ টাচ্'; চমকে উঠি। তারপরই পুরুষ কণ্ঠে হাসি 'হা-হা-হা-হা। ও! হো-হো-হো!' সে হাসি থামতে থামতেই একটি স্ত্রীলোকের হাসি শোনা যায়। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। কান খাড়া করে থাকি। আবার সব চুপচাপ। আমার বুদ্ধি-শক্তি জট পাকিয়ে যেতে থাকে। সন্ধ্যে রাতে এ কী! ওরা মানুষ না আর কিছু? শুনেছি, অশরীরীরা বার হয় নিশীথে। হঠাৎ গীটারের টুংটাং শব্দ হয়। তারপরই শোনা যায় গানের সুর। শব্দগুলো হঠাৎ থামে। আবার হাসি। তারপরই অনর্গল কথা। সে ভাষা কখন জড়ানো, দুর্বোধ্যে, কখনও দুটি একটি ধরা যায়—

ইংরেজী বা হিন্দী। আমার গলা শুকিয়ে আসে। গা দিয়ে ঘাম ঝরে। কীপারটা এই জন্তেই আমার ভয় পেতে বারণ করেছিল! ভাবলাম, চীৎকার করে বলি, তোমরা কে? যদি মানুষ হয় সাড়া দেবে। মানুষ না হলে——? তবে ওরা কারা? হঠাৎ ধপ্ ধপ্ শব্দ হতে থাকে। যেন তালে তালে নাচছে। তারপরই কাচের বা ঐ জাতীয় কিছু ভাঙার শব্দ। পরমুহূর্তেই মেয়েলী গলায় কান্না, যেন গভীর দুঃখ হয়েছে। আবার হঠাৎ সব চুপ।

ওদিকে কারখানার ঘন্টা বাজে—ঠংঠং—নটা। শেষ ঘন্টার শব্দ থমতে থামতেই মনে হয়, দূরে কোথায় বাঘ ডাকছে। সেখান থেকে বেরিয়ে কারখানার দিকে যাবার উপায়ও আর থাকেনা। অশরীরীরা দেখা দেয়, প্রাণে মারেনা, কিন্তু বাঘ দেখা দেয় রক্ত-মাংস খেতে। কেন গেস্ট হাউসের বিলাস ভোগ করতে এলাম? স্টেসনের ওয়েটিং রুমে রাত কাটিয়ে পরদিন আবার এলাম না কেন? অস্থিরভাবে পায়চারি করি, চেয়ারে বা বিছানায় বসি, চুপ করে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনি। খাবার-গুলো অভুক্ত পড়ে থাকে। দশটা পর্যন্ত সব চুপচাপ, নিঝুম। স্থির করি, চেয়ারে বসে রাত কাটাবো। ছেলেবেলায় ভূতের ভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, এখন ঘুম আসেনা। সেইভাবে কতক্ষণ কাটে বলতে পারবো না। কারণ, হাত ঘড়িটা দেখতে হাত ঘোরাতেই বাল্ব্ ফিউজ হয়ে যায়। আর শুরু হয় হাসি, নাচ-গান-বাজনা, কথা, কান্না। সেই গাঢ় অন্ধকারে আমার তখন-কার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবো না যদিও আমি ডাকতারদের কুট প্রশ্নের তুড়ুক জবাব দি, নিজের ওষুধের গুণ ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হই, চুট্‌কি ইয়াকির চটকদার বুক্‌নি ছাড়ি। কিন্তু তোমাদের মতো সাহিত্যিক চোখ, আর ভাষা তো আমার নেই। আমি ছুড়তে না জানলেও মনে প্রাণে চাইতে লাগলাম, একটা গুলিভরা পিস্তল। সৌভাগ্যবশতঃ ট্‌রচ্‌টা হাতের কাছেই ছিল। তার তীক্ষ্ণ আলোয় ঘরের জমাট অন্ধকার ছিন্ন-ভিন্ন করতে থাকি। কিন্তু সেই অদৃশ্য শব্দের উৎসকে স্পর্শও করতে পারিনা। ভাবতে থাকি কখন ভোরের পাখিটি, তা সে যত ছোটই হোক্, তার একটি ডাকে অভয় দেবে? আরকিমিডিস পৃথিবীর বাইরে লিভার রাখবার জায়গা পাননি বলে পৃথিবীটাকে ওলটাবার ইচ্ছা অপূর্ণ রাখতে বাধ্য হন। আর, আমি সেই অন্ধকার ঘরে চেয়ারে বসে ভৌতিক শব্দ শুনতে শুনতে কামনা করি যদি পৃথিবীটাকে তর্জনীর একটি ধাক্কায় গ্লোবের মতো মেরুদণ্ডের ওপর একবার ঘুরিয়ে আলোর বন্যায় রাতের অন্ধকার ভাসিয়ে দিয়ে সব

উজ্জ্বল, স্পষ্ট করতে পারি। কিন্তু তা হয়না, পৃথিবী রাতের কালো আবরণগায়ে দিয়েই তার নিজ নিয়মে চলে। আমি টর্চ্ হাতে শব্দের দিকে কান পেতে চেয়ারে কম্পিত বুকে বসে থাকি।—

অবশেষে হঠাৎ কোথায় যেন ভোরের পাখি ডাকে। তাড়াতাড়ি উঠে একটা জানলা খুলে দিতেই দেখি আকাশে শুকতারা জ্বলছে। তার নিচেই দিনের আলোর আভাসে রাতের অন্ধকার মুছে যাচ্ছে। তাই দেখে আমার বুক থেকে ভয়ের ভার নেমে যায় ; আনন্দে মন নেচে ওঠে। প্রভাত আলো দেখে এত আনন্দ আর শক্তি কখনও পাইনি। সেই অভিশপ্ত ঘরে আর নয়। বালিশটার বাতাস ছেড়ে দিয়ে, রাগ্‌খানা পাটকরে বাথরুমে ঢুকি চোখে-মুখে জল দিতে। সেখান থেকে ফিরে আসতে আসতেই দরজায় ঘা পড়ে, "হুজুর, দরজা খুলুন"।

তোয়ালে দিয়ে হাতমুখ মুছতে মুছতে গিয়ে দরজা খুলেই দেখি, কীপার।

সে বলে, "সালাম হুজুর। চা ভেজ দেই ?'

বলি, "এখানে আর একদণ্ডও নয়"।

সে বলে, "কাহে হুজুর ?"

তাকে রাতের সমস্ত ঘটনা বলতেই সে বলে, "এতনা ডর লাগলো ? শয়তানকো কামই এহি। চলুন, ওকে দেখাচ্ছি—"

সে পাশের ঘর খুলে তার ভেতর দিয়েই আমাকে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট ঘরের দরজা খুলেই বলে, "উ দেখিয়ে—"

দেখি মস্ত দাঁড়ে একটা হীরামন ! পাখীটা বলে, "গুড মর্নিং। হা-হা-হা।"

কীপার বলে, "পাখীটা ছিল আগের বড় সাহেবের। তিনি যাবার সময়ে এখানকার বড় সাহেবকে দিয়ে যান। কিন্তু ওটা ভারি বদমাস্। গালি বকে। তাই মেমসাহেব ওকে এখানে পাঠিয়েছেন। চলুন হুজুর। চা ভেজ দেই। হুঃ। সারারাত আপনার ভারি তখ্‌লিফ্ হোলো ! যদি ওর কথা বলিয়ে যেতেম তোবে—"

বলি, "হাঁ। চল।"

পাখিটা বলে, "নন্‌সেনস্ ! গেট আউট্।"

আমার এমন রাগ হয় যে তার গলাটা মুচড়ে দিতে ইচ্ছে করে ; বলি, "রাসক্যাল।" সে মোটা গলায় হাসে, "হাঃ হাঃ হাঃ। এই আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা।' আমি বলি, 'কিন্তু একটা পাখী কি এত কথা বলতে পারে।"

বন্ধু বলে, 'জান তো ভাই গল্পের হাতী মেঘে চড়ে ?'

চোরেরও অধম

অনেক দিন আগে—

ভাগীরথীর পূর্বতীরে একটি ছোট রাজ্য ছিল। রাজ্যটি ছোট হলেও রাজা-প্রজা সকলেই নিরুপদ্রবে, বেশ সুখে-শান্তিতে বাস করছিলেন। ক্ষেতগুলি ছিল শস্যশালী, শিল্পীদের তৈরী হাতের কাজগুলোও ছিল চমৎকার। ভাগীরথী দিয়ে দেশ-বিদেশে বাণিজ্য তরী যাওয়া-আসা করতো। রাজার মন্ত্রীরাও ছিলেন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও রাজভক্ত। তাঁদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শুভকর্মা ছিলেন বহুগুণসম্পন্ন। রাজা তাঁকে খুব ভালবাসতেন। বলতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় রাজ্যের অর্থাৎ প্রজাদের সমৃদ্ধি ঘটছিল।

কিন্তু আলো-অন্ধকার যেমন পাশাপাশি থাকে, সুখ-শান্তির পাশেই তেমনি দুঃখ-অশান্তি। সেবার রাজ্যবাসীদের ভাগ্যেও ঘটলো তাই। শীতের ফসল দিয়ে শীত চলে গেল। এল বসন্ত। গাছে গাছে নতুন পাতা গজালো, ফুল ফুটলো, মুকুল ধরলো। যেমন পাখিকুলের আনন্দ,—তেমনি সকলেরই গলায় গান। গান শুনতে শুনতে বসন্ত চলে গেল। এল গ্রীষ্ম। রোদের তেজ হয়ে উঠতে লাগলো প্রখর থেকে প্রখরতর। বাতাসে আগুন, জল শুকোয়। ভাগীরথী অন্নহীনা কাঙালিনীর মতো রোগা হয়ে ধীরে বইতে লাগলো। তার উজানে-ভাটিতে বাণিজ্য-তরী আর আসা-যাওয়া করতে পারে না। এখানে, ওখানে, সেখানে চড়া, যেন হাড় বেরিয়ে পড়েছে! রস শুকিয়ে মাঠ ফেটে-ফুটে চৌ-চির, গাছ-পালা নিস্তেজ, মর মর, জীব-রাজ্যে ঝিম ধরেছে। রাজ্য জুড়ে পিপাসা। জল—চাই, চাই—জল। লোকে আকাশের দিকে তাকায়—পুবে, পশ্চিমে উত্তরে, দক্ষিণে। কোথাও এক খাবলা মেঘ নেই। সারা আকাশ শুকনো, খালি, যেন দিক্-জোড়া একটা শুকনো হাঁ। তারই সামনে একটা পাখি উড়ে উড়ে করুণ সুরে কাঁদছে, 'ফটি-ই-ক্ জল!'

এমনি করে গেল জ্যৈষ্ঠ। এল আষাঢ়—আকাশে নতুন মেঘ। সকলেরই আশা, খরা শেষ হোলো, অঝোরে ঝরবে জল। গাছ-পালা, মাঠের আধমরা ঘাসগুলোও শিউরে উঠলো, ব্যাঙগুলো মাঝে মাঝে গলা খাঁকাড়ি দিতে লাগলো—গান গাইতে হবে যে! দেশজুড়ে গানের

আসর বসবে। তারপর সত্যি একদিন, মেঘলোক থেকে জল ঝরলো। তবে দেরীতে এবং বেশি ঝরলো না। চাষী কপালে হাত দিলে। জল না পেলে মাটি ফসল দেয় না। মাটি ফসল না দিলে অন্নের হাহাকার। সে বছরটা টানাটানিতে গেল। এলো পরের বছর। লোক সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। কিন্তু হায়! সে বছর হোলো আরও খরা। কেবল সেই পাখিটাই কাঁদলো না, লোকেও কাঁদতে লাগলো—'অন্ন চাই, জল চাই।'

রাজা চিন্তিত, মন্ত্রীরাও চিন্তিত।

লোকে বলতে লাগলো, 'রাজ্যে পাপ ঢুকেছে।'

কার পাপ, কিসের পাপ, কেউ জানে না ; তবু বলে, 'পাপ ঢুকেছে।' তারা পাপ তাড়াতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে, মানতও করে, কিন্তু বর্ষা অলস ; মেঘ জল বইতে, ঢালতে নারাজ। এমনি করে সে বছরটাও রাজ্যের ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার শুনতে শুনতে চৈতালী বাতাসে উড়ে গেল।

ওদিকে রাজা-মন্ত্রী-পাত্র-মিত্র সবাই ভাবছে, কি করা যায়?

এলো নতুন বছর। তার পিছু পিছু এলো কাল-বৈশাখী। শুকনো, জীর্ণ যা কিছু ছিল উড়লো ভাঙলো আর ভিজলো। ব্যাঙগুলো ডেকে উঠলো, কটর, কটর, কটর, কটর। চাষীরা মাঠে ছুটলো, নেয়েরা নৌকো সারাতে লাগলো। ভিজে গাছের পাতায় রোদ ঝিক্‌মিক করতে লাগলো।

প্রধানমন্ত্রী শুভকর্মা বললেন, 'মহারাজ! শুভ-লক্ষণ।'

রাজামশাই ঈষৎ হাস্য করলেন। প্রজার সুখে রাজার সুখ ; প্রজার সমৃদ্ধিতে রাজার সমৃদ্ধি।

কিন্তু বিধাতার মনের খবর কে জানে? জ্যৈষ্ঠ থেকে আকাশপথে মেঘের আনাগোনা শুরু হোলো ; ঝড়ের হাঁকাহাঁকি, দাপাদাপি চলতে লাগলো। আষাঢ়ে নামলো বাদল। ভাগীরথীতে এল নতুন জল—গেরুয়া রং যেন ভৈরবীর বসন। ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় ফেনা। খাল-বিল-পুকুর জলে ভরে উঠতে লাগলো। দিনভোর, রাতভোর ব্যাঙের ডাক। চন্দ্র-সূর্য মেঘের আড়ালে ওঠে, আড়ালে ডোবে। দিন-রাত একাকার। বর্ষার গতিক-সতিক দেখে লোকের বুক কাঁপে। সবাই বলাবলি করে, 'বান ডাকবে নাকি?' খড়ের ছাউনি, মাটির মেঝে ভেসে যাবে, দালান-কোঠা ক'খানাই বা! তারাও ভাবে, 'বান এলে ছাদে চড়তে হবে।' সকলেরই মুখের অন্ন যাবে ভেসে। খরায় হাহাকার, ভরায় হাহাকার। মানুষের বরাতে সুখ-শান্তি আর নেই!

আষাঢ় গিয়ে এলো শ্রাবণ। চারধারে জল থৈ থৈ। তারই মধ্যে কেউ কেউ গান ধরে! যেন বাদলার এলোমেলো বাতাসে প্রদীপের শিখা—এদিকে হেলে, ওদিকে হেলে, নিবু নিবু হয়। তবু আলো ছড়িয়ে ভরসা দেয়।

একদিন হোলো কী! সন্ধ্যে গড়াতে না গড়াতে নামলো বৃষ্টি। মেঘের হাঁক-ডাকে, বিদ্যুতের ঝলকানিতে, বাতাসের ঝাপটায়, সনসনানিতে মনে হতে লাগলো বুঝি প্রলয় হবে। সবার মনে আতঙ্ক। রাত যত এগোয়, দাপাদাপি তত বাড়ে। খানাখন্দ ছাপিয়ে পথে জল উঠলো। রাজবাড়িতে যাবার পথে এক মুদির ঘর। মুদি আর মুদি-বউ সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়েছে। কিন্তু বাইরের দুর্যোগে তাদের ঘুম আসছে না। ছেঁচের ফাঁকে বিদ্যুত্যের ঝলকানি, বেড়ায়, কপাটে বাতাসের ঠেলা, বৃষ্টির ঝাপটা। এতে কী ঘুম আসে?

রাত তখনও নিশুতি হয়নি। মুদি-বউ মুদিকে বললে, 'ওগো শুনছো, বাইরে কে যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে।'

মুদির তখন সবে একটু তন্দ্রা এসেছে; বললে, 'এই দুর্যোগে মানুষ বেরোয়? ঘুমোও।'

মুদি-বউ বললে, 'বেরোয় বৈকি! ও চোর।'

মুদি বললে, 'চোরও বেরোয় না। চুরি করতে গিয়ে তার প্রাণে মরতে বয়ে গেছে।'

—'ওই শোন। যেন বেড়া কাটছে। ওঠ। আলোটা জ্বালো। ও নিশ্চয় চোর।'

—'এই দুর্যোগে রাজার চাকর ছাড়া চোরও বেরোয় না। লোকটা নির্ঘাৎ রাজার চাকর। হুকুম তামিল না করলে চাকরি থাকবে না। তাই চলেছে। চোর বেরোয় নিজের গরজে। নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোও! ও রাজার চাকর। ওদের সময়-অসময় সমান। ঘুমোও দিকি।' বলে মুদি চাদর-খানা বেশ ভাল করে মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

তখন বৃষ্টি-বাতাসের বেগ একটু কমে এসেছিল। বৃষ্টি-বাতাসের দাপট থেকে রক্ষা পেতে মুদির ঘরের দাওয়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, মন্ত্রী শুভকর্মা। তিনি দরজা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন। চলেছিলেন, রাজ-বাড়ি। রাজা তাঁকে গোপনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনিও ডাকামাত্র গোপনে একা চলেছেন! তিনি মুদি ও মুদি-বউয়ের কথা-বার্তা শুনতে পেলেন। শুনে মনে ধিক্কার এলো। জীবনভোর রাজ-সেবার এই পুরস্কার?

রাজকর্মচারী চোরেরও অধম ? লোকে রাজ কর্মচারীকে ভালোবাসে না, ঘৃণা করে !

তিনি সিক্ত বস্ত্রে রাজার কাছে উপস্থিত হয়ে হাতযোড় করে বললেন, 'মহারাজ ! আপনার আজ্ঞামতো এসেছি। কিন্তু অধীনকে ভার মুক্ত করতে আজ্ঞা হোক। সুদীর্ঘকাল কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা করেছি। অধীন মুক্তি প্রার্থনা করছে।'

রাজা সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, 'কেন ? আমি তো তোমার কাজে পরম তুষ্ট ; প্রজারাও তোমাকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা জানায়। তবে কেন ও কথা বলছো ?'

—'মহারাজ ! প্রজাদের ওসব মৌখিক। রাজ-কর্মচারীর প্রতি কারো অন্তরে ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই।' বলে শুভকর্মা পথের ঘটনাটি জানালেন।

শুনে রাজা নিরুত্তর রইলেন।

শুভকর্মা বললেন, 'লোকের মতে আমি চোরেরও অধম। মহারাজ ! এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

তিনি রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলেন এবং পরদিন সংসার ছেড়ে চলে গেলেন !*

---

* বংলার একটি লোককথার অনুসরণে।

ঠাকুরদার গল্প

ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনতে চাইলেই বলেন,—'আমি বানিয়ে গল্প বলতে পারি না। আমার জীবনে যা ঘটেছে, যা দেখেছি তাই বলি। রং চড়াবার হিম্মৎ আমার নেই।'

আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না! সেদিন বললাম,—ঠাকুরদা, মিথ্যে গল্প শুনে শুনে আর পড়ে পড়ে অরুচি ধরে গেছে; আপনার সত্যি গল্প একটা শুনিয়ে দিন।

ঠাকুরদা বললেন, 'বেশ। তখন আমার বয়স তিরিশ বছর। কয়েক বছর ঠিকেদারি মানে কনট্রাকটারিতে কিছু নাম আর দুটো পয়সা করেছি। তার ফলে কাজে বেশ মন বসেছে। আমার কাজের জায়গা ছিল, ছোটনাগপুরের দেহাত মানে গ্রামাঞ্চল। দেশটা পাহাড়-বনে ভরা, ঝর্ণা-আঁকা। ওরই জায়গায় জায়গায় আবার বাঘ-ভালুক-সাপ আর বুনো হাতীর ভয়, আদিবাসীদের বাস।

'তা' সেবার ওর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বন কেটে পাথর সরিয়ে একটা সড়ক তৈরির কাজ পেয়েছি। বনটা যেমন গভীর, তেমনি মস্ত! তার মাঝ থেকে এধারে-ওধারে কতকগুলো ছোট-বড় পাহাড় উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঐসব টিলায়-টিলায় যোগ দিয়ে পথটা তৈরি করা হচ্ছিল! তার ফলে পথটার চেহারা হচ্ছিল আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু। আমার মজুরের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের মধ্যে কতক ছিল ঐ অঞ্চলের, কতক বাইরের।

'কাজ করতে করতে যেখানে দিন শেষ হোত, সেখানেই আমরা তাঁবু খাটিয়ে আস্তানা গাড়তাম। বনের শুকনো কাঠ-কুটো, ডাল-পালা জড় করে, তিনখানা পাথর দিয়ে চুলো বানিয়ে ঐসব কাঠ-কুটো ধরিয়ে মজুরেরা রান্না চড়িয়ে দিত—ভাত আর অড়হর ডাল। ওরা কাছের বা দূরের কোন ঝর্ণা বা দেহাত থেকে টিনে ভরে জল এনে রাখতো! তখন কেউ কেউ মাদল বাজিয়ে দেহাতি গান ধরতো, কেউ কেউ থলে বিছিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোতো, আর আমি হারিকেনের আলোয় খাতা খুলে সেদিনকার কাজের হিসাব লিখতে বসে যেতাম। চারধার থেকে ঝাঁক বেঁধে বুনো মশা উড়ে আসতো রক্তের লোভে। বন জুড়ে অসংখ্য ঝিঁ-ঝিঁ ঝঙ্কার

দিত, গাছের গায়ে ঘুণ-পোকার একটানা উৎকট শব্দে নিস্তব্ধ বনটাকে আরও ভয়ঙ্কর বোধ হোত। বুনো ইঁদুরের খোঁজে গাছের কোটর থেকে পেঁচা বেরিয়ে এসে মাঝে মাঝে বিশ্রী সুরে ডেকে উঠতো। দূর থেকে শিয়ালের পালের ডাক ভেসে আসতো। অন্ধকারে সাঁই সাঁই শব্দে উড়ে যেতো বাদুড়। চারধারে সীমাহীন বন আর অন্ধকার।

'এই রকম জায়গায়, এই অবস্থায় ভয় হওয়াই স্বাভাবিক ; কিন্তু আমার ভয় করতো না। কারণ, আগুনের কাছে কোন বুনো জন্তুই ঘেঁষে না। তবে বাঘ খুব চতুর। ওরা শিকার ধরার ফাঁক খোঁজে, ফিকিরে থাকে। তার ওপর আমার মজুরের সংখ্যাও কম ছিল না, তাদের কারো কারো কাছে টাঙি, বর্শাও থাকতো! তবে ওদের ভারি ভূতের ভয়।

'তখন শীতের শেষ। বনে গাছ ভরা আমলকি, ডাল ভরা বুনো পাকা কুল, পলাশ গাছগুলো ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে উঠছে, মহুয়া ফুল তখনও ফোটেনি। একদিন দুপুরে বাইসাইকেলে চড়ে বনের বাইরে ক্রোশ দুই তফাতে এক গাঁয়ে যাচ্ছি। সেখানে ছিল, একটা ছোট ডাকঘর, একটা ছোট বাজার, একটা পুলিশ চৌকি। ঐ ডাকঘরের কর্তার কেয়ারে আমার সরকারী বা বাড়ির চিঠি-পত্র আসতো।

'চড়াইয়ে উঠে, উৎরাইয়ে গড়িয়ে সাইকেল চালাচ্ছি। এক একটা চড়াই এমন খাড়া যে, বাইসাইকেল থেকে নেমে গাড়ি ঠেলে তার মাথায় তুলতে হচ্ছে। নির্জন পথ, দু'পাশে শাল-মহুয়া-পলাশ-আমলকি প্রভৃতির ঘন বন! শীতের শুকনো হিমেল হাওয়ায় বনতল মরা পাতায় ভরা। একটা ছোট উৎরাই থেকে নেমে খানিক হেঁটে গিয়ে চড়াইয়ে উঠছি।

'হঠাৎ দেখি, সামনে ডান ধারের বন থেকে বেরিয়ে এলো, গায়ে ডোরাকাটা এক জোড়া হায়েনা। ঠাহর করে দেখলাম, হ্যাঁ হায়েনাই বটে। সেই বড় মাথা, পিছনের পা দুখানা ছোট, বড় বড় লোমে ঢাকা লেজ। দুটোতে পথের মাঝে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আমাকে দেখে ভারি অবাক হয়েছে।

'হায়েনারা সাধারণতঃ রাতে বের হয়। গাঁয়ে ঢুকে ছাগল-বাছুর, ছোট ছেলে বাগে পেলে ধরে। ওদের দাঁত খুব শক্ত—মোটা মোটা হাড় কড়মড় করে ভেঙে ফেলে। গভীর রাতে এক একবার হঠাৎ ডেকে ওঠে। শুনে মনে হয়, কে যেন হা হা করে হাসছে। আমিও দিনের বেলায় ওদের দেখে কম অবাক হলাম না! দেখছি, ওদের নড়বার নামটি নেই। এদিকে বনের ছায়াও আড় হয়ে পথে পড়েছে। শীতের বেলা দেখতে

দেখতে ফুরিয়ে যাবে। সন্ধ্যার আগেই গাঁয়ে পৌঁছতে না পারলে বিপদ নির্ঘাৎ! বাইসাইকেল থেকে নেমে প্রাণপণে চীৎকার করলাম। কিন্তু টানা বাতাসে সে শব্দ উড়ে গেল। আমার গলার এই গুরু গম্ভীর স্বর আরও গম্ভীর করে আবার চীৎকার করলাম। হায়েনা যুগল তাতে বিচলিত হওয়া দূরে থাক্, বরং দাঁত বার করে দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

'জায়গাটা উৎরাই হোলে তাদের সামনে দিয়েই তীরবেগে গাড়ি চালিয়ে নেমে যেতে পারতাম। কিন্তু ক্ষুদে রাক্ষস জোড়া রয়েছে চড়াইয়ের মাথায়। ছুঁড়ে মারবার মতো কোন পাথর পেলাম না, যেগুলো পথের দুপাশে পড়েছিল, সেগুলো আকারে বড় আর ভারি। কাজেই নিক্ষেপাস্ত্র ব্যবহারের আশা ছেড়ে, ভয় দেখাবার উপায় ধরলাম। গায়ে ছিল কালো কোট। সেটা খুলে সাইকেলখানা সামনে আড় করে রেখে, জোরে দোলাতে-দোলাতে 'হো হো' করে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলাম। তাতে যে তারা ভয় পেল, এমন কথা বলতে পারি না। তবে পথ থেকে সরে গিয়ে বাঁ-ধারের বনে ঢুকে গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি টিলার মাথায় উঠে উৎরায়ের পথ ধরলাম। গাঁয়ে পৌঁছতে পৌঁছতেই সন্ধ্যা নামলো, ডাকঘর তখন বন্ধ।

'বনোয়ারীলাল নামে এক মুদির সঙ্গে পরিচয় ছিল। উঠলাম তার দোকানে। সে আমাকে দেখে খুব খুশি হোলো। সে তখন দোকান বন্ধ করছিল। সেদিকে সন্ধ্যার পর বেচা-কেনা হয় না। বনোয়ারী একা দোকানে থাকতো! তার পরিবারবর্গ থাকতো দু-আড়াই ক্রোশ তফাতে তার পৈত্রিক বাড়িতে একটা বড় গঞ্জে। দোকানের পিছনদিকের ঘরে সে রান্না করতো। তারই এক ধারে সে শুতো। ঘরে খান দুই খাটিয়া ছিল। তাদের একখানাতে কম্বল বিছিয়ে দিয়ে বললে, 'বসুন হুজুর। আজ আমার ঘরেই আপনার খানা। আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।'

বললাম, 'তোমাদের খানা আমার খুব ভাল লাগে।'

তারপর আরাম করে বসে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তাকে পথের কাহিনীটি বললাম। সে মেঝেয় উবু হয়ে বসে মস্ত কাঁসিতে যাঁতা-ভাঙ্গা লাল আটা মাখতে মাখতে বললে, 'হায়েনারা বড় মানুষের ওপর হামেশা হামলা করে না। তবে মেজাজের কথা। আমি একবার ভারি ঝকমারিতে পড়েছিলাম। বলছি—

'সে উঠে আঙ্গিনায় নেমে গেল। একটু পরে খানকয়েক শালের রলা বগলে করে ঘরে ঢুকে রলাগুলো উনুনের পাশে রেখে লেচি কাটতে কাটতে

বললে 'চৌরার ধারে এই গাঁ তখন ছিল ছোট। সে সময় ডাকঘর বসে নি, চারদিকে বন-জঙ্গল ছিল খুব ঘন। মাঝে মাঝে শের আসতো। কোন কাঠুরে একা বনে ঢুকতে সাহস করতো না। চার পাঁচজনে দল বেঁধে যেত। তবু দু-একটাকে শের ধরতো,—এখন বন-জঙ্গল পাতলা হয়েছে, মাঝে মাঝে আবাদ, দু-চার ঘর বসতি হচ্ছে। কিন্তু হরিণের উৎপাত হয়েছে! মকাই আর গম পাকলে এক একটা পাল আসে! ওদের লোভে দু'একটা বাঘও এসে পড়ে। তখন শিকারীর আনাগোনা হয়।

'আপনি তো দেখেছেন, এ অঞ্চলের বনে দু-চারটে টোপাকুলের গাছ আছে। মাঘ মাসে ঐ সব কুল পাকে। হাওয়ায় পাকাকুল ঝরে পড়ে। পাকা কুল খায় বুনো টীয়া, বুলবুল, আরও কয়েক রকমের পাখি। আর কারা খায় জানেন?—শিয়াল আর ভালুকে।'

'তার কথা শুনে অবাক হই, বলি, 'ভালুক তো মহুয়া ফুল, পোকা মাকড়, মৌচাক ভেঙে মধু খায় শুনেছি, টোপাকুলেরও ভক্ত ওরা?'

বনোয়ারী বলে, 'হ্যাঁ। ওরা রাতে বার হয় না। বছর চার পাঁচ আগের কথা—আমার পিতাজী তখন বেঁচে। তিনিই এই দোকানে বসতেন।

'মাঘ মাসে একদিন গেলাম ঝুড়ি আর টাঙি নিয়ে ঐ পশ্চিম দিক্‌কার জঙ্গলে। বেলা তখন দুপুহর হবে। আগের দিন শেষ বেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলে বন-জঙ্গল ভিজে ছিল। সিকি ক্রোশটাক যাবার পর এক জায়গায় একটা আমলকি গাছ পেলাম। তাতে বেশ বড় বড় আমলকি ফলে ছিল। ভাবলাম, এক ঝুড়ি আমলকি পেড়ে নিয়ে যাই! আট-দশ মাইল দূরে শহরের বাজারে ওর দাম পাওয়া যাবে। হঠাৎ দেখি, সামনের দিকে একটা মস্ত কুল গাছ। গাছটার ডালগুলো পাকা কুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। ঝরে পড়া পাকাকুলে গাছতলা ছেয়ে রয়েছে। হাওয়ায় দু-চারটে কুল টুপটাপ ঝরে পড়ছে। আমাদের দেহাতী মেয়েরা নুন মাখিয়ে কুল শুকিয়ে রাখে, গুড় দিয়ে মিঠা আচার বানায়। শহরের বাজারেও এসব বিকোয়। ভাবলাম, আমলকি আর কুল দুই-ই নিয়ে যাবো। একটা বস্তা সঙ্গে আনলে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হোত। কিন্তু যখন আনিনি তখন আফশোশে লাভ কি?

তবে কয়েকটা কুল আগে পরখ করে দেখতে হবে, মিঠা কি তিতো। বুনো কুল একটু তিতো হয়। ওদিকে আর একজনও যে আমার আগেই কুলতলায় ছিল তা তখনও দেখিনি।

একটা কুল কুড়িয়ে চাখ্‌তে যাবো অমনি দেখি সামনে এক ভালুক।

সে পিছনের দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে বদ্ বদ্ শব্দ করলে। তার কুতকুতে চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো চিক্ চিক্ করে উঠলো। বাবু, সাহসের সঙ্গে মোকাবেলা করলে দুর্দান্ত বুনো জন্তুকেও কাবু করা যায়। চাই সাহস, শক্তি আর কৌশল। ভালুকের দুর্বল জায়গা ওর নাক। ও দুপায়ে দাঁড়িয়ে দুহাতে নাক ঢেকে রাগে 'বদ্ বদ্' করছিল, যেন কি বলছিল।

দেখলাম পালাবার উপায় নেই। ছুটলেও আমায় তাড়া করবে। ওর সঙ্গে ছুটে পারবো না। গাছে চড়লে ভালুকটাও গাছে চড়বে, ওরা গাছে চড়তে ওস্তাদ! বাঁচবার একমাত্র উপায় ওর নাকে টাঙির এক কোপ বসানো! বুঝতেই পারছেন কাজটা কত কঠিন। ভালুকটা ধাপে ধাপে এগিয়ে আসতে আসতে সেই রকম বিশ্রী শব্দ করছিল আর ছুঁচলো ঠোঁট দুটো নাড়ছিল! ওর লক্ষ্য আমার চোখ মুখ আর গলা। ওর থাবার এক চাপড়ে আমার নাক-মুখ-চোখ তালগোল পাকিয়ে দেবে। তারপর সামনের দুপায়ে আমায় জাপটে ধরে গলায় কামড় দেবে। আমি জোয়ান মরদ; অমন অসহায়ের মতো মরবো কেন?

জানোয়ারটা এগোতে এগোতে আমার সামনে হাত দুয়েকের মধ্যে আসতেই দিলাম টাঙির এক কোপ। বরাতের কথা হুজুর,—কোপটা লাগলো ঠিক তার নাকে। সেই চোটে সে ঘোঁৎ করে উঠলো, আর এগোলো না। আমিও অমনি দিলাম, জান বাঁচানো ছুট-ছুট-ছুট-ছুট। অনেক দূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম। জানোয়ারটাকে দেখলাম না। একখানা বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলাম।

ওদিকে সামনেই গাঁ দেখা যাচ্ছিল। সড়ক দিয়ে মালবোঝাই একখানা ট্রাক ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। ভালুকটাকে না দেখতে পেয়ে বুঝলাম আমার কোপটা বেশ মোক্ষম হয়েছে।

ঘরে ফিরে পিতাজীকে সব বলতেই তিনি খুব বকলেন। আমি যে সেদিন বেঁচে গেছি,—আমার বরাত বলতে হবে। বললাম, তা বলতে পার।

রাতখানা তার অতিথি হয়ে কাটিয়ে পরদিন পোসট্‌মাসটারের কাছে আমার ডাকের খোঁজ-খবর নিয়ে নিরাপদে কাজের জায়গায় ফিরে এসে শুনি,—মজুরেরা নাকি অনেক দূরে বাঘের ডাক শুনতে পেয়েছে। সুতরাং কয়েকটা দিন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হলো।

নদীর চরের দৈত্য

চৈত্র মাস—

আম-বারুণীর মেলা বসেছে সেই নদীর ওপার, মঙ্গলবেড়ের মাঠে। এপার থেকে দেখা যায় না ; ওপারে পৌঁছেও সিকি ক্রোশ গেলে তবে মেলার ধারের জোড়া আমগাছ চোখে পড়ে।

মেলায় কত গাঁ থেকে কত লোক এসেছে—কেউ গরুর গাড়িতে, কেউা নৌকোয়, কেউ হেঁটে, কেউ বা ডুলি চড়ে। কেউ কেউ আবার ঘোড়ায়ও এসেছে। যত লোক তত জিনিষ—মাটির খেলনা, শাদা-লাল রঙ্ করা মাটির ঘট, বাঁশি, রাংতা-মোড়া বাঁশের তলোয়ার, কামারে ছুরি, চিনির জোড়া মোণ্ডা, রসগোল্লা, বাতাসা, খৈ, মুড়ি—কত নাম করবো ! আর মেলার বর্ণনাই বা করবো কি ! যে আমাদের মঙ্গলবেড়ের আম-বারুণীর মেলা না দেখেছে, সে বুঝবে না, সেখানে কি ব্যাপার ! কি মজা !

সেদিন মর্নিং ইস্কুলের পর ছুটি হ'য়ে গেল। বাড়ির পথে হরিশ ও রামগোপাল পরামর্শ করলে, মেলায় যেতে হবে। তারা এর আগে দু'বার ঐ মেলায় গেছে ; প্রত্যেক বছরই ওখানে আম-বারুণীর দিনে মেলা বসে।

বাড়ির সাম্‌নে এসে হরিশ বল্‌লে—"তবে শীগ্‌গির খেয়ে নে—"

রামগোপাল বললে, "এত সকালে ? এই তো সবে বেলা দশটা—"

—"কতটা পথ যেতে হবে তার ঠিক আছে ? এখান থেকে মজমপুরের খেয়াঘাটই তো প্রায় এক ক্রোশ—তারপর—"

—"ওখান দিয়ে কেন যাবো ?"

—"তবে কোথা দিয়ে যাবো ?"

"এই নদীর চর ভেঙে সোজা—বেদুইনদের মতো—"

কথাটা শুনে হরিশ রামগোপালের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলো। তারপর বল্‌লে—"সে আমি যাব না !"

—"তুই না যাস্ আমি একাই যাব—"

"যাস"—বলে হরিশ বাড়ি ঢুক্‌লো।

সেখান থেকে আর একটু গেলে একেবারে নদীর ধারে রামগোপাল-

দের বাড়ি। রামগোপাল বার-বাড়ির উঠোনে আমতলায় দাঁড়িয়ে একবার নদীর দিকে তাকালো। এ পারে ওদের বাড়ির কাছে নদীর সরু জলধারা; তারপর একখানা ছোট চর। তারপর আবার একটু জল, আবার এক-খানা ছোট চর, আবার খানিকটা জল—তারপর যে চর, তা যেন মরুভূমি—বালি, বালি, কেবল বালি। কোথাও শাদা, কোথাও শাদায় কালোয় মিশানো। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝাউবন—তারপর শক্ত, শুক্নো, চাবড়া বাঁধা মাটি রৌদ্রে ফেটে-ফুটে চৌচির। ঠিক দুপুরের রৌদ্রে বা রাতের গাঢ় অন্ধকারে একা এ চর পারাপার করতে সাহস ও শক্তির দরকার।

রামগোপাল বাড়ি গিয়ে বই রেখে জামা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"মা, আমি মঙ্গলবেড়ের মেলায় যাব—"

—"কার সঙ্গে?"

"একা" বল্‌তে বল্‌তে রুক্ষ মাথায়ই গামছা নিয়ে ছুটলো নদীতে।

নদীতে অল্প জল, স্রোতও সামান্য, ওপর থেকে একেবারে তলা অবধি দেখা যায়। ঐ যে চেলা মাছের ঝাঁক। রামগোপাল কোমরে গামছা বেঁধে জলে লাফিয়ে পড়লো। ঠাণ্ডা জলে তার গা গেল জুড়িয়ে। কিন্তু আজ আর সাঁতার কাটা হবে না। আর সাঁতার কাটবেই বা কোথায়? নদীটা একেবারে মরে গেছে—ব্যাপারীর বড় নৌকো তো চলেই না, যা চলে জেলে ডিঙ্গি। লোকে এ ধারে হেঁটে নদী পারাপার করে। তবে মজমপুরের খেয়াঘাটে এখনও জল গভীর।

রামগোপাল একটু এদিক-ওদিক সাঁতার কেটে, জল তোড়পাড় করে, গোটা কয়েক ডুব দিয়ে ডাঙায় উঠ্‌লো। তারপর মাথা মুছতে মুছতে বাড়ির দিকে দিলে দৌড়।

বাড়ি এসে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বল্‌লে—"মা, ভাত দাও—"

মা তখন মাছ ভাজছিলেন। বল্‌লেন—"এত তাড়া কিসের? ইস্কুলে তো যেতে হবে না—"

—"বাঃ রে! ক্ষিদে পায় না বুঝি?"

—"তোমার মতলব বুঝেছি। মেলায় যাওয়া হবে না—"

—"কেন!"

—"এই কাঠ-ফাটা রোদে তিন ক্রোশ ভেঙে যাবেন মেলায়! শেষে একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে বস। উনি নেই বাড়ি—"

—"কিছু হবে না। তোমার কেবল ভয়—"

—"না, যাওয়া হবে না—"

—"বেশ তাই, কিন্তু তুমি আমায় ভাত দাও—"

—"রান্না হোক আগে।"

রামগোপাল আর কিছু বললে না। কাল মফঃস্বলে যাবার সময় তার বাবা তাকে দু'আনা পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে পয়সা দু'আনা ট্যাঁকে গুঁজলো; তারপর জুতোজোড়া ও জামাটা নিয়ে বাইরের ঘরে রেখে এলো। আসবার সময় আর একবার আমতলায় দাঁড়িয়ে চোখের ওপর হাত রেখে নদীর ওপর দিয়ে চরের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লো। ঐ ধোঁয়ার মতো গাঁ দেখা যায়, ওর কোলে এক সার শাদা ফোঁটা। বোধ হয় মেলা-যাত্রীরা চলেছে। এর মধ্যেই কি রোদ! বালি তেতে উঠে তা থেকে জলের ঢেউয়ের মতো তাত উঠ্‌ছে। এই চর ভেঙে—!

কিন্তু সে হরিশের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, যাবেই। তবে চরের দৈত্যটাকে সে মাঝে মাঝে দেখেছে। সে যেখানে-সেখানে হঠাৎ দেখা দেয়। একবার যদি তার কবলে—!

কিন্তু ভয় কি? কিসের ভয়? সে দৌড়বে—তার আগে আগে। ইস্কুলে ১০০ গজের দৌড়ে সে প্রথম। আঃ! বেলা হয়ে যাচ্ছে। ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। মা যে কি করে তার ঠিক নেই! ইস্কুল না থাকলে কি হয়? তার খাবার অভ্যাস তো দশটার সময়।

ভেতরে গিয়ে হাঁকলে "ও মা! দাও না; ক্ষিদেয় মরে গেলুম যে—"

—"দিচ্ছি; কিন্তু তুমি কিছুতেই মেলায় যেতে পারবে না—"

রামগোপাল চুপ করে রইলো। মা ভাত দিলেন।

কিন্তু সে যখন খেয়ে উঠ্‌লো, তখন বেলা প্রায় বারোটা।

মা বল্‌লেন—"ঘরে গিয়ে শোওগে—"

—"দুপুরে ঘুমোলে আমার শরীর খারাপ লাগে—"

—"তবে পড় গে—"

—"ছুটীর দিন পড়তে ইচ্ছা হয় না—"

—"তবে কি করবে শুনি?"

—"কি আর করবো—?" বল্‌তে বল্‌তে রামগোপাল বাইরে বেরিয়ে গেল।

মা ডাকলেন—"গোপ্‌লা—"

—"কি? এইতো আমি বাইরে—"

—"কোথাও যেওনা—"

"যাইনি—" বলে একটু এদিক-ওদিক করে সে জামা গায়ে দিয়ে, জুতো জোড়া হাতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

তারপর তাদের ঘাট থেকে পূর্বদিকে কিছু দূরে গিয়ে সে কাপড় গুটিয়ে জলে নামলো। এখানে জল এত কম যে হাঁটু ডোবে না। সে পায়ে পায়ে নদী পার হয়ে উঠ্‌লো চরে। উঃ! কি গরম হাওয়া। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে; মুখখানা ঝল্‌সে গেল। চরের বালি—মুড়ির খোলার বালির মতো তেতে আগুন। তাতে পা ঠেকালেই ফোস্কা পড়ে। সে জুতো পায়ে দিয়ে ছোট চরখানি পার হোলো। তারপর আবার জুতো খুলে, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে জল পার হয়ে গেল। আবার চর; তবে ছোট। তার ওপর এখানে-ওখানে কেশুর ও আগুন জ্বলা চাবরা বেঁধে আছে। সে কয়েকটা কেশুর তুলে চিবতে চিবতে চর পার হয়ে আবার জলে নাম্‌লো।

এধারের জলধারাটা একটু বেশি চওড়া। জায়গায় জায়গায় জলও বেশি; সাবধানে পার হতে হয়। কিন্তু রামগোপালের ভয় নেই। কোথায় কি আছে সে সব জানে। জল পার হয়ে এবার সে যে চরখানার ধারে এলো, তাই পার হওয়া শক্ত।

তার প্রথমে কাদা ও চোরা বালি। সে বালিতে পা বসে গেলে আর রক্ষা নেই। সে একবার একটা মোষকে চোরা বালিতে পড়ে তলিয়ে যেতে দেখেছে। অনেক চেষ্টা করেও কেউ তাকে তুলতে পারে নি।

সে খুব সাবধানে কাদা পার হয়ে শক্ত মাটিতে দাঁড়ালো। সেখানে একটা ছোটখাট জলা মতো ছিল; তার জলে পা ধুয়ে জুতো পরে চারধার থেকে একরাশ কেশুর তুলে নিলে। পিপাসার সময় জলের অভাবে সেগুলো চিববে।

সামনেই সেই বড় উঁচু চর;—ওর ওপর উঠতে হবে। সে শক্ত জায়গাটা পার হয়ে চরখানার ওপর উঠ্‌লো। সেখানে দাঁড়িয়ে এপারে তাদের বাড়ির দিকে একবার তাকালো। ঐ যে আমতলায় বড় ঘরখানা; ওর ওধারে জামগাছ। আর, সেই একবারে ও কোণে সজনে গাছটা দেখা যাচ্ছে। রামগোপাল আর সে দিকে মনোযোগ দিলে না, চরের ওপর দিয়ে চলতে লাগ্‌লো।

চরখানা পাকা একক্রোশ; তবে তিন ভাগ পার হতে পারলে আর ভয় নেই, তারপর কেবল ঝাউবন। তার মধ্য দিয়ে সরু পথ এঁকেবেঁকে দূরে গাঁয়ের বাঁশঝাড়ের মধ্যে চলে গেছে। সেটা ধরে গেলেই মঙ্গলবেড়ের মাঠ।

রামগোপাল চলেছে। তার সাম্‌নে, পিছনে, পাশে শাদা বালির ছোট ছোট স্থির তরঙ্গ। মাঝে মাঝে হাওয়ায় বালি উড়ছে। রোদের ঝাঁঝে চোখ মেলে তাকানো যায় না। তার মনে হোলো, সে যেন বেদুইন, তবে তার উট বা ঘোড়া নেই ; সে হেঁটেই মরুভূমি পার হচ্ছে।

বালির ওপর দিয়ে কিছুতেই জোরে চলা যায় না। পা দু'খানা জড়িয়ে আসে। আবার দৌড়লে প্রতি পায়ে আছাড় খাবার সম্ভাবনা। রামগোপাল যায়, আর এদিক্-ওদিক্ তাকায়। কি জানি চরের দৈত্যটা কোনদিক থেকে আসে ঠিক কি ? যে হাওয়া ! এখনি হয়তো হাওয়ায় ভর করে তার সামনে বা পিছনে এসে দাঁড়াবে !

রামগোপাল কিছু দূর চলে গেল। সবে সিকিক্রোশ পার হয়েছে। এর মধ্যেই তার পা দু'খানা ভারী ভারী ঠেক্‌ছে ; মাথা পুড়ে যাচ্ছে, মুখ ঝলসে গেছে। চোখ ও নাকের ভেতরটা জ্বালা করছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। সে পকেট থেকে গোটা কয়েক কেশুর বার করে চিবতে লাগ্‌লো। কেশুরের মিষ্টি রসে গলাটা ভিজলো ; কিন্তু তৃষ্ণা মিট্‌লো না। এখনও যে অনেক বাকী।

হঠাৎ সে শুন্‌লে পিছনে শব্দ হচ্ছে—হু-উ-উ-উ—।

ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠ্‌লো। সে পিছন ফিরে দেখে তপ্ত বালি-রাশিকে ঘোরাতে ঘোরাতে তার পিছন থেকে উঠ্‌লো প্রকাণ্ড ঘূর্ণি।

ঘূর্ণিটা তার দিকেই ছুটে আসছে। ঐ যে ওর শরীরটা ক্রমে বাড়ছে ; আকাশপানে মাথা উঠলো, শরীরও উঠলো ফুলে। সে যেন রামগোপালকেই ধরবার জন্যে মাটির ভেতর থেকে হঠাৎ উঠে গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। রামগোপাল প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগলো। কিন্তু যাবে কোথায় ? আজ তাকে দৈত্যটা একা পেয়েছে—মুখে পুরবেই।

রামগোপাল ছুট্‌তে ছুট্‌তে ফিরে দেখ্‌লে, দৈত্যটা একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। ঐ যে তার একখানা হাত—গরম, খরখরে। রামগোপালও আর ছুট্‌তে পারে না। সে আবার পিছন ফিরে দেখ্‌লে, দৈত্যটা একটু পাশে সরেছে, তার ডান দিকে। রামগোপালও সেদিকে সরে গিয়েছিল। আর রক্ষা নেই। রামগোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ছে ; শরীর অবশ।

তবুও সে চট্ করে মনে মনে ঠিক করে নিলে, দৈত্যটা যদি তাকে ধরেই-সে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে চোখ বুজে পড়ে থাক্‌বে।

ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ দৈত্যটা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে নাকে, মুখে, চোখে গরম ঝাপটা মারলে। রামগোপালের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ঐ যে সে তার জামা-কাপড় ধরে টান্‌ছে, এখনই তাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে এই চরের মধ্যে কোথাও ফেলে দেবে! তার চারধারে শব্দ হচ্ছে—হু—উ—উ—উ—উ—। উঃ! কি গরম বাতাস!

সে তাড়াতাড়ি বসে হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে, চোখ বুজে রইলো। তার পিঠের ওপর ঝড় বয়ে যাচ্ছে—দৈত্যটা তার জামা-কাপড় ধরে টান্‌ছে, আর করছে—হু-উ—উ—উ—উ।

রামগোপাল মনে মনে বলতে লাগলো—"আর কোন দিন দুপুর রোদে এই চরে আসবো না—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—"

দৈত্যের মনে বোধ হয় দয়া হোলো; সে রামগোপালকে ছেড়ে দিয়ে পিছনে সরে গেল।

কিন্তু ঐ আবার আসছে! এবার রামগোপাল বাঁচবে না, নিশ্চয়ই দম্ বন্ধ হয়ে মারা যাবে। সে আর বস্‌তেও পারে না! হাত—পা—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে—এ সময় একটু জল—।

কিন্তু দৈত্যটা এবার এসে তাকে ধরলে না; তার কাছ থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে চীৎকার করতে লাগল—হু—উ—উ—উ—।

রামগোপাল সভয়ে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলো। কখন সে আবার ছুটে আসে ঠিক কি? ঐ যে সর্‌ছে। কিন্তু সর্‌তে সর্‌তে চরের ওপর দিয়ে হঠাৎ বাঁদিকে দিলে দৌড়।

রামগোপাল এবার সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মঙ্গলবেড়ের মেলায় যেতে আর পা চল্‌লো না; বাড়ির দিকে ফিরলো। যেতে যেতে দেখলে, দৈত্যটা ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ঝাউবনের ধারে গিয়ে পড়েছে। তার শরীর ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে।

ঐ যে রামগোপালের বাঁ ধারে আবার একটা; এটা ছোট। কিন্তু খুব জোরে ঘুরছে। রামগোপালও যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো। ছোট দৈত্যটাও এগিয়ে আস্‌ছে—কখনও শরীর বাঁকাচ্ছে, কখনও ফোলাচ্ছে, কখনও নোয়াচ্ছে।

এটাও কি তাকে ধর্‌বে? না—না—যত কষ্টই হোক, তাকে জলের ধারে গিয়ে পেঁছতে হবেই।

ঐ যে জল, ঐযে—ঐযে—আর দশ মিনিট। কিন্তু এই দশ মিনিটের মধ্যেই দৈত্যটা এসে পড়বে।

কিন্তু না, আর ভয় নেই। দৈত্যটা চড় ধরে মজমপুরের খেয়া-ঘাটের দিকে ছুটছে।

রামগোপাল দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে ভরসা হলো না। সে চর পার হয়ে নিচে নেমে নদীতে হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে আঁজলা ভরে জল খেল ও চোখে-মুখে-মাথায় দিলে। তারপর নদী পার হয়ে বাড়ি চলে গেল।

মা তাকে দেখেই বললেন—"এ কিরে গোপ্‌লা? তোর মুখখানা যে ঝলসে কালো হয়ে গেছে! জামায়, কাপড়ে, মাথায় বালি। কোথায় গিয়েছিলি? মেলায়?"

রামগোপাল ঘাড় নেড়ে বললে—"না।"

"তবে? শুয়ে পড়্‌, শুয়ে পড়্‌—" বলতে বলতে তিনি মাদুর পেতে দিলেন।

রামগোপাল কোন উত্তর দিলে না; সটান তার ওপর শুয়ে চোখ বুঁজে পড়ে রইলো।

মা কত জিজ্ঞাসা করলেন, রামগোপাল কিছুই বললে না। কোনদিন সে কথা সে কারও কাছে প্রকাশও করে নি।

কিন্তু ভীরু হরিশটা সকলের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, রামগোপাল নদীর চরের দৈত্যের হাতে পড়েছিল, এপারে আমতলায় দাঁড়িয়ে সে দেখেছে।

———

মৌটুস্‌কী

হরিশবাবুর নাত্‌নী মৌটুস্‌কী বল্‌লে, "দাদু, কাঁধে চড়বো।"

নাতি-নাতনীরা দাদুর কোলে-কাঁধে উঠেই থাকে। তবে পিঠে চড়ে না। কারণ, দাদুদের কোমরে সাধারণত বাত। তাই সাধ থাকলেও তাদের তাঁরা পিঠে বইতে পারেন না।

তা' হরিশবাবু বুঝতে পারলেন, এরপর মৌটুস্‌কী বল্‌বে, "মাথায় চড়বো।" তাতেও তাঁর আপত্তি নেই। কারণ, নাতনীটিকে তিনি বড়ই ভালোবাসেন। সেজন্যে সে কদাচিৎ তাঁর কোলে ওঠে, সচরাচর কাঁধেই চড়ে এবং তার একটু পরেই তাঁর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ মাথায় উঠে বসে। বসেই বলে, "আমি ছাদে উঠেছি।"

অচমকা উঠবার সময়ে হরিশবাবুর ঘাড়ে এক একদিন লাগে। লাগ্‌লে মনে রাগ ও দুঃখ দুই-ই হয়। কিন্তু তিনি দুটির একটিও প্রকাশ করতে পারেন না। একে তো ঐ একটি মাত্র নাত্‌নী। তার ওপর তিনি তাকে এত ভালোবাসেন যে, তার বাপ-মার দেওয়া নাম 'মধুমঞ্জরী' ফেলে দিয়ে নিজের পছন্দমতো দেওয়া 'মৌটুস্‌কী' নামে ডেকে থাকেন। এর ওপর আবার তাঁর মেয়েটির ভারি অভিমান! রাগ প্রকাশ করলে হয়তো তখনই বলে বসবে, "মেয়ের মেয়ে কিনা! তাই বাবা ওকে দেখ্‌তে পারেন না।" অথচ হরিশবাবুর আর ছেলে-মেয়ে নেই। দাদু হওয়ার ঠেলা বিষম!

হরিশবাবু তখন টাকে ঘষে ঘষে টাকারি তৈল মাখছিলেন, চুল গজাবার জন্যে নয়, মাথা ঠাণ্ডা রাখবার উদ্দেশ্যে। তাই বললেন,—"এখন তেল মাখছি, টুস্‌কীমণি। এখন কাঁধে চড়লে তোমার ইজেরে যে তেল লেগে যাবে। মা বকবে।"

টুস্‌কীমণি বললে,—"তুমিও মাকে বকে দেবে। তুমি তো মায়ের বাবা।"

—"বাবা হলেই মেয়েকে বকতে হয় কি?"

"হুঁ। বাবা তো আমায় বকে। আমি তোমার কাঁধে চড়বো।" বল্‌তে বল্‌তে মৌটুস্‌কী হরিশবাবুর কাছে এগিয়ে এলো।

হরিশবাবু বল্‌লেন,—"আমায় ছুঁয়ো না।"

"ছুঁলে কি হয়? এই তো ছুঁলুম।" বলেই মৌটুস্‌কী হরিশবাবুর একেবারে টাকে হাত বুলিয়ে দিলে।

পাশে একখানি ভিজে গামছা পড়ে ছিল। হরিশবাবু বল্‌লেন,—"ঐ গামছায় হাত মোছো। যে তেল মাখে তাকে ছুঁলে গায়ে তেল লেগে যায়।"

—"তেল লাগলে কি হয়?"

—"গা নোংরা হয়।"

—"তবে তুমি তেল মেখে গা নোংরা করলে কেন?"

ঘরে ছোট ছেলে-মেয়ে, বিশেষ করে মৌটুস্‌কীর মতো মেয়ে থাকা মানে আদালতের কাঠগড়ায় বাস করা। এ মেয়ে বড় হয়ে উকীল কি ব্যারিস্টার না হয়ে যায় না। তবুও তাকে ভোলাবার জন্যে বল্‌লেন,— "দেখে এসো তো মণি, তোমার টিয়াপাখীটা কি করছে।"

মৌটুস্‌কী তৎক্ষণাৎ বল্‌লে, "কি আবার করবে? ছোলা খাচ্ছে। নাও—আমায় কাঁধে চড়াও। নাহলে আমি এখুনি কাঁদবো।"

হরিশবাবুর মৌটুস্‌কীর কান্না! সে যে কি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড তা যে না দেখেছে তাকে বলে বা লিখে বোঝানো যাবে না।

হরিশবাবু একটু শক্ত হয়ে বললেন,—"আচ্ছা! তুমি দাঁড়াও। আমি চট্ করে মাথায় দু'মগ জল ঢেলে আসি।"

—"আমাকে কাঁধে নিয়েই মাথায় জল ঢালবে চল।"

—"সে কি করে হবে, টুস্‌কীমণি? তাতে আমারও নাওয়া হবে না, তোমারও গায়ে জল লাগবে।"

"লাগুক গে। আঁমি কাঁধে চঁড়বোঁ"—বলতে বলতে তার ভোঁতা নাক আর পুরু ঠোঁট ফুলতে লাগ্‌লো।

হরিশবাবু এবার মহাসঙ্কটে পড়লেন। তাঁরই আদরে গড়া মৌটুস্‌কী। তিনিও প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্‌লেন,—"তবে এস। শক্ত হয়ে বসে থেকো। তেলে কাঁধ পিছল হয়ে আছে।"

ওপরে উঠলেই সর্বদা পড়বার ভয়। তাই আসন আঁকড়ে থাকা দরকার। যারা ওপরে চড়ে থাকে তারাই জানে।

ঠিক সেই সময়ে হরিশবাবুর মেয়ে রান্নাঘর থেকে কলে এলো হলুদ্‌মাখা হাত ধুতে; বললে, "বাবা, তুমি ওকে কাঁধে নিয়েই নাইতে যাচ্ছো? এত আদর ভাল নয়।"

বাবা হওয়ারও কি কম ঝক্‌মারী! সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেও হয়তো মেয়ে ঐ কথাই বল্‌তো।

মেয়ে আবার বললে,—"তোমার আদরে আদরে ও একেবারে বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আমাদের কথা পর্যন্ত কেয়ার করে না!"

মায়ের বাবার কথাই যে কেয়ার করেনি সে মায়ের কথা কেয়ার করতে যাবে কেন?

তার মা এবার ধমক দিয়ে বল্‌লে, "এই! নাম্—নেমে আয়। বাবা, শয়তানটাকে নামিয়ে দাও।"

কিন্তু যাকে নামাবার এত চেষ্টা সে হরিশবাবুর কাঁধে বসে দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে "অঁা—অঁা" করে কাঁদতে লাগ্‌লো। হরিশবাবুর তৈলাক্ত বুকে তার কয়েক ফোঁটা তপ্ত চোখের জল পড়লো।

হরিশবাবু মিনতির সুরে বল্‌লেন, "আহা। ও থাক্ মা, থাক্। ওকে নিয়ে নাইতে আমার কিচ্ছু কষ্ট হবে না। না, তুমি কেঁদো না, টুসুমণি। চল—চল—আমার নেয়ে আসি।"

মা কলে হাত ধুয়ে গর্ গর্ কর্‌তে কর্‌তে চলে গেল।

হরিশবাবু বললেন,—"দেখলে দাদুমণি, মা কি রকম রেগে গেছে? তোমার জন্যে আমায়ও বকলে।"

দাদুমণির কান্না কতকটা হাতধরা। তাই দিব্যি শান্তস্বরে বললে,—"তুমি কেন মাকে বকলে না?"

কথাগুলি শুনে হরিবাবু একটু হাসলেন; বললেন, "তুমি গামছাখানা ধর।"

—"না, আমায় নামিয়ে দাও। তুমি নেয়ে আবার আমায় কাঁধে নেবে। কেমন?"

"আবার? আচ্ছা।" বলে হরিশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের কাঁধে চড়ে সেই বুড়োটার বেড়ানোর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। আহা! বেচারী সিন্ধুবাদ।

তিনি নেয়ে এসে দেখেন মৌটুস্‌কী তার মায়ের তৈরী ন্যাকড়ার মস্ত পুতুলটা আর খাঁচাশুদ্ধ তার টিয়া পাখিটা নিয়ে বসে আছে। দেখে হরিশবাবুর বড় আনন্দ হোলো; বললেন, "বা! লক্ষ্মী সোনা আমার। ওদের নিয়ে খেলা কর। তোমার খুকুকে ঘুম পাড়াও, টিয়াকে রাধাকেষ্ট বল্‌তে শেখাও।"

টুসুমণি বললে, "না—না—ও সব না। এরা তোমার কাঁধে চড়বে।"

হরিশবাবু এবার সত্যিই একটু উত্যক্ত বোধ করলেন; একটু রুক্ষ ভাবে বললেন,—"এবার দুষ্টুমী হচ্ছে। যাও—ভাত খাও গে।"

—"না—খাবো না। এদের কাঁধে চড়াও।"

এই বিপদে হরিশবাবুকে রক্ষা করলে তাঁর মেয়ে। সে ঘরে ঢুকেই বললে, "বাবা, তোমার ভাত বাড়ি?"

—"বেশ। টুসুমণি খাবে না?"

"ও কি তোমার অপেক্ষায় বসে আছে? তেমন মেয়ে কি না! এই বয়সেই ভারি স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। এই, যা ও ঘরে গিয়ে ঘুমোগে—ওঠ্। এ সব কেন এনেছিস্?" বলতে বলতে মা তার হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে পুতুল আর পাখিটা তুলে নিয়ে বল্লে, "আয়। চল্।"

টুসুমণি কাজলপরা গোল চোখ দুটো দাদুর মুখে একবার তুলেই মায়েব সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

আহারান্তে হরিশবাবু বিছানায় বসে তামাক টানতে টানতে ভাবতে লাগলেন, দিন কয়েক কাশীতে ডুব দিলে কেমন হয়? মুনি-ঋষিরা ভারি বিচক্ষণ ছিলেন। এই সব দেখে-শুনেই তাঁরা বুড়োদের জন্যে বনবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। একালে তেমন বন-জঙ্গল নেই যে একটু আরাম করে থাকা যায়। সব কেটে-কুটে সাফ করে ফেলছে বলে বুড়োদের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে কাশীবাসের। টুসুমণির দিদিমা থাকতে একবার তো তিনি কয়েকদিনের জন্যে কাশীতে ডুব দিয়েছিলেন। তখন চাকরিতে ছিলেন। কিন্তু ডুব দিয়ে কি পার পাবার যো ছিল! ওর দিদিমা সেখানেও গিয়ে হাজির হয়েছিল! এখন পেনসন্ পাচ্ছেন। এবার টুসুমণির জন্যে দিন কয়েক ডুব দেবেন। সত্যি তো! তাঁর জন্যে মেয়েটা যদি বেয়াড়া হয়ে ওঠে তবে ওর বাপ-মাকেই দুঃখ পেতে হবে যে! তাঁর আর কি? তিনি তো দু' দিন বাদেই চোখ্ বুজবেন। তাঁর ঘণ্টা তো অনেক দিনই বেজে গেছে। এতো ছুটির পরও ক্লাস করার মতো। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে হরিশবাবু শুয়ে পড়লেন। বুড়ো মানুষ হলেও তাঁর ঘুম কিছু গাঢ়। শুতে-শুতেই ঘুম এসে গেল।

তারপর এক সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখেন, পাশে বিছানায় খাঁচাশুদ্ধ মৌটুসকীর টিয়া পাখিটা আর কানের ওপর একটা বালিশ—না—না—ন্যাকড়ার পুতুলটা। সেই সঙ্গে শুনলেন, হাসির খিল্ খিল্ শব্দ।

না, আর নয়। হরিশবাবু সংকল্প করলেন, দিন কয়েক কাশী গিয়েই থাকবেন। যদিও বাড়িখানি তাঁর তবুও এ বাড়ি এখন ছাড়াই দরকার। তিনি উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিয়ে খট্ খট্ করতে করতে চোখ-মুখ ধুতে গেলেন।

তার দু'দিন পরেই হরিশবাবু চললেন কাশী। দরজায় ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে। ট্যাক্‌সিতে তাঁর বিছানা-ট্রাংক-হুঁকো-ঘটি-ছাতি উঠেছে, উঠ্‌তে বাকি কেবল হরিশবাবু নিজে আর তাঁর মকরমুখো লাঠিখানি। মনটাকে আর টুসুমণিকে তিনি কিছুতেই বাগে আনতে পারছেন না। মনকে ভেতর থেকে ঠেলা দিয়ে বলছেন, "কাশী চল্।" মন বলছে, "ইচ্ছে করছে না।" আর, টুসুমণি দু হাতে তাঁর গলা আঁকড়ে ধরে বলছে, "আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।' তার বাবা ডাকছে, মা ডাকছে। সে কারো কথা শুনছে না; কেবল বলছে "আমি কাশী যাবো।" হরিশবাবু মনকে যদি বা রাজী করালেন টুসুমণিকে আর কোল থেকে নামাতে পারেন না। সে কিছুতেই বাগে আসে না; কেবল বলে, "আমি দাদুর সঙ্গে যাবো। না—না—তোমরা থাকো। আমি যাবো।"

তার মা বললে, "দাদু আবার ফিরে আসবেন। তুমি আমার কোলে এস। এস তো মঞ্জুমণি—"

"না—না—তোমার কোলে যাবো না। আমি আবার ফিরে আসবো।"

হরিশবাবু তখন হতাশ হয়ে বললেন, "কাশীনাথ আমার মাথায় থাকুন। ট্যাক্‌সি থেকে মোট-ঘাট নামাতে বল।"

অগত্যা সব নামানো হলো। শিখ ড্রাইভার বীরোচিত তেজের সঙ্গে কটু কথা বল্‌তে বল্‌তে গাড়ি নিয়ে গেল চলে।

হরিশবাবু নাতনীকে কাঁধে নিয়ে আবার নিজের ঘরে ঢুক্‌লেন।

তারপর থেকে আবার আগের মতোই হরিশবাবু ও মৌটুস্‌কীর দিন কাটতে লাগ্‌লো। তবে মৌটুস্‌কী মাঝে মাঝে বলে, "কাশী যাবে না দাদু? চ'ল।"

হরিশবাবুও উত্তরে বলেন, "যাবো বৈকি দিদি।"

শেষে সত্যিই একদিন তিনি টুসুমণিরও ছোট হাত দুখানির বন্ধন ছাড়িয়ে তার নাগালের বাইরে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না! টুসুমণির বায়না-আবদারের জন্যে রইলো না আর কেউ।

তবুও স্বভাব কি সহজে যায়? তার মা তার বায়না-আবদারে এক একদিন জ্বালাতন হয়ে ঘা কতক দেয় চিপিয়ে। মধুমঞ্জরী মানে হরিশবাবুর মৌটুস্‌কী তখন দাদুর শূন্য ঘরের দিকে তাকিয়ে বসে বসে হাঁ করে কাঁদে।

বেচারী! অত মধু আর কি কারো কাছে কোন দিন সে পাবে?

গণেশচন্দ্রের অশুভ যাত্রা

গণেশচন্দ্র যাচ্ছিল দিদির বাড়ি।

মা বল্‌লেন—"খুব সাবধান বাবা। গাড়ির জানালা দিয়ে ঝুঁকো না, সালতির ধারে ব'সো না—"

গণেশ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না মা; তোমার কোন ভাবনা নেই।"

—"এই তোমার দিদির জন্যে আট গণ্ডা নাড়ু, একখানা আমসত্ত্ব, সের দুই গুড়, আর আটখানা চন্দ্রপুলী দিলাম। সে চন্দ্রপুলী খেতে ভালবাসে; সেইজন্যে ক্ষীরের ভাগ এতে বেশি আছে। তুমি এ থেকে কিছু খেয়ো না। তোমার জন্যে সব আলাদা দিয়েছি। একই পোঁটলায় রইলো বুঝ্‌লে?"

গণেশ বহু কষ্টে জিভের জল সাম্‌লে নিলে; উত্তরে শুধু ঠোঁট চেপে বল্‌লে—"হুঁ"। "হাঁ" বল্‌লে ঠোঁট দু'খানা ফাঁক হ'য়ে যেত। তা' হোলেই জিভের জল ঠেকান যেত না।

গণেশের এক হাতে জামা-কাপড়ের পোঁটলা, আর এক হাতে আমসত্ত্ব-চন্দ্রপুলী প্রভৃতির পোঁট্‌লা। খাবারগুলো মা কচি কলাপাতা দিয়ে মুড়ে একখানা পরিষ্কার কাপড়ে বেশ ভাল ক'রে বেঁধে দিয়েছেন।

সকাল ৮টা ২২ মিনিটে গাড়ি। বাড়ি থেকে রেল-স্টেশন প্রায় এক ক্রোশ। তখন উঠোনে সবে রোদ নেমেছে। একটু সকাল সকাল যাওয়া ভাল। তাই গণেশ তখনই রওনা হোলো। তার খালি পা, গায়ে একটা কালো ডোরাদার ছিটের কোট। কোঁচার ওপর খুঁটে বাঁধা যাতায়াতের পথ-খরচ সাড়ে চার টাকা।

মা বল্‌লেন—"দুর্গা, দুর্গা। পথে কোথাও দেরী ক'রো না বাবা!"

গণেশ খাবারের পোঁট্‌লাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বল্‌লে—"না মা!"

সোজা পথ। গণেশ চলেছে। কিছুদূর গিয়ে মাণ্টুর সঙ্গে তা'র দেখা। মাণ্টু ডাক্‌লে—"এই গণশা? কোথায় যাচ্ছিস্ রে?"

গণেশ বল্‌লে—"খবরদার! পিছু ডেকো না।"

—"নিশ্চয় ডাক্‌বো। এই তোর্ পিছনে গিয়ে ডাক্‌ছি"—বল্‌তে বল্‌তে মাণ্টু গণেশের পিছনে স'রে গিয়ে ডাক্‌লে—"এই গণ্‌শা—।"

গণেশ পোঁট্‌লা দুটো রাস্তার ধারে নামিয়ে রেখে মান্টুকে তাড়া করলে। পথের ধারে ঘোষেদের রোগা এঁড়েটা তখন ঘাস খাচ্ছিল। সে খাবারের পোঁট্‌লাটার কাছে গুটি-গুটি স'রে গিয়ে তা'র গন্ধ শুঁক্‌লে। কচি কলাপাতা, গুড় ও আমসত্বের গন্ধে সে মুগ্ধ হ'য়ে গেল।

গণেশ তখন মান্টুকে ধরে ধরে। সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একবার পোঁট্‌লা দুটোর দিকে ফিরে দেখলো। দেখেই তা'র আক্কেল গুড়ুম! মান্টুকে ধরা হোল না। সে তৎক্ষণাৎ ফিরে ছুট্‌ দিলে; ছুট্‌তে ছুট্‌তে চেঁচাতে লাগ্‌লো—"হেই—হ্যাট্‌—হ্যাট্‌—"

এঁড়েটা ততক্ষণে পোঁট্‌লাটা চিবতে আরম্ভ করেছে। গণেশের তাড়ায় তা'র ভ্রূক্ষেপ নেই—দিব্যি লেজ নাড়্‌ছে আর পোঁট্‌লা চিবচ্ছে। পথের ধারে একখানা বাঁশের আগা পড়ে ছিল। গণেশ ছুটে এসে সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে এঁড়েটার পিঠে মার্‌লে এক ঘা। এঁড়েটার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে গেল। সে পোঁট্‌লাটা ছেড়ে লেজ তুলে দিলে ছুট্‌।

গণেশ তখন হাঁপাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে সে পোঁট্‌লাটা তাড়াতাড়ি তুলে নিলে; মনে মনে বল্‌লে—"এঃ! সবগুলো বোধ হয় নষ্ট হ'য়ে গেছে। মান্টু বাঁদরটাই যত নষ্টের গোড়া! পিছু ডেকে এই কাণ্ড!—না, না, খাবারগুলো ঠিক আছে। এঁড়েটা কেবল পোঁট্‌লাটার গেরোটা চিবচ্ছিল।" সে একবার এঁড়েটার দিকে, একবার মান্টুর দিকে তাকালো। এঁড়েটা তখন নিশ্চিন্তমনে মুখুয্যেদের বেড়ার ধার থেকে পুঁইগাছের একটা কচি নরম ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে; আর, মান্টু বাঁদর তাদের বাগানের বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে—"গণশা—এই গণ্‌শা—"

গণেশ পোঁট্‌লা দুটো দু' হাতে তুলে নিয়ে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—"আমি এসে এর শোধ তুল্‌বো।"

মান্টু বললে—"আচ্ছা—।"

গণেশ আর কিছু বল্‌লে না।

পাড়াটা বেশি বড় নয়। তা'র পরই মাঠ। পথটা গেছে মাঠের মাঝ দিয়ে। গণেশ তখনও হাঁপাচ্ছে। মান্টুর পিছনে তাড়া কর্‌তে গিয়ে কিছু দেরী হ'য়ে গেল! গাড়িখানা না চ'লে যায়। সে হন্‌-হন্‌ ক'রে হাঁটতে লাগ্‌লো।

পাড়া শেষ হ'য়ে গেল; সাম্‌নে দুপাশে মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে পৌঁছলে একটু বাঁ-ধারে স্টেশন দেখা যাবে।

খাবারের পোঁট্‌লাটা বড় ভারী। সে একবার হাত বদ্‌লে নিলে;

শেষে জামা-কাপড়ের পোঁট্‌লাটা হাতে ঝুলিয়ে খাবারের পোঁট্‌লাটা ঘাড়ে নিয়ে চল্‌তে লাগলো কিন্তু ঠিক নাকের কাছেই এমন টাট্‌কা খাবারগুলো! চমৎকার গন্ধ নাকে লাগ্‌ছে। সে মনে মনে বল্‌লে—'মা দিদিকেই বেশি ভালবাসে। যা' কিছু দিদির জন্যে। আমার জন্যে কেবল—'

হঠাৎ পিছনে শব্দ হোল—টক্‌-টক্‌। সে ফিরে দেখে, হরচন্দর ডাক্তার ঘোড়ায় চ'ড়ে আস্‌তে আস্‌তে জিভ দিয়ে শব্দ ক'রে ঘোড়াকে তাড়া দিচ্ছেন। ছোট ঘোড়া; ডাক্তারের পা-দু'খানা মাটিতে প্রায় ঠেকে-ঠেকে। ঘোড়াটার মুখে লাগাম; পিঠে কম্বলের উপর ছেঁড়া জিন; কিন্তু রেকাব জোড়া ঠিক আছে। ডাক্তারবাবু গণেশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কিরে গণ্‌শা! কোথায় যাচ্ছিস্‌?"

—"দিদির বাড়ি।"

—"শীগ্‌গির যা, না হ'লে গাড়ি পাবি না—" ব'লে তিনি কোটের পকেট থেকে রস্কো-মার্কা আমপাড়া ঘড়ি বার ক'রে সময় দেখ্‌লেন। ঘড়িটাকে একটা ছোট ক্লক বল্‌লেই চলে। ঘড়িটা নিকেল-করা লোহার চেনে বাঁধা। একবার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন ব'লে সোনা বা রুপোর চেন ডাক্তারবাবু আর ব্যবহার করেন না। ঘড়ি দেখে তিনি বল্‌লেন,—"আটটা বাজতে আর এগার মিনিট বাকী। পূবের গাড়িতে যাবি তো?"

—"হুঁ।"

—"তবে জোরে হাঁট্‌। গাড়ি দু'একদিন আগেও আসে"—ব'লে ডাক্তারবাবু ঘোড়ার পিছনে পিড়িক ক'রে কঞ্চির ছিপ্‌টি মারলেন। ঘোড়াটাও অম্‌নি ছুট্‌বার চেষ্টা করলে, কিন্তু পার্‌লে না, তবুও গণেশকে ছাড়িয়ে চ'লে গেল।

গণেশও আরও তাড়াতাড়ি হাঁট্‌ছে। সে ঘাড়ে খাবারের পোঁট্‌লাটা এক হাত দিয়ে ধ'রে আছে। তাতে হাত ও ঘাড় ব্যথা হ'য়ে গেল; পোঁট্‌লাটা ভারী ঠেক্‌ছে। ঝাঁকি লেগে চন্দ্রপুলীগুলো বোধ হয় ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। দিদি ভাব্‌বে সে বুঝি ভেঙ্গে খেয়েছে। আচ্ছা, স্টেশনে গিয়ে খুলে দেখবে। এত ভারী—টান্‌তেও কষ্ট হচ্ছে। সময় থাক্‌লে কিছু ভার কমিয়ে ফেলবে। তার ভাগের গুলো খেয়ে ফেললেই হোলো। দিদিরগুলো সে কিছুতেই খাবে না। কিন্তু গাড়ি—ঐ যে সিগ্‌ন্যাল দেখা যায়, এখনও ডাউন করে নি। আর তো আধ ক্রোশেরও কম।

সে দেখ্‌লে হরচন্দর ডাক্তার পথ থেকে মাঠে নেমে পশ্চিমদিক্‌ ধর্‌লেন। ঐ দিকের গাঁয়ে তিনি রোগী দেখ্‌তে যাচ্ছেন। ঘোড়াটা

এবার টকাস্-টকাস্ করে ছুট্ছে। ডাক্তারবাবু পা দু'খানা ফাঁক করে সোজা হ'য়ে বসে আছেন। গণেশ একমনে তাঁকে দেখ্ছিল! হঠাৎ তা'র চোখ পড়্লো সাম্নে সিগ্ন্যালের দিকে। ও কি? ডাউন! সিগ্ন্যাল ডাউন হয়েছে! এখনও যে সিকি মাইল।

গণেশ ছুটলো। সে কাঁধ থেকে খাবারগুলো নামিয়ে হাতে ঝুলিয়ে নিলে। ঐ যে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। পুবের মাঠ দিয়ে আরও একজন কে দৌড়চ্ছিল। সেও বোধ হয় ঐ গাড়িতে যাবে।

গণেশ সকালে ঘি, আলু-ভাতে আর দুধ দিয়ে এক পেট ফেনভাত খেয়েছে। সেগুলো এখন পেটের ভেতর ঢকস্ ঢকস্ কর্ছে। সে আর ছুট্তে পার্ছে না; এর মূল হোলো—মান্টু উল্লুকটা। সে যদি না পিছু ডাক্তো, তা' হ'লে দেরী হতো না। গাড়ি মিস্ কর্লে ফিরে গিয়ে সে তা'র মাথা ভাঙ্গবে—উল্লুক, বাঁদর, ছাগল—!

গাড়িখানা হু-হু শব্দে ছুটে আস্ছে। ঐ যে ইন্জিন। ইন্জিনখানা একবার সাদা ধোঁয়া ছাড়্লো; হুইস্ল দিলে। আর পাঁচ মিনিট দৌড়লে সে স্টেশনে এসে পড়্বে। এখনও উপায় আছে; গাড়ি মামুদপুরের গুমটি ছাড়ায় নি।

গণেশ প্রাণপণে ছুট্ছে; মাঠের লোকটাও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল! তা'র এক হাতে একটা ছোট টিনের বাক্স, আর এক হাতে পোঁট্লা।

দু'জনেই ছুট্তে ছুট্তে স্টেশনে এসে পোঁছলো। গাড়ি তখনও আসে নি। তা'রা ছুটে গিয়ে টিকিট-ঘরের জানলার বাইরে দাঁড়ালো; কিন্তু জানালা বন্ধ! জানলার জালের ফাঁক দিয়ে দেখ্লে টিকিট-বাবু একটা ঝাঁপের মত বড় খাতা খুলে একমনে তা'তে কি লিখ্ছেন। তাঁর মুখে জ্বলন্ত বিড়ি; গায়ে কালো কোট, মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চেহারা দেখ্লে মনে হয়, তিনি কেবল উপোস করেন।

মাঠের সেই লোকটা ডাক্লে—"বাবু! টিকিট দিন্। গাড়ি এল—"

গণেশও ততক্ষণে পোঁট্লা দুটো মাটিতে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে কোঁচার খুঁট খুলে টিকিটের দাম বা'র করছে।

টিকিট-বাবু ফিরে তাকালেন না। লোকটা আবার বললে—"মাস্টার-বাবু, টিকিট দিন—"

তা'র কথা শেষ হ'তে না হ'তে স্টেশন কাঁপিয়ে গাড়ি ছুটে এলো। গণেশের বুক কেঁপে উঠলো। সে সরু গলায় চীৎকার ক'রে বল্লে—"টিকিট দিন—গাড়ি এলো—"

টিকিট-বাবু এবার চোখ তুলে তাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বল্‌লেন না।

ইন্‌জিনখানা তখন হুঙ্কার দিতে দিতে ছুট্‌ছে। দু'জনে সেখান থেকে সভয়ে গলা বাড়িয়ে তা' দেখ্‌লো; তাদের বুক ঢপ্ ঢপ্ করছে। কিন্তু—না ভয় নেই—মালগাড়ি। গাড়িখানা যেন তাদের বুকের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে স্টেশন পার হ'য়ে গেল।

স্টেশনের 'পানি পাঁড়ে' এতক্ষণ 'শেডের' সিঁড়ির ওপর ব'সে খৈনি ডল্‌ছিল, আর গুন্ গুন্ ক'রে ভজন গাইছিল 'আরে হনুমানজীকো—'। মাঠের লোকটা তা'কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"পূবের গাড়ি চলে গেছে গো?"

পানি পাঁড়ে উত্তর দিলে না; আরও গম্ভীর হ'য়ে খৈনি ডলতে' লাগ্‌লো। গণেশ তা'র কাছে স'রে গিয়ে খাঁটি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলে—"জমাদারজী, পূবের গাড়ি চলে গিয়া হ্যায়?"

লোকটাও পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে—"কুথা যাবে?"

—"আমতলী—"

—"তব্ এখুন্ আস্‌বে—"

তা'র কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিকিটের ঘণ্টা পড়লো।

গণেশ একবার ভাব্‌লে পোঁট্‌লাটা খুলে দেখে। কিন্তু তা' হ'লে টিকিট কিনতে দেরী হবে। তা'র চেয়ে গাড়িতেই খুলে দেখ্‌বে ভেবে, সে টিকিট কর্‌তে গেল। সেই মাঠের লোকটাও তা'র পাশে দাঁড়িয়ে ঠেলা দিচ্ছে। আরও জন দশ-বারো জন ষণ্ডা লোক জানালার কাছে এসে ভীড় জমালে। লোকগুলো এতক্ষণ কোথায় ছিল? শেডের মধ্যে গণেশ কাউকে তো দেখে নি। সকলেই ঠেলাঠেলি কর্‌ছে, আর টিকিট-বাবুকে ডাক্‌ছে—"বাবু, ও বাবু!" গণেশ ছোট মানুষ; তাদের মধ্যে ডুবে গেছে। তা'র এক হাতে দুটো পোঁট্‌লা—চোরের ভয়ে বাইরে রেখে আস্‌তেও ভরসা পায় নি।

টিকিট-বাবু তখনও খাতা লিখ্‌ছেন। গণেশ ডিঙ্গি দিয়ে জানালায় মুখ দিয়ে বল্‌লে—"মশায়, ম'রে গেলাম—"

টিকিট-বাবু এবার নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে খাতা ছেড়ে উঠ্‌লেন; তারপর জানালার কাছে এসে ঘুলঘুলির ঢাকনা সরিয়ে কড়া মেজাজে বল্‌লেন—"কৈ হে! পয়সা দাও—"

গণেশ হাত গলিয়ে দুটো টাকা দিয়ে বল্‌লে—"আমতলীর হাফ-টিকিট—"

—"হাফ-টিকিট ? তোর বয়স কত ?

—"সাড়ে এগার বছর।"

—"তা মনে হচ্ছে না তোর !" বল্‌তে বল্‌তে তিনি টাকা দুটো বাজিয়ে একখানা টিকিট নিয়ে ঘটাং ক'রে আওয়াজ করলেন। তারপর বাকী পয়সা ও টিকিটখানা ফোকরের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

সেখানে তখন চার-খানা কালো ও শক্ত হাত ঠেলাঠেলি করছে। গণেশ বহুকষ্টে তা'র মধ্যে হাত দিয়ে পয়সা ও টিকিটখানা কুড়িয়ে নিয়ে প্রায় লোকগুলোর পায়ের তলা দিয়ে বেড়িয়ে এলো। এসে পয়সাগুলো ট্যাঁকে গুঁজে, টিকিটখানা প'ড়ে দেখ্‌লো ঠিক আছে—তৃতীয় শ্রেণী—রতনপুর হইতে আমতলী—ভাড়া এক টাকা দশ পয়সা। গণেশ টিকিট ও পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে পেটের কাছে গুঁজে রাখলে।

ওদিকে টিকিট-ঘরে তখন ঘন ঘন আওয়াজ হচ্ছে—ঘটাং-ঘটাং ঘটাং-ঘটাং। গাড়ি আস্‌তে আর দেরী নেই। টেলিফোনে টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে। স্টেশন-মাস্টার হাঁকলেন—"এ তেওয়ারী, সিগ্‌ন্যাল দেও—!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্টেশনটা সরগরম হ'য়ে উঠ্‌লো। গেট খোলা হোল! গণেশ পোঁট্‌লা হাতে প্ল্যাট্‌ফরমে এসে দাঁড়ালো।

পশ্চিমদিক্‌টা রোদে ঝাঁ-ঝাঁ করছে। ঐ দিক্ থেকে গাড়ি আস্‌বে। গণেশ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। ঐ যে কালো মতো ইন্‌জিন দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়্‌লো। গাড়িতে যাত্রী বেশী নেই। গণেশ তাড়াতাড়ি একখানা কামরায় উঠে পড়লো। কামরাটা একদম খালি। সে পোঁট্‌লা দুটি বেঞ্চির ওপর রেখে জানালার ধারে বস্‌লো। গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় সেই মাঠের লোকটা ছুটতে ছুট্‌তে এসে দরজা ঠেলে কামরাটায় ঢুকে পড়্‌লো। ঠিক তখনই গাড়িও দিলে ছেড়ে।

লোকটা গণেশের সাম্‌নের বেঞ্চির ওপর পোঁটলা ও টিনের বাক্সটা রাখতে রাখতে বল্‌লে—"টিকিট-বাবু একটা সিকি অচল দিয়েছিল, তা'র জন্যে এত দেরী। তুমি আমতলী যাবে ?"

—"হুঁ—"

—"ক'র বাড়ি ?"

—"আমতলী থেকে দু'ক্রোশ দূরে সিংগীহাটি যা'ব—"

—"সিংগীহাটি ? কা'র বাড়ি ?"

—"চণ্ডী রায়ের বাড়ি—"

—"চণ্ডী রায়ের বাড়ি? সেখানে কি জন্যে?"

—"আমার দিদির বাড়ি।"

—"তুমি চণ্ডীবাবুর কুটুম?" লোকটা হেসে বললে।

—"হুঁ—"

—"তা" ভাল। আমিও ঐ গাঁয়ে যা'ব। আমার বাড়িও ওখানে। এদিকে কিছু জমি আছে; তাই মাঝে মাঝে আসতে হয়। চণ্ডীবাবুর বাড়ির পর একখানা পুষ্করিণী আছে—"

—"দেখেছি—"

—"রায়মশায়েরই পুষ্করিণী; ওর ওপারে আমার বাড়ি। এখন একটু শুয়ে থাক। আমতলী পৌঁছতে সেই বেলা দুটো—"ব'লে লোকটা আধময়লা কামিজের পকেট থেকে একটা টিনের কৌটো বা'র ক'রে তা থেকে একটা পান নিয়ে গালে পুরলে; তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। বিড়ি টানতে টানতে লোকটা বার দুই গণেশের মুখের দিকে তাকালে। বিড়ির গন্ধে গণেশ নাক সিঁটকাচ্ছে। লোকটা বললে—"তুমি বুঝি খাও না?"

—"না—"

"ভাল। আচ্ছা আমি ঐ দিকে যাই। একটু শোব—" ব'লে সে জানালার ধারে গিয়ে বেঞ্চিরওপর শুয়ে পড়লো।

গাড়ি চলেছে। সময়টার কথা এতক্ষণ লেখা হয় নি, এবার লিখি। ভাদ্র শেষ হয়ে এসেছে; অর্থাৎ তখন ভরা শরৎকাল। আকাশে মেঘ আছে, কিন্তু তাতে জল নেই; মাঠে মাঠে ধান আছে, কিন্তু অনেক মাঠ লাইনের দু'পাশের খালে জল আছে, কিন্তু তা' ঘোলা নয়। মাঝে মাঝে শস্যশূন্য, বক উড়ছে। পদ্ম, কাশ, কলমী বনের দিকে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হয় না। সাদা, নীল, লাল ও সবুজ রঙে চারধার উজ্জ্বল ও আলোকিত। গণেশ ব'সে ব'সে দেখছে।

গাড়ি অনেকদূর চ'লে এলো। বেলা বারোটা হবে। লোকটা চীৎ হ'য়ে হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছে। এর মধ্যে আর কেউ কামরাটায় ওঠে নি। গণেশের পেট জ্বলছে। সে খাবারের পোঁটলাটা খুলে বসল।

মা তা'কে বেশি খাবার দেন নি—দু'খানা চন্দ্রপুলী, আটটা লাড়ু, একখানা আমসত্ব, আর এক ডেলা ক্ষীর। খাবারগুলোর দিকে তাকিয়েই তা'র জিভে জল এলো। ক্ষিদেটাও খুব বেড়ে গেছে। তা'র চন্দ্রপুলীগুলো

তো সব গেছে ভেঙ্গে। দিদির গুলোও হয়ত আস্ত নেই। সে তা'র দিদির চন্দ্রপুলীগুলোও খুলে দেখ্‌লে, সত্যি দু'খানা একদম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে! কতকগুলো লাড়ু চ্যাপ্টা হ'য়ে গেছে। দিদি কি ভাব্‌বে? মনে কর্‌বে সে একটু একটু খেয়েছে! বল্‌লেও বিশ্বাস কর্‌বে না যে, রাস্তায় ঝাঁকি লেগে ভেঙ্গেছে। দিদি তাকে এমনই তো বলে—"পেটুক গণেশ"। ভাঙ্গাগুলো আর দিদিকে দিয়ে কি হ'বে?

সে ভাঙ্গা চন্দ্রপুলী দু'খানা ও চ্যাপ্টা লাড়ু চারটে বা'র ক'রে নিয়ে নিজের খাবারের সঙ্গে রেখে দিদির খাবারগুলো বেঁধে রাখ্‌লো। তারপর একবার দেখ্‌লে, লোকটা কি কর্‌ছে। লোকটা তখনও হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছিল! গণেশ তা'র দিকে পিছন ফিরে ব'সে খেতে লাগ্‌লো। কিন্তু কেবল মিষ্টি! খেতে তা'র গলা শুকিয়ে এলো। একটু জল যদি পাওয়া যেত। সে গলা বাড়িয়ে দেখ্‌লে সাম্‌নেই ষ্টেশন। এদিকে খাওয়াও শেষ হ'য়ে গেছে। ষ্টেশনে গাড়ি থাম্‌তেই সে পানি পাঁড়ের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে লাগল। লোকটাও ততক্ষণে উঠে বসেছে। গণেশের হাতে পানি পাঁড়ে জল ঢেলে দিচ্ছে দেখে সে বল্‌লে—"গেলাস দেবো? বাক্‌সের মধ্যে আছে—"

গণেশ ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"না"—

আবার গাড়ি চল্‌তে লাগ্‌ল। লোকটা আর ঘুমোল না, ব'সে ব'সে বিড়ি টান্‌তে লাগ্‌ল। গণেশও এবার গুন্ গুন্ ক'রে গান ধর্‌লে, লোকটা ছিল ব'লে লজ্জায় সে গলা ছেড়ে গাইতে পারলে না।

গাড়িও থামে না, গণেশেরও গানের বিরাম নেই। সেই লোকটাও আপন মনে বিড়্-বিড় কর্‌ছে আর মাথা নাড়ছে। শেষে বেলা দেড়টার সময় গাড়ি এসে আমতলী থাম্‌লো। গণেশ পোঁটলা দুটো নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়লো নেমে। লোকটা বল্‌লে—"তাড়া কিসের? গাড়ি এখানে পাঁচ মিনিট ধরে—'

তারপর দু'জনে গেটে টিকিট দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। লোকটা বল্‌লে—"সালতিতে যাবে তো?'

—"হুঁ—"

—"তবে চল! একখানাতেই দু'জনে যা'বে।"

গণেশ তা'র পিছনে পিছনে চল্‌লো। ষ্টেশন থেকে ঘাট বেশি দূর নয়; রাস্তায় দাঁড়ালে দেখা যায়। দু'জনে এসে নদীর ধারে দাঁড়াল।

ছোট নদী; খাল বল্‌লেই চলে। স্রোত অল্প। তারা যাবে ভাটিতে।

ভাড়া ঠিক ক'রে দু'জনে একখানা সালতিকে উঠ্‌লো। তাদের দু'জনের পোঁট্‌লা তিনটে, আর টিনের বাক্‌সটা রইলো একজায়গায়।

সাল্‌তি চলেছে। দু'পাশে উঁচু পাড়া পাড়ে কাশের বন, গ্রাম, মাঠ বাগান পিছনের দিকে স'রে যাচ্ছে। প্রায় ক্রোশ দেড়েক গিয়ে লোকটা সামনের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বল্‌লে "ঐ সিংগীহাটির মন্দির দেখা যায়"।

গণেশ তাকিয়ে দেখলে, গাছপালার মধ্যে একটা সাদা চূড়া দেখা যাচ্ছে। তারপর তা'রা যখন ঘাটে পৌঁছল—বেলা আর নেই। রাখাল-কৃষাণ গরু তাড়িয়ে বাড়ি ফির্‌ছে। গণেশ তা'র পোঁট্‌লা দুটো হাতে তুলে নিলে। লোকটাও একটা পোঁট্‌লা ও টিনের বাক্‌স নিয়ে নেমে পড়্‌লো।

দু'জনেই চলেছে! কিছুদূর গিয়ে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল। গণেশ গিয়ে দাঁড়াল তা'র দিদির বাড়ির বাইরের বাড়ির উঠোনে, সেই লোকটা চ'লে গেল পাশের বাঁশবনের দিকে।

গণেশকে দেখে তার ভগ্নীপতি ভারি খুশী। তিনি তখন বাইরে জলচৌকির ওপর ব'সে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি তামাক খেতে খুব ভালবাসেন; বল্‌লেন—"এস, এস। সব ভাল তো? ওরে শ্রীকান্ত—শ্রীকান্ত রে"—। শ্রীকান্ত চাকর তখন গোয়ালে খোঁটা পুঁতছিল। উত্তর দিলে—"কি বলেন?" বল্‌তে বল্‌তে খোঁটা হাতে বেরিয়ে এলো।

—"ভেতরে খবর দে, কুটুম এসেছে। একে নিয়ে যা—"

গণেশ তা'র ভগ্নীপতিকে প্রণাম ক'রে পোঁট্‌লা হাতে শ্রীকান্তর পিছন পিছন চল্‌লো। হঠাৎ গণেশকে দেখে দিদিও আনন্দ চাপ্‌তে পারে না; বল্‌লে—"আয়—আয়। মা কেমন আছে রে?"

গণেশ কোন দিন দিদির পায়ের ধুলো নেয় না; আজ কিন্তু নিয়ে বল্‌লে—"ভাল।" তারপর খাবারের পোঁট্‌লাটা তা'র হাতে দিতে দিতে বল্‌লেন—'মা তোমার জন্যে খাবার পাঠিয়েছে—"

দিদি হাস্‌তে হাস্‌তে পোঁট্‌লাটা গণেশের হাত থেকে নিলে, তারপর বল্‌লে—"ও পোঁট্‌লায় কি আছে?"

—"আমার জামা-কাপড়।"

—"দে আমার হাতে—"

চাকর হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিলে। গণেশ হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বস্‌লো। দিদি মনে করলে, সে বুঝি সারাদিন কিছুই খায় নি; বল্‌লে—"তোর মুখ শুকিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। এখন এইগুলো খা, আমি

শীগ্‌গিরই রান্না ক'রে দিচ্ছি।" ব'লে তা'কে বাটিতে করে ক্ষীর, সালিধানের চিঁড়ে, মর্তমান কলা আর গুড় এনে দিলে। গণেশ পেট পুরে খেয়ে আঁচিয়ে এলো।

এমন সময় তা'র ভগ্নীপতি এলেন ভেতরে। গণেশের দিদি খাবারের পোঁটলাটা তাঁর সাম্‌নে বা'র করে খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে—"মা, এই খাবারগুলো পাঠিয়েছেন—।" গণেশও সেখানে ছিল। পোঁট্‌লাটার বাঁধন খুলে পাতাখানা সরিয়েই দিদি বল্‌লে—"এ কি খাবার রে গণ্‌শা ?"

তা' দেখে গণেশও অবাক্ ! বল্‌লে—"এঁ্যা ! সেই চন্দ্রপুলী, লাড়ু, আমসত্ব সে-সব তবে গেল কোথায় ?"

ভগ্নীপতি হেসে বল্‌লেন—"গণেশবাবু ঠাট্টা কর্‌ছ। আমি তামাক খেতে ভালবাসি ব'লে কয়েক সের তামাক এনে বল্‌ছ—চন্দ্রপুলী, লাড়ু, আর আমসত্ব—!"

—"সত্যি বল্‌ছি, রায় মশায় ; না—"

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল—"রায় মশায় আছেন ?

সেই ডাক শুনে রায়মশায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

দিদি বল্‌লে—"কি লজ্জা বল্ দেখি ? তুই শেষে তামাক আন্‌লি ?"

—"না দিদি, বিশ্বাস করো—"

আবার রায় মশায়ের খড়মের আওয়াজ শোনা গেল। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে আসছেন। তাঁর হাতে পোঁট্‌লা।

তিনি এসেই বল্‌লেন—"হয়েছে। খাবারের পোঁট্‌লাটা গিয়েছিল জিতে দত্তর সঙ্গে, আর তা'র তামাকটা এনেছিলেন আমাদের গণেশ-বাবু—" ব'লেই তিনি হো-হো ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌লেন। গণেশের দিদিও হেসে সারা। গণেশ খুঁটির গায়ে মুখ লুকিয়ে হাস্‌ছে।

গণেশের ভগ্নীপতি বল্‌লেন—"যাই হোক্, ওর কিছু অন্ততঃ জিতেকে দিতে হবে ; সন্ধ্যেবেলা পাঠিয়ে দিও।"

সন্ধ্যাবেলা গণেশের দিদি জিতে দত্তর বাড়ি একখানা চন্দ্রপুলী, গোটা আষ্টেক লাড়ু, সিকিখানা আমসত্ব পাঠিয়ে দিলে। জিতেও শুধু হাতে দান নিলে না,—চণ্ডী রায়কে পাঠিয়ে দিলে আধ সেরটাক তামাক।

সে-রাতে জিতে চন্দ্রপুলী খেয়ে, আর চণ্ডী রায় তামাক টেনে গণেশকে খুব বাহবা দিলে—তা'র জন্যই তো এমন লাভ ! কিন্তু গণেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে—'বাড়ি গিয়ে মান্টু বাঁদরের মাথা ভাঙ্গব। তা'র জন্যই ত এত কাণ্ড !'

কপালের লেখা

তখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। ডোবার ধারে বাঁশবনের মাথায় সূর্য নামে-নামে। লালু উঠোনের এক কোণে ছেঁচ-তলার ছায়ায় ব'সে বেলের আঠা দিয়ে খবরের কাগজের ঘুড়ির প্রকাণ্ড লেজ তৈরি করছিল। লেজ না হ'লে ঘুড়ি উড়তেই চায় না; কেবল নেমে পড়ে।

তার খুড়োমশায় ডাকলেন—"নেলো।"

লালু তাড়াতাড়ি আঙুলের আঠা কাগজে মুছতে মুছতে উত্তর দিলে—"যাই।" তারপরে ছুটে বারান্দায় উঠে ঘরের দরজায় দাঁড়াল।

খুড়োমশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"কি করছ?"

লালু নখ খুঁটতে খুঁটতে চুপ করে রইল। খুড়ীমা ঘরের কোণে মাদুর বিছিয়ে কাঁথা সেলাই করছিলেন। লালুর হয়ে তিনি উত্তর দিলেন; বললেন—"কি আবার করবে? যা করে।"

খুড়োমশায় চোখ পাকিয়ে বললেন—"আবার ঘুড়ি?" সেদিন যে তোমাকে বারণ ক'রে দিয়েছি, আর ঘুড়ি উড়িও না। মনে নেই, তারাচাঁদ ডাক্তারের ছোট ছেলে পচার সঙ্গে মারামারির কথা?"

লালু ঘাড় নেড়ে জানালে—"হাঁ।"

—"তবে যে আবার ঘুড়ি ওড়াচ্ছ?"

—"ঘুড়ি ওড়াই নি; তৈরী করছিলাম—"

তার উত্তর শুনে খুড়ীমা হেসে ফেললেন; খুড়োমশায় আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। চাদরখানা গলায় তুলতে তুলতে বললেন—"আজ তোমাকে হাটে যেতে হবে; আমি পারব না। আমার এখনই কাছারি যাওয়া দরকার। কি আনতে হবে তোমার কাকীমার কাছ থেকে শুনে, টাকা নিয়ে রওনা হও—" ব'লে তিনি ঘরের কোণ থেকে হারিকেন-লণ্ঠন ও ছাতা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে নিচে নামলেন। তারপর উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন—"দেরী ক'রো না; এই বেলা যাও। না হ'লে ফিরতে রাত হবে—"ব'লেই ধানের গোলার পাশ দিয়ে উত্তর-দিকে চ'লে গেলেন।

দূর থেকে একবার তাঁর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বোধ হয় বেগুন ও লঙ্কা ক্ষেতে গরু ঢুকেছিল; তাড়িয়ে দিলেন। লালুর মনে

পড়ল, বাগানের হুড়কোটা কাল সে ভেঙে ফেলেছে। চাকর নিতাই এখনও একটা নতুন হুড়কো তৈরি করে নি। ভাগ্যে খুড়োমশায় জানেন না, কার কাজ। নিতাইকে সে একটা পয়সা দেবে ব'লে, ব্যাপারটা চেপে রেখেছে।

খুড়ীমা বললেন—"নে রে ছোঁড়া! দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যেতে হবে না?" ব'লে তিনি কাঁথা ফেলে উঠলেন। ঘর থেকে আসতে আসতে বললেন—"আজ তোর মাসী আসবে জানিস্ না?"

—"মাসীমা আসবে! কখন?"

—"সন্ধ্যে বেলা। তা'রা আজ সকালে রওনা হয়েছে। নৌকোয় আসতে সারাদিনই তো কেটে যায়। যা, জামা গায়ে দিয়ে আয়—"

মাসীমা লালুকে সেবার যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। লালু বললে—"ওঃ কেয়া মজা!"

সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে বাঁশের আলনা থেকে তার জামাটা পেড়ে গায়ে দিলে। কোমর আগে থেকেই বাঁধা ছিল।

খুড়ীমা রান্নাঘর থেকে খালুইটা এনে উঠানে রেখে আঁচলের গেরো খুলে একটা টাকা বা'র করে বললেন—"এই নে—বেশ ভাল দেখে একটা মাছ আনবি। আর ঐ সঙ্গে দু'পণ পান, আধসের সুপুরী, চার পয়সার খয়ের। আর যদি পাস্ ত সের খানেক আলু কিনিস্—"

—"এতসব আনব কিসে?"

—"কেন, অত বড় খালুইটাতে ধরবে না? তবে ঐ ছোট্ট খালুইটাও নে।"

লালু খুড়ীমার হাত থেকে টাকাটা নিলে। খুড়ীমা বললেন—"টাকাটা কাপড়ের খুঁটে বেশ ক'রে বেঁধে পেটের সঙ্গে গুঁজে রাখ।"

"ভয় নেই, হারাবে না।" ব'লে খালুই দুটো হাতে তুলতেই লালুর মনে পড়ল, তার ঘুড়ি, লাটাই, ঘুড়ির লেজ, কাগজ, আধখানা কাঁচা বেল; হেঁসোখানা ছেঁচতলায় পড়ে আছে। হেঁসো দিয়ে সে কাগজ কাটছিল। সে খালুই দুটো মাটিতে নামিয়ে তার জিনিসগুলো ঢেঁকী ঘরের কোণে রেখে এল। তারপর ছুটে এসে খালুই দুটো হাতে তুলে তেমনি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

গাঁ থেকে ফকিরগঞ্জের হাট দেড় ক্রোশ, মাঝে একটা নদী। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে—বৃহস্পতি ও রবিবারে। সেদিন রবিবার। আধক্রোশের মাথায় খেয়াঘাট। খেয়া পার হয়ে নদীর ধার ধ'রে ক্রোশটাক গেলেই

হাট। দূর থেকে হাটের ধারে বড় বটগাছটা দেখা যায়। নদী পার হ'তে হ'তে হাটের ঘাটের নৌকোগুলোও চোখে পড়ে। হাটের ওধারেও একটা খেয়া আছে। সেটা দিয়ে হাট কাছে হয়; কিন্তু এপারে হাঁটতে হয় ঠিক ওপারের সমান।

লালু চলেছে। জোলাপাড়ার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জনকয়েক জোলা তার সঙ্গী হলো।

তা'রাও যাচ্ছে হাটে। কেউ নিয়েছে এক মোট নতুন গামছা, কেউ নিয়েছে সুতো, কেউ নিয়েছে চাদর।

একজন জিজ্ঞাসা করলে—"কি গো নালুবাবু! হাটে যাবে নাকি?"

—"হাঁ—"

—"তা একা যে! নিতাই কৈ?"

—"জানিনে—"

জোলাটা নিজেদের মধ্যে একজনকে বললে—"বুঝলে গো চাচা, মাধববাবু মরার পর ছেলেটারও হাল হয়েছে।"

—"ছাড়ান দেরে ভাই। ভদ্দর নোকের কথা—।

জোলাপাড়ার পর প্রকাণ্ড ধান-ক্ষেত। আলে আলে যেতে হয়। ক্ষেত পার হ'লেই খেয়াঘাট; ঘাটের উপর পাটনীর ঘর। তার সামনে একখানা নৌকোর ভাঙ্গা ছই, কতকগুলো ছোট ছোট ঝাঁপ ও একটা গলুই প'ড়ে আছে।

লালু ক্ষেত পার হয়ে সেখানে গিয়ে দেখলে খেয়া ওপার থেকে রওনা হয়েছে। জনকয়েক হাটুরে বেসাতি নামিয়ে ব'সে গল্প করছিল। লালু তাদের কাছে না ব'সে ভাঙ্গা ছইটার উপর গিয়ে বসল। খেয়া ভিড়তে এখনও কিছু দেরী।

তারপর খেয়া-নৌকো ঘাটে ভিড়তে না ভিড়তে সে পাড় দিয়ে নিচে নেমে সকলের আগে গিয়ে উঠল খেয়ায়। হাটের বেলা; দেরী করা চলে না। যাত্রী নিয়ে তখনই খেয়া ছাড়লো।

খেয়া চলেছে। এদিক-ওদিক দিয়ে ডিঙ্গি ও ব্যাপারীদের দু-একখানা বজরা বা পানসী যাওয়া-আসা করছে।

লালু বসেছিল ধারে পা ঝুলিয়ে। পাটনী বললে—"স'রে বস। হাতে দড়ি দেবে নাকি? ঐ টানে একবার পড়লে নিয়ে যাবে সেই মহেশপুরের ঘাটে।" কিন্তু লালু পাটনীর কথায় কান দিলে না। পায়ের নিচ দিয়ে নদীর স্রোত যাচ্ছে, দেখে তার বড় আনন্দ।

পাটনীর ভাই সকলের কাছে পারাণির পয়সা আদায় করছে। কেউ বলছে—"কাল দেব", কেউ বলছে—"ফিরতি বেলা", কেউ ট্যাঁক থেকে পয়সা বা'র করছে। লালুর কাছে এসে সে পয়সা চাইতেই পাটনী বললে—"বোসমশায়ের ভাইয়ের বেটা।" পাটনীর ভাই লালুর কাছে আর পয়সা চাইলে না।

লালু তার পাশের লোকটির সঙ্গে অনর্গল কথা বলছে। নদী কোথা থেকে আসে, পাহাড় কি রকম, স্টিমার কেমন দেখতে ইত্যাদি ইত্যাদি। তার অনর্গল বক্তৃতায় পিছন থেকে একটা লোক ব'লে উঠল—"তুমি উকিল হবে বাবু।"

শুনে লালুর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। তার বক্তৃতা আর থামে না, লোকগুলোও তার কথায় আর কান দিলে না।

খেয়া পারে পৌঁছল, কিন্তু স্রোতের টানে ঘাটে ভিড়তে পারলে না; ভাটিতে কিছু দূর চ'লে গেল। জায়গাটায় উঁচু পাড়। তার গায়ে গাঙ-শালিখের বাসা। যাত্রীদেরই একজন দাঁড়ে বসেছিল। নৌকো উজিয়ে গিয়ে ঘাটে লাগল। তখনও লগি পোঁতা হয় নি। লালু লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামতেই নৌকোর উপর থেকে কে যেন বললে—"ওরকম ক'রে নেম না হে। হাত-পা ভাঙ্গবে।"

লালু ফিরে দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত শশধরবাবু। সে জিভ কেটে পাড় দিয়ে তাড়াতাড়ি তীরে উঠে হাটের পথ ধ'রে চলল।

সামনে একপাল গরু ও ছাগল হাটের দিকে চলেছে। তাদের ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ছে। লালু পথ ছেড়ে মাঠ ভেঙ্গে ছুটতে ছুটতে তাদের ছাড়িয়ে গেল।

ঐ যে ফকিরগঞ্জের হাটের বড় বটগাছটা দেখা যায়। পথ দিয়ে নানা রকমের লোক যাওয়া-আসা করছে। কেউ বেসাতি নিয়ে যাচ্ছে, কেউ সওদা নিয়ে ফিরছে, কেউ সওদা করতে চলেছে।

হাটটা লালুর চেনা, সে অনেক বার হাটে এসেছে। হাটের মুখেই সার্কাস হচ্ছিল, এক পয়সার খেলা। সার্কাসের ছোট তাঁবু। কয়েকটি মুসলমান তার বাইরে দাঁড়িয়ে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে চীৎকার ক'রে বলছে—"ভানুমতীর খেল্ এক পয়সা—চ'লে এস।"

তাদের একজন একটা টুপির ভিতর থেকে মুঠো মুঠো কাগজের সরু ফালি বা'র ক'রে চিবচ্ছে; আর বলছে—"নাস্তা, নাস্তা!" ব'লেই মুখের ভিতর থেকে একটা কাগজের ভেঁপু টেনে বা'র করছে।

লালুর ইচ্ছে করতে লাগল, সে এক পয়সা দিয়ে ভিতরে যায়। একটা টাকা ত আছে। সে ট্যাঁকে হাত দিয়ে টাকাটা বা'র করতে গিয়েই চম্‌কে উঠল। টাকা কোথায় গেল? এ ট্যাঁকে আছে কি? না, এ ট্যাঁকেওত নেই। পকেটে রেখেছে কি? সে তিনটে পকেটেই হাঁতড়ে দেখলে। না, নেই ত! তার বেশ মনে হচ্ছে, খুড়ীমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে সে গুঁজলো ট্যাঁকে। ট্যাঁকেই রেখেছিল; ট্যাঁক ছাড়া সে কোথাও রাখে নি। সে আবার ট্যাঁক দুটো ও সেই সঙ্গে জামার পকেট তিনটে খুঁজলে।

ভয়ে তার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ। কি দিয়ে সে হাট করবে? খুড়োমশায় শুনলে রক্ষা থাকবে না; বলবেন, "একটা টাকা রোজগার করতে ক' ফোঁটা রক্ত জল হয় জান?" টাকাটা সে কোথায় পাবে? পথে পড়েছে কি? পড়লেও ত পাওয়া যাবে না। তার চোখে জল এলো। সে খালুইশুদ্ধ হাত দুখানা পিছনে দিয়ে টাকাটা পথের চারধারে খুঁজতে খুঁজতে আস্তে আস্তে চলল।

পথে কেবল ধুলো, গোবর ও শুকনো কাঁটানটের গাছ। সাদা জিনিস চোখে পড়লেই তার বুক নেচে উঠে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে যায়। কিন্তু গিয়ে দেখে, সেটা শামুকের ভাঙ্গা খোলা! তার বুকটা আবার দমে' যায়। একটা টাকা সে কোথায় পাবে? কি ক'রে টাকাটা হারালো? নিশ্চয়ই পথে কোথাও প'ড়ে গেছে। খুড়োমশায় বলবেন, "তুমি অসাবধানী!" তারপরই বেত পড়বে। তার জন্যে একখানা বেত তোলা আছে। আবার তার চোখে জল এলো। কি করবে সে? সে ত ইচ্ছে ক'রে হারায় নি। চট্ ক'রে তার মনে পড়্‌লো, মাসীমা ত এবারও যাবার সময় তাকে একটা টাকা দিয়ে যাবেন। এখন যদি একটা টাকা ধার পায় ত সেই টাকা দিয়ে ধার শোধ দেবে!।

সে ঘাড় তুলতেই দেখে তার সামনে সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি খুঁজছো? হাটে যাও নি?"

লালু ঢোক গিলে বললে—"না স্যার, আমার টাকাটা—"

—"হারিয়েছে? হারাবারই কথা। তোমার মত চঞ্চলমতি বালকেরাই অসাবধানী হয়। সম্ভবতঃ খেয়াঘাটেই তোমার টাকাটি হারিয়ে থাকবে। কোথায় রেখেছিলে?"

—"ট্যাঁকে—"

—"না পকেটে? পকেটে টাকা রাখলেই হারায়। সেই যখন

লাফিয়েছিল তখনই প'ড়ে গেছে। দেখ, তোমার দোষেই এরকম ক্ষতি হলো। বাড়িতে কতখানি অসুবিধার কারণ হবে বুঝতে পারছো?"

লালুর চোখ দুটো ছল্-ছল্ ক'রে উঠল; বললে—"স্যার, আমাকে একটা টাকা ধার দেন; কাল ইস্কুলে শোধ দেব"।

পণ্ডিতমশায় প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন; তারপর বললেন—"দেখ, আমি দিতে পারি। তবে কিনা টাকাটা আমার নয়। তোমারই খুড়োমশায়ের টাকা। আমি কাল কলকাতা যাব। তিনি একটি ওষুধ কিনতে আমাকে কয়েকটি টাকা দিয়েছেন। আমি তাই থেকে তোমায় দিচ্ছি"—বলতে বলতে তিনি পেটের উপরের কোঁচাটা খুললেন। লালু দেখলে, তার খুঁটে জড়িয়ে বাঁধা একখানি ময়লা রুমাল। রুমালের খুঁটে বাঁধা একখানি পাঁচ টাকার নোট, কয়েকটি টাকা ও রেজ্‌কি। তিনি তাই থেকে একটি টাকা বা'র ক'রে বললেন—"দেখো বাবা, আমাকে অপদস্ত ক'রো না।"

টাকাটা নিতে লালুর বুক কেঁপে উঠলো। তার খুড়োমশায়ের টাকা! কিন্তু সে ত দিয়ে দেবে। মাসীমার কাছ থেকে আজ রাতের বেলায়ই সে চাইবে। মাসীমা তাকে ভালবাসেন, সেবার সঙ্গেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সে টাকাটা হাতে নিয়ে বললে—"স্যার, টাকাটা আমি কাল ঠিক দেব। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, খুড়োমশায়কে বলবেন না।"

—"সে কথা বিবেচনা করা যাবে। আজ যে শিক্ষা লাভ করলে, কখনও ভুলো না! সর্বদা ধীর ও সাবধানী হবে।"

"হ্যাঁ স্যার" ব'লেই লালু হাটের দিকে ছুটলো। কিন্তু সে মনে আর স্ফূর্তি পেল না।

মস্ত হাট। কোথাও কাপড়-গামছা-সুতো, কোথাও মাছ, কোথাও মুড়ি-চিড়ে-গুড়-বাতাসা-জিলাপী, কোথাও মাদুর-চাটাই, টিন, চিটেগুড় বিক্রী হচ্ছে। তরি-তরকারিও এসেছে নানা রকমের। হাটের ধারে ধারে দোকান-পসার—পান, মসলা-পাতি, টিনের ছোট আয়না, ঘুনসী, কাঁকই এমনিতর নানা জিনিসের। ওদিকে গোহাটা; তার এধারে কতকগুলো গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে প'ড়ে আছে। কোথাও মুরগী ও ছাগলের হাট বসেছে। কোথাও ভিখারীর দল নানান সুরে চীৎকার করছে। কোথাও বা ব্যাপারীতে ব্যাপারীতে এক গাদা খালি বস্তা সামনে রেখে তুমুল বচসা। চারধারে ঠেলাঠেলি, চীৎকার, গোলমাল। লালু খালুই দুটো হাতে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সে যখন বেরিয়ে এল, তার খালুই ভর্তি সওদা। মাছটা বেশ বড়; ওজনে সের দুই হবে। খুড়ীমা যা যা বলেছিলেন, সবই সে কিনেছে। কিনেও বেঁচেছে সাড়ে তেরো পয়সা।

সে একবার ভাবলে, পয়সাগুলো পণ্ডিতমশায়কে ফেরৎ দেয়। তার পরই মনে পড়ল, খুড়ীমার কাছে হিসাব দেবার সময়ে ধরা পড়বে। সে টাকা হারানোর কথা কাউকে বলবে না, এক মাসীমা ছাড়া।

হাটের বাইরে এসে পয়সাগুলো কোঁচার খুঁটে বেঁধে নিয়ে খালুই দুটো দু'হাতে তুলে সে ফিরে চললো।

বেলা প'ড়ে এসেছে; নদীর জলে কালো ছায়া। মাথার উপর দিয়ে পাখী উড়ে যাচ্ছে; পাড়ের গায়ে গাঙশালিখেরা কিচির-মিচির করছে। অনেকেই হাট থেকে ফিরছিল। সামনে একখানা খালি গরুর গাড়ি-ধুলো উড়িয়ে যাচ্ছিল। খালুই দুটো ভারী; লালু একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে গাড়িখানার পিছনে পেঁ ীছে খালুই দুটো তার উপর রেখে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চললো। গাড়োয়ানের খেয়াল নেই; সে তার পিছনে যে লোকটা বসেছিল তার সঙ্গে গল্পে মশগুল। গত বছর কোন কোন গাঁয়ে সে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, কত টাকা রোজগার করেছিল, তাই নিয়ে আলোচনা করছে।

চলতে চলতে খেয়াঘাট দেখা দিল। দু'চারজন নৌকোয় উঠে বসেছে; কেউ কেউ উঠছে। এবার লালুর ভয় হ'লো। যদি মাসীমা না আসে? সে যত ঠাকুর-দেবতার নাম জানত সকলকে মনে মনে ডাকতে লাগলো। খেয়া ছাড়ে-ছাড়ে এমন সময় সে গিয়ে খেয়ায় উঠলো। এবার সে চুপচাপ ব'সে আছে। খেয়াটাতেও যাত্রী ও বস্তা, হাঁড়ি, মাছ, পান প্রভৃতি জিনিস-পত্রে ঠাসাঠাসি। একজন দুটো পাঁঠা নিয়ে যাচ্ছিল। পাঁঠা দুটো মাঝে মাঝে "ম্যা-ম্যা" করছে।

খেয়া যত কূলের কাছে আসে লালুর ততই ভয় করে। কিন্তু ঐ যে একখানা ডিঙি খেয়াঘাটের এধারে কূলে বাঁধা। মাঝিরা রান্নার যোগাড় করছে। একজন মশলা বাঁটছে! ঐ ডিঙিতেই বোধ হয়....একবার সে জিজ্ঞাসা করে দেখবে?

খেয়া আবার অঘাটায় গিয়ে পড়ল। দাঁড় টেনে ডিঙির পাশ দিয়ে যেতে যেতে পাটনী জিজ্ঞাসা করলে—"কোথাকার ডিঙি গো?"

মাঝি উত্তর দিলে—"কালীডাঙার।"

—"যাবে কোথা?"

—"মহেশপুর।"

—"ওঃ ?"

—"মহেশপুর।"

—"এখানে যে ?"

—"সওয়ারী ছিল।"

লালুর মন আনন্দে নাচছে—মাসীমা এসেছে! পণ্ডিত-মশায়ের টাকা সে কাল ইস্কুলে গিয়েই দিয়ে দেবে।

তখন সন্ধ্যা লাগে-লাগে। খুড়োমশায় ফিরেন নি। তিনি ফিরবেন রাত্রে।

লালু বাড়ির ভিতরে ঢুকেই দেখে সামনে খুড়ীমা। তিনি তাকে দেখে ব'লে উঠলেন—"কিরে! বাড়ি এলি যে ?"

লালুর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। সে খালুই ছুটো মাটিতে নামাল।

খুড়ীমা বললেন—"এসব কিনলি কি দিয়ে ?"

লালু অবাক হয়ে গেল। তার টাকা হারানোর কথা তিনি জানলেন কি ক'রে ? পণ্ডিতমশায় ত ফেরেন নি। সে আসবার সময় তাঁকে শ্রীনিবাস সা'র দোকানে ব'সে তামাক খেতে দেখেছে; বললে—"টাকা দিয়ে।"

—"টাকা পেলি কোথায় ?"

—"তুমি দিয়েছিলে—"

—"আমি ত দিয়েছিলাম ? তুই নিয়েছিলি ?"

—"হাঁ।"

—"ফের মিছে কথা ?"

গোলমাল শুনে মাসীমা সেখানে এলেন। তাঁর কোলে একটি মোটা-সোটা খোকা। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হয়েছে ?"

লালু মাসীমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তাঁকে যেন একটু অচেনা ঠেকছে। তিনি যেন ঠিক সেই মাসীমা ন'ন। মাসীমা এর আগে যখন এসেছিলেন তখন খোকা হয় নি।

খুড়ীমা বললেন—"আমি ওঁকে বাজারের টাকা দিয়েছি। উনি টাকাটি ঐ ছেঁচতলায় রেখে ঘুড়ি-লাটাই ঘরে তুলে খালুই নিয়ে হাটে গেছেন।....টাকা পেলি কোথায় বল্ ?"

—"সেকেণ্ড পণ্ডিতমশায়ের কাছ থেকে ধার করেছি।"

মাসীমা গালে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন—"ও বাবা! সেই নেলো এমন হয়েছে ?"

খুড়ীমা বললেন—"দেখলে ত? দাঁড়াও। আসুন আজ।" বলতে বলতে তিনি খালুই দুটো হাতে তুলে নিলেন।

লালু চট্ ক'রে তার খুড়ীমার পায়ের উপর প'ড়ে বললে—"তোমার পায়ে পড়ি কাকীমা, তুমি কাকাকে ব'লো না! আমি এবার থেকে খুব সাবধানী হব।"

—"আচ্ছা, ছাড়্। মনে থাকে যেন!"

লালু ঘাড় নেড়ে বললে—"থাকবে।"

মাসীমা বললেন—"ছোঁড়া এতও জানে।"

খুড়ীমা একথার কোন জবাব দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত ফিরেছে?"

—"সাড়ে তেরো পয়সা।"

—"কাল ইস্কুল গিয়ে টাকাটা পণ্ডিতমশায়কে ফেরৎ দিবি। বাকী পয়সাগুলো তোর মাসীর হাতে দে।"

লালুর বুকের ভার সব নেমে গেল! তার মনে পড়ল, মাসীমাকে প্রণাম করা হয় নি। সে টপ্ ক'রে তার মাসীমার পায়ে প্রণাম করতেই মাসীমা বললেন—"হয়েছে-হয়েছে, তোর সুবুদ্ধি হোক।"

মাসীমার আশীর্বাদ খচ্ ক'রে লালুর বুকে বিঁধল। কেউ তাকে ভালবাসে না!

যাহোক্, সন্ধ্যা ও পরের সকালটা মাসীমার খোকাকে নিয়ে তার বেশ আনন্দেই কাটলো। খুড়ীমা খুড়োমশায়ের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন না।

মাসীমা সেইদিন বিকেলেই চ'লে যাবেন। ইস্কুলে যাবার সময় লালু বার বার ক'রে বললে—"মাসীমা, আমি না ফিরলে যেও না।" মাসীমা এই অনুরোধের উত্তরে শুধু একটু হাসলেন। খুড়ীমা তাকে টাকাটা চুপি চুপি দিয়ে বললেন—"নিয়ে যা।"

লালু লাফাতে লাফাতে ইস্কুলে চ'লে গেল। আজ বিকেলে সে মাসীমার কাছে একটা টাকা পাবে!

বিকেলে ইস্কুল থেকে ফিরে সে দেখে নিতাই মাসীমাদের বিছানা ও ট্রাঙ্ক মাথায় নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। মাসীমা ও মেসোমশাই বা'র-উঠানে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে খুড়োমশায় ও খুড়ীমা।

মাসীমা লালুকে বললেন—"তুই আর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে কি করবি?" বলতে বলতে আঁচলের গেরো খুলতে লাগলেন।

লালু আনন্দে মাসীমা ও মেসেমেশায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই মাসীমা বললেন—"এই নে।

লালু দেখলে, দুটো পয়সা। সে ছুটে ভিতরে চলে গেল। মাসীমা চীৎকার ক'রে বললেন—"নিয়ে যা নিয়ে যা—লজ্জা হয়েছে!···· আচ্ছা, দিদি, তুমিই ওর পয়সা দুটো রাখো।

লালুর দু'চোখে জল। সে ঘরে গিয়ে বইগুলো কেরোসিন কাঠের সেল্‌ফের উপর রেখে, ঢেঁকিশালায় গিয়ে ঘুড়িখানা পেড়ে নিয়ে তার লোজটা টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগল!

তারপর একবার বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলে—শেষ-বেলার রৌদ্র-মাখানো ধান-ক্ষেতের আল দিয়ে ঐ মাসীমারা চলেছেন নদীর দিকে। সে আবার নীরবে কাঁদতে লাগলো।

কাঁটাখালি ও কোদালচাঁচি

এখনও আশ্বিনে ঝড় উঠলেই আমাদের গাঁয়ের হরিপদকে মনে পড়ে।

তাকে চিন্‌তো না কে? সে পড়তো আমাদেরই সঙ্গে।

বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, মাথায় লম্বা চুল, মুখের ওপর পাটির সামনের দাঁত দুটো ভাঙা। ছোটবেলায় ক্রিকেট বল লেগে দাঁত দুটো ভেঙে গিয়েছিল। ওঃ! সে কি রক্ত! কিন্তু হরিপদ একটুও কাঁদে নি এবং তারপর ক্রিকেট খেলাও ছাড়ে নি। বরং আর সব খেলার চেয়ে ঐ খেলাতেই তার আকর্ষণ ছিল বেশি।

তার গায়ে ক্ষমতাও ছিল বেশ। সে সকলের সঙ্গে, বিশেষ করে তার বয়ঃকনিষ্ঠদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতে খুব ভালোবাসতো। তার একটা প্রিয় খেলা ছিল, লোককে ভয় দেখানো।

"মারবো" "কাটবো" বলে নয়;—তাকে কারো গায়ে কখন হাত তুলতে দেখি নি, গালাগালও সে কাউকে দিত না। কিন্তু ভয় দেখাতো যত সব উদ্ভট গল্প বলে আর অন্ধকার রাত্রে কিছু সেজে চলে-ফিরে বেড়িয়ে বা গাছে উঠে গাছের ডালে দোলা দিয়ে কিংবা কোথাও দাঁড়িয়ে থেকে।

অনেক বয়স্ক লোকও অন্ধকার বা জ্যোৎস্না রাতে তাকে কিম্ভূত কিমাকার সাজে বেপট জায়গায় আচমকা দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখে অথবা অট্টহাস্য করতে শুনে আঁৎকে উঠতেন।

পরদিন তাই নিয়ে বেশ আলোচনা—এমন কি কখন কখন তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হোত।

কিন্তু যাঁর প্রতি অন্যায় করতো তাঁকে সে এমন একটি ভেট দিত বা তাঁর এমন একটি উপকার করতো যে শেষে তিনিই হাসতে হাসতে বলতেন, "না, ছেলেটা এদিকে ভাল। আমরাও তো ও বয়সে কত দুষ্টুমি করেছি। ছেলেবেলায় দুষ্টু হওয়া ভাল। বড় হলে শান্ত হয়।"

তাঁকে তৎক্ষণাৎ সমর্থন করবার লোকের অভাব হোত না। কারণ হরিপদর দুষ্টুমীর ফল আরও কেউ কেউ ভোগ করেছিলেন। তিনি বলতেন, "তা যা বলেছেন! ছেলেবেলায় যারা চুপচাপ্ থাকে তারা মিট-মিটে, ভেতরে ভেতরে শয়তান। বড় হয়ে তারা হয়ে ওঠে ভীষণ লোক।"

মনে পড়ে হরিপদকে নিয়ে বয়স্কদের একটি দিনের আলোচনা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সেদিন আবার একজন বললেন, "ও কথা বলবেন না। ছেলেবেলায় আমাদের মধ্যে দুষ্টু ছেলে ছিল কমই। তাই

বলে কি শয়তান লোকে গাঁ ভরে গেছে ? তবে হাঁ”—বলেই তিনি বামুন-পাড়ার কৃষ্ণরামবাবুর দিকে তাকান।

কৃষ্ণরাম তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন, “থামলেন কেন ? প্রমাণটা কি করতে চান বলেই ফেলুন—”

তারপর যা হয়, তা আমাদের শুনতে, দেখতে বা জানতে দেওয়া হয় নি। আমরাও জানতে চাই নি। কারণ বড়দের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভাল ! আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ভুলি ! ওঁরা ভোলেন না।

যাক সে কথা। একদিন গাঁয়ে এল একটি নতুন ছেলে। আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাগ্নে সে। সেও গাঁয়ের ছেলে। আমাদের গাঁ থেকে একখানা গাঁ পরে তাদের বাড়ি। তফাৎ মাত্র তিনক্রোশ—মাঝে একটা বিল আর খানকয়েক ক্ষেত।

ছেলেটির বাবা ছিলেন ডাক্তার। বেশ পয়সা ছিল তাঁর। আমাদের গাঁয়েও মাঝে আসতেন। ভদ্রলোক হঠাৎ মারা যান। তাই হেডমাস্টার মশাই ছেলেটিকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে রেখে লেখা-পড়া শিখাতে।

কারণ বাড়িতে সে পড়াশুনা কিছুই করতো না, মাঠে মাঠে, বাগানে বাগানে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতো। পাখির বাসা ভাঙ্গতো, ডিম ও ছানা চুরি করতো ; পরের বাগানের ফলফুল রাখতো না। মালিক কিছু বললে গাছের গায়ে গর্ত করে তাতে হিং পুরে দিত। এক রাত্রের মধ্যেই কলার ঝাড় কেটে মানগাছ উপড়ে এমন অবস্থা করে রাখতো যে যার ক্ষেত সে সকালে উঠে সেই দৃশ্য দেখে হাহাকার করতো। অথচ ডাক্তারবাবুর ছেলেটিই যে, সে সব করেছে তার কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যেত না ! এমনি কত রকমের কুকাজ যে সে করে বেড়াতো—কতখানি কুবুদ্ধি যে তার মাথায় ঘুরতো তা বলে শেষ করা যায় না।

কুবুদ্ধি সত্যিই খারাপ। ওতে লোকের খুব ক্ষতি হয় ! তাই বলে সামরিক বিভাগে ওটা উপেক্ষণীয় নয়। যত রকমে সম্ভব কুবুদ্ধি খাটিয়ে শত্রুর ক্ষতি করতে পারাটাই সেখানে মস্ত গুণ। এই গুণ যার নেই তার আদরও নেই সেখানে। সে উন্নতিও করতে পারে না।

তা হেডমাস্টার মশাইয়ের ভাগ্নে সমীর এল। তার গায়ের রঙ পোড়া লোহার মতো, নাকটি যেন খাঁড়া, চোখ দুটি টানা, মাথার চুলগুলি ঘন ও কোঁকড়ানো, শরীরটিকে নধর বলতেই হবে। মুখে তার কথা নেই। দেখলেই মনে হল, গোবেচারা ; তার বিরুদ্ধে যা কিছু শোনা গেছে সবই শত্রুপক্ষের কুৎসা।

কিন্তু আমাদের হরিপদ প্রথম দিন থেকে লাগলো তার পিছনে। বলতে ভুলে গেছি আমাদের গাঁয়ের নাম কাঁটাখালি আর সমীরদের গাঁয়ের নাম কোদালচাঁচি।

হরিপদ সমীরের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিলে। যেন সে সমীরের পরমহিতৈষী এমনি ভাব দেখাতে লাগলো।

সে সমীরকে জানিয়ে দিলে আমাদের গাঁয়ের কোন্ কোন্ জায়গা ভয়ের। কে কোথায় ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠে, কে কোথায় ভূত দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সে সব কাহিনী সবিস্তারে বলে গেল। সমীর তার বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় করে, ওপরের ঠোঁট কামড়ে হরিপদর কথা শুনে গেল।

হরিপদ তার ভাব দেখে মুচকি হেসে বললে, "তুমি রাত-বিরেতে একা বেরিও না। আমাদের স্কুল থেকে আসতে ঐ যে পুরোনো পুকুর আর ভাঙা দরগাটা পড়ে, দেখেছো তো; ঐ জায়গা দুটো হ'ল সব চেয়ে খারাপ। ওখানে—"

সমীর ভালমানুষের মতো বললে, "ওখানে জঙ্গলে বুঝি বড় বড় সাপ আছে?"

"আরে সাপ থাকলে তো ভালই হোত! সাপ কোথায় নেই বলতে পার? সেদিন আমাদের এই ক্লাসেই দপ্তরী ভোরে চারহাত লম্বা একটা কালকেউটে মেরেছিল। সাপ নয়—সাপ নয়, অপদেবতা। আমাদের গাঁয়ের সব ভাল হোত, যদি রাতের বেলা ওটা গাঁ ময় না ঘুরে বেড়াতো। লোকে বলে, এখানে রাতের বেলা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে বলে, এর নাম হয়েছে কাঁটাখালি।"

সমীর বললে, "তুমি নিজে কখন দেখেছো?"

"দেখিনি। তবে শুনেছি।"

"যদি দেখতে তাহলে কি করতে?"

"কি আর করতাম? সবাই যা করে আমিও তাই করতাম। চেঁচিয়ে উঠেই অজ্ঞান। আচ্ছা! তুমি যদি কখন দেখ?"

সমীর আস্তে আস্তে বললে, "আমার বড় ভয় করে। অন্ধকারে গাছ-পালা নড়তেই আমার বুক টিপ্ টিপ্ করে ওঠে। আর, ভাঙা দরগার কাছে যদি অপদেবতা দেখি তো বোধ হয় মরেই যাব।"

সমীরের মতো গোবেচারীর মুখে এতগুলো কথা শুনে আমরা সবাই অবাক ও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

কিন্তু তারপর আমাদের কথাবার্তায় সে আগ্রহের সঙ্গে আর যোগ দিলে না এবং যেন কি ভাবতে লাগলো।

আমাদের স্কুল থেকে কিছুটা তফাতে সেক্রেটারিবাবুর পাকা বাড়ি। তিনি কাঁটাখালির ইজারাদার। তাই ভারী খাতির।

হেডমাস্টারমশাই সেক্রেটারির বড় ছেলে মদনকে রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের অফিস ঘরে বসে পড়াতেন। সমীরকেও রোজ সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়ে পড়াশুনো করতে বলেছিলেন। মাস্টারমশাই আমাদের প্রতিবেশী। তাই সমীরও যেত। পড়াশুনো সেরে সে কোনদিন আসতো তাঁর সঙ্গে কোনদিন বা আসতো একা। সঙ্গে আলো নিত না, অন্ধকার রাতে, বই চাপড়াতে চাপড়াতে আসতো। এক একদিন তার বই চাপড়ানোর শব্দ দূর থেকে শুনতে পেতাম।

একদিন সে একাই আসছে। রাত তখন আটটা কি তার কিছু বেশি হবে। একে পল্লীগ্রাম। তার ওপর গাঢ় অন্ধকার। সে পুকুর ও দরগা ছাড়িয়ে রায়েদের পোড়ো ভিটের ধারে আসতেই পাশের আম গাছটার ডাল সর্ সর্ করে নড়ে উঠল। আর সেই সঙ্গে ঝুর ঝুর করে মাটি ও আরও কি যেন ওপর থেকে ঝরে পড়লো।

সমীর থমকে দাঁড়ালো। তারপর ওপর দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তবুও মনে হলো, গাছের ডালে শাদা মতো কি যেন একটা রয়েছে। সে হাতের বই-খাতা ও পায়ের চটিজোড়া গাছতলায় রেখে কোমর বেঁধে গাছে উঠতে লাগলো। খানিক দূর উঠেই বললে, "হরিপদ নেমে এস। মিথ্যে কষ্ট করছো। আমায় ভয় দেখায়—"

কিন্তু হরিপদের সাড়া পাওয়ার বদলে সে দেখলো অন্ধকার ডালপালার মধ্যে একখানা কিম্ভূতকিমাকার মুখ ঝক্‌ঝক্ করছে। সে প্রথমটা খুব চমকে গেল। পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে আরও হাত কয়েক ওপরে উঠ্‌তেই জ্বলন্ত মুখখানা আর দেখতে পেল না। কিন্তু আগের দেখা সেই শাদা জিনিসটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো! সে আবার বললে, "হরিপদ নেমে এস!"

এমন সময়ে সে দেখতে পেল, পুকুরধারে দরগাটার আড়াল থেকে দুল্‌তে দুল্‌তে বেরিয়ে এল একটা লণ্ঠন। তার একটু পরেই শোনা যেতে লাগলো কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ। হেডমাস্টারমশাই চাকরের সঙ্গে বাড়ি ফির্‌ছেন।

সমীর আবার বললে, "হরিপদ, নেমে এস। ঐ দেখ আলো

হাতে কারা আসছে। বোধহয় মামা। আমি এখনই চীৎকার করবো।"

ওপর থেকে উত্তর হলো, "আমিও বলবো, তুমি আমায় ভয় দেখাতে গাছে উঠেছিলে! আমি তোমায় ধরতেই গাছে উঠেছি।"

সমীর কোন উত্তর না দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লো। হরিপদও তার পিছন পিছন নেমেই অন্ধকারে দিল ছুট।

ওদিকে আলোটাও ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে। কিন্তু একেবারে কাছে আসবার আগেই সমীরও অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

এই ঘটনাটি সমীর পরদিনই আমাদের বলে। শেষকালে বলে, "বুঝতে পেরেছিলাম, সেক্রেটারির চাকর আলো হাতে মামাকে বাড়ি পোঁছে দিতে আস্‌ছিল! আমি বাড়ি আসবার একটু পরেই মামাও বাড়ি এসেছিলেন।" হরিপদ কিন্তু এ সম্বন্ধে কাউকেই কিছু বললে না। আমরা জিগ্যেস করলেও সে চুপ করে রইলো এবং সমীরের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাতে লাগ্‌লো।

সেদিন থেকে হরিপদর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয় গেল কমে আর শয়তানীতে তার চেয়েও উঁচু আসন দিলাম, সমীরকে। তবে মনে মনে আমাদের দুঃখও হলো যে, কাঁটাখালি কোদালচাঁচির কাছে শায়েস্তা হলো!

কিন্তু সমীর কোন রকমের শয়তানী প্রকাশ করলে না, নিতান্ত গোবে-চারীর মতো থাকতে লাগলো। শেষে স্কুল বন্ধ না হতেই মহালয়ার দু'দিন আগে সে বাড়ি চলে গেল।

হরিপদ যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো।

হরিপদদের বাড়ির পিছন দিকে ছিল একটি আমকাঁঠালের বাগান। তার এক জায়গায় ছিল অনেককালের একটি পুরোনো কবর। তার পাকা গাঁথুনি ভেঙে-চুরে খানিকটা মাটিতে বসে গিয়েছিল। আর, তার কাছ থেকে কিছু দূরে ছিল, একটি পুরোনো বেলগাছ। সেদিকে কেউ যেত না। আমরাও যদি কোনদিন ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে পড়েছি তো তৎক্ষণাৎ ভয়ে পালিয়ে আসতে পথ পাই নি।

লোকে বলে, আলখাল্লাপরা, মুখে পাকা লম্বা দাড়ি, মাথায় টুপি এক মৌলবি নাকি জ্যোৎস্না-রাতে ওখানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কোরানের বয়েৎ আওড়াতেন। তিনি কারো অনিষ্ট করতেন না। কিন্তু বছর কতক থেকে তাঁকে আর দেখা যায় না। তবে কাহিনীটি সমানে চলে আসছে। সবেরই শেষ আছে। কাহিনীর আর শেষ নেই। যত পুরোনো হয় ও যেন ততই সত্য হয়ে ওঠে।

হরিপদদের বাড়ির পিছনদিকের কাহিনী একদিন সমীরও শুনেছিল। তাকে ভয় দেখাবার কয়েকদিন পরে সে হরিপদকে বলে, "মহালয়ার দিন রাত বারোটার সময় যদি ওই কবরের ওপর বসে থাকতে পারো তবেই বুঝবো তোমার সাহস আছে।"

হরিপদ বলেছিল, "আমি যে বসবো তার সাক্ষী থাকবে কে ?"

সমীর বলেছিল, "কবরের ধারে একটা গাছের ডাল পুঁতে রেখে এস। পরদিন সকালে দলবেঁধে সবাই গিয়ে দেখবে।"

হরিপদ বলেছিল, "আচ্ছা।"

আমরাও সানন্দে তাতে সম্মত হয়েছিলাম।

কিন্তু মহালয়ার আগেই সমীর হঠাৎ চলে গেল।

তবুও হরিপদ বললে, "ও না থাক, আমি কথা রাখবোই। ছুটির পর ও ফিরে এলে তোরা ওকে বলিস্ যে, আমি গিয়েছিলাম।"

মহালয়ার দিন থেকেই আমাদের স্কুল বন্ধ হলো। সেদিন সকাল থেকেই আকাশে ঘন কালো মেঘ করে হাওয়া উঠ্‌লো, সেই সঙ্গে সামান্য বৃষ্টি পড়তে লাগ্‌লো।

আমরা হরিপদকে বললাম, "তুমি কবরের ধারে যাবে না ?"

হরিপদ বললে, "কথা যখন দিয়েছি, তখন যাবোই! তাতে প্রাণ থাক, চাই যাক।"

এদিকে শেষ বেলা থেকেই মেঘ আরও জমাট বেঁধে আকাশ ছেয়ে রইলো। পৃথিবীতে পড়ল তার কালো ছায়া। গাঁয়ের পথ-ঘাট তাতে একেবারে মুছে গেল। কখন দিন গেল, রাত এল, কেউ বুঝতে পারলো না। সারাদিনই বৃষ্টি ও দমকা বাতাস। তারা যেন বেলাশেষের সঙ্গে অপেক্ষায় ছিল! হঠাৎ দুটিতে তাণ্ডব শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে উঠ্‌ল ভিজে গাছ-পালার শাখা ও পাতা আন্দোলনের একটানা শব্দ যেন উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের অবিরাম আর্তনাদ। থেকে থেকে বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো চমক ও মেঘের প্রচণ্ড গর্জন! প্রকৃতির সে রুদ্র মূর্তি দেখে ভয়ে আমাদের বুক কাঁপতে লাগ্‌লো। বাতাসের দমকায় ঘর এক একবার মড়্ মড়্ করে দুলে ওঠে। গাছের ডালে-পাতায়, ঘরের চালে, মাটিতে বৃষ্টির চট্‌পট্ শব্দ; জঙ্গলে, ডোবায়, পুকুরে, খানায় ভেকের উল্লাস-চীৎকার; বাইরে ঘরের ভিজে দাওয়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে শুয়ে কুকুরের কান্না—সব মিলে এমন একটা অবস্থায় সৃষ্টি করলো যে, হরিপদর কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলাম! এই রাতে ও যদি কথা না রাখে,

ওর দোষ নেই। যদি রাখে, ও অসাধারণ ছেলে। ওর সাহস আমাদের অনুকরণীয়। ওর কাছে কোথায় লাগে নেলসন!

"কিন্তু হরিপদ পারবে কি?" বসে বসে এই কথা ভাবছি। সময় সেই সাংঘাতিক ক্ষণটির দিকে পলে পলে এগিয়ে যাচ্ছে আর বৃষ্টি বাতাসের বেগ আসছে কমে। কিন্তু বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের গর্জন চলছে সমানে।

শেষে সেই সাংঘাতিক ক্ষণটি ঢং ঢং করে ঘড়িতে বেজে উঠলো এবং তার খানিক পরেই একটা ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি, কয়েকটা আলো হরিপদদের বাগানে ঘোরাফেরা করছে। গোলমালটা আসছে সেদিক থেকেই।

অভিভাবকদের নিষেধ উপেক্ষা করে আমরা ছুটলাম সেদিকে। অভিভাবকদেরও কেউ কেউ চললেন আমাদের সঙ্গে।

গিয়ে দেখি, আমাদের কয়েকজন সঙ্গী, জন কতক প্রতিবেশী ও হরিপদের অভিভাবকেরা সেখানে উপস্থিত। কয়েকজন হরিপদকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসছেন আর সে চোখ বুজে গোঁ গোঁ করছে।

একজন সভয়ে বললেন, "ওখানে কঙ্কাল এল কি করে?"

বিদ্যুতের ও লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, ভাঙা কবরটির গায়ে ঠেসান দিয়ে একটি মনুষ্যকঙ্কাল এক হাত তুলে বসে আছে।

আর একজন বললেন, "শয়তান জব্দ হয় নিজেরই শয়তানীর প্যাঁচে।" হরিপদর কিন্তু চেতনা নেই।

তাকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। তখন থেকে সে সেই যে ভুল বকতে আরম্ভ করলো এবং তার যে জ্বর এল তা যতদিন সে বেঁচে ছিল সে সময়ের মধ্যে একটি বারের জন্যেও বিরাম হলো না।

পরদিন লোকে দেখলো, কঙ্কালটি কিছুদূরে একটি খাদে পড়ে আছে।

হরিপদ ছিল পিতৃমাতৃহীন ও দুরন্ত। তবুও তার মৃত্যুতে সকলেই ব্যথিত হলেন। আমরা বহু চেষ্টা করেও জানতে পারলাম না, হরিপদ যে সেই রাত্রে কবরের কাছে গিয়েছিল, তা তার অভিভাবকেরা জানতে পারলেন কি করে।

কিন্তু কিছুদিন পরে খুব অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল, ঐ কঙ্কালটি সমীরের বাবার। তিনি ডাক্তারি পড়বার জন্যে ওটি কিনেছিলেন।

কিন্তু সমীর আর আমাদের গাঁয়ে কোনদিন ফিরে আসে নি। তারপর থেকে আমরাও কোদালচাঁচি গাঁয়ের নাম কোনদিন মুখেও আনতাম না।

মিণ্টুর ছবি

মিণ্টুর দাদা ছবি আঁকে। কী সুন্দর! পদ্ম, হাঁস, মানুষ, রাজা-রানী, আরও কত কি!

মিণ্টুও একদিন দাদার ছবি আঁকবার সাদা কাগজ কলম আর কালি নিয়ে ছবি একখানি আঁকলো।

ছবির বিষয় হলো, 'মা তার ছোট্ট বোন মিনুকে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্চে আর সামনে চুপ করে বসে আছে পুষি।' ছবিখানি কী সুন্দর হলো! মিণ্টু ছুটে গেল মাকে দেখাতে। মা তখন ও বাড়ির বুড়ী মাসীর সঙ্গে বারান্দায় বসে গল্প করছেন আর চুল শুকোচ্ছেন।

মা ছবি দেখেই বললেন, "এ কাগজ তুই কোথায় পেলি, অ্যাঁ? রঞ্জনের বুঝি?"

মিণ্টু বললে, "ছবিখানা সুন্দর হয়নি মা? বল না?"

"রঞ্জনের দরকারী কাগজ-পত্র নষ্ট করচো?"

"নষ্ট করলাম বুঝি? ছবি এঁকেচি তো! সুন্দর হয় নি?"

"ছাই হয়েচে। ভূত আঁকা হয়েচে। সে এসে তোমায় কি করে দেখো! শিগ্‌গির রেখে এস তার কলম। আর কখ্‌খন ওতে হাত দিয়েচো কি মজা দেখবে।"

বুড়ী মাসী বললেন, "আহা! কেন বকচো বাছা! ও কি বোঝে? দেখ তো মুখখানা কেমন হয়ে গেল!"

মিণ্টু কাঁদ-কাঁদ মুখ করে ফিরে এলো। এত সুন্দর ছবিখানা! মা বললেন, "ভূত আঁকা হয়েচে! ভূত কি এই রকম দেখতে? সে দাদার চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ছবিখানা রেখে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, রাতের বেলা চিলেকোঠায় এইরকম ভূত ঘুরে বেড়ায়? ও দিক্‌কার বেলগাছে যে ভূতটা থাকে সে কি এই রকম? সে ভূত এঁকেচে?

পাশের ঘরে দিদি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছিল।

মিণ্টু সেখানে গিয়ে দিদির পাশে দাঁড়িয়ে তার সামনে বইয়ের ওপর ছবিখানি রাখতেই দিদি খিঁচিয়ে উঠলো, "কি হচ্চে? নিজেও পড়বে না, অন্যকেও পড়তে দেবে না!"

"লক্ষীটি দিদি! দেখ না ভাই—"

—"কি দেখবো?"

"ছবিখানা কেমন হয়েছে?"

"বাঁদর হয়েচে ! যা, ভাগ্—"বলে ছবিখানা ছুঁড়ে মেঝেয় ফেলে দিয়ে আবার একমনে পড়তে লাগলো—"দূষিত জল পান করিলে টাইফয়েড, আমাশা, গলগণ্ড বা কৃমি প্রভৃতি রোগ হয়।"

মিন্টু কাঁদ-কাঁদ মুখে ছবিখানা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। মা বললেন, ভূত ! দিদি বললে, বাঁদর ! বাঁদর যে হয় নি তা সে জানে। কারণ, সামনের পানওয়ালার যে বাঁদরটা আছে, রাস্তায় যে বাঁদর খেলা দেখায় সে এ রকম দেখতে নয়। চিড়িয়াখানার বাঁদরের চেহারার সঙ্গেও এর মিল নেই।কিন্তু এ তো মা, তার ছোট বোন মিনু আর পুষি। কেউই তার মনের কথা বুঝ্তে পারচে না !

সেদিন রবিবার। বাবা বৈঠকখানায়। সে ছুটলো সেখানে। কেউ যা বলতে পারে না, বাবা ঠিক তার উত্তর দেন। তারও সব প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে থাকেন বটে তবে দু-একটার উত্তর দিতে পারেন না। যেমন, 'বাঘ কুমড়ো খায় কিনা।' 'হাতী পাঁটা খায় না কেন ?' 'উইচিংড়ি চিংড়ির কে হয় ?'—সেদিন এসব প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন নি।

সে গিয়ে দেখলো, বাবা একমনে একখানি মোটা বই পড়চেন।

সে পাশে দাঁড়িয়ে ডাকলো, "বাবা !"

বাবা অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, "অ্যাঁ !"

মিন্টু বইয়ের ওপর ছবিখানা রেখে বললে, "বাবা, দেখ তো ছবিখানা কেমন হয়েচে ?"

"ছবি ? কে এঁকেচে ?"

"আমি।"

বাবার ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি দেখা দিল ; জিগ্যেস করলেন, "কি এঁকেচো ?"

"এই মা, এই মিনু, এই পুষি। মা মিনুকে দুধ খাওয়াচ্চে আর পুষি বসে বসে দেখচে—।" বাবা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

"কেমন হয়েচে ?"

"কেমন হয়েচে ? কিন্তু দুধের বাটি কৈ ?"

"ওঃ ! ভুলে গেচি।" বলেই খপ্ করে বাবার লাল-নীল পেনসিলটা তুলে নিয়ে নীল দিয়ে একটি গোল এঁকে বললে, "এই যে—"

বাবা আবার হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, "মাকে দেখাও গে—"

"মাকে দেখিয়েছিলুম, মা বললে, "ভূত হয়েচে", দিদি বললে, "বাঁদর হয়েচে"। ভাল হয়নি বাবা ?"

"তুমি দাদার কাছে ছবি আঁকা শিখ—"

"বল না, ভাল হয়েচে কি না?"

"দাদাকে দেখিও—এখন যাও।" বলে বাবা তার গাল টিপে আস্তে পাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। অমনি দাদার ঘর থেকে হাঁক এল, মিন্টু—এই মিন্টু—আবার আমার জিনিষে হাত দিয়েচিস্?"

মিন্টু আবার বৈঠকখানায় ঢুকে বাবার পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

স্যানডাল চট্ চট করতে করতে বৈঠকখানায় ঢুকে দাদা বললে, "আমার চাইনিজ্ ইংকের শিশিটা ভেঙেচিস্, কলমটা ভোঁতা করেচিস্, কাগজ ছিঁড়ে নিয়েচিস—তোকে না বারণ করেচি আমার জিনিষে হাত দিতে? কেন এ সব করেছিস্?"

মিন্টু ফ্যাল-ফ্যাল করে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, "তোমার মতো ছবি আঁকছিলুম।"

দাদা হঠাৎ মুখে রুমাল পুরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মিন্টুও হতভম্বের মতো ঘর থেকে গেল বেরিয়ে।

তার ধারণা হলো, ছবিখানি খারাপ হয়েচে। সে আর দাদার ছবি আঁকবার কিছুতে হাত দেবে না।

কিন্তু পরদিন থেকে দেয়ালে, নিজের পড়ার বইয়ে, খাতায়, বাবার দামী বইয়ের সাদা পুস্তানিতে মিন্টুর আঁকা নানা বিষয়ের ছবি দেখা যেতে লাগলো। এজন্যে কেউ তার প্রশংসা করলে না, বরং কানমলা, চাঁটি ও বকুনি দিতে লাগলো।

শেষে তার বাবা দাদাকে ডেকে বললেন, "ওতে হবে না। ওকে আঁকতে শেখা—"

দাদা নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে অগত্যা তাতেই রাজী হলো। মিন্টুরও ছবি ক্রমে বহির্জগৎ থেকে খাতায় গিয়ে ঢাকা পড়লো এবং এখনও সেখানে সত্যিকারের ছবির রূপ নিচ্চে।

মা তাই-ই দেখে একদিন বললেন, "বাঃ! মিন্টু কি সুন্দর ছবি এঁকেছে।"

মিন্টু একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে মাথা নিচু করলো। তাই বলে সে ছবি আঁকা শেষ করে নি।

চন্দনপুরে

এক টাকা সাড়ে তিন আনার গোলমাল !

'আপ' ও 'ডাউন' ট্রেনে টিকিট বিক্রয় পাওয়া যাচ্ছে, ছাপ্পান্নখানা ; কিন্তু মাশুল বাবদ রয়েছে মোট একষট্টি টাকা দশ আনা।

নতুন বদলি হয়ে এসেই গুণে'গার ! স্টেশনটি আবার এমন যে উশুল করবার যো নেই। পান আর মাছে কি হবে ? তা ছাড়া এখন খাবার লোকও ত—

খাতা থেকে মুখ না তুলেই 'ছোটবাবু' শ্রীরঞ্জন চৌধুরী হাঁকলেন—"এই ফত্রিঙ্গা—ফত্রি—উঃ ! যেমন মশার ডাক, তেমনই ডাকছে বেটার নাক।"

ছোটবাবুর তামাক খাবার অভ্যাস আছে।

পিছনে তার-ঘরের দরজায় ফত্রিঙ্গা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একে শীতকাল ; তার ওপর রাত তখন দুটো। কিছুক্ষণ আগে ডাকগাড়ি 'পাস্' হয়েছে ; তারপরের মালগাড়িখানাও বিঘাটি স্টেশন ধরে-ধরে। কাজেই ফত্রিঙ্গা নিশ্চিন্ত।

ছোটবাবু একবার ভাবলেন, নিজেই তামাকটুকু সেজে নেন। কিন্তু ইচ্ছাটা প্রবল হলো না। আবার খাতায় টিক দিতে আরম্ভ করলেন।

"এই ত টিকিটের হিসেব দিব্যি মিলে যাচ্ছে।" সহসা ছোটবাবুর শুষ্ক মুখের ওপর দিয়ে একটু বিষাদের হাসি খেলে গেল। মনে মনে বললেন—"তখন কি জানতাম, একদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট্ স্টেশন মাস্টার হয়ে চন্দনপুর স্টেশনেই বদলি হয়ে আস্‌বো ? ওঃ। সে কত বছর আগেকার কথা। তখন এখানে এমন বাঁধানো প্ল্যাটফরম্, পাকা স্টেশনঘর, ওয়েটিংরুম—কিছুই ছিল না। মাঠের মাঝখানে একখানা ছোট খড়ের ঘর, তার আলকাতরা মাখানো চাটাইয়ের বেড়া। পিছন দিকে পাশাপাশি দুটো খাদ জলে ভরা। তাদের মধ্যে কল্‌মি আর হেলঞ্চ বন। পাড়ের ওপর কাশের ঝাড়। খাদের ওপারে রেল বাবুদের কোয়াটারস্ ;—দুটো খাদের মাঝ দিয়ে সেদিকে যাতায়াতের কাঁচা পথ। তার শেষে একটা বাঁকা নিম গাছ। প্ল্যাটফরম্‌টা ছিল এত নিচু—ট্রেন থেকে

নামবার সময় কয়েকবার ত পড়তে পড়তে রয়ে গেছি। সে সব দিন আর নেই! হাঃ—হাঃ—অক্ষয় আর আমি—”

ফত্রিঙ্গা কম্বলটা গায়ে-মাথায় জড়িয়ে নিতে নিতে বললে—“কি বলছেন? ইস্‌পিস্যাল আস্‌ছে?”

শ্রীরঞ্জনবাবুর চমক ভাঙল; বল্‌লেন, “না। একটু তামাক দিবি বাপ?”

শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ির কথা মনে পড়ল।....

স্টেশন থেকে একটা কাঁচা-পাকা সড়ক চলে গেছে সোজা উত্তরে। সড়কটার দুপাশে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল। তার মাঝে মাঝে চারা খেজুর, শিমুল, আম ও বাবলা গাছ নানা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের মাঝে দুটি খাল, গরুর গাড়ির চাকায় তৈরী হয়েছে। দুপাশে মাঠ, মাঠের শেষে গ্রাম। সড়ক ধরে ক্রোশ দেড়েক ভাঙলেই চন্দনপুরের বিল। বিলটা শেষ হয়েছে একবারে অক্ষয়দের গ্রাম মালাড়ার পূবে। ঐ মালাড়াতেই ছিল, শ্রীরঞ্জনবাবুর মামার বাড়ি।

ফত্রিঙ্গা তামাক এনে বল্‌লে—“নিন বাবু।”

শ্রীরঞ্জনবাবু হুঁকোটা নিয়ে নলচে ধরে একমনে টান্‌তে লাগলেন; তাঁর বাঁ হাতখানা রইল খাতার ওপর। ক্রমে ধোঁয়ায় তাঁর মুখের চারধার ঢেকে গেল।

“অক্ষয়টা—হাঃ—হাঃ—একবার আখ-ক্ষেতে আখ ভাঙতে গিয়ে—কি রে অক্ষয়?—তুই? এই রাতে—? বস্—বস্। সে কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বি?”

শ্রীরঞ্জনবাবু আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করলেন—“কবে এসেছিস?”

“দুটো রাতও কাটেনি। তোর চিঠি পেয়েছিলাম। যা গোলমাল গেল ক’দিন! উত্তর দেওয়া হয়নি। দেখদেখি ভাই, কি গ্রহের ফের। সেই চন্দনপুর স্টেশনেই এলাম ছোটবাবু হয়ে? তারপর কি খবর? কিন্তু এই রাতে তুই—?”

অক্ষয়ের আপাদ-মস্তক ঢাকা, কেবল মুখখানা খোলা। তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দুটোকে আরও উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে; বললেন—“রঞ্জন, তোর চুল সবই পেকে গেছে—”

“পাক্‌বে না? কত বয়স হলো বল দেখি? তা ছাড়া—কিন্তু তোর চেহারা বেশ আছে। বস্‌ছিস্ না কেন?”

অক্ষয় টেবিলের কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে সরে গিয়ে টিকিট

বাক্‌সের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। শ্রীরঞ্জনবাবুর মনে হলো, অক্ষয়ের ব্যবহারে আন্তরিকতা নেই, সে যেন একটু দূরে সরে গেছে ; বললেন—"তামাক খা! ওহো! আমি ভুলেই গেছি, এই বদ্ অভ্যাসটা তুই করিসনি। হ্যাঁরে অক্ষয়! বিলের ধারে বটতলায় সেই পোড়ো মন্দিরটা এখনও আছে? মাঠের ধারের সেই আমগাছ ক'টা? আমার মামাদের ভিটে?"

অক্ষয় ঘাড় নেড়ে জানালেন—হাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন— "তুই সপরিবারে এসেছিস্?"

"নাঃ। নতুন জায়গা—সব দেশে। আমাদের দেশের কথা তোর মনে পড়ে?"

"হাঁ। সেই চিঁড়ে, গুড়, নারকোল আর সকলের ওপর কাকীমার যত্ন এখনও ভুলতে পারিনি।"

মায়ের কথা মনে পড়ে গেল ; শ্রীরঞ্জনবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন—"যখন দেশে যাব ওদের আনতে আসবার সময় তোর জন্য চিঁড়ে, গুড়, নারকোল এনে মাল্লাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসবো—"

"কিন্তু আমি ত আর ওখানে নেই।"

"সে কি? কোথায় আছিস্? তোর স্ত্রী ছেলে-মেয়ে—?"

"তারা সকলেই আছে! কেবল আমিই চলে এসেছি—"

"এই বয়সে রাগ করে বিবাগী হয়েছিস? কার ওপর রাগ—স্ত্রীর না ছেলের ওপর?

"কারো ওপরেই আমার রাগ নেই। আর থাকতে পারলাম না।"

"কোথায় যাচ্ছিস্? এ কি ছেলেমানুষী? সে হবে না—টিকিট ত আমার হাতে। ছাড়ছি না। বাড়ি না যাও, এখানে থাক। হতভাগারা এল বলে তোর খোঁজে। আমি নিজে যাব তোর সঙ্গে—"

অক্ষয় একটু হাস্‌লেন ; তাঁর চোখে-মুখে নির্লিপ্ত ভাব।

শ্রীরঞ্জনবাবু বললেন—"কোন গুরু পাকড়েছ বুঝি? তিনি কানে মন্ত্র দিয়েছেন—কা তব কান্তা?"

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল—ঠং-ঠং-ঠং! বাইরে কোথায় কাকও ডাকছে। দূরে রেল-লাইনের ধার থেকে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল—রাত শেষ হয়ে এল।

"দাঁড়া ভাই। কাজটি সারি—ভোরের গাড়ির সময় হলো" বলে ছোটবাবু তাড়াতাড়ি উঠে হাত থেকে হুঁকোটা টেবিলের পায়ার গায়ে

হেলান দিয়ে রেখে টেলিফোনের কাছে গেলেন। তারপর ফোন ধরে হাঁকলেন "হ্যাঁ—কি?—লেট হয়নি? আসছে? ওরে ফত্রিঙ্গা—এই ফতে! গাড়ির ঘণ্টা দে।"

সেখানকার কাজ সেরে টিকিটবাক্সের দিকে যেতে যেতে বললেন—"তারপর? ব্যাপারটা কি খুলে বল্ত।" এবং অক্ষয়ের দিকে চোখ তুলে দেখেন, সেখানে অক্ষয় নেই! এদিকে-ওদিক তাকালেন, কোথাও তাঁকে দেখতে পেলেন না। দেখলেন, বাইরে যাবার দরজার কাছে বসে ফত্রিঙ্গা তার বিছানাটা গুটিয়ে নিচ্ছে! শ্রীরঞ্জনবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাক্‌ল না। ঘরের দুটি দরজা, দুটি জানালাই ত বন্ধ। টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটাও আঁটা।

শ্রীরঞ্জনবাবু ফত্রিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবুটি কোথায় গেলেন দেখেছিস্?"

"কৌন বাবু?"

"যে বাবু একটু আগে এসেছিলেন?"

"কোনো বাবু ঘরমে ঘুষা নেহি—"

শ্রীরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি তারঘরের মধ্যে গিয়ে ঘরখানা পরীক্ষা করে এলেন। সেখানেও অক্ষয় নেই।

ফত্রিঙ্গা ঘণ্টা দিচ্ছে; পয়েন্টস্‌ম্যান ফাগু মস্ মস্ কর্‌তে কর্‌তে এসে সিগ্‌নালের তালার চাবি নিয়ে গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু অন্যমনস্কের মতো টিকিট বাক্‌সের ডালাটা খুল্‌লেন, টিকিট দেবার ঘুলঘুলিটার ঢাকা সরিয়ে নিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান দিয়ে একখানা কালো হাত ভেতরে এল, ওপাশ থেকে হাতের মালিক বললে—"বাবু, ষষ্ঠীপুর সাড়ে তিন খানা—"

তারপরই শোনা যেতে লাগ্‌ল টাকা-পয়সার শব্দ, টিকেটে ছাপ দেবার আওয়াজ—ঘটাং—ঘটাং—ঘটাং—

হাতের মালিক বল্‌লে—"বাবু! দুটো পয়সা কম নেন্। গরীব মানুষ!"

"ধ্যৎ! কৈ হে আর কে আছে? এই! সরে যাও ওখান থেকে।"

টিকিট দিতে দিতে শ্রীরঞ্জনবাবু নিজের মনেই বলে উঠলেন—"তখন নিশ্চয়ই আমার তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলাম।"

স্থির করলেন, অক্ষয়কে তাঁর আগমন-সংবাদ জানিয়ে চিঠি দেবেন। তবুও তিনি মনে শান্তি পেলেন না।

ক্রমে টিকিট দেওয়া শেষ হলো। ওদিকে তখন পুব দিক ফরসা হয়ে এসেছে। গাড়ির হুইসিল শোনা গেল।

শ্রীরঞ্জনবাবু কম্ফর্টারের ওপর মাথায় কালো গোল টুপি চড়িয়ে কলম হাতে প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ি হোম-সিগন্যাল পার হচ্ছে। ঐ ঝিকমিক করছে ইন্‌জিনের সবুজ আলো।

আবার ঘন্টা পড়ল দেখতে দেখতে গাড়ি এসে থাম্‌ল। যাত্রীরা উঠছে, নামছে, ছুটছে, চীৎকার করছে; দরজা বন্ধ হচ্ছে, খুলছে। চারধারে ব্যস্ততা ও শব্দ। শ্রীরঞ্জনবাবু গার্ডের গাড়ির কাছ থেকে মাথার ওপর হাত নেড়ে হাঁক্‌লেন—"ঘন্টা—।"

ঘন্টা পড়ল, গার্ড হুইসিল দিতে দিতে লণ্ঠন দোলাতে লাগ্‌ল, ইন্‌জিন হুইসিল দিয়ে সশব্দে চল্‌তে আরম্ভ করল। শ্রীরঞ্জনবাবু জন দুই যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ষ্টেশন ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

এদিকে পূবের আলো ততক্ষণে আকাশ বেয়ে পশ্চিমে পৌঁছেচে। নিচের অন্ধকার গলে পাতলা হয়ে উবে যাচ্ছে; কিছুদূরের মানুষকে বেশ চেনা যায়।

শ্রীরঞ্জনবাবু দেখলেন, একটি যুবক, তার পাশে একটি কিশোরী, তাদের পাশে একজন লোক আসছে। লোকটার মাথায় বিছানা ও ট্রাঙ্ক। তারা সেই ট্রেন থেকেই নেমেছে। তারাও স্টেশন ঘরের দিকে আসছিল। ঘরের গায়েই ষ্টেশন থেকে বা'র হবার ফটক।

তারা তিনজনে শ্রীরঞ্জনবাবুর কাছাকাছি হতেই তিনি তাদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। দেখেই বলে উঠলেন—"অক্ষয়ের জামাই না? ঐ ত ওর পাশে কমলা। আর ঐ যে ওদের রাখাল, মধু। নিশ্চয়ই অক্ষয় এসেছে। আমি স্বপ্ন দেখি নি। কিন্তু সে পালাল কেন?" তারপর উঁচু গলায় বল্‌লে—"বাবাজী যে? ভাল ত? মা কমলা!'

অক্ষয়ের জামাতা বাবাজী ও মেয়ে কমলাও এবার তাঁর দিকে ভাল করে তাকালে।

জামাতা বাবাজী নমস্কার করে বললে—"আজ্ঞে হাঁ।"

কমলা তাঁর মেয়ে গৌরীর বয়সী। গৌরী নেই! তিনি বললেন—"কেমন আছ মা? তোমার বাবা ত—"

কমলা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখলেন, তার দুচোখে জল টল টল করছে। তিনি বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে বলে উঠলেন—"তোর চোখে জল কেন মা?"

জামাতা বাবাজী বল্‌লে—"জানেন না? সাত দিন হ'ল শ্বশুর মশায় স্বর্গারোহণ করেছেন—"

"কি?"

"সাত দিন হ'ল মারা গেছেন—"

"কিন্তু—আমি যে"—শ্রীরঞ্জনবাবুর মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বার হলো না। ক্ষণিকের জন্য তিনি স্মৃতির মাঝে চেতনা হারিয়ে ফেল্‌লেন। সহসা ফত্রিঙ্গার ডাকে ফিরে দেখেন, জামাতা বাবাজীরা তিনজনে গেট পার হয়ে, পথের ধারে একখানা ছই-ওয়ালা গরুর গাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না; স্টেশন ঘরের দিকে চলতে লাগলেন।

সেদিন কোয়াটারসে যাবার আগে তিনি সেই এক টাকা সাড়ে তিন আনার হদিস্ পেলেন। কিন্তু অক্ষয়ের সঙ্গে নিশীথে সাক্ষাৎ—স্বপ্ন কি সত্য, তার মীমাংসা করতে পারলেন না।

———

উপন্যাস

সুমন্ত

১

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে

ঘটনাটির পর বিশটি বছর চলে গেছে—

যেখানে ঘটনাটি ঘটেছিল সেই গ্রামের নাম হরিশপুর।

তার কোল দিয়ে বয়ে চলেছে মধুমতী; এক মাইল দূরে রেলপথ।

নদী একে-বেঁকে গিয়ে মিশেছে সাগরে; রেলপথটি চলে গেছে দূর-দূরান্তরে। একটা পাকা সড়ক গেছে গ্রাম থেকে মাইল দশেক দূরে সে-ই শহরে এবং সেখান থেকে আরও দূরে কোথায়!

সপ্তাহে দুটো দিন হাট, হাটবারে, হরিশপুর বেশ সরগরম হয়ে ওঠে, বাকী সময়টা যেন ঘুমোয়। এমন ঘুম যে কতকাল ধরে ঘুমোচ্ছে কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু মাস তিনেক আগে—হাঁ তিন মাস হবে—শহর থেকে জন কয়েক বাবু, একটা মাড়োয়াড়ী ও একজন সাহেব চারখানা মোটর গাড়িতে চড়ে কয়েকদিন ধরে গ্রামে আনাগোনা করেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল আমিন, কুলি, মাপের চেন ও আরও কি সব যন্ত্রপাতি।

আমিন নদী ও সড়কের মাঝে মস্ত আমবাগানটা ও পতিত জমিগুলো মেপে কাগজে কি সব লিখে নিয়েছিল। তারপর একদিন নদী-পথে এল রাজহাঁসের মতো একখানি ছোট শাদা মোটর-লানচ।

লানচ থেকে সাহেবী পোশাক পরা জন তিনেক লোক ঘাট থেকে একটু দূরে নেমে ছিল। তাদের চোখে ছিল রুপালী ফ্রেমের বড় বড় চৌকো কালো চশমা, যেন জানলা. চেহারা সুন্দর। কিন্তু তারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, কি সাহেব তখন তা জানা যায় নি। তাদের সঙ্গে ছিল জন কয়েক বাঙ্গালীবাবু। তারা সকালে গ্রামের বাজার, রাস্তা, সেই জরিপ-করা জায়গা ও বাগানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে আবার লানচে গিয়ে উঠে টেবিলে খেতে বসে ছিল। সে যে কত রকমের খাবার তা সুমন্ত ভুলেই গেছে। অত রকমের খাবার সে জীবনে দেখেনি; সে সবের নামও জানে না।

তারা এসেছিল সকালে, ফিরে যেতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দিনটা তার

বেশ ভাল করেই মনে আছে। সেদিন তার মায়ের হয়েছিল খুব জ্বর; বাবা গিয়েছিল শহরে। মা উঠে যে তার জন্যে একমুঠো চাল ফুটিয়ে দেবে, সে শক্তিও তার ছিল না। খিদেয় তার পেট হু হু করে জ্বলছিল।

সুমন্ত গ্রামের উপোসী কুকুরের মতো তাদের খাবার-ভরা ডিশগুলোর দিকে তাকিয়ে ডাঙায় বসে ছিল। তার মতো মলিনবেশী আরও অনেকে ছিল বসে বা দাঁড়িয়ে। লান্‌চের কেউ তাদের কারও সঙ্গে একটি কথাও বলে নি; তারাও বলতে সাহস করে নি।

সুমন্ত সেই সাহেবী পোশাক ও কালো চশমা-পরা একজনের একটি কথায় বুঝেছিল, লোকটি বাঙালী। তিনি জমাট দইয়ের মতো কি যেন চাম্‌চে করে তুলে খেতে খেতে বলে উঠেছিলেন,—"খাশা হয়েছে!"

তার কিছুক্ষণ পর লান্‌চখানা জল কেটে, ঢেউ তুলে উজানে চলে গেল। তার পিছনে জলের বুকে পড়ে ছিল শাদা ফেনার দাগ। অনেকক্ষণ ধরে শোনা গিয়েছিল ইঞ্জিনের ধুক্‌-ধুক্‌ শব্দ। একবার লান্‌চখানা হঠাৎ একটা সিটি দিয়েছিল। তখন তার সামনে এসে পড়েছিল একখানি ডিঙি। সিটিটাকে মনে হয়েছিল, শিয়ালের ডাকের মতো—"হু-উ-উ-উ!" নদীর এ পারে ওপারে উঠেছিল তার প্রতিধ্বনি। তারপর কয়েকদিন নিশুতি রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে নদীর ধারের শিয়ালের ডাক শুনে মনে করেছিল সেই লান্‌চখানা বুঝি আবার ফিরে এল। ঐ রকমের একখানা লান্‌চ যদি সে নদীতে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত! নদীপথে বেড়াতে তার ভারী ভাল লাগে।

লান্‌চ যারা তৈরি করে, "ওঃ! তারা কি চালাক!" সে শুনেছে, লান্‌চ তৈরি করে সাহেবরা। তাদের গ্রামের কেউ কি পারে না? সতীশবাবুর ছেলে রূপেন তিনটে পাশ। সেবার হাকিমের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কয়েছিল। সে-ও পারে না?

সে মোচার খোলা দিয়ে কয়েকদিন লান্‌চ তৈরির চেষ্টা করলে। তার আকারটা লান্‌চের মতো একটু হোল বটে আর কিছুই হোল না। ব্যর্থতার জন্যে সে মনে মনে বেদনা পেল। কিন্তু সে ব্যথা হোল স্বল্পস্থায়ী। তারপর এলো নানা রকমের যন্ত্রপাতি, ট্রাক লরি ও বহু লোক জন। গ্রামের বাইরে বাগানের বড় গাছগুলো কাটবার, জঙ্গল পরিষ্কার ও উঁচু-নিচু জমি সমান করবার যন্ত্রপাতির অবিরাম শব্দে, লোকের কোলাহলে ও অদ্ভুত ধরনের গাড়ির ব্যস্ততায় সে ব্যথা গেল ভুলে। পেট্রলের গন্ধ তার নাকে সেই প্রথম লাগলো।

ক্রমে তাদের ও আশ-পাশের আরও অনেক গ্রামের লোক এল মজুর হয়ে। নদীপার থেকেও এল অনেকে। আর এল দেশওয়ালীরা। যেমন তাদের ভাষা, তেমন তাদের চেহারা, আর সেই রকম তাদের মেজাজ। হরিশপুর কুম্ভকর্ণের মতো জেগে উঠে মহাকাণ্ড বাধিয়ে দিলে। রাতেও জ্বলতে লাগলো বড় বড় আলো। রাত হয়ে গেল একেবারে দিনের মতো! 'ইলেকটিরি' আলো সে দেখলে সেই প্রথম।

সেখানে এক সার ছোট-বড় তাঁবু পড়ে গেল। দরমার বেড়া দেওয়া ও ঢেউখেলানো টিনের চালের লম্বা লম্বা ঘর তৈরী হোলো। তার ওধারে দূরে উঠলো ইটের বড় বড় পাঁজা। শহর থেকে আসতে লাগলো কত কি জিনিস! নদী-পথেও এল ঢাউস নৌকো-বোঝাই মাল-মশলা। সুমন্তর বাবাও মজুর খাটতে লাগলো।

কিন্তু তার আগে ঘটলো এক মজার ব্যাপার। সেই সাহেবরা আবার একদিন এলেন। এবার তাঁরা এলেন মোটরে; সঙ্গে সুমন্তর বয়সী একটি ছেলে। ছেলেটির পরনে খাকী রঙের সাহেবী পোশাক। তাতে ছেলেটিকে মানিয়েছিল চমৎকার! যেমন তার রঙ, তেমনই তার মুখ-খানা। সে চালাক, চটপটেও খুব।

ছেলেটা মোটর থেকে নেমেই ছুটলো নদীর ধারে। ও বোধ হয় কোন দিন নদী দেখেনি। কৌতূহলবশে সুমন্তও গেল তার পিছু পিছু।

ছেলেটা যে সেদিকে গেল বড়রা কেউ তা লক্ষ্য করলো না। সকলেই নিজের কাজে ব্যস্ত; আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলো, একজন বাঙালী সাহেবকে দেখে। তাঁকে খুশী ও তাঁর হুকুম তামিল করতে, তাঁর কথা শুনতে সকলেই উৎসুক। তিনি যার দিকে তাকিয়ে একটু হাসছিলেন বা যাকে একটি মিষ্টি কথা বলছিলেন, সে যেন মাটিতে শুয়ে পড়ছিল। তিনি একবার একজনের পিঠ চাপড়ে কি বলতেই লোকটা যেন কেমন হয়ে গেল!

সুমন্ত এই সব দেখতে দেখতে ছেলেটির পিছু পিছু নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

ছেলেটা পাড়ের ওপর থেকে পায়ে পায়ে তৈরী সরু আঁকা বাঁকা পথটা দিয়ে পাড়ের একেবারে নিচে জলের ধারে নেমে গেল।

জ্যৈষ্ঠের শেষ। মধুমতীতে এসেছে নতুন জল। জলের রঙ হয়ে উঠেছে সন্ন্যাসীর কাপড়ের মত গেরুয়া। দূর-দূরান্ত থেকে জলে কত কি ভেসে আসছে, আবার চলে যাচ্ছে দূরে। কত রকমের নৌকো চলাচল

করছে; কত রকমের, কত রঙের তাদের পাল। রাতের বেলায় জলের টান আরও বাড়ে। জল তখন কল-কল, ছল-ছল করে ডেকে ওঠে; ঝুপ-ঝাপ শব্দে পাড় ভেঙ্গে পড়ে। নদীর ধারেই সুমন্তদের ঘর। সে শোনে হুস করে শুশুক নিঃশ্বাস ছাড়লে, বড় বড় মাছ লেজের ঝাপটা মারলে; চাঁদনী রাতে নেয়েরা গান গেয়ে বা বাঁশি বাজিয়ে নৌকো বেয়ে ভাটিতে চলে গেল। আবার যখন নদী-পারে গাছের মাথায় মেঘ করে মিশকালো, তার বুকে বিদ্যুৎ ঝিলিক হানে, ধুলোবালি, খড়কুটো, গাছের পাতা উড়িয়ে হু হু শব্দে ঝড় ছুটে আসে, তখন মধুমতীর জল—

ছেলেটা জিজ্ঞেস করলে,—"এই, নদীতে কুমীর আছে—"

হঠাৎ সুমন্তর চমক ভাঙলো।

সুমন্ত জবাব দিলে—"কুমীর? হাঁ।"

—"তুমি দেখেছো?"

—"হাঁ। মস্ত মস্ত—ঘোড়ার মতো মুখ, লেজে বড় বড় কাঁটা, গায়েও কাঁটা। সেবার মণ্ডলদের মেজ বউকে কুমীরে ধরেছিল; একবার আমাদের একটা দুধেলা গরুকেও লেজের ঝাপটা মেরে ফেলে দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। তিন চার রকমের কুমীর আছে।'

ছেলেটা ভয়ে চমকে জলের ধার থেকে সরে আসতে গিয়েই তার পা আঠাল মাটিতে গেল পিছলে। সঙ্গে সঙ্গে সে সড়াৎ করে গিয়ে পড়লো জলে।

পাড়ের ওপর থেকে কারা যেন চীৎকার করে উঠলো,—"গেল গেল।"

সুমন্ত যেন কলের পুতুল। কে যেন হঠাৎ তার ভিতরকার কলকব্জা টিপলে। সে নিমেষে গিয়ে পড়লো জলে ছেলেটার কাছে এবং স্রোতে টেনে নিয়ে যাবার আগেই ছেলেটির জুতোশুদ্ধ একখানা পা দু হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ডাঙার দিকে তাকে টানতে লাগলো। তারপর বাকীটুকু সম্পূর্ণ করলে সেই ডাঙায় যারা চীৎকার করে উঠেছিল তাদের একজন। তবুও ছেলেটিকে বাঁচাবার বাহাদুরীটা ষোল আনাই যদি সুমন্তকে দেওয়া যায় তাহলে সেটা মিথ্যে হয় না।

আর সিকি মিনিট দেরি হলে যে মধুমতীর স্রোতে ভেসে চলে যেত, এই দুর্ঘটনায় সে কিন্তু বিচলিত হোলো না। তবুও সুমন্তর ওপর তার কেমন একটু টান জন্মালো। সে মরে যেত এ ভয়টা যেন তার কমই। তবে ও-বয়সে প্রাণের ভয়টা কমই থাকে। কারণ, জীবনের মূল্য ও

বিপদের সবটুকু তো তখন চোখে পড়ে না। মনে হয়, সব কিছুই বুঝি খেলা ও আনন্দ—হাল্‌কা ও হাসির। সুমন্তও বুঝতে পারলো না যে, সে পাঁচ কোটি টাকার ভবিষ্যৎ মালিককে বাঁচিয়ে মস্ত একটা কাজ করেছে।

মধুমতীর মিঠে জলের সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। কেবল তার কেন? তাদের গ্রামে সব ছেলে-মেয়েই তো নদীতে সাঁতার কাটে, মাছ ধরে। যারা বড়-সড় তারা সাঁতরে মাঝ-নদীতে যায়; আবার যারা আরও বড় তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাঁতার দিয়ে চলে যায় একেবারে ওপারে মহেশতলার ঘাটে। নদীতে ডুবে মরতে সে কাউকেই দেখে নি। তবে শুনেছিল, মুখুয্যেদের এক বউ একদিন কার ওপরে যেন রাগ করে সন্ধ্যাবেলায় ডুবে মরেছিল। সেও বছর দেড়েক আগের কথা। সেই ব্যাপারে পুলিশ এসেছিল।

যাঁর ছেলে ডুবে যাচ্ছিল তাঁর কাছে ছেলেটি গিয়ে পৌঁছবার আগেই কিন্তু খবর গিয়ে পৌঁছলো। তিনি তো ছুটে এলেনই, এল আরও অনেকে। সকলেই ব্যস্ত ও ভীত। জলে ডোবার হাত থেকে সে বাঁচলেও জলে ভেজার ফল থেকে নিষ্কৃতি পাবে কি না সে এক মহা-ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। তার পা থেকে মাথা অবধি সব গেছে ভিজে। পোশাক আছে শহরের ডাকবাংলোয়। যতক্ষণ সেগুলো না পরতে পাচ্ছে ততক্ষণ ভিজে পোশাকেই তাকে থাকতে হবে। এ কি কম কষ্ট! সুমন্ত গাঁয়ের গরিব ছেলে। ওতে তাদের কষ্ট হয় না, অসুখও করে না। ভিজে কাপড়ের আধখানা পরে আধখানা তারা শুকিয়ে নেয়! গ্রামের দু'একজন এবিষয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে সাহায্য করবার প্রস্তাব করলে। তা অবশ্যই গৃহীত হোলো না। যাই হোক, দশ মাইল পথ একখানা মোটরের যেতে-আসতে লাগে বড় জোর আধ ঘণ্টা। সেই সময়টা ছেলেটা একটা ঝাঁকড়া আমগাছের ছায়ায় তার বাবার কাছে একখানি ক্যামবিসের চেয়ারে বসে তার বাবার কালো কোট চাপা দিয়ে রইলো যেন একটা মোমের পুতুল।

তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো অনেক লোক। আর, ছেলেটার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে মাটিতে ভিজে কাপড়ে উবু হয়ে বসে রইলো সুমন্ত ও তার বাবা দুঃখহরণ। ওদিকে কাজ চলছে সমানে—মড়্‌-মড়্‌ শব্দে গাছ পড়ছে, ধুক ধুক শব্দে ইঞ্জিন চলছে, মস্ত মস্ত করাত ঘস্‌-ঘস্‌ করছে, হাতুড়ি পড়ছে খটাখট, ধম্‌-ধম্‌ এবং এই সকলকে ছাড়িয়ে উঠছে

জনতার কোলাহল। সেখানে একটা কাপড়ের কলের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে—গড়ে উঠছে একটা উপনগর; আসছে এক নতুন ভাব। সেই সঙ্গে আসছে শিক্ষা, আনন্দ, ফ্যাসান, দুঃখ, অবনতি, অবিচার ইত্যাদি।

মালিক দত্ত-রায়সাহেব আরাম-চেয়ারে, আরাম করে বসে পাইপ টানতে টানতে খোশ-মেজাজে একটি গল্প বলতে লাগলেন—

'আমার দাদুর মুখে শুনেছিলাম, তাঁরা এই মধুমতী নদীতেই একবার জল-ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে কয়েকটি জোয়ান লোক ছিল, বন্দুকও ছিল, কিন্তু ডাকাতেরাও ছিল সংখ্যায় অনেক। তারা এসেছিল তিন দিক থেকে তিনখানা ছিপে। তাদের সঙ্গেও ছিল বন্দুক।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। তাঁরা একটা আলো লক্ষ্য করে সেদিকে এগোচ্ছেন। সেই সময় তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একখানা ছোট পান্‌সি। দুখানা নৌকো প্রায় পাশাপাশি চলেছে।

তাঁদের নৌকোর মাঝি পান্‌সির মাঝির সঙ্গে দু'এক কথায় আলাপ করে জানতে পারে, তারা আসছে হরিশপুর থেকে, যাবে বাদায়। পানসির মাঝির নাম বাসুদেব। হ্যাঁ, বাসুদেবই। বাসুদেব দাদুর নৌকোর মাঝিকে বলে, 'সামনের ঘোনায় আলোর কাছে নৌকো ভিড়িও না। বাঁকটা পেরিয়ে কাৎলামারির গঞ্জে ভিড়িও। সেখানে চাল-ডাল-হাঁড়ি পাবে। আমিও সেখানে রাত কাটাব।'

এই বলে সে একটু এগিয়ে গেছে কি, বাঁয়ে ঘোনার অন্ধকার থেকে একটা হাঁক ওঠে,—'নৌকো কোথা যাবে?'

কাছ থেকেই বাসুদেব বলে,—'মাঝিরপো, বল কাৎলামারি।'

দাদু বসেছিলেন ছইয়ের ওপর; বলেন, 'মিছে কথা বলার দরকার নেই। গাঁয়ের লোকদের স্বভাবই এই।'

মাঝি বলে,—'হুজুর' ওরা ডাকাত। সত্যি কথা বললে কি আর রক্ষে আছে?

এমন সময় পিছন থেকে বন্দুকের আওয়াজ হয়।

ততক্ষণে বাসুদেব তার নৌকোখানাকে নিয়ে এসে পড়েছিল দাদুর একেবারে নৌকার পাশে। সে বলে, 'কর্তা, বন্দুক যদি থাকে, আওয়াজ করবেন না। চুপচাপ বসে থাকুন। আমি যতক্ষণ আছি ভয় নেই। সহজ মানুষের মতো থাকুন।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে তিনখানা ছিপ ছুটে আসে। ছিপ থেকে কয়েকজন লোক দাদুর নৌকোয় ওঠবার আগেই বাসুদেব তাদের সাটে কি যেন বলে।

তারাও সাটে উত্তর দেয়। তারপর আর কিছু না বলে অন্ধকারে ছায়া-ছিপের মতো মিলিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে দাদু যেমন আশ্চর্য হন তেমনই ভয় পান। তাঁর ধারণা হয়, বাসুদেবও ডাকাত। সে তাঁকে ভুলিয়ে গঞ্জে নিয়ে যেতে চায়। তার বা তাদের দলের হাত থেকে তাঁর আর নিষ্কৃতি নেই।

তিনি খুব ভাল সাঁতার জানতেন। ভাবলেন, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে কূলে গিয়ে উঠবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে, এই অন্ধকারে অচেনা নদীতে, অজানা তীরভূমিতে বাঁচতে গিয়ে মরাও সম্ভব। তার চেয়ে দেখা যাক শেষে কি ঘটে।

আধঘণ্টা কি তাঁর কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই তাঁরা গিয়ে পৌঁছলেন কাৎলামারির গঞ্জে। সেখানে অনেক নৌকো, ঘাটে লোকজনও ছিল অনেক।

তাঁরা বাজার থেকে চাল-ডাল-হাঁড়ি ইত্যাদি কেনেন। বাসুদেবও রান্না-বাড়া করে খাওয়া-দাওয়া সারে।

তারপর দাদু তাকে তাঁর নৌকোয় ডাকিয়ে আনেন।

বাসুদেব আসে—লম্বা-চওড়া জোয়ান। গায়ের রং মিশকালো; কিন্তু মাথায় লম্বা পাকা চুল, মুখে কাশ-ফুলের মতো শাদা দাড়ি।

দাদু জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি আমাকে আজ ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছ। এর জন্যে কি পুরস্কার যে—'

সে দাদুকে থামিয়ে বলে, 'কর্তা, আমি কিছুই চাই না।'

'তবে তুমি আমাকে বাঁচালে কেন?'

'একটা মানুষের জান দিতে পারি না আর তাকে মারবো?'

দাদু জিজ্ঞেস করেন, 'ওরা কাৎলামারির নাম শুনে চলে গেল কেন?'

'এক সময়ে কাৎলামারির জঙ্গলে মস্ত একদল ডাকাত থাকতো। তারা জলে, ডাঙায় ডাকাতি করে বেড়াত। আমিও ছিলাম তাদের দলে। বাড়ি আমার হরিশপুর। আমার তখন ছেলেপুলে কিছু ছিল না। একদিন আমাদের সর্দার ভুল করে তার ভাইকে মেরে ফেলে। তারপরই সে ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে দরবেশ হয়ে দেশান্তরী হয়। দলটিও

ভেঙে যায়। আমরা চারধারে ছড়িয়ে পড়ি; কেউ কেউ ঘরে ফিরে চাষ-বাস, কাজ-কর্ম শুরু করি। কেউ কেউ গিয়ে আবার একটা নতুন দল তৈরী করে। কিন্তু কাৎলামারির নাম যারা করে ওরা তাদের ছেড়ে দেয়। আজ যারা আপনার নৌকো লুঠ করতে এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল আমার এক স্যাঙাৎ। আপনি এদিক দিয়ে যখন আবার যাবেন, ডাকাতের হাতে পড়লে ঐ কথাই বলবেন।

বাসুদেবকে দাদু আমাদের বাড়িতে আনতে চেয়েছিলেন, দারোয়ান করবেন বলে; কিন্তু সে আসেও নি, টাকাও নেয় নি। এই গ্রামের নামও তো হরিশপুর। সে কি এখানকারই লোক ছিল?"

দুঃখহরণ বললে, "হুজুর, বাসুদেব জোয়ারদার ছিলেন আমারই ঠাকুরদা। শুনেছি, তিনি এক সময়ে ডাকাতি করতেন। আমি তাঁকে দেখিনি। আমি জন্মাবার আগের দিনই তিনি মারা যান।"

দত্তরায়সাহেব বললেন,—"তা হবে।"

তাঁর পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন,—"কি অদ্ভুত মিল! বাসুদেবের নাতির ছেলেও আবার বাঁচালো আপনার ছেলেকে।"

সুমন্ত তখন এইটুকু শুনলো।

তারপর রাতে তাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সতীশবাবুর ছেলে রূপেনকে তার বন্ধু সুরেনকে বলতে শুনলো, 'বুঝলি, ওর ছেলের জীবনের দাম হোলো একখানা দশ টাকার নোট! ও দুখেকে তাই বখশিশ দিয়ে গেছে।'

সুরেন বললে,—একটা কাজও দিয়েছে।

—কাজ তো ও আগেও করছিল। তাতে পেত দশ টাকা। এখন না হয় মাইনে হোলো পনেরো টাকা। দুখেটাকে কিনে নিলে। লোকটা সারাজীবন হয়ে থাকবে ওর কেনা গোলাম। অথচ ওর কাছেই—

সুমন্ত আর কিছু শুনতে পেল না। বৃষ্টি এসে পড়লো দুজনে চলে গেল।

২

নতুন জীবন

তারপর—বেশি দিনও গেল না, সুমন্ত দেখলো সেখানে গড়ে উঠলো একটা কাপড়ের কল। ছোট-বড় অনেকে কলে কাজ করতে লাগলো। তার মতো কত ছেলেও এল মজুর হয়ে।

কলের একধারে তৈরী হোলো কারিগর, মিস্ত্রী, কুলি প্রভৃতির আস্তানা —ছোট ছোট ঘরের সারি। জায়গাটা হয়ে উঠলো যেমন নোংরা তেমনই সেখানে দিন-রাত গোলমাল, ঝগড়া ও কখন কখন মারামারি অথবা ঢোল-করতালের সঙ্গে গান নামীয় বিচিত্র চীৎকার। আর দূরে নদীর তীরে উঠলো পাকা বাড়ির সারি কলের বাবুদের জন্যে। সেদিকটা হোলো কতকটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও শান্ত। আর উঠলো খোদ মালিক, সাহেব-সুবো ও ম্যানেজারদের জন্যে ফুল-বাগিচা ঘেরা সুদৃশ্য বাংলো।

গ্রামের নির্মল নীল আকাশ এখন কল-বাড়ির ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়ায় মলিন হয়ে থাকে ; বাতাসে ভেসে বেড়ায় কাঁচা কয়লা-পোড়ার বিকট গন্ধ ও কয়লার গুঁড়ো। রাতের বেলা কল-বাড়িতে ও তার চারধারে জ্বলে বিজলী-আলো। ফটকে বাজে ঘন্টা, ইঞ্জিনে দেয় ভোঁ। ভোরে তাই শুনে শ্রমিকেরা কলে ঢোকে, ছুটি হলে বেরিয়ে আসে দলে দলে।

গ্রামের বাজারটা হয়েছে অনেক বড়। বাজারের ধারে হোটেল, মিঠাইয়ের দোকান আর ডাকঘর। চা-ঘর এখন যেখানে-সেখানে। পথে এখন বিস্তর লোক ও গাড়ি। সারাদিন মোটর, লরি ও বাস্ যাতায়াত করে ; ঘাটে নৌকোর ভিড়। ঘোল-বোঝাই কেঁড়ের কানায় যেমন মাছির সারি বসে, পাড়ের ওপর থেকে নৌকোগুলোকে দেখায় তেমনই।

সুমন্তর মনে হয়, তাদের গ্রামখানা কত ছোট হয়ে গেছে। আগে যা সে দেখে নি এখন তাই দেখছে। ঐ যে বাজারের শেষে একখানা ঘর যাকে লোকে বলে ভাটিখানা, ওখানে সব মাতালের আড্ডা। ওটা আগে ছিল না।

মাতাল দেখলে তার বড় ভয় করে! আগে সে কদাচিৎ মাতাল দেখেছে ; এখন দেখে প্রায়ই, বিশেষ করে শনিবারে ও হাটের দিনে।

সে মাঝে মাঝে তার বাবার সঙ্গে কল-বাড়ির মধ্যে যায়। তার বাবা

কাজে বেরোয় সেই ভোরবেলা যখন কলের প্রথম ভোঁ বাজে। তখনও গ্রামের চোখে ঘুম লেগে থাকে। দুপুরে ভোঁ বাজলে সে খেতে আসে; খেয়ে একটু পরেই আবার চলে যায়। তারপর ফিরে আসে সন্ধ্যার ভোঁ বাজলে। তখন ফটক দিয়ে পিল পিল করে লোক বেরোয়। দেখে মনে হয়, কারখানাটা যেন মানুষ উগরে দিচ্ছে।

সুমন্ত কলের ভেতর গিয়ে দেখেছে, ছোটবড় কত রকমের চাকা ঘুরছে। ভোঁ-ভোঁ, খট্-খট্, খর্ খর্ শব্দ হচ্ছে। কোথাও তুলো পেঁজা হচ্ছে, কোথাও সুতো তৈরি হচ্ছে, কোথাও তাঁত চলছে, কাপড় বোনা হচ্ছে। আবার যেখানে কাপড়ে ছাপ দেওয়া হয়, গাঁট বাঁধা হয় সে-সবও সে দেখেছে। সেখানে কত নতুন কাপড়! মাড়ের কি মিঠে গন্ধ!

এত কাপড় পরে কে? তাদের গ্রামের অনেকেরই তো পরনে উপযুক্ত কাপড় নেই। অনেকেই ময়লা ছেঁড়া কাপড় কোমরে, গায়ে জড়ায়। ছোটরা কাপড় এক রকম পরেই না। তবে এত কাপড় যায় কোথায়?

তার বাবার কাছে জিজ্ঞেস করেছিল। তার বাবা উত্তর দিয়েছিল, 'যাদের পয়সা আছে তারাই পরে।'

তাদের পয়সা নেই কেন? তারা বাবুদের মতো লেখা-পড়া জানে না বলে? কিন্তু সে ব্যাপারি ও দোকানদারদের দেখেছে, তাদের তো অভাব নেই। তারা তো লেখা-পড়া এক রকম জানেই না। সে কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। কেন সামান্য লোকের অনেক পয়সা, আর অনেক লোকের পয়সাই নেই!

সে তার বাবাকে কয়েকবার বলেছে,—"কলে আমার একটা চাকরি করে দাও।"

কিন্তু তার বাবা বলে,—"তুই গেলে গরুটাকে দেখবে কে? ক্ষেতটুকু দেখা-শোনা করবারও তো কেউ থাকবে না!"

সুমন্তর এসব আর ভাল লাগে না। তার সঙ্গী মধু, কেষ্টা, সাদেক, খুরসেদ—এরা সকলে এখন কলে কাজ করছে। প্রত্যেকে সপ্তাহে আড়াই টাকা করে পায়। রবিবারে ছুটি। সে তাদের কাছে বসে গল্প শোনে, কল কি করে চলে; সর্দার তাদের কি বলে; কে কবে মার খেয়েছে; কার মাইনে কাটা গেছে; কাকে জরিমানা করেছে; তারা কি রকম করে কাজে ফাঁকি দেয়—

একদিন একজন তাঁতের ঘরে একটু বেসামাল হয়ে কাজ করছিল। চাকায় পড়ে লোকটার বাঁ হাতের আঙুলগুলো উড়ে গিয়েছিল। তার

এই ক্ষতির জন্যে সে পেয়েছে ত্রিশ টাকা, কিন্তু তাকে দিয়ে কাজ চলবে না বলে সেদিন তার একেবারে ছুটি হয়ে গেছে। লোকটার বাড়ি তিওরপাড়া।

কথাগুলো শুনতে শুনতে সুমন্তর ভয় হয়েছিল। যদি তার বাবারও অমনই হয়? হাটের ধারে একটা ভিখারী বসে 'আল্লার' নাম ধরে চীৎকার করতে করতে ভিক্ষা করে। লোকটার দু'খানা হাত কাটা; সেও নাকি কোন্ দেশের কোন্ কলে কাজ করতো। লোকটার কেউ নেই। আহা! বেচারী!

সুমন্তর মায়ের নিত্য অসুখ। কিছুতেই তা সারে না; মা অনেক রকমের পাঁচন ও বড়ি, মস্‌জিদের জলপড়া, বামুনের পা ধোয়া জল খেয়েছে, গলায় তাবিজ বেঁধেছে। তবুও ভাল হচ্ছে না। কলের ডাক্তার একদিন তাকে বুকে নল লাগিয়ে পরীক্ষা করেছে। কাগজে ওষুধের নামও খচ্‌খচ্ করে লিখে দিয়েছে।

কিন্তু তার বাবা বলে,—"অত টাকা কোথায় পাব? এবার তুইও কাজ কর সুমু। কাজ না করলে টাকা আসবে কোথা থেকে? এই কটা টাকায় কি এত হয়?"

তাই সেও একদিন কাজে ঢুকলো। তার কাজ হোলো রঙ-ঘরে। সেখানে রঙ তৈরী হয়। সেখানকার কারিগরদের কাজে সে জোগান দিতে লাগলো। তারও মাইনে হোলো সপ্তাহে আড়াই টাকা। তার নিজের বলে একটা পয়সাও কোন দিন ছিল না। এখন সে রোজগার করে মাসে দশ টাকা। তবুও তাতে তাদের অভাব ঘুচলো না।

সে মাঝে মাঝে সাহেবের সেই ছেলেটির, যাকে সে বাঁচিয়েছিল তার কথা ভাবে। সে আর কখনও তাদের গ্রামে আসে নি। তবে সাহেব মাঝে মাঝে আসেন। তাঁকে দেখলে লোকে ম্যানেজারের চেয়েও ভয় করে। অথচ ম্যানেজারের চেয়ে তাঁর চেহারাটা ভালই। ম্যানেজারসাহেব যেমন কালো, তেমনই মোটা, আবার সেই রকম বেঁটে। তাঁর বাড়ি পশ্চিমের না দক্ষিণের কোন এক দেশে। লোকটা ভারি কড়া। তাঁর চোখ দুটো সব সময় লাল, যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। মুখখানা দেখলে ভোঁদড়ের মুখ মনে পড়ে। সুমন্ত একদিন তাঁর হাতে একটা চড় খেয়েছিল।

সুমন্তর মা কিন্তু আর ভাল হোল না; তার বাবাও যেন কেমন হয়ে গেল। সুমন্তর মন গেল খারাপ হয়ে। সে দুবেলা পেট ভরে খেতেও

পায় না। কে রান্না করবে ? তার মা সব দিন পারে না। তাছাড়া তার বাবার সঙ্গে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। এ রকমটা পাড়ার আরও অনেকের ঘরে হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মাতাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একদিন কি নিয়ে যেন কলের এক দেশওয়ালী কারিগরের সঙ্গে তাদের পাড়ার সাবেরের ঝগড়া বাধলো!

সেদিন শনিবার। তার বাবা, সাবের ও জন তিনেক মজুর সাবেরদের বারান্দায় বসে অন্ধকারে কথাবার্তা বলছিল। হঠাৎ কি নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হোলো। শেষে হোলো মারামারি। তারপর লোক তিনটে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই হোলো এক ভয়ানক কাণ্ড। বহু লোক জড় হয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে। জসিমের মাথা ফাটলো, সেই দেশওয়ালীটাকে কে যেন দা দিয়ে কেটে ফেললে। ওঃ! সে কি রক্ত! জায়গাটা একেবারে কাদা হয়ে গেল! লোকটার মাথা ঘাড় থেকে একদম কেটে পড়ে গিয়েছিল।

তারপর? তারপর যা হয়; পুলিসের ঠেলা। কত লোককে ধরে নিয়ে গেল। এসব তাদের গ্রামে সে কোনদিন দেখে নি। এখন লোকে এটাকে বলে—"টাউন।" কত ঘর-বাড়ি হয়েছে; কত রাস্তা। এসব হোলো মোটে তিন বছরে। আগে গ্রামের মধ্যে বাগান-পুকুর-বাঁশঝাড় ছিল, দু-একখানা ছোট ক্ষেতও এখানে সেখানে দেখা যেত, এখন সে-সব নেই। ক্ষেতখামার সব সরে গেছে বাইরে। আগের মতো সস্তায় আর কিছু পাওয়া যায় না। তার বাবা বলে, চাষীর সংখ্যা গেছে কমে, মজুর বেড়েছে; রোজই বাড়ছে। গ্রামে যে দু-একঘর তাঁতী ছিল তারা বাড়ি-ঘর বেচে কোথায় গেছে কে জানে। এখন সবই পাওয়া যায় কিনতে। লোকে বলে—পয়সা, পয়সা। সব কিছুতেই পয়সা। তবুও তাদের হাতে পয়সা থাকে না! তবে কেউ কেউ ফেঁপে উঠেছে। তাদের চেহারায় জেল্লা দিয়েছে।

গ্রামে এখন ছোট-বড় দুটো ইস্কুল। তাতে অনেক ছেলে পড়ছে। কল-বাড়ির বাবুদের অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে পড়তে আসে। কিন্তু কলে যে-সব মজুর কাজ করে, তারা পড়তে পারে না। অত মাইনে, অত বই কে দেবে? মেয়েদেরও আলাদা একটা ইস্কুল হয়েছে।

তবে মুমন্তুদের জন্মে একটা ইস্কুল হয়েছে বটে রাতের বেলা। সে সেখানে পড়তে যায়। ইস্কুলটা তাদের বাড়ি থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে,

থানার ওধারে একখানা টিনের চালায়। ঘরখানা শ্রীদাম সাঁতরার। লোকটার অনেক পয়সা হয়েছে। চাষাভূষো গরীব-গুর্বো ছেলেদের পড়ার জন্যে ও ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছে। জায়গাটা জংলা, নির্জন। অন্ধকার রাতে সে যখন সেখান থেকে একা আসে তখন তার গা ছম্‌ছম্ করে। বাতাসে বড় বড় গাছের মাথা যখন দোলে, সর্-সর্ শব্দ হয়, তার বুক দুর্-দুর্ করে।

তাদের মাস্টার-মশায় বলেছেন, 'ভূত নেই।' তাহলে তাদের গ্রামে ভূতের ওঝা আছে কেন? সেবার কেষ্ট গয়লার মেয়েটাকে ধরলে কে? সে চুল ছিঁড়ত, লাফাত, হাসত, কাঁদত, দাঁত কড়মড় করত, বড় বড় চোখ মেলে তাকাত। শেষে ওঝা মন্ত্র পড়ে, মার দিয়ে তার ভূত ছাড়ায়। তার বাবাও তো দেখেছে নদীর ধারে আলেয়া ভূত। তার বাবা সেবার যাচ্ছিল ঘোষপুরে নৌকোয়। রাতের বেলা এক জায়গায় তারা নৌকো বেঁধে ছিল। রাত দুপুরে হঠাৎ দেখে, ওপারে জলের ধারে আলেয়া ভূত ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার আলোটা একবার দপ্ করে জ্বলে উঠে জলের কুল ধরে কিছুদূর গিয়ে হঠাৎ নিভে যায়, তারপর আবার জ্বলে উঠে এদিকে-ওদিকে বেড়ায়। তারা এপারে ছিল। তাই ভূতটা কিছু করতে পারে নি।

সুমন্ত মাস্টার মশায়ের কাছে গল্প দুটো বলেছিল। তাতে তিনি বলেন, কেষ্ট গয়লার মেয়ের অসুখ হয়েছিল। আর ঐ আলোটা ভূতের নয়। ওটা দু'রকম গ্যাসের মধ্যে এক রকমের কাজের ফলে যে আলো জ্বলে ওঠে তাই। ঐ আলোর শিখা নেই। ও ভূত আমিও দেখেছি, আমাদের গ্রামের বিলের ধারে। তখন আমার বন্ধুর সঙ্গে রেল-স্টেশনে যাচ্ছিলাম।

আমাদের বাড়ি থেকে রেল-স্টেশন মাত্র দু' মাইল। মাঝে ঐ বিলটা পড়ে। তখন পূজো হয়ে গেছে, কিন্তু ছুটি ফুরোয় নি। তাই আমার বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিলাম। সে পূজোটা কাটিয়ে গেল আমাদের বাড়িতে।

"তখন অনেক রাত; বিলের ধার দিয়ে কিছুদূর যেতেই আমাদের কাছ থেকে খানিক দূরে দপ্ করে একটা নীলাভ আলো জ্বলে উঠলো। প্রথমটা আমরা ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু তারপরই বুঝলাম; ওটা জলার গ্যাসের খেলা। দু'জনে আলোটাকে তাড়া করলাম। ধরতে পারলাম না; সেটা কুল থেকে জলের ওপর গিয়ে নিভে গেল। দু'জনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম যদি আবার দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখা গেল না।"

মাস্টার-মশায় খুব ভাল লোক। তাদের সকলকে তিনি ভালবাসেন। তাঁর মুখখানি; বিশেষ করে চোখ দু'টি বড় সুন্দর। তিনি সব সময় সত্যি কথা বলেন; খুব হাসেন, খুব গল্প বলেন। তাঁর কথা শুনলে মনে খুব সাহস হয়। তবুও অন্ধকার রাতে তার মনে হয় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মাস্টার মশায় বলেন ; ভূত নেই। তার মা-বাবা বলে; ভূত আছে। কি অদ্ভুত!

একথা সে মাস্টার-মশায়কে বলেছিল। তাতে তিনি বলেন;—তুমি ভূতের কথা ভেবোই না। তা'হলে ত দেখতেই পাবে না।

সে এখন পড়তে-লিখতে পারে কিন্তু দিনের ইস্কুলে যদি পড়তে পারত! সন্ধ্যাবেলা তার বড় ঘুম পায়। সারাদিনের খাটুনি। তার ওপর পড়া। ছুটির পর সে ঘুমোতে ঘুমোতে পথ চলে।

সেদিন তো একটা গোখরোর মুখে তার প্রাণটা গিয়েছিল আর একটু হলে! ইস্কুল যাবার পথে আছে একটা পুরোনো সাঁকো। সাঁকোটার ধারে আছে এক জোড়া বকুলগাছ। তারা কতোদিন পাকা বকুল ফল পাড়বার জন্যে গাছ ছটোতে উঠেছে।

সেদিন সে, মধু আর কমুরুদ্দিন আসছিল। গাছ দুটোতে ফুল ফুটে ছিল অনেক। তলায় কত ফুল পড়ে, জ্যোৎস্নায় দেখাচ্ছিল চমৎকার। গন্ধে বাতাস ছিল ভরে। তাদের তিনজনেরই খেয়াল হোলো ফুল কুড়োবে।

সুমন্ত গাছতলাতে এগিয়ে গিয়ে ফুল কুড়োবার জন্যে নিচু হতেই একটা গাছের গোড়ায় ফোঁস করে ফণা ধরে দাঁড়ালো একটা গোখরো। গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে তার ফণার ওপর পড়েছিল চাঁদের আলো। ফণাটা রুপোর মত ঝক্‌ঝক্ করতে লাগলো। সাপটা ছিল তার কাছ থেকে হাত চারেক দূরে। তিনজনে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দিলে ছুট।

তারপর থেকে তারা রাতে যখন সেখান দিয়ে যায় হাতে তালি দিতে দিতে চলে।

শোনা যাচ্ছে, এইখানে হবে একটা ছবির ঘর। শহরে বাজারের একধারে সে ছবি-ঘর দেখেছে। সেখানে গান হয়, বাজনা বাজে, বিজলী আলো জ্বলে, দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় কাগজে নানা রকমের ছবি থাকে। কিন্তু সে ভেতরে গিয়ে কোনদিন দেখে নি। এখানে ছবিঘর হোলে, নিশ্চয়ই দেখবে। সে শুনেছে, ছবি চলে-ফিরে বেড়ায়, কথা বলে, গান গায়, ঘোড়ায় চড়ে, লড়াই করে! এ কলও তৈরী করেছে সাহেবরা। সেও এমন একটা কিছু তৈরী করতে পারে না, যা দেখে লোকের তাক্ লেগে যাবে?

৩

সুমন্তর অভিজ্ঞতা

সুমন্তদের গ্রামে বরাবরই জ্বর-জ্বালা লেগেই থাকে। বর্ষার পর ঘরে ঘরে রোগী। আবার কখন কখন কলেরার মড়ক লাগে। সে এক ভয়ানক ব্যাপার। এবেলা-ওবেলা লোক মরে।

গ্রামখানা শহর হয়ে যাওয়ার পর থেকেও অসুখ-বিসুখ কমলো না। মজুরও মরে, সাধারণ লোকও মরে। তাদের চিকিৎসা হয় না। সরকারী ডাক্তারখানায় তারা ওষুধ পায় বটে কিন্তু তাতে সারে না। ডাক্তারখানাটা আগে ছিল না, কলের কর্তাদের চেষ্টায় হয়েছে। আবার রোগীরা যখন শয্যাশায়ী হয় তখন ওষুধ আনবে কেমন করে? ডাক্তারবাবু বাড়িতে এলে টাকা দিতে হয়, ওষুধের দাম লাগে। তারা গরিব। সে সব করবার পয়সা তাদের কোথায়? তাই লোকে ভোগে, ভুগে ভুগে সারে, মরেও।

কিন্তু বাবুরা, বড়লোকেরা খুব চিকিৎসা করে। শহর থেকে বড় বড় ডাক্তার আসে। কলকাতা থেকেও কখন কখন ডাক্তার এসে থাকে। গরিবের প্রাণের যেন দাম নেই।

তার মা বলে,—"বাবা, গরিবের প্রাণ বেরিয়ে গেলেই ভাল। কিন্তু সহজে যে বার হতে চায় না।"

মা কেন একথা বলে? মরে যাওয়া কি ভাল? সে কিন্তু গরিবদেরই বেশি মরতে দেখেছে।

পাশের বাড়ির ময়রা-বুড়ী বলে;—"আর-জন্মে কত পাপ করেছি; তাই এ জন্মে এত কষ্ট পাচ্ছি। পরনে কাপড় নেই; পেটে ভাত নেই; মাথার ওপর থেকে ঘরের চাল উড়ে যায়; অমন সোমত্ত ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে মরে গেল!"

বুড়ী মুড়ি ভাজে; লোকের কাছে বেচে। ওর মাথার চুলগুলো সব কাশ ফুলের মতো সাদা হয়ে গেছে। বুড়ী সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারে না। ওর ছেলের নাম ছিল নারাণ।

তার গায়ে ছিল মোষের মতো জোর। শহরে চাটুয্যেদের বড় ছেলে বিলেত থেকে একদম সাহেব হয়ে এসেছে। তার মুখে সব সময় পাইপ। আচ্ছা, যখন ঘুমোয় তখনও পাইপটা থাকে কি? একবার নারাণকে নিয়ে শিকারে গিয়েছিল ওপারের জঙ্গলে। ওদিকে একটা গুলবাঘা ক'দিন খুব উৎপাত করছিল। কেউ তাকে মারতে পারছিল না।

বাঘটা লোকের ছাগল-বাছুর ধরে নিয়ে যেত। চাটুয্যে বাবুদের ওপারে একটা মৌজা আছে। সেই মৌজায় একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁদের এক কর্মচারীর ছেলেকে বাঘটা ধরে নিয়ে যায় কিন্তু ছেলেটাকে সে খেতে পারে না। লোকজন তাকে তাড়া করে। তারপর ছেলেটা দিন তিনেক মাত্র বেঁচে ছিল।

সাহেববাবু সেই বাঘটাকেই মারবার জন্যে মৌজার জঙ্গলে যান। যাবার পথে তিনি নারাণকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। নারাণের এক খুড়ো ওঁদের বাড়িতে পেয়াদাগিরি করতো। তারও গায়ে ছিল খুব জোর। সে ছিল পাকা লাঠিয়াল। তার নাম ছিল গগন। একবার চারজন ডাকাতের সঙ্গে তার টক্কর লাগে। চারজনেই তার লাঠিতে ঘায়েল হয়।

নারাণ তারই তো ভাই-পো! কাজেই তার বিক্রম ছিল কতকটা খুড়োর মতো।

সাহেববাবু বন ঘিরে বাঘ খুঁজতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে অনেক লোক। তাদের হাতে লাঠি, রামদা, সড়কি, কানেস্তারা, ঢাল। তারা চীৎকার করে, ঢোল-কানেস্তারা বাজিয়ে বাঘের দিনের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতেই সে লাফ দিয়ে ওঠে। বাঘটা ঘুমোচ্ছিল একটা আমগাছের গোড়ায় এক ঝোপের মধ্যে।

কিন্তু পালাবে কোথায়? চারধারে সশস্ত্র লোকজন। তবুও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সে এ-ঝোপ থেকে ও-ঝোপে চোরের মতো চুপি চুপি সরে পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ শিকার ও শিকারীতে বেশ খানিকটা লুকোচুরি চলে। শেষে সে আর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে না। শত্রুর বেষ্টনি ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। তাকে একবার খানিকটা ফাঁকায় হঠাৎ বেরিয়ে আসতে হয়। তবে সে ক্ষণিকের জন্যে। সাহেববাবুকে এক ঝলক দেখা দিয়েই ডান পাশের জঙ্গলে ঢুকে যায়। সাহেববাবু গুলি করবার সুযোগ পান না। তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা মোটা আচিন গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে।

বাঘটা চলে যেতেই নারাণও সাহেবের বাঁ-পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে গাছটার দিকে আসতে যাবে এমন সময় বাঘটা হঠাৎ তার বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে আবার সাহেবের সামনে এসে পড়ে। এবার সাহেববাবু তাকে আর ছাড়েন না, গুলি করেন। গুলিটা লাগে তার সামনের ডান পায়ের থাবায়।

সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফে এসে পড়ে সাহেবের বুকের ওপর। তার দুটো থাবা থাকে সাহেবের দু কাঁধে, মুখটা তাঁর টুঁটির নাগাল পায় না; বন্দুকটা আড় হয়ে গলাটাকে রক্ষা করে। কিন্তু আর একটু হোলেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেত যদি না নারাণও এক লাফে সেখানে এসে পড়তো। সে রামদায়ের এক কোপে বাঘটার ঘাড় থেকে মাথাটা প্রায় নামিয়ে দেয়। বাঘটা মরে, সাহেবও ভুগে ভুগে বাঁচেন, নারাণের নামও ছড়িয়ে পড়ে। সে পুরস্কার পায় পঞ্চাশ টাকা!

সকলে বলে,—"ছোঁড়াটার কপাল ভাল।"

কিন্তু তেমন কপাল সে ভোগ করতে বেশিদিন পায় না; পরের বছরই তিন দিনের জ্বরে মারা যায়। তবে তার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার-কবিরাজ আসে নি। কোথা থেকে আসবে? সে ছিল গরিবের ছেলে। সাহেববাবুকে বাঘে জখম করেছিল; তিনি তার কত চিকিৎসা করিয়েছিলেন; কত দেশ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এখন তাঁর শরীর হয়েছে কুমীরের মতো। লোকে বলে, 'কি অকৃতজ্ঞ! যে তার প্রাণ বঁাচালে, সে মরে গেলে তার বুড়ো মাকে দশটা টাকা দিয়েও সাহায্য করলে না। অথচ ওরা গরিবের রক্ত শুষে ফুলে উঠেছে!'

সুমন্তদের কাপড়ের কলে যে অনেক লাভ হয়, একথা সে এখন বুঝতে পারে। তাদের সাহেব নাকি হরিশপুর আর তার আশে-পাশের যত জায়গা-জমি ছিল সব কিনেছেন। ঐ যেখানে-ক্ষেত-খামার আছে ও-সব জায়গাতেও নাকি কল বসবে। তখন চাষীরা যাবে কোথায়? খাবে কি? সেই তাঁতীদের মতো দেশান্তরী হবে?

না। ওরাও নাকি কলে কাজ করবে। তা'হলে চারধারে হবে কেবল কল, মজুর আর বাবু। ক্ষেত-খামার বলতে কিছু থাকবে না। কিন্তু চাষ-আবাদ না হোলে খাবার আসবে কোথা থেকে? সে জানে না, এমনি ভাবে কত ক্ষেত-খামার যাচ্ছে কলের তলায়।

এক এক সময় সুমন্তর মজুর-জীবন বেশ লাগে; আবার কখনও কখনও সে হাঁফিয়ে ওঠে।

কোথায় গেল তাদের সেই ছায়াঢাকা নিঝুম গ্রাম, আম-কাঁঠালের বাগান? সেই পাখীর ডাক, খোলা মাঠ? সেই সোনার ফসল ভরা ক্ষেত; আর সেই বাঁশ-ঝাড়—ঝাড়ের পর ঝাড়? বাতাসে সেগুলোর মাথা নুয়ে পড়তো, পাতাগুলো থরথর্ করে কাঁপতো, মাঝে মাঝে গাছগুলো শব্দ করে উঠতো কটরর্‌র্। সন্ধ্যাবেলা তার তলাটা জোনাকি ও অন্ধকারে

যেত ভয়ে। সেদিকে তাকালেই তার কেমন ভয় করতো। তখন বসন্তকালে কত রকমের পাখ-পাখালী আসতো। তাদের গানে বাগান ছাপিয়ে যেত।

তাদের পাড়ায় এখন কত নতুন লোক, কত নতুন মুখ, কত নতুন বাড়ি। লোকের গায়ে রকম রকমের, রং-বেরঙের পোশাক ; পায়ে কত রকমের জুতো, মুখে সিগরেট-বিড়ি। এদের সকলকে তার ভাল লাগে না। তার বাবার কিছু মাইনে বেড়েছে। সে এখন সুতো তৈরির দিকে আছে। বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে। লোকে তার দুর্নাম করে। সেকথা শুনে তার মনে বড় দুঃখ হয়। তার বাবা নাকি চর! কল-বাড়িতে কে কোথায় কি করছে দেখে বেড়ায় আর ছোট-ম্যানেজারের কাছে নালিশ করে। ছোট ম্যানেজারের মুখখানা দেখতে খেঁকশিয়ালের মতো। সে যখন হাসে তখন মনে হয় ঠিক একটা খেঁকশিয়াল হাসছে।

সুমন্ত রাতের স্কুলে এখনও যায়। সে নিজেই একখানা বাঙলা, একখানা ইংরেজি আর একখানা অঙ্কের বই কিনেছে। সে আস্তে আস্তে ইংরেজী পড়তে পারে, বাঙলা বেশ তাড়াতাড়ি পড়ে ; অঙ্কও কষতে পারে বেশ। তাদের মাস্টারমশাই বলেন,—"সুমু, তুই চেষ্টা করলে অনেক লেখা-পড়া শিখতে পারবি। পৃথিবীতে সকলের আগে রেলগাড়ির ইঞ্জিন তৈরি করেন কে জানিস্? তোর মতো এক মজুরের ছেলে, মজুর। আঠারো বছর বয়সে তাঁর হয় হাতেখড়ি। তুই তো লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছিস্ বারো বছর বয়সে। এর মধ্যে কত শিখেছিস্! বাঃ!"

সেই মজুর সাহেবটির গল্প সে একখানা বাঙলা বইয়ে পড়েছে। কাজের যা কিছু সবই কি করবে সাহেবরা? তারা কি কিছুই পারে না? কেন পারে না? সে এক একদিন খবরের কাগজ পড়ে। কাগজে থাকে কত দেশের নাম, কত দেশের খবর।

এখন সকলে বলে,—"দুখের ছেলেটা খুব সেয়ানা হয়ে উঠেছে। ওকে কিছুতে ঠকানো যায় না। আর দুদিন পরে ও ভদ্রলোক হয়ে যাবে। তখনই মুস্কিল।" কেন?

সে যদি সেয়ানা হয়ে থাকে তো তা মাস্টার-মশায়ের গুণ। তারা এখন সকলেই লিখতে-পড়তে পারে। কিন্তু তাদের মাস্টার-মশায়ের বুকে কি একটা অসুখ আছে। উনি তাই চলে যাবেন পশ্চিমে কোন

পাহাড়ে। আর আসবেন না! সেখানকার হাওয়ায় নাকি ওই রোগটা সারানো গুণ আছে।

তিনি এক একদিন বলেন,—"তোদের সকলকে ছেড়ে যেতে হবে সুমু। আর ফিরবো কিনা কে জানে?" বলতে বলতে তাঁর মুখে কেমন একটু ব্যথা ফুটে ওঠে, চোখ দুটো কেমন হয়ে যায়।

তাঁর চলে যাবার কথা শুনে তাদের সকলেরই মন খারাপ হয়। তিনি কাজ করেন এখানকার একটা বড় ইস্কুলে। যারা গরিব তাদের ছেলেদের বই কিনে দেন; অসুখ হোলে ওষুধ কিনে দেন। সুমন্তকেও তিনি বই কিনে দিয়েছিলেন। দেশে তাঁর মা-ভাই আছে; বিদেশে আছে আর এক ভাই। তাঁরা ওঁর চেয়ে বড়; ওঁদের টাকা-পয়সার অভাব নেই।

মাস্টার-মশায়কে অনেকে, বিশেষ করে গরিবেরা ভালবাসে। বাবুরা, বড়লোকেরা তাঁকে দেখতে পারে না; বলে,—"ও ছোটলোকের সঙ্গে মেশে। তাদের আস্পর্ধা বাড়িয়ে দিচ্ছে।"

একবার তাঁকে বড় ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেবারও কথা হয়; কিন্তু সেক্রেটারিবাবু ওঁর পিসে। উনি তাঁর বাড়িতেই থাকেন। তাই আর কিছু হয় না। উনি যখন চলে যাবেন তখন সুমন্তরা একটা উপহার দেবে। সুমন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করে রেখেছে কি দেবে। আর কেউ না দিক, সে দেবে। জিনিসটা কি তা এখন সে কাউকে বলবে না।

তার মাকে নিয়ে এখন হয়েছে খুব মুস্কিল। মা আর উঠতে পারে না। মায়ের কষ্ট দেখে, তারও বড় কষ্ট হয়। সে মায়ের যন্ত্রণা দেখে এক এক সময় কেঁদে ফেলে। আবার, কখন কখন বাড়ির বাইরে নদীর ধারে গিয়ে চুপ-চাপ বসে থাকে। মা যদি মরে যায় তবে সে আর ঘরে থাকবে না। সকলের মা ভাল আছে, তার মা কেন রোগে কষ্ট পাবে? তার মা যদি না থাকতো সে আলাদা কথা। যখন আছে তখন ভাল থাকবে না কেন?

কেনর উত্তর দেয় পাশের বাড়ির ময়রা-বুড়ি। সে বলে,—"তোর কপাল! যেমন আমার দেখছিস্ না?"

আর এক মাস পরে তাদের সাহেবের জন্ম দিন। এখন থেকে ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হচ্ছে, সেদিন কি হবে। এখানে সাহেবের জন্ম দিন হবে এই প্রথম। ঐ তারিখে কলেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তারা শুনতে পাচ্ছে, তিন দিন যাত্রা-গান, থিয়েটার, কীর্তন ও বায়স্কোপ

হবে। অনেক লোককে খাওয়ানো হবে, বাজি পুড়বে, লাঠি-খেলা হবে। মিল দুদিন বন্ধ থাকবে। মিল একদিনের বেশি কখনও বন্ধ থাকে না। তবে মজুরদের সঙ্গে কর্তাদের মাইনে ও ছুটির মাইনে নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। মজুর কর্তাদের কথা না শুনলে তখন নাকি মিলে তালা-চাবি পড়বে। মিল বন্ধ হোলে তার ভয় কি?

মিলের বাবুরা থিয়েটার করবেন। থিয়েটার কি সে জানে না। নিশ্চয় কোন মজার ব্যাপার। সে গান গাইতে পারে। একজন বাবু বলছিলেন,—"মজুরদের তরফ থেকে সুমন্তকে দিয়ে গান গাওয়ানো হবে।"

সুমন্ত তা পারবে না। সেই বকুলতলায় দিন পনেরো হোলো সিনেমা হল্ হয়েছে। তার নাম "ছায়াপুরী।" আর এসেছে বেতার। কল-বাড়িতেই চার-পাঁচটা আছে। ছায়াপুরীর ছবির চেয়ে বেতার তার কাছে লাগে খুব আশ্চর্যের। সাত-সমুদ্র-তেরো-নদী পারে বসে কে কথা বলছে, গান গাইছে, আর এখানে ঐ বাক্সটার ভেতর এসে তা ধরা পড়ছে, সকলে শুনছে। কি করে হয় এ ব্যাপারটা? সে ভেবে ঠিক করতে পারে না। মাস্টারমশায়কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বলেছিলেন,—"তুমি জানবার চেষ্টা কর, বই পড়। সব জানতে পারবে।" বইয়ে কত জানবার কথা থাকে।

তবে ছবিগুলো তার লাগে ভাল, যদি সে ছবি হয় যুদ্ধের, কোন দেশ আবিষ্কারের বা হিংস্র-জীব-জন্তুভরা কোন গহন অরণ্যের কি সমুদ্রের। গল্পও সে ভালবাসে।

সে তিনখানা ছবি দেখেছে। তিনখানা ছবির মধ্যে একখানা তার লেগেছে খুব ভাল।

তার গল্পটা হচ্ছে—

'সুন্দরবনের কাছে মাতলা-নদীতে একটা জেলে আর তার ছেলে মাছ ধরতো। একদিন ছেলেটির বাবার অসুখ করলে, তার ছেলেটি মাছ ধরতে গেল একা। পথে তার এক বন্ধু হোলো সঙ্গী। দু'জনে নৌকো নিয়ে চললো। কিন্তু মাছ ধরার চেয়ে মন রইলো বেড়াবার দিকেই বেশি।

তারা নৌকো বাইতে বাইতে গ্রাম থেকে গিয়ে পড়লো দূরে। তখন ভাঁটার সময়। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। দু' পাশে গভীর বন। এদিকে নৌকোয় জল নেই। দুজনেই শ্রান্ত, তৃষিত ও ক্ষুধার্ত।

ভাঁটার টান কাটিয়ে নৌকো ঘুরিয়ে উজানে চালানোও তখন অসম্ভব। পথে কোন নৌকোও তারা দেখতে পেল না; তবে দেখতে পেল, বাঁদিকে জঙ্গলের মধ্যে একখানা কোঠা-বাড়ির ভাঙা আলসের একটুখানি।

বাড়িখানা অনেককালের। তারা কূলে নৌকো ভিড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়িখানার দিকে চললো। মনে করলে সেখানে লোক আছে। কিন্তু বাড়িখানির কাছে গিয়েই দেখলে, বাইরে চারধারে উঁচু পাঁচীল। পাঁচীলটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। মাঝখানে মস্ত ফটক। ফটকটা রাক্ষসের মতো হাঁ করে আছে। তার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। কতকালের কোঠা কে জানে! তার গায়ে, মাথায়, ছাদে বট-অশথ প্রভৃতি নানা রকমের গাছ-পালা চারধারে ঝোপ-ঝাড়; দেওয়াল ফেটে গেছে; চুন-বালি খসে পড়েছে। বাড়িখানার কেউ কোথাও নেই।

দু'জনে আর এগোলো না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এলো। জঙ্গলটা অন্ধকারে গেল ডুবে। তারা তাড়াতাড়ি ফিরে চললো নদীর দিকে। কিন্তু অন্ধকারে খানিকটা ঘুরে-ফিরে আবার এসে পড়লো সেই বাড়িটারই কাছে।

সেখানে এসেই দেখে, বাড়ির সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে ঢাল-তলোয়ার, সড়কি, লাঠি ও খাঁড়া। সকলের পরনে লাল কাপড়, মাথায় বাবড়ি, গালে গাল-পাট্টা। সকলেই জোয়ান। তাদের কয়েকজনের হাতে কয়েকটা মশাল জ্বলছে।

তারা জেলের ছেলে দুটিকে দেখেই বলে উঠলো,—"তোরা কে রে?"

ছেলে দুটির মধ্যে যেটি বড়, তার নাম বরুণ। সে বললে,—"আমরা এইদিকে মাছ ধরতে এসে পথ হারিয়েছি।"

লোকগুলোর একজন বললে,—"আজকাল জঙ্গলে মাছ থাকে নাকি? তোদের কেটে ফেলবো। তোরা গুপ্ত চর।"

আর একজন বললে,—"তার দরকার নেই। ওরা কতটুকুই বা মানুষ! চল্, সর্দারের কাছে নিয়ে যাই।"

তাদের দু'জন ছেলে দুটিকে ধরে নিয়ে চললো সর্দারের কাছে। তাদের আগে আগে চললো একজন, তার এক হাতে মশাল, আর এক হাতে সড়কি। আর যে-দু'জন তাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। আলোয় সবই ঝক্‌ঝক্ করছে। কাঁচ-পোকায় উইচিংড়ি ধরলে চিংড়িটির যেমন অবস্থা হয়, তাদের অবস্থা তখন তেমনই।

তারা কিন্তু বাড়ির ফটকে ঢুকলো না, পাঁচীলের পাশ দিয়ে তাদের দু'-জনকে নিয়ে চললো এবং হাত পঁচিশ-ত্রিশ গিয়েই আর একটা ফটকে ঢুকলো।

৪

রূপকথা

ফটকের পর জায়গাটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একপাশে রয়েছে খান দুই পালকি। তাদের ডাঁট বোধ হয় সোনা-রুপো দিয়ে তৈরী; মশালের আলোয় ঝলমল করে উঠলো। পালকির চাল থেকে রেশমের সঞ্জাব ঝুলছে; সঞ্জাবে ফুল আঁকা। আর একদিকে রয়েছে আট-দশটা বড় বড় ঘোড়া। তাদের মধ্যে একটার রঙ দুধের মতো শাদা। ঘোড়াগুলো সাজ পরানো। সাজগুলোও ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

দু'জনে অবাক হয়ে গেল। এ কোন্ দেশ? সুন্দরবনে মাতলার ধারে এমন একটা জায়গা আছে বলে তারা কোনদিন শোনে নি তো! তাদের মনে কেবল ভয় জাগলো না; সেই সঙ্গে দেখা দিলে বিস্ময় ও আনন্দ। এ যেন রূপকথার রাজ্য। এরাজ্যে সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে দুর্বল, সব চেয়ে কুশ্রী যে, সে অসাধ্য সাধন করে সব চেয়ে বড় পুরস্কার পেয়ে থাকে। তারা কি এলো সেই দেশে? তারা দুজনে রূপকথা শুনেছে। এ কি তাই?

কিন্তু তারা বেশিক্ষণ ভাবতে পারলো না; সামনেই দেখলো মস্ত দরজা। তার দুপাশে দুজন ভীমকায় প্রহরী আছে। তাদের কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম ও ঢাল; মাথার বাবড়িগুলো সোনালি সুতো দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা।

লোকগুলোকে তারা কিছু বললে না, ঠিক কালো পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কেবল তাদের লাল বড় বড় চোখ ঘুরতে লাগলো।

দরজা পার হয়ে তারা একটা সরু গলি দিয়ে এগিয়ে চললো। গলিটার মাঝখানে ও শেষদিকে দুটো মশাল জ্বলছিল। যত রাজ্যের বুনো পোকা এসে মশালের আগুনে পুড়ে মরছে ও তার চারধারে ঘুরছে।

তারা এসে পেঁছিলো একখানা ঘরের সামনে। সেখানে ছিল সশস্ত্র পাহারা। তারাও পথ ছেড়ে দিলে।

ঘরে ঢুকেই ভেতরকার সাজ-সজ্জায় তাদের দু'জনের চোখে কেমন ধাঁধাঁ লেগে গেল। এমন সোনা-রুপো-মুক্তোর ছড়াছড়ি, এমন মখমল-রেশমের বাহার, এমন সুগন্ধ, এমন আরামের ব্যবস্থা দেখা তো দূরের কথা তারা ভাবতেও পারে না; এমন কি কোনদিন স্বপ্নেও দেখে নি।

তারা দেখলে ঘরের মাঝখানে মখমলের গদিতে দামী ও ঝলমলে পোশাক পরে এক বুড়ো বসে একটি পদ্ম ফুলের মতো সুন্দর ছোট মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বুড়োর মুখে শাদা লম্বা দাড়ি; কিন্তু তার চোখ দুটোর চাহনি কেমন বাঁকা।

বুড়ো ও মেয়েটি দু'জনেই তাদের দিকে ফিরে তাকালো। তাদের সঙ্গের একজন বললে,—"এই ছোঁড়া দুটো ধরা পড়েছে।"

বুড়ো বললে,—"ওদের বাঘের মুখে ফেলে দে।"

—"কিন্তু সর্দার, এরা জেলের ছেলে।"

—"তবে সাঁতার জানে। ওদের কুমীর-দহর জলে কাল ফেলে দিস্। আমি দেখবো ওরা কি করে কুমীরকে ফাঁকি দিয়ে পারে গিয়ে ওঠে। যা—"

বুড়োর কথা শুনে ছেলে দুটোর মুখ যেন কেমন হয়ে গেল।

তাদের নিয়ে গিয়ে রাখা হোলো, একটা অন্ধকার ঘরে। ঘরে যত রাজ্যের পোকা-মাকড়, ইঁদুর, চামচিকের উৎপাত। শেষে এল এক জোড়া সাপ। কি তাদের ফণা! কিন্তু কিসের সাড়া পেয়ে সব কোথায় গেল সরে! তখন ঘরের দরজা খুলে অরুণালোর মতো ঢুকলো সেই মেয়েটি।

সে এসেই বললে,—"তোমাদের ভয় নেই। বুড়োটা আমাকেও ধরে এনে এখানে বন্দী করে রেখেছে। আমিও পালিয়ে যেতে চাই। আমার দেশ এখান থেকে অনেক দূর। দেশে আমার মা ছাড়া আর কেউ নেই। এরা ডাকাত—লোকের সর্বস্ব লুঠে নিজেরা আরাম করে।"

বরুণ জিজ্ঞেস করলে,—"কি করে আমরা বাঁচবো?"

—"বুড়ো যে-ঘরে ঘুমোয় সে ঘরের দেওয়ালে আছে সুড়ঙ্গ। আমি তা দেখেছি। ডাকাতেরা সকলেই যে ওকে ভালবাসে তা নয়। একজন আছে সে চায় বুড়ো মরুক। তা'হলে সর্দার হবে সে। তার দলেও অনেকে আছে। কিন্তু ওদের টাকা আর ধন-দৌলত সব কোথায় আছে, বুড়ো ছাড়া আর কেউই জানে না। শুনেছি, সে-সব বড় বড় জালা ভর্তি করে একজায়গায় রাখা হয়েছে। এ সব ধন-দৌলত হচ্ছে আগেকার। এখনকার গুলোর কথা সকলেই জানে; আমিও জানি। ঐ সুড়ঙ্গের একটা কুঠুরিতে আছে সেগুলো।

বরুণ বললে—"বুড়ো ঘুমোলে যদি আমরা সুড়ঙ্গে ঢুকে—"

—"উহুঁ! সে হবে না। বুড়োর ঘুম খুব সজাগ। ওকে কেটে ফেলতে হবে। তারপর—"

—"তারপর ওরা যদি আমাদের কাটে ?"

—"না ; ওরা নিজেরাই কাটাকাটি-মারামারি করবে। সেই ফাঁকে আমরা কোঁচড় ভরে মোহর নিয়ে পালাবো।"

সুমন্তর সব মনে নেই। তারপর তারা বুড়োকে মেরে ফেললে—দলের মধ্যে ভয়ানক মারামারি-কাটাকাটি হোলো। ঘোড়া ছুটলো, আড্ডায় আগুন জ্বলতে লাগলো; রক্তে সব লাল হয়ে গেল। শেষে কেউ বাঁচলো না। তারা তিনজনে ডাকাতদের ধন-দৌলত সব এনে গ্রামের গরিব-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলে।

তারপর মেয়েটা তার মায়ের কাছে ফিরে যাবে এমন সময় বরুণের ঘুম ভেঙে গেল। সে স্বপ্ন দেখছিল !......'

কি করে বায়োস্কোপের ছবি তৈরি করা হয়, মাস্টারমশায় সুমন্তদের একদিন ছবির সাহায্যে দেখিয়েছিলেন। তার মতো এবং তার চেয়ে ছোট ছেলেরাও ছবিতে অভিনয় করে। তাদের খুব নাম হয়। সুমন্তর ইচ্ছা সেও একজন অভিনেতা হবে, কিন্তু তা'হলে তো আর আবিষ্কারক হতে পারবে না। আচ্ছা, কে বড় ? অভিনেতা, না, আবিষ্কারক ? মাস্টার-মশায় বলেন—"দু'জনেই।"

তাই-ই হবে। এক একজনএক এক দিকে বড। কেউ আনন্দ দেয়, কেউ মানুষের উপকার করে।

৫

নানা ঘটনা

এদিকে সাহেবের জন্মতিথির ও কলপ্রতিষ্ঠার দিন এগিয়ে আসছে! মাস্টার-মশায় আর বেশিদিন থাকবেন না। তিনি উৎসবের দিন কয়েক আগেই চলে যাবেন।

সুমন্তকে যে-গানটা গাইতে হবে সে প্রত্যহ তা অভ্যাস করছে। তার সুরে সুর মিলিয়ে বাজে বেহালা, অরগান, বাঁশি ও ডুগি-তবলা। গানটার মানে, সাহেব তাদের অন্নদাতা, রক্ষাকর্তা। সাহেব কর্মবীর; কর্মযুদ্ধে তিনি অতিরথ, তিনি দেশপ্রেমিক।'

শুনে মাস্টার-মশায় বলেন,—"দেশপ্রেমিক না ছাই! ও যা করে, করছে সব নিজের জন্যে। ও তোদের খাটিয়ে যা দেয় নিজে পায় দশগুণ! তোদের না'হলে ওর কল চলে? ওর লাভের কড়ি যোগায় কে? তোরা আর খরিদদারেরা। কোপটা পড়ে তোদের ঘাড়েই প্রায় তিন ভাগ!"

এইসব কথা শুনে তার আর গান গাইতে ইচ্ছে হয় না। গানে আছে, সাহেব জন্মে দেশ ধন্য হয়েছে।

মাস্টার-মশায় শুনে হেসে বলেছিলেন,—"ওই ধন্য হয়েছে যে এমন দেশে জন্মেছে যেখানে অনেক লোকে রক্ত-চোষা বাদুড়ের পুজো করে। যাঁরা এ দেশকে ধন্য করেছেন তাঁদের কথা শুনলেও পুণ্য হয়। তাঁরা অন্য মানুষ। তাঁদের নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে, কত গান আছে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে! পড়িস নি বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুরের কথা? শুনিস নি বাঘা যতীনের কাহিনী? জানিস না তোদের মতো কিশোর ক্ষুদিরামের বৃত্তান্ত?" আরও কতজন ছিলেন।

এসব কথা সুমন্তের যেন মনে লাগে না। এমন সুন্দর যার চেহারা তার দোষ যেন চোখেই পড়তে চায় না!

সাহেবের সেই ছেলেটি এসেছে। ওদের বাড়ির অনেকেই এসেছে; আসেন নি কেবল সাহেব। তিনি গেছেন বিলেত।

সেদিন বিকেলে ছেলেটি, নাম তার অরুণালো, নৌকোয় নদীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে সুমন্তকে নিয়েছিল। নৌকোখানা মাঝ-নদীতে যেতেই সে বলে—"এই, আমি জলে একটা টাকা ফেলে দিচ্ছি। তুই ডুব দিয়ে তুলে আনতে পারবি? তা'হলে টাকাটা তোর হয়ে যাবে।"

সুমন্ত কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে যায়! এ কি সম্ভব? এই দুর্দান্ত

নদী, গভীর জল! এর মধ্যে মানুষ ডুবলে তা খুঁজে পাওয়া যায় না তো একটা টাকা!

অরুণালো বলে,—"পারিস্ না? পুরীর মুলিয়ারা পারে। সমুদ্রের জল কাচের মতো পরিষ্কার! টাকা ফেলে দিলে দেখা যায়, টাকাটা চিক্‌-চিক্ করতে করতে জলের তলায় চলে যাচ্ছে। ঠিক তখনই নৌকোর ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মুলিয়ারা টাকা তুলে আনে! আমি পাঁচটা টাকা সমুদ্রে ফেলেছিলাম। দুটো মুলিয়া সেগুলো তুলে এনে ছিল!"

সুমন্ত অবাক হয়ে তার কথাগুলো শোনে।

নৌকোয় ছিল একটা ঝাঁকড়া লোমওয়ালা বড়-সড় বিলিতী কুকুর।

ছেলেটা একটা কাঠের বল তাকে শুঁকিয়ে ছুড়ে জলে ফেলে দিলে। কুকুরটা তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে গিয়ে বলটিকে কামড়ে ধরলে, তারপর স্রোতের বিপরীত দিকে সাঁতরে আসতে লাগলো। ততক্ষণে নৌকোখানা তার কাছে গিয়ে তাকে তুলে নিলে।

অরুণালো বলে,—"তুই এরকম করে বল আনতে পারিস্?"

সুমন্ত চেষ্টা করলে পারে; কিন্তু বলে,—"না।"

—"একটা কুকুরে যা পারে তুই তাও পারিস্ না?"

সুমন্ত মনে মনে বলে, "আমি তো কুকুর নই, মানুষ। তুমিও কি পার?"

ছেলেটির মুখখানি সুন্দর; কিন্তু যখন সে হাসছিল তখন সেই হাসি দেখে সুমন্তের মনে হচ্ছিলো, ছেলেটা শয়তান। হঠাৎ তার মনে হলো, একেই সে একদিন বাঁচিয়েছিল! তার ইচ্ছা হতে লাগলো, নৌকো থেকে সে নেমে যায়। কিন্তু উপায় নেই; নৌকো ও ডাঙার মাঝে অনেকখানি জল নেচে, ঘুরপাক দিয়ে, ফেনিয়ে ছুটে চলেছে।

ওদিকে পশ্চিম আকাশে মেঘ করে এসেছিল। হঠাৎ বাতাস এলো পড়ে; জলে পড়েছে মেঘের কালো ছায়া। গাছপালা সব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন নীল আকাশের গায়ে সবুজ রঙ দিয়ে আঁকা ছবি! এক সার বক শাদা ডানা মেলে কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে চলেছে কোথায় কে জানে। নৌকোখানা তাড়াতাড়ি চললো কূলের দিকে এবং কূলে গিয়ে ভিড়তে না ভিড়তেই গাছগুলোকে দুলিয়ে, নদীকে নাচিয়ে, আকাশখানাকে বিদ্যুৎ তলোয়ারে ছিঁড়ে-খুড়ে, চিরে-চিরে ঝড় ছুটে এলো—হু—হু—হু—শব্দে। সুমন্ত এক লাফে ডাঙায় নেমে বাড়ির দিকে দিলে ছুট। তারপর কে নামলো, কে রইলো, কে পড়লো, সে তার হিসেব নিলো না।

পরের দিন সে শুনেছিল, নামবার সময় ছেলেটার পায়ে চোট লেগেছে; তবে পা ভাঙে নি। ডাক্তার তাকে শুইয়ে রেখেছে। অমন চোট তাদের কত লাগে। কেউ তাদের শুতেও বলে না; কোন ডাক্তারও কোনদিন দেখে না। পয়সাওয়ালাদের শরীর কি পলকা! ওদের বাঁচবার, বাঁচাবার কত উপায়।

দিন দুই হোলো মাস্টার-মশায় চলে গেছেন।

যাবার সময় তাঁর ছাত্রেরা ও তিনি সমানে কেঁদেছিলেন। সুমন্তরা তাঁকে দিয়েছে একখানা পোড়ামাটির ফলক। তাতে খোদাই করা একটি ফোটাপদ্মের মাঝখানে লেখা—'মাস্টার মহাশয়, নমস্কার।' পদ্মটা আঁকা ও লেখা সুমন্তর। উল্টো পিঠে লেখা 'আপনার বড় স্নেহের ছাত্রদল।'

সেখানা হাতে নিয়ে মাস্টার-মহাশয়ের চোখে জল এসেছিল। তিনি বলেছিলেন,—"এমন সুন্দর ছবি, তোদের মনের ছবি, আমি আর কখন দেখি নি। ছবিখানা আমি টাঙিয়ে রেখে দেব। এর দিকে চোখ পড়লেই শুনতে পাব, তোরা সকলে আমার মঙ্গল কামনা করছিস্। আমিও রোজ তোদের নমস্কার করবো।"

সুমন্তর মনটা খারাপ হয়ে আছে। নদীর ধারে, এক জায়গায় কয়েকটা সোঁদালের গাছ ছিল। গাছগুলোতে এখন থোকা থোকা হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে! গাছের পাতা এক রকম দেখাই যায় না; যেন সোনায় ছেয়ে গেছে! সুমন্ত তার তলায় একা বসে ভাবছে, তার ছাত্র-জীবনের কথা। সে আরও যদি পড়তে পায়! কিন্তু তা আর হবে না। তাদের ইস্কুলটা উঠে গেল! বড় ইস্কুলে পড়বার মতো তার সময়ও নেই, পয়সাও নেই! তার বাবা এখন বাড়িতে টাকা-পয়সা দেয় না। তার মাইনের টাকাতেই সংসার চলে।

সংসার বলতে সে আর তার মা। মা তো কোনদিন খায়, কোনদিন খায় না। সে এখন কবিরাজী চিকিৎসা করাচ্ছে। ওষুধের দাম লাগে; তবে কবিরাজ-মশায় ভিজিট নেন না। মায়ের পথ্য ও নিজের ভাত সে নিজেই তৈরি করে। সব দিন পারে না; পাশের বাড়ির ময়রাবুড়ী তাকে সাহায্য করে। বুড়ী খুব ভাল। ওর একমাত্র দোষ বড় বকর্-বকর্ করে আর কাশে।

বুড়ীর এক জ্ঞাতি সেদিন বলছিল,—"তোর মাকে পীরসাহেবের ওষুধ খাওয়া সুমু। পীরসাহেবের ওষুধে আমি মরা মানুষকে জীয়ন্ত হতে দেখেছি।

তিনি পয়সা-কড়ি নেন না; কেবল দরগায় দিতে হয় সোয়া পাঁচ আনার সিন্নি। কিন্তু ওষুধটা আনতে হবে অমাবস্যার রাতে।"

সুমন্ত বসে বসে সে কথাটাও মনে মনে আলোচনা করছিল।

পীর-সাহেবের দরগা সে একবার দেখে এসেছে। দরগাটা ওপারে সেই করিমপুরে। কিন্তু অমাবস্যার রাতে সেখানে সে যাবে কি করে? নৌকোই বা পাবে কোথায়? তার সঙ্গেই বা যাবে কে? তবে যদি সন্ধ্যাবেলা খেয়াপার হয়ে যায়; কিন্তু রাতের বেলা এক ডাক ছাড়া আর কাউকে পাটনি পার করে না। ফিরবেই বা কেমন করে? তবে সে বুড়ীর কাছে শুনেছে অমাবস্যার এখনও দেরি আছে পনেরো দিন। আর সাতদিন পরে সাহের জন্মতিথি। তারপর অমাবস্যা।

গাছপালার মাথার ওপর চাঁদ উঠেছিল;—পূর্ণিমার চাঁদ। চারধারে ছায়া ও আলো। সোঁদাল ফুলগুলো জ্বলছে; নদীর বুকে ঢেউগুলো ঝলমল করছে। বাতাসে ভাসছে বকুল ও সোঁদালের মিঠে গন্ধ। পাশেই কোন একটা গাছে যেন আম পেকে উঠেছে। ফুলের গন্ধের সঙ্গে ফলের মধু-বাস গেছে মিশে। একটা বাদুড় সন্ সন্ শব্দে উড়ে এসে গাছটার ডালে বসলো। গাছের ডালে বোধ হয় টিন বাঁধা ছিল। কে যেন দড়িতে টান দিলে। টিনটা ঢং ঢং করতেই বাদুড়টা গেল উড়ে। কয়েকটা ডাল দুলতে লাগলো।

তার কাছ থেকে নদীর জল হবে হাত দশেক নিচে। সেখানে পাতা ছিল গোটা ছয়েক দোয়াড়। সেগুলোর মধ্যে তারও একটা দোয়াড় আছে। দোয়াড়ে ছোট ছোট মাছ পড়ে; কখন কখন দু'-একটা সাপও ঢোকে। সাপ মাছের মতোই বন্দী হয়। তবুও তার শয়তানী স্বভাব যায় না। বন্দী সাপটা মাছ খেয়ে টাকা-ভরা গেঁজের মতো পড়ে থাকে।

সুমন্তর ইচ্ছা হতে লাগলো তার দোয়াড়টা তুলে দেখে কত মাছ পড়েছে। আগের দিন সে দোয়াড়টা পেতেছিল, এ পর্যন্ত তোলে নি। হয়তো মাছ যা পড়েছিল সব বেরিয়ে গেছে, কিংবা যা পড়েছিল তা ভোরবেলা কেউ চুরি করে নিয়েছে। মাছ-চোরেরা আবার রাত-দুপুরেও মাছ চুরি করে থাকে। চোরের ভয় নেই। অথচ কেউ বলে না—'লোকটা চোরের মতো সাহসী!'

হঠাৎ তার নাকে লাগলো একটা উৎকট আঁশটে গন্ধ। জলের ধারে এমন গন্ধ পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু এ গন্ধটা যেন—

সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, কুলের কাছে কি যেন আস্তে আস্তে

নড়ছে। সেই সময়ে হঠাৎ সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়লো। সেই আলোয় দেখলে সচল বস্তুটি একটা কুমীর। সুমন্ত চীৎকার করে সেখান থেকে দিলে ছুট। ছুটতে ছুটতে শুনতে পেল, জলে হুড়মুড় শব্দ। কুমীরটা জলে নেমে পড়েছে। ও কার জন্যে কুলে উঠেছিল তখন সে বুঝতে পারলে না! কিন্তু পরদিন রসিক বললে,—"কাল বড় বাঁচা বেঁচেছিস্!"

ও কি করে ব্যাপারটা জানতে পারলো?

সুমন্তদের জমিখানা তার বাবা বেচে দিয়েছে। সেখানে তৈরি হয়েছে একটা দোতলা বাড়ি। তার চারধারে ফুলের বাগান। বাড়িখানা সুন্দর। তার নাম 'গেস্ট হাউস।' সে বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে সাহেব-সুবো। তাদের দেখলেই মনে হয় বড়লোক।

তার এধারে হয়েছে ব্যাংক। তার কাছ থেকে কিছুদূরে একটা লাইব্রেরী। তাতে অনেক বই আছে। সুমন্তর ইচ্ছা হয়, সেখানে গিয়ে বই পড়ে! কিন্তু সাহসে কুলোয় না; তার মতো কেউ তো সেখানে যায় না। সেখানে যারা যায়, তারা সকলেই ভদ্রলোক। তাকে সেখানে তারা বসতে বা বই পড়তে দেবে কেন? তার সাথীদের মধ্যেও অনেকে বই পড়তে চায়। কিন্তু তার মতো তাদেরও যেতে সাহস হয় না।

সে ঠিক করেছে, আজ কাজে যাবে না, তার মায়ের কাছে থাকবে। কাল তার মায়ের ভয়ানক জ্বর এসেছিল। জল-পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছিল; মুখে এক ফোঁটা জল দেবার কেউ ছিল না। এর সঙ্গে আবার কাসি। তার যদি একটা বোন কি ভাই থাকতো তা'হলে এ সময়ে কত কাজে লাগতো! তার তিনটে বোনও ছিল। কিন্তু সব ক'টা মারা গেছে! মা তাদের কথা এখনও বলে আর কাঁদে। মায়ের কথা শুনে সুমন্তর চোখের পাতা ভিজে ওঠে। মরবার সময় বড় বোনটার জ্ঞান ছিল। সে মাকে কাঁদতে দেখে বলেছিল,—"মা, তুই কাদিস্ নে।"

তার মনেও কি তখন দুঃখ হয় নি?

সেকথা শুনে তার মা আরও কেঁদেছিল। এখন তো কাঁদেই।

দুপুরে খাবার ছুটি হোলে দুঃখহরণ বাড়ি এলো। তার মেজাজ কেমন যেন চড়া হয়ে গেছে। সে বললে,—"সুমন্ত, তুই আজ কাজে গেলি না যে?"

—"মায়ের অসুখটা কাল থেকে বাড়াবাড়ি। ওর কাছে কে থাকবে?"

—"তবে তুই মায়ের কাজেই থাক ; কাজ-কর্ম কিছু করিস্ নে। কে তোকে খেতে দেয় দেখি !"

সুমন্ত চুপ করে রইলো। সত্যি কথা। কাজ না করলে সে খাবে কি ? তার বাবা তো তাদের আর দেখে না ; কখন বাড়ি আসে, কখন আসে না, সাহেবের বাড়িতেই থাকে। তার আয়ে সংসার চলে, মায়ের চিকিৎসা হয়। কিন্তু সে আর ক'টা টাকা ? যদি কেউ খোঁজ রাখতো, তার মায়ে-ছেলে খেয়ে-পরে কেমন সুখে আছে ! কতদিন সুমন্ত মাত্র একবেলা খেয়েছে। কখন কখন সে এর-ওর গাছের ফল-পাকুড় খেয়ে থাকে। তাদের আম-কাঁঠালের ক'টা গাছ, তার বাবা ও-পাড়ার বিশ্বেশ্বরকে জমা দিয়ে টাকা নিয়েছে। তবুও সে লুকিয়ে-চুরিয়ে তার দু'একটা ফল খায় বৈ কি !

এক পেট ক্ষিদে নিয়ে মানুষ কতদিন সাধু থাকতে পারে ? যাদের অনেক আছে তারাই চুরি-ডাকাতি করছে তো যার নেই তার তো কথাই নেই। তবুও লোকে গাল দেয় তাকেই ! শাস্তিও ভোগ করে সে। তার ওপর সে কিশোর। খিদে তার বেশী। এখন যে শরীরের বাড়-বাড়ন্তর সময়।

সুমন্তর মা আস্তে আস্তে বললে,—"তুই কাজে যা সুমু ; আমার কাছে কাউকে থাকতে হবে না।"

সুমন্তর বাবা বললে,—"ওর বাবার কল কিনা, তাই যখন ইচ্ছে তখন যাবে। কাজের একটা 'টাইন্' আছে।"

সুমন্ত তবুও উঠলো না, চুপ করে মায়ের কাছে বসে রইলো।

তার বাবা বললে,—"তোকে গান শিক্ষে করতে হবে জানিস্ ? এখানে বসে থাকলে চলবে ?"

সুমন্ত তবুও কোন কথা বললে না।

—"যাবি নে !"

—"মায়ের কাছে কে থাকবে ?"

—"তোর মায়ের তো নিত্যি-তিরিশ দিন অসুখ। তাই বলে লোকে কাজ-কম্ম করবে না ?"

সুমন্ত বাবার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সে তার চাহনিতে যেন রয়েছে কত কথা !

সুমন্তর মা আস্তে আস্তে বললে,—"যা সুমু !"

তার বাবা বললে—"যা শীগ্‌গির ! লেখা-পড়া শিখে একেবারে

বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। আরে আহাম্মক! সাহেবের কাছে গান গাইলে তোর মাইনে বাড়বে, এটা বুঝিস্ নে?"

সুমন্তর মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল,—"আমার একার মাইনে বেড়ে কি হবে?"

—"কি! শয়তানদের সঙ্গে মিশেছ! এবার তোমার ব্যাপার বুঝলাম। দাঁড়াও তোমাকে সিদে করছি। ওদেরও রক্ত দেখবো, তোমারও পিঠের চামড়া তুলবো। গান তোকে গাইতেই হবে।"

হঠাৎ সুমন্তর রোখ চেপে গেল; তার মা বলে, এমন রোখ তার দাদামশায়েরও ছিল। বাঁকলে আর কেউ তাকে সিদে করতে পারতো না।

সুমন্ত বললে,—"আমি গান গাইবো না।"

দুঃখহরণ বললে,—"গাইতেই হবে তোকে।"

সুমন্ত আর কোন কথা বললে না, পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলো।

দুঃখহরণ ছেলেকে চিনত; স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে,—"কেন গাইবি না? জানিস্, তুই গান গাইলে আমারও ভাল হবে?"

সুমন্ত এবার কেমন যেন হয়ে গেল। সে তার নিজের উন্নতির পথ ছাড়তে পারে; কিন্তু তার মা-বাবার জন্যে সে করতে পারে না কি? মায়ের জন্যে সে যে কতখানি দুঃখ ভোগ করছে, সে কথা কেউ তো বুঝতে পারে না! আর তার বাবা—বাবাকে খুব সে ভালবাসে। তার ওপর তার হয়েছে কঠিন অভিমান। কেন, তা সে নিজের কাছেই প্রকাশ করতে চায় না।

এ অবস্থায় সে যে কি করবে, বুঝে উঠতে পারলে না। এখন যদি সে মাস্টার-মশায়ের একবার দেখা পেত? এত বড় শহরে তাঁর মতো একটি লোকও কি নেই?

অবশেষে বললো,—"তুমি মায়ের কাছে থাক, আমি যাচ্ছি।"

—"আমি? আমাকে এখনই যেতে হবে বেলগেছের হাটে, বিশটা পাঁঠা আর বিশটা খাসি কিনতে। তুই যা।"

সুমন্ত বললে,—"মা যদি ভাল থাকে যাব।"

—"তবে তুই আমার ভাল চাস না?"

—"চাই।"

—"তবে যাচ্ছিস্ না যে?"

—"তুমি ভাল আছ।"

দুঃখহরণ চট করে এ কথার উত্তর দিতে পারলে না; একটু চুপ করে থেকে বললে,—"তুমি গোল্লায় গেছ। তোমাকে দাওয়াই দিতেই হবে।"

সে আর দাঁড়ালো না ; ছেলের কথায় তার মনের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগলো।

দুঃখহরণ চলে গেলে সুমন্তর মা তার শীর্ণ তপ্ত সিক্ত হাতখানা বাড়িয়ে সুমন্তর মাথাটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, —"আমার কাছে কত দিন বসে থাকতে পারবি বাবা? এ রোগ সারবে না। তোর ভাল দেখে যদি মরতে পারি তা'হলে সুখে মরব।"

সুমন্তর গলা ধরে এলো। সে বলতে পারলে না, 'তুমি সেরে উঠলেই আমার ভাল।'

সে মনে মনে স্থির করলে, অমাবস্যার রাতে সে একাই যাবে পীর-সাহেবের দরগায়। হরা জেলের ডিঙিখানা সে চেয়ে নেবে; না দেয় চুরি করবে। সে হাল ধরতে, বৈঠা মারতে ভালই জানে। মায়ের কষ্ট সে আর দেখতে পারে না!

সারাদিন একভাবে কাটিয়ে তার মা একটু বেশি রাত হলে ঘুমিয়ে পড়ল; মনে হোলো তার জ্বরটাও যেন কমে গেছে। সকালের চারটি জল-দেওয়া ভাত ছিল। একটা পাতি লেবুর রস ও একটু নুন দিয়ে ভাতগুলো খেয়ে সুমন্ত তার মায়ের পাশে ছেঁড়া মাদুরখানার ওপর শুয়ে পড়ল।

তারপর ভোরে মিলের ভেঁা শুনে তার ঘুম ভাঙল। ইচ্ছে ছিল, একটু রাত থাকতে উঠে সে চারটি চাল ফুটিয়ে নেবে। কিন্তু তা আর হোলো না। তার মায়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলে গতকালের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা। মা তখন ঘুমোচ্ছিল।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখে ময়রা-বুড়ী ধামাহাতে গুটি-গুটি চলেছে। বললে,—"আইমা, একটু নজর রেখ।"

বুড়ী "হুঁ" বলে আমতলার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। বুড়ীর একটা আমগাছ আছে। রাতের বেলা গাছ থেকে যে পাকা আমগুলো পড়েছে বুড়ী বোধ হয় সেগুলো কুড়োতে চলেছে।

কলে যেতেই সুমন্তর ডাক পড়ল সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে। ডাক শুনে সুমন্তর বুক কাঁপতে লাগল।

সাহেব পাইপ মুখে চেয়ারে বসে কাগজ-পত্র নাড়ছিলেন।

সুমন্ত গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই সাহেব চোখ একটু তুলে একবার

তাকিয়েই তেমনই আপন মনে কাজ করতে করতে দেঁতো সুরে বললেন, —"কাল আসিস্ নি কেন ?"

—"মায়ের অসুখ।"

—"আজ রাত দশটার আগে বাড়ি যেতে পারবি না। গানটা বেশ করে শিখে তবে বাড়ি যাবি।"

সুমন্ত মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলো। তা'হলে তার মাকে দেখবে কে ?

সাহেব বললেন, "যা—"

সুমন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এল ; কিন্তু মনে মনে বললে,—"আমি থাকব না।"

ঐ লোকটার মুখখানা দেখতে কনেসটেবলের নাগরা-জুতোর মতো। কেউ ওকে পছন্দ করে না ; সবাই ওকে গাল দেয়।

সুমন্ত ফিরে এসে কাজ করতে লাগলো।

তার জুড়িদারেরা জিজ্ঞেস করলে,—"সাহেব কি বললে রে ?"

—"রাত দশটা অবধি থাকতে হবে।"

—"সকলকে ?"

—"না ; আমাকে।"

—"তুই থাকবি ?"

সুমন্ত কোন উত্তর দিলে না ; সব জায়গায় সাহেবের চর আছে।

দুপুরের ছুটি হোলে, সে কল থেকে বেরিয়ে বাড়ি এলো। দেখলে, তার মা বসে গয়লা-বৌয়ের সঙ্গে গল্প করছে।

সে ঘরে ঢুকেই কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লো। তার মনটা হালকা হয়ে গেল।

ক্ষিদেয় তার পেট দারুণ জ্বলছে। পথে বলাই পালের দোকান থেকে চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়ে আবার এক গেলাস জল খেয়ে ছুটল মিলের দিকে। তার মনে আনন্দ ও উৎসাহ এসেছে।

কিন্তু কাজ করতে করতেই বিকেলের দিকে আবার তার মন বেশ ভার হয়ে উঠল এবং ছুটি হোলে সে আর দাঁড়াল না, বাড়ি চলে গেল।

৬

সংগ্রাম

সেদিন সন্ধ্যার পর তার বাবাও আবার বাড়ি এল।

এবার সে তাকে কেবল বকলেই না, বেশ ঘা কতক দিয়ে বললে,—"আমার চাকরিটাও তুই খাবি? 'সুপুরিনটে' সাহেব বলছে 'তোর ছেলেকে যখন তুই শায়েস্তা করতে পারিস্ না তখন তোকেও রাখব না। সে আমার কথার অবাধ্য হয়ে চলে গেছে।"

সুমন্তর মা চুপ করে তাকিয়ে রইলো। ছেলেটা তাকে এত ভালবাসে যে, তার জন্যে মার খাচ্ছে!

সে বললে,—"ছেলে-মানুষ! সকাল থেকে খাটছে। সারাদিন কিছু খায় নি। ও কি আর পারে?"

সুমন্তর বাবা বললে,—"আর ওকে পারতে হবে না। কাল ও গেলেই ওর গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। সেই সঙ্গে যেতে হবে আমাকেও। তোমার জন্যেই ও গোল্লায় গেল।"

সুমন্তর মা জানত, তার সুমু ঠিকই আছে, অমন ছেলে খুব কম দেখা যায়। মায়ের জন্যে ক'টা ছেলে এমন করে? তার মনে যেমন গর্ব ও আনন্দ হোলো, তেমনই হোলো দুঃখ।

সে নিজে তো আর বাঁচবে না, অথচ তার জন্যে ছেলেটা গাল-মন্দ সয়ে, মার খেয়ে উপবাসী থেকে কত কষ্ট সইছে! সে মরবে একথা সত্য, কিন্তু মরণটা কেন শীঘ্র হয় না?

সুমন্তর বাবা বললে,—"তোর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোর জন্যে আমার কেন সর্বনাশ হবে? তুই আর এ বাড়িতে থাকিস্‌নে।"

সুমন্ত তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তখনই চলে যাবার ইচ্ছা থাকলেও তার পা দুখানা চললো না।

"আচ্ছা, তুই না যাস, আমিই আর আসব না।" বলে দুঃখহরণ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সুমন্তর মা তাকে কাছে ডাকতেই সে সেখানে বসে পড়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বেচারী! কি যে করবে ভেবে পেল না। একদিকে তার রোগ-জীর্ণা মা, আর একদিকে তার বাবার চাকরি।

নিজের চাকরির কথা সে বড় করেই দেখল না। সে ছোটলোকের ছেলে। ভদ্ররা তো তাই বলে। একটা চাকরি গেলে আর একটা চাকরি জোগাড় করে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন নয় যতদিন হাত দুখানা শক্ত আছে।

তার গায়ে জোর আছে। সে কাজে এমন পটুতা দেখিয়েছে যে, ছোকরা-মজুরদের মধ্যে তার বেশ খাতির। সকলেই তাকে একটু খাতির করে, যেমন খাতির করে থাকে সর্দারকে।

সে ভেবে দেখল, তার বাবা যা বলেছে, তা ঠিক। সে বরং ময়রা-বুড়ীর বাড়িতে গিয়েই থাকবে। তা'হলে তার মাকেও দেখা হবে, বাবার বাড়িতেও থাকা হবে না। এতেও যদি তার বাবাকে ফল ভোগ করতে হয়, তার আর কিছু করবার নেই।

পরদিন সে কলে যেতেই আবার সাহেবের ঘরে তার ডাক পড়ল।

সাহেবের মেজাজ আজ এমন গরম যে, তার মাথায় জলভরা কেটলি রাখলেও বোধ হয় তার জল কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফুটে ওঠে।

সুমন্ত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন,—"এই র‍্যাস্‌ক্যাল, কাল তুই কল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলি যে?"

সাহেবের দাঁতগুলো কড়মড় করতে লাগলো; চোখ দুটো মোটর-গাড়ির আলোর মতো জ্বলতে লাগলো।

সুমন্ত বললে,—"আমি ছুটি হলে গিয়েছিলাম।"

সাহেবের টেবিলের ওপর বেতের লাঠিখানা পড়ে ছিল। তিনি তার দিকে চকিতে একবার তাকিয়ে বললেন,—"আমি তোকে থাকতে বলেছিলাম না?"

—"হাঁ।"

—"থাকিস নি কেন?"

—"মায়ের অসুখ। তা ছাড়া আমার কাল খাওয়া হয় নি।"

—"মায়ের অসুখের কথা তোর বাবা তো কিছু বলে না। আর, এক-বেলা না খেলে মানুষ মরে যায়?"

সুমন্ত খরখরে চোখে সাহেবের দিকে একবার তাকাল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, বলে, 'সাহেব, তোমাকে এখানে দিনের মধ্যে চারবার কত রকমের খাবার খেতে দেখেছি। তুমি কেন একদিনও উপোসী থাক না? আর মায়ের কথা? তোমার মা বোধ হয় কোনদিনই ছিল না।' কিন্তু সে আত্ম-সংযত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—"তোকে 'স্যাক' করবো।"

—"বেশ।"

—"কি! স্টুপিড্। আবার 'স্পিরিট' দেখাচ্ছ? আমাকে অপমান! যা, তোকে কাজ করতে হবে না।"

সুমন্ত ঘর থেকে বার হয়ে গেল এবং তারপর মিনিট চারেকের মধ্যে তার কাজের জায়গায় গিয়ে পৌঁছতেই সে শুনলে, তাকে চাকরি থেকে অন্যায় ভাবে 'ডিস্‌মিস্' করা হয়েছে বলে সমস্ত মজুর ক্ষেপে উঠেছে।

সে অবাক হয়ে গেল। খবরটা যেন বেতারে চারধারে ছড়িয়ে গেছে। কৈ, সেখানে তো কেউ ছিল না; সেও তো কাউকে এপর্যন্ত খবরটা দেয়নি। ত'হলে কি কল-বাড়ির ইট-পাথরগুলো জীবন্ত? সেই সঙ্গে তার মনে এক নতুন চেতনা এলো। এর আগে সে নিজেকে মনে করত নিঃসঙ্গ, দুর্বল। আজ হঠাৎ দেখলে, তার চারধারে রয়েছে এক বিরাট শ্রমিক-সমাজ। সে তারই অংশ। তার শক্তি কত! এই সমাজকে সে মাঝে মাঝে অনুভব করতো মাত্র; আজ হঠাৎ তাকে দেখতে পেল, সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে যেন এক শক্তি-সমুদ্র ঢেউয়ে উঠছে।

সে কল-ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে এমন সময় সর্দার এসে বললে,—"তুমি জায়গায় যাও নি কেন?"

—"আমাকে 'ডিস্‌মিস্' করেছে।"

—"না, সাহেব সে অরডার দেন নি। যতক্ষণ আমি তা না পাচ্ছি, ততক্ষণ তোমাকে এখান থেকে যেতে দেব না। কাজ কর।"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! আজকে কি তাকে কেবল বিস্ময়ের মধ্য দিয়েই যেতে হবে?

সারাদিন সে উন্মনা হয়ে কাজ করলে। কিন্তু তারপরও অরডার আর এল না। তবে শুনতে পেল, সাহেবের জন্মতিথির গানটা তাকে গাইতে হবে না, গাইবে আর একটি ছেলে। সুমন্তর ঘাড় থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল।

সাহেবের জন্মতিথির উৎসবের আর কয়েকটি দিন মাত্র বাকি। বড় মাঠটায় প্রকাণ্ড সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। একধারে খাটানো হয়েছে স্টেজ। রসুই করবার জন্যে একটা জায়গা ঠিক করে সেখানে পাতা হয়েছে বড় বড় চুল্লি। বড় বড় হাঁড়ি, কড়া, হাতা-খুন্তি ও কতরকমের বাসন-পত্র এসেছে। সুমন্তর বাবা সেদিন হাট থেকে কিনে এনেছে এক-পাল পাঁঠা ও খাসি। শোনা যাচ্ছে, খাওয়ানো হবে মাংস, খিচুড়ি, চাটনী, বোঁদে আর দই। মজুরদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে একখানি করে কাপড়

ও একটি করে টাকা। তারা তাদের ছেলে-মেয়েদেরও ভোজে আনতে পারবে!

সাহেবের বাড়িতে অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছে ও আসছে। তাদের মধ্যে বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে। তাদের কি সাজ-পোশাক! কি চাল! কি চেহারা! এখানকার সকলকে এবং সব-কিছুকে তারা এমনভাবে তাকিয়ে দেখে যে, পরিষ্কার বোঝা যায়, তারা একেবারে অন্য জগতের মানুষ। তাদের কাছে এসব একেবারে অদ্ভুত ও তাদের অনেক নিচের স্তরের।

তারা গাছ পালা চেনে না, ফুল চেনে না, নদীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। খেজুর গাছকে বলে, আনারস গাছ। তারা কারও সঙ্গে বড় একটা কথাও বলে না; আবার, এখানকার লোকের কথা শুনে হাসে। হাসিটা যেন কেমন!

সুমন্ত তাদের কয়েকজনের সামনে একবার পড়েছিল। সেই দলটিতে ছিল, চারটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। সকলেই তার চেয়ে বড়।

বড় রাস্তার ধারে মধু বাউরির বাড়ি। বাড়ির বার দিকে বেড়ার কোলে আছে একটা ফসলা ও এক জোড়া গাব গাছ। কয়েকটা গাব পেকে দেখাচ্ছিল সোনার গোলার মতো, আর, ফলসাগুলো পেকে হয়ে উঠেছিল কালো।

ছুটির পর সুমন্ত বাড়ি যাচ্ছিল। সেখান দিয়ে যেতে যেত দেখলে, তারা ছ' জনে আসছে।

একটি মেয়ে ফলসাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে,—"ফলসা! ফলসা! ও ছোটদা পাড় না।"

মধু বাউরি বড় কড়া লোক। একটা কুটো কেউ ওর বাড়ি থেকে নিতে পারে না তো এক মুঠো পাকা ফলসা! সেবার একটা গাবের জন্যে সুমন্তকে খেতে হয়েছিল, দুটো চড়। সে ব্যথা এখনও তার মনে আছে। সুমন্তকে দেখে 'ছোটদা' বললে,—"এই! শোন্।"

সুমন্ত তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বললে,—"ঐ গাছটা থেকে কতকগুলো ফলসা পাড়তে পারিস্? পয়সা দেব।"

সুমন্তর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললে,—"যার গাছ সে গাল দেবে। পারব না।"

—"দুটো ফলসা পাড়লে গাল দেবে? আমরা কল-বাড়িতে থাকি।"

সেদিন হাট ছিল। সুমন্ত বললে,—"হাটে ফলসা বিক্রি হয়। ঐ দিকে নদীর ধারে হাট।"

—"হাটটা বড় ?"

—"এ তল্লাটে এত বড় হাট আর নেই।"

—"হাওড়ার হাটের চেয়েও বড় ?" ছোটদা কথাটা শেষ করতে করতেই দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

সুমন্ত কিন্তু একটুও অপ্রতিভ হল না, শান্তভাবে বললে,—"হাওড়ার হাট আমি দেখি নি।"

—"আচ্ছা, তোদের দেশের হাটটাই আমাদের দেখা।"

—"এই রাস্তাটা ধরে সোজা চলে গেলেই হাটের ধারে গিয়ে পড়বেন।"

—"তুই সঙ্গে যাবি না ?"

—"না। আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

—"পয়সা দেব।"

—"আমার সময় নেই" বলে সুমন্ত বাড়ির দিকে হন-হন করে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, এদের পয়সা কি সস্তা! কত সহজে হাতে এসেছে!'

তারা যে সুমন্তের সম্পর্কে কোন অশোভন মন্তব্য করেছিল, তা সে পরিষ্কার না শুনতে পেলেও বুঝতে পারলে। সে তাদের বিষয় আর ভাবলে না।

সুমন্তদের পাড়া থেকে আরও চারটি ছেলে মিলে যায় কাজ করতে। সুমন্তর মা ভাল থাকলে সন্ধ্যার পর সে তাদের ডেকে নিয়ে কোন নদীর ধারে হাত-সুতো দিয়ে মাছ ধরতে যায়; নদীর ধারে কোনদিন বসে বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে গান করে; কখন কখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমতো দেশ-বিদেশের ও সাহেব সুবোর আলোচনা করে থাকে। আর, আলোচনা করে তাদের মিলের ওপর ওয়ালাদের।

সুমন্ত সেদিন বাড়ি এসে দেখলে, তার মা ভাল আছে। সে হাত-মুখ ধুয়ে জল-দেওয়া ভাত খেয়ে মায়ের কাছে কিছুক্ষণ বসল। তার মা খায় মুড়ি, বার্লি, কখন কখন এক মুঠো ভাত এবং কদাচিৎ একটু দুধ। দুধটা বুড়ীর গরুর; মন ভাল থাকলে আদর করে বুড়ী তাকে খেতে দিয়ে যায়। সুমন্তদের গরুটি অনেক দিন থেকে সর্দারের গোয়ালে বাঁধা আছে। গরুটা ছিল ভাল; দুধও দিত বেশ। কিন্তু সুমন্তর মায়ের অসুখ হলে তার

বাবা তাকে বিদায় করে দেয় ! কেননা তাকে দেখা-শোনা করবে কে ?

সুমন্ত চালের বাতা থেকে হাত-সুতো ইত্যাদি পেড়ে নিয়ে চলল নভাইদের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে টোপ যোগাড় করে সত্যকে নিয়ে গিয়ে বসলো কাঁঠাল তলার ঘাটে।

ওখান থেকে তারা কয়েকবার কয়েকটা মাছ ধরেছিল, বোয়াল আর রিটে। বোয়াল মাছটা নভাইয়ের একটা আঙ্গুল এমন কামড়ে ধরেছিল যে, সে আঙ্গুল নিয়ে ভুগেছিল পূরো দু'মাস। আর, সতুর কাকা ধরেছিল একটা এক মণী কেঠো। তার মাথাটা ছিল কলাগাছের মতো মোটা। সেই কেঠোর মাংস খেয়ে শশী সর্দার কলেরায় মারা যায়। সে মাংস অনেকেই তো খেয়েছিল, তবে সে কেন মারা গেল ?

শশী সর্দার অনেককে লাঠি খেলা শিখিয়েছিল।

সে বলত,—"বাবা, শুধু খেলা শিখলেই হয় না, চাই সাহস। আর লাঠি-খেলা জানলেই যে 'কেজের' সময় বাজিমাৎ করা যায়, তাও নয়। তখন এই 'তামেচা-বাহেরা' কোন কাজে লাগে না। লাঠি খেলা শিখলে লাঠির ওপর দখল আসে ; চালাকীর সঙ্গে লাঠিবাজি করা যায় ; দম থাকে।"

সুমন্ত এ পর্যন্ত তার প্রমাণ পায় নি। সুমন্ত শুনেছে, তার ঠাকুরদার বাবা ছিল পাকা লেঠেল। তার সঙ্গে কেউ পারত না। তার বাবাও লাঠি ধরতে পারে ; কিন্তু ঠাকুরদার বাবার কাছে কিছুই না। শীতল সর্দারও বলত, "দুখেটা বাপ-ঠাকুরদার নাম ডুবিয়েছে !"

সুমন্ত লাঠি-খেলা জানে না। তবে তার রোখ খুব, আর চেহারাটাও উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলের মতো, যদিও তার বয়স ষোলোও পার হয় নি। তার হাতের কব্জি ও বুকের ছাতি বেশ চওড়া, পায়ের ডিম মোটা।

সমবয়সী একটা দেশওয়ালী মজুর ছেলের সঙ্গে কলবাড়ির দক্ষিণের মাঠে তার একদিন গায়ের জোরের পরখ হয়েছিল। ছেলেটা সুমন্তর চেয়েও লম্বা-চওড়া। বহু লোক দাঁড়িয়ে দেখেছিল। দেশওয়ালী মনে করেছিল, 'বাঙাল চিংড়ী পটাক যাবে।' শেষে তাদের 'ছাতুই' আছাড় খেয়ে 'হালুয়া' বনে গিয়েছিল।

সুমন্তরা তো একটা জায়গা বেছে নিয়ে থলে পেতে বসলো। টোপ গেঁথে সুতোও ফেললে ; কিন্তু সময়টা যে জৈষ্ঠের শেষ। তাদের বেশিক্ষণ বসতে দিলে না ; উত্তর দিক থেকে ঝড় ছুটে এলো। তারাও তাড়াতাড়ি সুতো গুটিয়ে দিলে ছুট।

জায়গাটা শহরের একেবারে শেষে। কিছুদূরে বাড়ুপুরের শ্মশান। সেখান থেকে চব্বিশ ঘন্টা ধোঁয়া উঠছে। শ্মশানের এক জায়গায় ছিল একখানি টিনের ঘর ; যারা মরা পোড়াতে আসে, তারা সেখানে বিশ্রাম করে।

সেদিন দুপুর অবধি সেখানে গোটা চারেক মরা পুড়েছিল। তখন আর কেউ ছিল না। সুমন্তরা কাছে কোন আশ্রয় না পেয়ে তিনজনে সেই টিনের ঘরে গিয়ে উঠলো ! ঠিক সেই সময় এলো এক হাওয়া দমকা। তাতে চালখানা ফড়্-ফড় শব্দে বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে গিয়ে পড়লো নদীর জলে। বেড়াটা গেল কাৎ হয়ে। তখন সেখানে থাকা না-থাকা সমান ; বরং একটু বিপদ দেখা দিলে।

সেখান থেকে বাজারের শেষ বা প্রথম ঘরগুলো প্রায় এক মাইল দূর। পথের দু' পাশে বড় বড় গাছ। ঝড়ে মাতামাতি করছে। সন্ধ্যার একটু পরে চাঁদ উঠেছিল ; কিন্তু মেঘের আড়ালে তা ঢাকা পড়ে পৃথিবী বিকট অন্ধকারে ডুবে আছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনজনে বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাজারের দিকে চললো। কারণ ঝড়ের সময় গাছতলায় দাঁড়ানো নিরাপদ নয়।

দূরত্বটা সংক্ষেপ করতে তারা রাস্তা থেকে মাঠে নেমে ছুটতে লাগলো। মাঠখানা পার হয়ে বড় রাস্তাটার ওপর উঠতেই হঠাৎ একটা মড়মড় শব্দ হোলো। ঝড়ের দাপটে সামনে কোথায় যেন একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়লো। শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মানুষের আর্ত্তনাদ শুনতে পেল।

তিনজনে সভয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বিদ্যুতের আলোয় দেখলে রাস্তার ওপর একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। ডালটির পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেই তাদের কানে এলো গোঙানির শব্দ। ডালটার নিচে যে কেউ চাপা পড়েছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। কিন্তু তার গোঙানি শুনে নিভাই ও সতু ভয়ে কেমন যেন হয়ে গেল।

সতু বললে, "সুমু, শীগগির পালা।"

সেই সময় শুরু হোলো বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা, বাতাসের বেগে গুলতির মতো গায়ে মাথায় বিঁধতে লাগলো।

সুমন্ত বললে,—"লোকটাকে ফেলে পালাবো ? ওকে ডালটার নিচে থেকে বার করি চল্।"

কিন্তু বিদ্যুতের আলোয় সে দেখলে, তার পাশে কেউ নেই ; তার সঙ্গীরা সরে পড়েছে ; আর, তার সামনে পড়ে রয়েছে একটা মস্ত ডাল।

তার নিচে পাতার আড়ালে লোকটা যে কোথায় পড়ে আছে তা সে ঠাহর পেল না। ঝড়-বৃষ্টিতে গাছগুলো মত্ত হাতীর মতো হেলছে-দুলছে ; বৃষ্টি, বাতাসও ডালপালার উথাল-পাথাল শব্দ এবং বজ্রের গুরু-গুরু ডাক একসঙ্গে মিশে যেন তাদের তাণ্ডব নাচের সুর বাজাচ্ছে।

একটা মানুষ তার সামনে ঘোর বিপদে পড়েছে, কেউ তাকে সাহায্য করবার নেই, এই চিন্তায় সুমন্তর মনে সাহস, গায়ে শক্তি যেন বাড়লো। লোকটাকে সাহায্য করতে গিয়ে যে সেও বিপদগ্রস্ত হতে পারে এ ধারণা তার মনেই এলো না। সে ভিজতে ভিজতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আবার বিদ্যুৎস্ফুরণের অপেক্ষায় সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর তাকে বেশিক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকতে হোলো না ; কয়েক বার ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে দেখতে পেল, ডালপালার মাঝ থেকে একটা মাথা আর খানিকটা কাপড় দেখা যাচ্ছে।

সে আর একটু এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের আলোয় চিনতে পারলো লোকটা মধু বাউরি। ওর মাছ ধরার বড় বাতিক। বোধ হয় তাদেরই মতো মাছ ধরতে এসেছিলো। ঝড়-বৃষ্টিতে পালাবার সময় গাছের ডাল চাপা পড়েছে।

সে চেঁচিয়ে ডাকলে,—"মধু কাকা! ও মধু কাকা! আমি সুমন্ত। তোমার ভয় নেই।"

কিন্তু মোটা ডাল একা সরায় তার সাধ্য কি? তার ওপর ভিজে আরও ভারী হয়েছে। সে সরু ডাল-পালাগুলো কোন রকমে সরিয়ে মধুর মাথার কাছে বসল এবং বিদ্যুতের আলোয় দেখলে একটা ডাল ভেঙে মধুর পাঁজরার ভেতর ঢুকে গেছে। সেখান থেকে রক্ত বার হচ্ছে আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। মধুর গোঙানিরও বিরাম নেই।

মধুর হাতে সেই লাঞ্ছনার ব্যথা সমবেদনা ও করুণায় তার মন থেকে দূর হয়ে গেল।

সে বললে,—"কাকা, ভয় নেই। আমি লোক নিয়ে আসছি।"

সে ছুটলো বাজারের দিকে। সেখানে ছিল সিধু ডাক্তারের চেমবার। যখন গিয়ে পৌঁছলো তখন বাতাসের বেগ কিছু কমেছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে আরও জোরে।

সৌভাগ্য যে তখন ডাক্তার ও কয়েকজন লোক সেখানে ছিলেন। কিন্তু সেই বৃষ্টির মধ্যে কে যাবে? যে গাছের ডাল চাপা পড়ে, আহত ও রক্তাক্ত, সে কি আর বাঁচে? তা'ছাড়া, ওকে তো পুলিশের খর্পরে পড়তে

হবে। ওকে যে কেউ খুন করে নি, তার তো কোন প্রমাণ নেই। মধুর জন্যে সুমন্তর এত মাথা-ব্যথা কেন?

সুমন্ত লোকগুলোর কথা শুনে অবাক হয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাইরের বারান্দায় কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়িয়ে শকুনের মতো বসে ছিল যদু আর কেশব বাউরি। মধু দূর-সম্পর্কে কেশবের পিসে।

যদু বললে,—"চ' কেশব। সুমোটা ছেলে মানুষ। আমরা তো ওর কেউ নয়। তবুও ছোঁড়াটা ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিয়েছে।"

যদু উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"চল। সুগো তুই যাবি?"

—"না গেলে তোমরা তাকে বার করবে কি করে? একটা হারিকেন নাও।"

ডাক্তারবাবুর বেহারাদের দুটো তালের টোকা মাথায় দিয়ে ও হারিকেনটা নিয়ে তারা তিনজনে রওনা হোলো। সুমন্ত আগে জলে ভিজে গিয়েছিল। কাজেই সে চলল খালি মাথায়।

তিনজনে সেখানে গিয়ে ডাল সরিয়ে মধুকে তার তলা থেকে অতি কষ্টে বার করলে। তার একখানা পা গিয়েছিল থেঁৎলে। যে-ডালটা তার পাঁজরায় বিঁধেছিল সেটা টেনে বার করতেই সেখান থেকে বেগে রক্ত বেরিয়ে এলো এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণটাও আর থাকল না বেরিয়ে গেল।

কেশব তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলে,—"পিসে! ওগো পিসে! শুনছো?"

পিসে আর সাড়া দিলে না। তিনজনে তার ক্ষত-বিক্ষত ও প্রাণহীন দেহটা বয়ে এনে ডাক্তারের বারান্দায় তুললে।

ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষাও করলেন। সুমন্ত আর দাঁড়াল না, হরির বাড়িতে খবর দিতে ছুটলো। যেতে যেতে তার মনে পড়লো মায়ের কথা; আর তার দুই সঙ্গীর আচরণ। ওরা নিজেরা যদি কখনও বিপদে পড়ে? কি অদ্ভুদ ছেলে ওরা!

৭

মাতৃভক্তি

সাহেবের জন্মতিথির ও কলপ্রতিষ্ঠা দিনের উৎসবটি হোলো এমন যে, সে অঞ্চলে তেমন সমারোহ কেউ কখনও দেখে নি! গান, বাজনা, থিয়েটার, যাত্রা, খাওয়া-দাওয়া, তার ওপর মজুরদের প্রত্যেককে একখানা করে কাপড় ও একটি করে টাকা দান। কত লোক এলো-গেলো। কত বাজি পুড়লো,—হাউই, ফুলঝুরি, তুবড়ি, যুঁই-ঝাড়, দমা, চরকি, নারকোলী-বোমা। আলোয়, শব্দে, চীৎকারে, বাজনায়, ভিড়ে, মোটরে ও ধুলোয় দুটো দিন যা হোলো তার স্মৃতি লোকের মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। বড়লোক মানে ধনী হয়ে জন্মানো অতি সৌভাগ্যের কথা!

সুমন্ত এই আনন্দে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রাণখুলে নয়। কেননা তার মায়ের অসুখটা আবার বেড়েছে।

উৎসব-ক্ষেত্রে সে বারকয়েক তার বাবার দেখা পেয়েছিল বটে, কিন্তু তার পোশাক ছিল এমন বাহারী আর সে ছিল এমন ব্যস্ত যে, সুমন্ত তার কাছে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারে নি। তা'ছাড়া, সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে সে যেতেও সাহস করে না। সে তো কেউ নয়!

উৎসব কেটে গেলে আবার সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে লাগলো। সুমন্ত উৎসব-ক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে। এমন উৎসব বছরে অনেকবার হয় না কেন?

এদিকে মায়ের জন্যে পর পর দুটো দিন তার কামাই হোলো! তারপর আবার কয়েকটা দিন কাটলো। শেষে এলো অমাবস্যা। সেদিনও সে কাজে গেল না।

তার মাও তাকে যেন ছাড়তে চায় না। সেদিন সে স্পষ্টই বললে,—"সুমু আমি আর বাঁচব না!"

সুমন্তর বুকটা কেঁপে উঠলো; হাত-পা অবশ হয়ে গেল।

সে ঢোক গিলে বললে,—"কে বললে? আমি আজ এমন ওষুধ আনব—"

সুমন্তর মা একটা নিঃশ্বাস ফেললে।

সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করবার পর তার মা সন্ধ্যার দিকে ঘুমিয়ে পড়লো।

সুমন্ত আর একটুও দেরী করলে না। কাপড়খানা বেশ গুছিয়ে পরে কোমরে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা গুঁজে চললো নদীর দিকে।

বিহারীলাল জেলের ছোট ডিঙিখানা ছিল তার বাড়ির নিচে ঘাটে বাঁধা। তাতে বৈঠা ছিল না; একটা লগির সঙ্গে ডিঙির আগ-গলুইটা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। সুমন্ত জানত কোথায় তার বৈঠা থাকে। সে বাড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে তার জাল রাখবার ঘরের পিছন দিকে গেল। সেদিকে বেড়ার ধারে এক কোণে চওড়া ছেঁচতলায় একধারে ছিল একটা বাঁশের মাচার ওপর খানকয়েক বৈঠা। সে খুব সন্তর্পণে একখানি বৈঠা সেখান থেকে তুলে নিয়ে নদীর পাড় ধরে নিচে নেমে গেল।

বিহারীর এই ডিঙিখানিকে বয় বিহারীর ছেলে হীরু।

সুমন্ত গিয়ে ডিঙিতে উঠে লগিটা তুলে নিয়ে একটা ঠেলা দিতেই ডিঙিটা সরে গেল বার জলে। তারপর ডিঙির মুখ ঘুরিয়ে লগির ঠেলা দিতে দিতে কূল ধরে খানিক দূর উজানে চলে গেল। সামনেই বাজারের ঘাট। তার কাছাকাছি গিয়েই সে লগি তুলে, বৈঠা নিয়ে পিছনের গলুইয়ে বসলো।

করিমপুর সেখান থেকে ভাটিতে এক বাঁক।

সুমন্ত ডিঙি বেয়ে চললো সেই দিকে। অমাবস্যার অন্ধকার রাত। নদীটা যেন কালির স্রোত। এক একবার ছল-ছল কল-কল করে উঠছে। সুমন্তর কাছ থেকে কিছুদূরে কখন কখন শুশুক হুস্ করে লাফিয়ে ওঠে; কাছিম নিঃশ্বাস নেবার জন্যে জলের তলা থেকে উঠে আসে; বড় বড় মাছ ঘাই দেয়, লেজের ঝাপ্টা মারে; মাঝে মাঝে হঠাৎ শোনা যায়, একটা বিশ্রী শব্দ। শব্দটাকে সুমন্ত চেনে। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! ও শব্দ কুমীরের ডাক। সুমন্ত চারধারে তাকিয়ে দেখলে তার আশে-পাশে বা কাছে কোন নৌকো নেই। সেই অন্ধকার রাতে তার মতো কে এই রাক্ষসী নদীর বুকের ওপর দিয়ে যাবে? কেবল দূরে দু'একটা আলো দেখা যায় টকটকে লাল। আর নদীর কূলে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি।

সে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে। কষ্টিপাথরের মতো গাঢ় কালো আকাশ; তার কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই, আছে শুধু ছোট-বড় তারা। তারাগুলোর রঙ লাল, সাদা, কমলা, সবুজ। সবগুলো দুলছে। কালো স্রোতে তাদের ছায়া পড়ে যেন গলে গড়িয়ে জলে মিলিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকার রাতের সেই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর রূপ দেখে সুমন্তর মন যেমন

আনন্দে, তেমনই ভয়ে ভরে গেল। এই ভয়ঙ্কর ও সুন্দরের মাঝ দিয়ে সে চলেছে একা এক কঠিন কাজ করতে—তার মাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নেবার ওষুধ আনতে। সে জানে, সেখান থেকে কিছু দূরে উজানে আছে একটা ঘূর্ণি! তাতে একবার একখানা নৌকো পড়ে ডুবে যেতে সে দেখেছিল। তবে তার ভয় নেই। সে সেদিকে যাবে না।

সে সামনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে বৈঠা বেয়ে চলতে লাগলো। তার মন ছুটে গেল বাড়িতে মায়ের কাছে, কল-বাড়ির দিকে তার বাবার উদ্দেশ্যে; সেখান থেকে ছুটলো করিমপুরে পীরসাহেবের দরগায়। না জানি সেখানে এখন কি হচ্ছে! সাহেব আছেন কি-না? এই অন্ধকার রাতে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চিনে সেখানে সে পৌঁছতে পারতো?

সে শুনেছে, পীর সাহেব আগে থাকতে জানতে পারেন, তাঁর কাছে কে কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। সেইজন্যে তার মনে একটা ভরসা আছে। না হলে এই রাতে এমন নদীর ওপর দিয়ে সে একা যেতে সাহস করে? কোন কারণে যদি নৌকোখানা ডুবে যায়? কিন্তু তারও সম্ভবনা নেই। আর যদিই বা যায় সে সাঁতরে গিয়ে কূলে উঠবে। সে নদীর প্রায় তিনভাগ পার হয়েছে।

তার চোখ দুটোতে অন্ধকার ততক্ষণে সয়ে গেছে। তারার ম্লান আলোয় সে কাছের জিনিস আবছায়া দেখতে পাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে সামনে একটা আলো। আলোটা একদিকে এগিয়ে চলেছে। আলোটা নৌকোর নয় ডাঙার; নৌকোর হলে জলে তার ছায়া পড়তো। একটু পরেই আলোটা অন্ধকারে হঠাৎ ডুবে গেল।

করিমপুরের সামনে ছিল প্রকাণ্ড চর। তার ওপর ছিল বন-ঝাউয়ের জঙ্গল। নতুন জলে চরখানা প্রায় ডুবে গেছে, কিন্তু ঝাউগাছগুলোর মাথা ছিল তখনও জলের ওপর ভেসে। সুমন্তর কানে হঠাৎ একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসতেই সে চমকে উঠলো।

সে বৈঠাখানা ধরে কান পেতে শব্দটা শুনতে লাগল, এবং একটু পরেই বুঝতে পারল, শব্দটা ঝাউবনের মাঝ দিয়ে জল-স্রোত যাবার। ঝাউ-বনের জলে নানা রকমের মাছ থাকে। ডালে থাকে সাপ। মাছের লোভে এদিকে মাছ-খেকো কুমীর ঘুরে বেড়ায়। কখন কখন এখানে তারা জলের কূলে বালিতে ডিম পাড়ে। কুমীর ডিমে তা দেয় না; ডিমের গায়ে রোদ লেগে ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয়। ডিমে তা না দিলেও কুমীর ডিমের কাছে কাছেই থাকে।

সে অন্ধকারে বুঝতে পারলে না, ঘাট কোথায়; তবে দেখলে, তার ডানধারে একটা আলো বার দুই জ্বলে উঠে নিভে গেল। আলোটা হয়তো কোন লোকের বাড়ির, কিংবা এ সময়ে নদীর ধারে যে-সব মেছো থাকে, তাদের কারও।

সে ডিঙিখানা সেইদিকে চালিয়ে দিলে এবং একটু পরেই দেখতে পেলো ঝাউবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। দু'পাশ থেকে এসে ভিজে ঝাউগাছগুলো ছপ্-ছপ্ করে তার গায়ে লগেছে; তাতে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। নৌকোখানা একবার হঠাৎ দুলে উঠলো; কিসে যেন তার তলায় ধাক্কা দিলে। তার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠলো; যে ধাক্কা দিলে, সে হয় কুমীর, না হয় কাছিম!

সে ভয়ে ভয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু তারপর আর নৌকা এগোল না; কম জল, তলা হঠাৎ মাটিতে ঠেকলো।

দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে সে সামনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো, সেখান থেকে ডাঙা কত দূর। কিন্তু অন্ধকারে ঠাহর পেল না। সে লগি দিয়ে জল মেপে দেখলে, সেখানে জল হবে বড় জোর তার হাঁটু-সমান।

দিনের বেলায়, সেখানে নেমে জল পার হয়ে যেতে তার একটুও ভয় করত না। কিন্তু এই জনমানবহীন অন্ধকার রাতে! সে চুপ করে নৌকোর ওপর একটু বসে ভাবতে লাগলো কি করবে।

পীর-সাহেবের শক্তির ওপর তার বিশ্বাস আছে, কিন্তু কি জানি কেন তবুও সে ভরসা পেল না। এমনও তো হতে পারে, এইখানটা কাছিমের পিঠের মতো উঁচু হয়ে আছে, এর পর আবার গর্ত। গর্তটাতে সাঁতার জল হতে পারে; তারপর হয়তো ডাঙা। কিন্তু জল কমই হোক আর বেশিই হোক, তাকে যেতেই হবে। তার মা পড়ে আছে ঘরে। হয়তো এখন উঠে জলের জন্যে ছট্‌ফট্ করছে; কাসিতে তার দম আটকে আসছে, তার সঙ্গে উঠছে কাঁচা রক্ত।

সে হঠাৎ নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখলে, সব অন্ধকার; কেবল মাথার ওপর সেই তারা-ঝলমল নিকষ কালো আকাশ, নিচে বয়ে চলেছে কালির স্রোত। তার চারধারে ভিজে ঝাউবন, কেমন একটা চাপা শব্দ করছে। করুক শব্দ; যা হয় হোক তার, সে ওষুধ আনবেই!

সে নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়খানা গুছিয়ে পরলে; তারপর জলে নেমে এক হাতে বৈঠা, আর এক হাতে নৌকোর দড়ি ধরে টানতে টানতে কূলের দিকে চললো।

কিছু দূরে যেতেই তার ডান ধারের ঝাউগাছগুলো দুলে উঠল। নিশ্চয়ই সেখানে কিছু ছিল, তার সাড়া পেয়ে সরে গেল। তারপর সুমন্তকে আর বেশি দূর জল ভাঙতে হোলো না। সে কূলে গিয়ে পৌঁছল।

কিন্তু সে কূলে পৌঁছতেই ওপর থেকে কে বলে উঠল,—"ঘাটে কে?"

সুমন্ত চমকে উঠল। এমন মোটা গলা সে কোন দিন শোনে নি এবং সেখানে কোনো লোককে আশাও করে নি।

সে না ভেবেই উত্তর দিলে,—"আমি সুমন্ত।"

—"কোথা যাবে?"

—"পীর-সাহেবের দরগায়।"

—"কোথা থেকে আসছ?"

—"হরিশপুর।"

—"সঙ্গে কে আছে?"

—"কেউ নেই।"

সুমন্ত ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে, যেন একটা ছায়া সরে গেল।

সে ভয়ে ভয়ে লগি পুতে ডিঙিখানা দড়ি দিয়ে তার সঙ্গে বেঁধে বৈঠাখানা হাতে নিয়ে পাড়ে উঠতেই তার সামনে একটা লম্বা-চওড়া লোক এসে দাঁড়াল। তেমন লম্বা লোক সুমন্ত কখনও দেখে নি।

সে বললে,—"পীর-সাহেবের কাছে কি দরকার?"

—"ওষুধ নেব।"

—"কার?"

—"আমার মায়ের।"

—"তবে তোমার মা কৈ?"

—"মা বিছানা থেকে উঠতে পারে না।"

—"বাঁ দিকের ঐ বটগাছটার তলা দিয়ে সোজা চলে যাও। জিনের ভয় নেই, জানের ভয় নেই! যাও চলে।"

সুমন্ত বৈঠাখানা হাতে নিয়ে লোকটার নির্দিষ্ট-পথ ধরে এগিয়ে চলল।

এবার তার দুপাশে জঙ্গল ও বড় বড় গাছ। উঃ! কি অন্ধকার! যেন তাকে চারধার থেকে চেপে ধরছে। তার দম আটকে আসছে!

কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই, কেবল লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝিঁ পোকা প্রাণপণে চীৎকার করে অন্ধকার ও জঙ্গলটাকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে। তার মাঝে উড়ছে জোনাকির ঝাঁক তুবড়ির আগুনের ফুলকির মতো।

মনকে সাহস দিয়ে বৈঠাটাকে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে সে এগিয়ে চলল।

৮

পীর সাহেব দান

সামনে থেকে তার কানে এল ব্যাঙের ডাক। ব্যাঙগুলো নানা সুরে অবিরাম ডাকছে।

সুমন্তর মনে পড়ল, দরগার সামনে আছে একটি বেশ বড় পুকুর। তার জলে আছে কলমি-হিঞ্চে ও শালুকের বন, আর পাড়ের ওপর গোটা কয়েক নারকোল গাছ। পুকুরটার ঘাট সান-বাঁধানো। সানটা অনেক কালের—মাঝে মাঝে ফেটে গেছে। ঘাটের ওপর দুপাশে বসবার জন্যে আছে রোয়াক।

ঘাটের পরেই দরগার আঙ্গিনা! আঙ্গিনাটার দক্ষিণে আছে একটা নিমগাছ। কি মোটা তার গুঁড়ি! আঙ্গিনার শেষেই দরগা, ছাউনী দেওয়া লম্বা উঁচু ঢিপি।

সুমন্ত পুকুরের ধার দিয়ে আঙ্গিনার সামনে গিয়েই দেখে সেখানে মেয়ে-পুরুষ অনেক লোক বসে!

দরগার ওপর বিছানো রয়েছে একখানা লাল রঙের কাপড়। তার ওপর বেলফুলের মালা; গায়ে হেলানো রয়েছে এক গোছা ময়ূর-পুচ্ছ; নিচে পাতা রয়েছে দস্তার ফুলকাটা দু'খানা বড় বড় থালা। তার একখানা থালায় রয়েছে শাদা বাতাসার স্তূপ।

দরগার ওপরে লাল চাঁদোয়া। সেখান থেকে ঝুলছে মোমবাতির ঝাড়; নিচে দু'পাশে বসানো রয়েছে দুটো বড় বড় সেজ। বাতাসে মোম-বাতির শিখা এদিকে-ওদিকে নড়ছে; ঝাড়ের পরকলায় টুং টাং শব্দ হচ্ছে। বেড়ার গায়ে ও চাঁদোয়ায় দুলছে ছায়া। ভেতর থেকে আঙ্গি-নায় ভেসে আসছে লাবাং ও ধূপের সুগন্ধি ধোঁয়া।

সব শান্ত, নীরব। পীর-সাহেব কোথায় কেউ জানে না! তাঁর দর্শনও সকলে পায় না। তাঁর চেলারাই তাঁর নির্দেশে কাজ করে। তিনি কোন কোন দিন দেখা দেন। সুমন্ত তাঁকে কোনদিন দেখে নি।

সুমন্ত আঙ্গিনায় যেতেই একটি ফকির তার সামনে এসে বললে,—"বস ঐ নিমগাছটার গোড়ায়। সাহেব তোমার কথা জানতে পেরেছেন।"

সুমন্তর মন আনন্দে নেচে উঠল। তার মা তা'হলে ভাল হবে?

সে আর ইতস্ততঃ করল না; তাড়াতাড়ি গিয়ে নিমগাছটার গোড়ায় বসল। সেখান থেকে দরগার একটা পাশ দেখা যায়। সাহেব আসবেন

কিনা কে জানে। সেও সকলের মতো হাত-জোড় করে বসে রইল সাহেবের দর্শন পাবে এই আশায়।

মিনিট কতক বসবার পর সুমন্ত দেখল, হঠাৎ সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। কে যেন বললে,—"সাহেব আসছেন।"

সুমন্ত সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলে, দরগার মধ্যে পীর-সাহেব এসে বসলেন। তাঁর বয়স যে কত তা সে বুঝতে পারলে না, তবে তাঁর চেহারা বেশ; মাথায় বাবড়ি, মুখে লম্বা দাড়ি, নাকটা উঁচু, রঙ খুব পরিষ্কার, গায়ে আলখাল্লা, গলায় কত রকমের চেনা-অচেনা জিনিসের মালা; হাতেও একগাছা তসবি (মালা) রয়েছে।

যাই হোক, সেখানে হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ছিল। তারা সাহেবকে সালাম-নমস্কারে ভক্তি জানাল।

সাহেব সকলের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ বন্ধ করলেন।

সাহেবের কাছে একজন ফকির দাঁড়িয়ে ডাকলে, "সুমন্ত! সুমন্ত!"

সুমন্ত প্রথমটা বুঝতে পারলে না যে, তাকে ডাকছে। সে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল!

এমন সময় কয়েকজন বলে উঠল,—"সুমন্ত। সুমন্ত কে?"

তার পাশে একজন বসে ছিল; সে বললে,—"তোমার নাম কি?"

—"সুমন্ত।"

—"যাও—যাও—তোমার ডাক পড়েছে! কি বেহুঁশো ছেলে!"

তখন চট করে সুমন্তর মনে পড়ে গেল সাহেবের অলৌকিক শক্তির কথা। উনি সব জানতে পারেন। সে চমকে উঠল।

সাহেবের সামনে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়াতেই সাহেবের পাশের লোকটি বললে,—"তুমি সুমন্ত?"

—"হাঁ।"

—"এই নাও—ধর—"

সুমন্ত হাত বাড়িয়ে দিলে।

—"মুঠো করে ধর—দেখো না। পশ্চিম দিকে মুখ করে রোগীর বালিশের তলায় রেখে দেবে। সাত দিন, সাত রাত থাকবে। একটু অনিয়ম হলে ফল হবে উল্টো। পীরের পুজো দাও ঐ থালায়—সওয়া পাঁচ আনা।"

সুমন্ত গাঁঠ থেকে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা বার করে থালার ওপর রেখে দিলে। থালায় ছিল টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানি, ও পয়সা।

লোকটা একখানা শাদা বাতাসা এনে বললে,—"ধর।" কিন্তু সে ধরবে কোন্ হাতে? তার ডান হাতের মুঠোয় রয়েছে ওষুধ। বাঁ হাত দিয়ে তো প্রসাদ নিতে পারে না।

লোকটা বললে,—"ওষুধটা চোখ বুজে কাপড়ের খুঁটে বাঁধ।" সুমন্ত তাই করে দু'হাত পাতলে।

লোকটা বাতাসাটা তার হাতে দিয়েই ডাকলে,—"জয়নাল! জয়নাল!"

সুমন্ত বাতাসাখানা মাথায় ঠেকিয়ে খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে সেখান থেকে আবার নিমগাছটার গোড়ায় ফিরে আসতে যাবে, অমনি তার পিছন থেকে কয়েকজন বলে উঠল,—"জিজ্ঞেস করলে না অসুখটা সারবে কিনা? জিজ্ঞেস কর।"

সুমন্ত ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে,—"সাহেব, আমার মায়ের অসুখটা সারবে তো?"

কথাগুলো বলতে বলতে তার চোখে জল এল।

সাহেব ঘাড় নাড়লেন। তাঁর পাশের লোকটা বললে,—"খুব হুঁশিয়ার! একটু অনিয়ম হলেই উল্টো ফল।"

সুমন্তর বুক কাঁপতে লাগল। যদি ঠিক মতো চলে তা'হলে সারবে। না হলে—?

সে ঠিকমতো নিশ্চয়ই চলবে। সাহেব বলেছেন, তার মা সারবে। এতদিন কেন সে সাহেবের কাছে আসে নি? তার বাবা কি জানত না, সাহেব মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন! কিন্তু ওষুধটা কি রকমের? জিনিসটা হাতে ঠেকল নরম। কোন গাছের পাতা কি? যে জিনিসই হোক, সাহেবের দেওয়া।

বাড়ি গিয়েই সে ওষুধটা পশ্চিমমুখো হয়ে তার মায়ের বালিশের তলায় রেখে দেবে। আর, বাতাসাখানা দেবে খেতে। পীরের সিন্নি! এতে সব সারে। না খেলে পীরের গোঁসা হবে।

আসবার সময় তার মনে কত স্ফূর্তি ও সাহস ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল।

এবার দরগা থেকে ঘাটে যেতে তার কষ্ট হোলো না; একজন সঙ্গীও পেল। সে দরগার লোক। তার হাতে ছিল লণ্ঠন।

দুজনে কথায় কথায় ঘাটের কাছাকাছি এসে পড়ল।

লোকটা ডান ধারের পথটা ধরে বললে,—"সোজা যাও। দু কদম গেলেই ঘাট। ভয় নেই। পীরের নাম করো।"

সুমন্তর কোন বিপদই ঘটল না। সে ডিঙিখানাও পেল এবং আগের মতোই ঝাউবনের মাঝ দিয়ে কিছু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে তাতে উঠে লগি ঠেলে কূলের কাছ দিয়ে আস্তে আস্তে উজানে চলল। কেননা এবার তাকে যেতে হবে উজানে। সেইজন্যে হরিশপুর ছাড়িয়েও তাকে যেতে হবে আরও প্রায় এক ক্রোশ। না হলে সে গ্রামের ঘাটে পাড়ি জমাতে পারবে না; স্রোতে টেনে নিয়ে যাবে সেই শোলকুপোপুর কি তারও ওধারে।

এপারে চর পড়ে; সেই জন্যে তাকে লগি ঠেলে যেতে খুব বেশি কষ্ট পেতে হোলো না। চরের ধারে মাঝে মাঝে দু' একখানা করে ছোট বড় নৌকো বাঁধা ছিল।

কোন কোন নৌকো থেকে সুমন্তকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল,—"কোথাকার নৌকো?"

সুমন্ত উত্তর দিতে লাগল,—"হরিশপুরের।"

সুমন্তর ডিঙি যখন জেলে বাড়ির ঘাটে পৌঁছল, তখন অনেক রাত।

সে ডিঙিখানা কূলে বেঁধে, বৈঠাখানা সেখানেই রেখে তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে বাড়ির দিকে চলল। যখন বাড়ি গিয়ে পৌঁছল তখন তার মা খুব কাসছে আর ডাকছে,—"ও সুমু! সুমু—উ—উ!"

সুমন্ত তাড়াতাড়ি ঘরে উঠে বললে,—"মা আমি এলাম।" তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে বাতাসাখানা খুলে তার মুখের কাছে ধরে বললে,—"মা, ধর—মাথায় ঠেকাও।"

সুমন্তর মা হাত বাড়িয়ে বাতাসাখানা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি?"

—"করিমপুরের পীরের সিন্নি-বাতাসা।"

—"করিমপুরের 'মুট' কোথায় পেলি!"

—"আমি গিয়েছিলাম যে! এই এলাম।"

—"কি সর্বনাশ!"

মায়ের মুখ দিয়ে কথা সরল না।

সুমন্ত বললে,—"মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে ফেল মা। তোমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে।"

—"তুই খেয়েছিস্?"

—"আমি? আমার তো অসুখ হয় নি।"

—"এই নে—তুই-ও খা—" বলে তার মা বাতাসাখানা ভেঙে তার হাতে একটু দিলে।

সুমন্ত বাতাসার টুকরোটুকু মাথায় ঠেকিয়ে গালে ফেলে, পশ্চিম দিকে

দাঁড়িয়ে তার মায়ের বালিশের তলায় ওষুধটা রেখে দিয়ে মনে মনে বললে, "সাত দিন, সাত রাত। হে পীর সাহেব! আমার মাকে সারিয়ে দাও।"

কিন্তু প্রায় তারপর থেকেই মায়ের কাসি ও জ্বর বাড়ল এবং সকালের দিকে সে কেমন ক্লান্ত ও বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

তা দেখে সুমন্তর হাত-পা গেল অসাড় হয়ে। হায় রে! তারই জন্যে মা গেল! কি অনিয়ম সে করলে? সাহেবের কথা-মতোই তো সে কাজ করেছে। পীর সাহেব বলেছেন, সে বাঁচবে। কিন্তু একি হোলো? তার চোখের কোলে জল আসতে লাগল। এ দুঃখের কথা যে সে কারও কাছে বলতে পারবে না।

একবার মনে করলে ওষুধটাকে বালিশের তলা থেকে টেনে ফেলে দেয়; কিন্তু তারপরই মনে হোলো, তাতেই বা লাভ কি? যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার মা আর বাঁচবে না। তার জন্যেই মা চলে গেল!

সে বসে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।

পাশের বাড়ি থেকে ময়রা-বুড়ী এসে বললে,—"ও সুমু! যা তোর বাপকে একবার খবর দিয়ে আয়। শেষ দেখা একবার দেখে যাক। কাঁদিস্ নে মানিক। বাপ-মা লোকের চিরদিন থাকে না।"

সুমন্ত বলে উঠল,—'মিথ্যা কথা! তার সঙ্গীদের সকলেরই মা আছে।'

বুড়ী আবার বললে,—"যা! ওঠ্! অভিমান করিস্ নে।"

সুমন্তর মা সেই সময় একবার তার দিকে বড় বড় চোখে তাকাল।

সুমন্ত ডাকলে,—"মা! ও মা!"

কিন্তু মায়ের চোখ দুটি আবার বন্ধ হয়ে এল এবং সেই দিনই গভীর রাতে সে হঠাৎ মারা গেল।

সুমন্তর বাবা শেষ সময় এল বটে, শেষ কাজও করলে, কিন্তু তারপরই এমনভাবে চলে গেল যেন সুমন্ত তার কেউ নয়।

বুড়ী সুমন্তকে বললে,—"তোর কপাল! আর ওরও কপাল। তোর মতো ছেলেকে ভাসিয়ে দিলে গা! তা তুই আমার বাড়িতেই থাক, বুঝলি দাদু?"

সুমন্ত দু চোখে জল নিয়ে বুড়ীর ঘরের বারান্দায় চুপ করে বসে রইল। সে আজ বড় একা! সংসারে তার আপন বলতে কেউ নেই, কেউ নেই! সব ফাঁকা!

৯

দুঃখের শিক্ষা

সুমন্ত তারপর তিন দিন কাজে গেল না। কিন্তু এক সময় তার মনে পড়ল, কাজ না করলে সে খাবে কি?

চতুর্থ দিন সে কাজে গেল। সাথীরা তাকে সহানুভূতি জানালে। কিন্তু কাজে তার মন আর বসতে চায় না। সে যে তার মায়ের জন্যেই এত দিন মন দিয়ে কাজ করছিল, এ কথাটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন তো মা নেই। তার বাবাও বেশ ভালই রোজগার করে। কাজেই সে যদি মন দিয়ে কাজকর্ম না করে, তার কাজ যদি যায়ই তাতেই বা কি ক্ষতি?

সে তারপর থেকে ঢিল দিয়ে কাজ করতে লাগল। তাই নিয়ে সর্দারের সঙ্গে তার প্রায়ই কথা কাটাকাটি হতে লাগল।

এই অবস্থায় সে মাঝে মাঝে কামাইও আরম্ভ করলে। সে একা মধুমতী-তীরে বসে থাকে, ঘুরে বেড়ায়; তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ কমে গেল। বুড়ী তাকে কত সান্ত্বনা দেয়!

সাথীরা তাকে বোঝায়; কিন্তু সুমন্তর মন কিছুতেই বুঝতে চায় না। বুড়ী বলে,—"এমন মা-পাগল ছেলে দেখিনি!"

একদিন সুপারিনটেনডেনট্ তাকে ডাকলেন।

সে সেদিন গেল বেশ সাহসের সঙ্গেই। গিয়ে দেখল, তার বাবাও সেখানে আছে।

সাহেব জিজ্ঞেস করলেন,—"তুই কাজে কামাই করেছিস্ অনেক দিন। কেন?"

—"আমার মায়ের অসুখ ছিল। তাই আসতে পারি নি।"

—"কতদিন তোর মায়ের অসুখ ছিল?"

—"অনেক দিন।"

—"তুই কি করতিস্?"

—"মায়ের কাছে থাকতাম।"

সাহেব একটু হেসে বললেন,—"গোপাল!"

বিদ্রূপের অপমানে সুমন্তর চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

সাহেব বললেন—"কিন্তু তুই বিনা নোটিশে কামাই করেছিলি, তা জানিস্ তো?"

—"হাঁ। নোটিশ দিলে ছুটি পেতাম না।"

—"অনেক কথা শিখেছিস্ যে!"

সুমন্ত চুপ করে রইল।

সাহেব আবার বললেন,—"তোর মা মারা যাবার পরও তো তিন দিন আসিস্ নি। এখনও তো কামাই করিস্! তোকে আর রাখা হবে না।"

—"বেশ, জবাব দিন।"

—"তোকে ডিস্‌মিস্ করলাম!"

—"কিন্তু আপনার একটা মেয়ের অসুখের সময় আপনি কি করতেন? সে মারা যেতে আপনিও তো ক' দিন কামাই করেছিলেন। তার জন্যে আপনাকে তো কেউ ডিস্‌মিস্ করে নি!"

—"কী! শূয়ার! পাজী!" বলতে বলতে সাহেব চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে সুমন্তর গালে একটা চড় কষে দিলেন।

দুঃখহরণ এতক্ষণ নিরীহ মেষের মতো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ছেলের গালে চড়ের শব্দে তার যেন চমক ভাঙল। চড়ের খানিকটা যেন লাগল তারও গালে। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যেই সে আগুন নিভে গেল। আবার সে প্রাণহীন অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সুমন্ত কোন কথাই বললে না; ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

আজও এই ঘটনাটার খবর চারধারে নিমেষে ছড়িয়ে গেল।

সুমন্তর সাথীরা বললে,—"ওকে দিয়ে কাজ না চলে ডিস্‌মিস্ করুক, কিন্তু মারল কেন? ওকে যদি আমরা মেরে কেটে জলে ভাসিয়ে দিই? দেবই—নিশ্চয়ই দেব। মজুরদের গায়ে হাত!"

সুমন্তকে তারা থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সুমন্ত বললে,—"না; এখানে আর নয়।"

সে মিল থেকে বেরিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

বুড়ী তাকে সকাল সকাল ফিরতে দেখে, জিজ্ঞেস করলে,—"কি রে দাদু! এত সকালে ফিরলি যে! জ্বর হয়েছে?"

সুমন্ত ঘাড় নেড়ে জানালে, না। তারপর সে বাড়ির দিকে চলল।

খালি বাড়ি। তার মা নেই! মা যখন সুস্থ ছিল তখন বাড়িখানা ঝক-ঝক করত। মা অসুখে পড়ে শ্রীহীন হয়েছে। আজ চারধারে আগাছা ও জঙ্গল।

হায় রে! তারই জন্যে মা চলে গেল। কেন সে গেল পীর-সাহেবের দরগায়? সে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল।

তার মনে পড়ল, মা একবার বলেছিল,—"সুমু, তুই যখন ছোট ছিলি তখন তোর একবার ভারি অসুখ করেছিল। বাঁচবার আশা ছিল না। তখন পাঁচটা পয়সা তোর কপালে ছুঁইয়ে একটা কৌটোয় রেখেছিলাম। মানৎ ছিল, কালীঘাটে পাঠাব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। কৌটোটা আছে ঐ কোণে খুঁটির পাশে গোঁজা।"

সুমন্ত ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরের কোণে গিয়ে খুঁটির পাশ থেকে কৌটোটা টেনে বার করে খুলে দেখলে পয়সাগুলো ঠিক আছে। মা নেই, কিন্তু তার মানৎ রয়েছে আজও! সে কৌটোটা মাথায় ঠেকাল—মায়ের আশীর্বাদ।

সে কৌটোটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় বসে ভাবতে লাগল, মাস্টার-মশায়ের কাছে যাবে। দিন কয়েক আগে তাঁর চিঠি এসেছে। তাতে তাদের কত উৎসাহ, কত উপদেশ দিয়েছেন। লিখেছেন, 'তোমরা আমাদের দেশের, গোটা মানব জাতির উন্নতির আশা-ভরসা। একমাত্র কর্মেই, সৎকর্মেই উন্নতি। মানুষকে সব প্রাণীর সেরা করেছে তার মস্তিষ্ক আর হাত দুখানি। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমার শরীর একটু সেরেছে।' সুমন্ত তাঁর কাছেই যাবে।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, তাঁর উপদেশ, কাজ করো।

তার চারধারে রয়েছে কাজ। এ কাজের আর শেষ নেই; বরং কাজের লোকেরই অভাব। সে কাজ করবে আর পড়বে। তবে এখানে নয়, দূরে আর কোথাও। এখানে সে থাকবে না।

পরদিন ভোরে উঠে, সুমন্ত তার কাপড়-জামা ও মাস্টারমশায়ের চিঠিখানা একটি পুঁটুলিতে বেঁধে, পুঁটুলিটি লাঠির মাথায় ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে বুড়ীকে বললে,—"আমি চললাম, আজিমা। আর আসব না।"

বুড়ী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—"কোথায় রে? কোথায় যাবি?"

—"দূরে—অনেক দূরে।"

—"ওরে দাদু! শোন্—ফিরে আয়।"

সুমন্ত আর দাঁড়াল না, তার মায়ের সেই মানতের পাঁচটি পয়সা সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল দূরের পথে, কাজের সন্ধানে।

———

১০

পথচলা

কিন্তু মস্তিষ্কেই থাকে স্মৃতি। সেই স্মৃতিই তাকে চিরদিনের চেনা ঘর-বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধা দিতে লাগল।

তার পোঁতা কল্কে ফুলের চারাটি বড় হয়ে কুঁড়ি ও মধুভরা ফুল নিয়ে যেন হাতছানি দিচ্ছে; লেবুফুলের ঝাঁঝাল গন্ধ জিউলি আঠার গন্ধে মিশে বাতাসে ভাসছে। রাংচিতের ডালে ডালে মধুভরা ফুলের থোকা। একটা মৌটুস্কি উড়ে এসে কল্কেফুলের একটা ডালে বসে ফুলের মধ্যে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলে।

তাদের বারান্দায় যে লাল রঙের কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে, সুমন্তর পাতের এক মুঠো ভাত, একগাল মুড়ি বা একটুকরো রুটি পেলে খুশি হয়, তার পায়ের কাছে এসে মুখের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে যেন বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল, সুমন্তর মনের কথা। একবার একটু হাঁ করলো যেন কি বলতে চায়।

সুমন্ত তার মুখ ধরে ধরা গলায় বললে,' 'চললাম রে।' এবং মুখ ছেড়ে দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চললো। সব তার চেনা। ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে, কিন্তু যেতেই হবে! ঐ দেখা যায় কলের চিমনি ধোঁয়া ছাড়ছে।

সে চললো মেঠো পথ ধরে তখনও যেখানে গ্রামের চিহ্ন ছিল সেখান দিয়ে। চললো গুলঞ্চ-ঝোলা আমগাছটার তলা দিয়ে, দত্তর বাঁশঝাড় বাঁয়ে রেখে, দাঁতছোলাবনের পাশে পাশে, কেষ্ট গয়লার গোয়ালের সমুখ দিয়ে, কুণ্ডুর ধানের গোলা ছাড়িয়ে বটতলার দিকে।

সামনের দিক থেকে আসছিল, জয়নাল জোলা, কাঁধে খালি ধামা, হাতে মাকু; বললে, "সুমু, কোথা যাস্?"

সুমন্ত বললে, "পারে।"

—"কুটুমবাড়ি নাকি? তোর মায়ের ব্যারাম সারছে?"

কি জবাব দেবে সুমন্ত ভেবে পেল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "সব ব্যারাম আরাম হয় না, চাচা। মা মারা গেছেন।"

—"তোর মা নাই? আহা রে! যাস্ কোথা?"

—"যাই" বলেই সুমন্ত জয়নালের পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। সামনে মধুমতী। তার উজানে-ভাটিতে নৌকো চলেছে। ওপারে

জলের রেখা, গাঁয়ের কোল, আকাশের কিনারা একাকার। ডান ধারে নদী কিছু সরু। সেই দিকেই খেয়া। খেয়াঘাট ছাড়িয়ে ঐ দূরে করম-পুরের ঘাট সেখান থেকে চেনাই যায় না। সে চললো খেয়াঘাটের দিকে। ওপার থেকে এপারে খেয়া আসছিল। পা চালিয়ে গেলে খেয়া ধরা যাবে।

কিন্তু হঠাৎ তার মনে হোলো, সে যাচ্ছে কোথায়? কি এমন কাজ সে করবে যা এখানে নেই? কি কাজই বা সে জানে যা লোকে তাকে দিয়ে করাবে? সব জায়গায় কাপড়ের কল নেই। কোন্ কোন্ জায়গায় আছে তাও সে জানে না। জানলেও সেখানে যে কাজ পাবে, এমন কথা নেই। তার মস্তিষ্ক ও হাত দুখানা সে কিসে ব্যবহার করবে? গত রাত থেকে সে উপবাসী। খিদে তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিচ্ছে।

তার বয়সী একটি ছেলে এক জোড়া মোষের পিছনে পিছনে আসছিল। তার বাঁ হাতে লকড়ি, ডান হাতে একটা বড় পেয়ারা। সে লকড়ি দিয়ে মোষ জোড়ার একবার এটাকে, আর একবার ওটাকে খোঁচা দিচ্ছে আর পেয়ারায় কামড় বসাচ্ছে। সুমন্তর মনে হোলো সে যেন ছেলেটাকে চেনে। সেও তার দিকে আড়চোখে কয়েকবার তাকালো।

সুমন্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "পথে পেয়ারার গাছ আছে?"

—"হুঁ। ঐ সামনেই।"

—"কার বাগান?"

—"বাগান নয়, পাঁচু শেখের ঘরের পাশের গাছ।"

—"দু-একটা ছিঁড়লে বকাবকি করে?"

—"তা করে। শেখ এখন ঘরে নেই। তুমি সুমু নয়?"

—"হাঁ। তুই গগ্‌না? মোষ নিয়ে কোথা যাস্? কার মোষ?"

—"নৈমুদ্দি চাচার। তুমি কাজে যাওনি? কল বন্ধ?"

—"না। আর ও কলে কাজ করবো না।"

—"কোন্ কলে কাজ করবে? আমায় একটা কাজ দাও না। পেট-ভাতায় রাখালি করতে মন চায় না। তার ওপর মনীষের মতো খাটায়, কীল-চাপড় মারে।"

সুমন্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আমি চলেছি কাজের খোঁজে। তুই কাল গিয়ে সর্দারকে বল্, সুমু চলে গেছে। তার জায়গায় আমায় শিক্ষা-নবীশ রাখ।"

গগ্‌না বললে, "তা কি হয়? তোমার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যাও। আমি দুই এক দিনের মধ্যেই পালিয়ে তোমার কাছে হাজির হব।"

সুমন্ত ম্লান হেসে বললে, "আমি বে-ঠিকানা।"

—"তবে যাচ্ছ কেন? পালিয়েছ নাকি?"

—"না। আমার কেউ নেই।"

—"মা-বাপ দুই-ই মরেছে? কবে? তোমাদের ওদিকে অনেকদিন যাই না—হেই হেই! ধর—ধর" বলতে বলতে গগন কোঁচড় থেকে একটা পেয়ারা নিয়ে সুমন্তের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মোষ দুটোর পিছনে ছুটলো। মোষ দুটো ততক্ষণে সামনের সর্ষেক্ষেতে ঢুকে পড়েছে। পেয়ারাটা গিয়ে পড়ল কাঁটা ঝোপে। সুমন্তর সেটাকে খুঁজে নেবার আগ্রহ হোলো না।

সে খেয়াঘাটের পথে এগিয়ে চললো। পথে পাঁচু শেখের বাড়ি বা পেয়ারা গাছ তার নজরে পড়লো না। হয়তো ঐদিকে কোথাও হবে।

সে ঘাটে পৌঁছে দেখলো বটগাছটার তলায় কতকগুলো লোক বসে ও দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে কয়েকটা ছাগল, সদ্য বোনা ধামা-কুলো ও কয়েকটা আধভরা বস্তাও রয়েছে। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে ঘাটের দিকে আসছে; খেয়াও ঘাটে লাগে লাগে।

সুমন্তর হঠাৎ মনে পড়লো, তার মায়ের পাঁচটি মানতের পয়সা ছাড়া তার কাছে একটি কাণাকড়িও নেই। সে পারাণি দেবে কি করে?

খেয়া-নৌকো ঘাটে ভিড়তে ভিড়তেই ওঠা-নামার ঠেলা-ঠেলি শুরু হোলো। সুমন্ত তবু দাঁড়িয়ে। কে যেন পিঠে ঠেলা দিয়ে বললে, "চল্। এখনই ছেড়ে দেবে। আজ হাটবার জানিস্ নে? এক ক্ষেপ ছাড়লে—"

সুমন্ত ফিরে দেখে বলাই সর্দার। সে সুমন্তকে এক রকম ঠেলে নৌকোয় তুললো।

সুমন্ত বললে, "আমার ঠেঙে পারাণি নেই।"

—"পরে দিস্।" বলে পাটনীকে বললে, "ও মাধব, এ হোলো সেই দুঃখহরণের ছেলে। বউটা মরেছে। ছেলেটা ভাল। লোকটা গোল্লায় যেতে বাকি নেই। সুমু, তুই দাঁড়ে বোস্। জলের যা টান।"

যাত্রীভরা খেয়া ছেড়ে দিলে। আর একখানা দাঁড়ে বসলো মাধব পাটনীর ছেলে শ্রীধর।

খেয়া নিরাপদে এসে পারে লাগল। শ্রীধর নৌকো ধরে রইল। মাধব ঘাটে দাঁড়িয়ে পারাণি আদায় করতে লাগল। সুমন্তর দিকে ফিরেও তাকাল না। সুমন্ত ঘাটে উঠে চলল হাটের দিকে।

বলাই সর্দার কলের পিওন। কলের বড়বাবুরা দরকার মতো তাকে ফায়-ফরমাস খাটায়। তাতে বলাইয়ের লাভ বই লোকসান হয় না।

লোকটা খুব হিসেবী। থাকে সুমন্তদেরই বাড়ির কাছাকাছি পুকুর পাড়ে।

সে সুমন্তর পাশে পাশে চলতে চলতে বললে, "ময়রাবুড়ীর মুখে সব শুনেছি। কিন্তু তুই পাগলের মতো যাচ্ছিস্ কোথায় ? একটু তো লিখতে-পড়তে শিখেছিস্। থাকবি কোথায়, খাবি কি ? কাজ চাইলেই কি পাওয়া যায় ? কাজ না করলে পয়সা আসবে কোথা থেকে ? চুরি চামারি না ভিক্ষে করবি ? দেখছিস্ নে ভদ্দর লোকের ছেলেদের কি হাল হয়েছে ? ঘরে ফিরে চল্। যে কাজ করছিলি সেই কাজই করবি। ঐ থেকেই তোর উন্নতি হবে।"

সামনেই হাট, নদীর ধারে বললেই হয়। হাটের নিচে মহাজনী নৌকো, খড়ের ও হাঁড়ি কলসীর নৌকো, জেলে ডিঙি। হাটের শেষে খেয়াঘাট।

বলাই সর্দার বললে, "ঐ সামনে মেঠাইয়ের দোকানে বেঞ্চিতে বোস্। আমি সওদা সেরে আসি। কোথাও যাস্ নে। তোর মতো একটা ছেলে যদি আমার থাকতো !"

বলাই সর্দার তাকে একরকম জোর করে মেঠাইয়ের দোকানে এনে বেঞ্চির একধারে বসিয়ে বললে, "ও হাজারী, একে চারটে মেঠাই দাও।"

হাজারী বললে, "দাম কে দেবে ?"

—"মাল না দিয়েই দাম ? যে ফরমাজ দিচ্ছে সে দেবে।"

বলাই সর্দারের বদান্যতায় সুমন্ত মুগ্ধ এবং ক্ষুধার জ্বালা তীব্র হলেও কেমন এক সঙ্কোচ তার মনে জেগে উঠল। কিন্তু দোকানের ছোকরাটা যখন এক টুকরো কলা পাতায় চারটে মেঠাই এনে তার সামনে ধরলো তখন ক্ষুধার জ্বালাই তার সঙ্কোচ নিশ্চিহ্ন করে দিলে। ছেলেটা তেল হড়্‌হড়ে্ একটা পেতলের গেলাসে জলও দিয়ে গেল। সুমন্ত খাবারটা খেতে খেতে এপারের দিকে তাকাতেই যেন একখানি নতুন ছবি দেখল। যেখানে সে দিনরাত কাটিয়েছে, তার গাছপালার এমন ঘন মায়া ? আকাশের কোল জুড়ে তা বিছিয়ে আছে। নদী তাকে ছুঁয়ে বয়ে চলেছে ; আকাশ তাকে শান্তশ্রী মাখিয়ে দিয়েছে ! ঘরছাড়া না হলে বোধ হয় ঘরের চারপাশের এমন মধুর ছবি সে দেখতে পেত না, ঘর তাকে এমন করে টানত না। কিন্তু ঘরে সে কার কাছে যাবে ? তার কেউ নেই !

এদিকে দিন শেষ হয়ে আসছে, ছায়া নামছে, হাট ভাঙছে, যে যার মতো ঘরে ফিরছে—কেউ সওদা নিয়ে, কেউ পসরা খালি করে। কেউ ধরেছে পায়ে চলা পথ, মাঠের ওপর দিয়ে, আলের ওপর দিয়ে, কেউ চলেছে খেয়ায়, কেউ গোরুর গাড়িতে।

বলাই সর্দার বস্তাবোঝাই সওদা ঘাড়ে এসে বস্তা নামিয়ে, মেঠাইয়ের দাম চুকিয়ে সুমন্তকে বললে, "তোর হিল্লে করেছি।"

তার কথা শেষ হতে হতেই চোখে চশমা, মুখে দাড়ি, মাথার চুল উসকো-খুসকো, আধ-ফরসা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক এসে বললেন, "কই হে বলাই, তোমার লোক?"

বলাই সর্দার বললে, "আজ্ঞে এই যে।"

—"ওযে খুব ছেলেমানুষ।"

—"কথা বলে দেখুন।"

—"তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? কতদূর পড়েছ?"

সুমন্ত বললে, "সুমন্ত দাস, বাড়ি নদীর ওপার। ঐ যে কলের চিমনির ধোঁয়া দেখা যায় ঐ শহর-গাঁয়ে। বড় স্কুলে পড়িনি। কলে কাজ করতাম, রাতের স্কুলে পড়তাম। মাস্টার মশায়ের কৃপায় একটু লিখতে-পড়তে শিখেছি। তিনি থাকলে আরও শিখতাম। নেহাৎ তাঁর ব্যামো হোলো—চলে গেলেন।"

—"বটে—বটে। তোমার কে আছে?"

—"বাবা। তিনি আলাদা থাকেন।"

—"কি রকম?"

বলাই সর্দার বললে, "সে অনেক কথা।"

ভদ্রলোক বললেন, "বুঝলাম। মনে হচ্ছে, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে। আমার সঙ্গে তোমাকেও গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ঘুরতে হবে। কখন নৌকোয়, কখন রেলগাড়িতে, কখন গোরুর গাড়িতে, কখন পায়ে হেঁটে। দরকার হলে লিখতে-পড়তে হবে। কোথায় থাকবো, কি খাবো কিছুরই ঠিক নেই। সব আরাম তুচ্ছ করে কাজ করতে হবে। কি কাজ? লোক-সঙ্গীত, লোক-কথা, পুরনো পুঁথি সংগ্রহ বা নকল করা। ভারি কঠিন কাজ। তোমার খাবার আর পোশাকের খরচ আমার, যান-বাহনের খরচও আমি দেব আর দেব মাসে মাসে হাতখরচ বাবদ পঁচিশ টাকা। রাজি আছ?"

সুমন্ত বললে, "হাঁ।"

—"কিন্তু তোমাকে বহাল করবার আগে পরীক্ষা করবো। পাশ করলে চাকরি। আমারও বাড়ি নদীর ওপার তোমাদের কাছাকাছি। এপারে এসেছিলাম এক গায়েনকে ধরতে। তিনটে গান তার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তুমি গান গাইতে পারো?"

বলাই বললে, "সুমুর গলা ভারি মিঠে।"

"বটে—বটে। সুরও সংগ্রহ করা যাবে। বলাই আমার নৌকোয় চল।"

বলাই বললে, "তাহলে আমায় এক ক্রোশ উজিয়ে আসতে হয়।"

—"বটে—বটে। চল সুমু আমরা যাই। আমারও কেউ নেই।

সুমন্ত দেখল, ভদ্রলোকটির হাতে একটি ফোলিও ব্যাগ, আধময়লা শাদা পাঞ্জাবির বুক পকেটে একটি ফুটকি কলম, চোখ দুটি টানা ও চঞ্চল।

দুজনে হাট থেকে নেমে একখানি ছোট পানসিতে উঠলেন। পানসির মধ্যে একটি ছোট বিছানা পাতা ছিল। মাথার দিকে একটি ছোট ব্যাগ। তিনি বিছানায় বসে ফোলিও ব্যাগ থেকে একখানি বাঁধানো খাতা বার করে তার একটি জায়গা খুলে সুমন্তকে বললেন, "পড়ে শোনাও।"

সুমন্ত দেখল, সুন্দর হাতের লেখা। পাঠ্য বিষয়টি হাটে সদ্য সংগৃহীত গান তিনটি। সে পড়ে শোনাতে লাগল। তার গলার স্বর ও স্রোতের একটানা শব্দে বেশ একটা মিল ঘটে গেল।

তার পাঠ শেষ হোলে ভদ্রলোকটি তাঁর উন্মনা, চঞ্চল দৃষ্টি সুমন্তর মুখের দিকে তুলে বললেন, "ঠিক আছে। তুমি বাইরে গিয়ে বোস। আমি একটু কাজ করি।"

সুমন্ত বাইরে এসে বসল। তার ইচ্ছা হতে লাগল, ভদ্রলোকটির নাম জানতে এবং তাঁর বাড়িতে এসে জানতে পারল। তাঁর নাম, নির্মলানন্দ ভট্ট। কিন্তু গলায় না আছে পৈতে, না আছে আচার-বিচার, সকলের সঙ্গেই একাত্ম। সুমন্তর মনে হতে লাগল, এঁর ও তাদের মাস্টারমশায়ের মনের সুর যেন এক। কথা শুনলে, মিশলে ভক্তি করতে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ভট্টমশায়ের কোঠাবাড়িখানি সেকেলে, কিন্তু ভেতরে বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মস্ত হলঘরটা র‍্যাক, আলমারি, বই, খাতা, পুঁথিতে ভরা। মেঝে জোড়া পাটি পাতা। তার চারধারে পাঁচ-ছখানা ঢালু বাক্স-টেবিল, একটার সামনে একটি তাকিয়া। সেখানটিতে ভট্টমশায় বসেন।

তিনি একখানি টেবিল দেখিয়ে সুমন্তকে বললেন, "তুমি ঐ টেবিলে কাজ করবে।" এবং একটা র‍্যাক থেকে একখানি পুরনো খাতা নিয়ে আবার বললেন, "এতে যা আছে সব নকল করবে। ঐ টেবিলের মধ্যে কাগজ, কলম, পেনসিল আছে।" বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যা নামল। সুমন্তর চেয়ে বয়সে বড় চারটি তরুণ লণ্ঠন ও টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে ঘরে ঘরে রেখে এল।

খানিকপরে তাদের সঙ্গে সুমন্তর আলাপ-পরিচয় হোলো। তারাও তারই মতো কাজে নিযুক্ত, 'আনন্দঠাকুর' তাদের কুড়িয়ে এনে কাজে লাগিয়েছেন। এঁকে ছেড়ে তাদের কোথাও যেতে মন চায় না। একজন বললে, 'আমরা বাড়িখানির নাম দিয়েছি, 'পল্লী-ভারতী।' দেখে ঠাকুর হাসেন; "বলেন, ভারতী যে মস্ত কথা। আমরা তো ভারতীর পুজোর ফুলের একটা পাপড়ি রে! হা-হা-হা। কয়েকদিন থাকলেই এখানকার সব জানতে পারবে। আমরা নিজেরাই রান্না করি, জল তুলি, কাঠ কাটি। ঠাকুরও সময় পেলে সাহায্য করেন।"

সুমন্ত বললে, "ও সব কাজ আমিও পারি, বাড়িতে করতাম। এখানেও করব।"

কিন্তু সুমন্তর থাকার, নকল ও সে-সব কাজ করার অবসর হোলো না; প্রত্যুষে উঠেই সুমন্তকে আনন্দ বললেন, "আমার সঙ্গে যেতে হবে। সব গুছিয়ে নাও। ক'দিন পরে ফিরবো ঠিক নেই। যাবো সুন্দরবনের দিকে। ওদিককার গ্রামগুলো ভাল করে দেখা, মানুষগুলোর কথা আর গান শোনা হয় নি। দেখতে হবে, শুনতে হবে, মিশতে হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

সুমন্তর মনে পড়ল, মাস্টারমশাইয়ের কথা—"মস্তিষ্ক আর হাত দুখানি মানুষকে সবার সেরা করেছে। ওদের সাহায্যে কল্যাণের পথে এগিয়ে যাও।"

তাই বেলা দশটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনের প্রয়োজনীয় যা কিছু নিয়ে সুমন্ত নির্মলানন্দের সঙ্গে যাত্রা করল সুন্দরবনের পথে।

সেই নদী মধুমতী, নদীতীরে দুপাশে সেই ছায়া শীতল গ্রাম। নির্মলানন্দের ছোট পানসীখানি চলতে লাগল তার মাঝ দিয়ে স্রোতে ভেসে দক্ষিণে, মানুষের মনের কথা কুড়োতে!

———

ঠাকুরদার বুনো গল্প

॥ ১ ॥

রোদ ঝাঁ ঝাঁ নিঝুম দুপুর। আমবাগানে ঘন শীতল ছায়া। সামনে নদী। নীল তার জল যেন ইস্পাত, রোদে চিক্ চিক্ করছে। ওপারে সাদা বালুচর। তার এক ধার জুড়ে বিশাল ঝাউ-বন যেন সবুজ গালচে পাতা। তা ছাড়িয়ে আকাশের কোল জুড়ে ধোঁয়াটে গাঁ।

আমবাগানে শীতলপাটি বিছিয়ে বসেছেন পাড়ার ছেলেমেয়েদের ঠাকুরদা। রোজই দুপুরে হুঁকো হাতে এসে বসেন। পাড়ার পাঁচ-ছটা ছেলেমেয়েও ঘিরে থাকে তাঁকে। ওদের এখন গরমের ছুটি। ওরা গল্প শোনে।

আজও এসেছে। বলছে, "গল্প বলুন।"

ঠাকুরদা বলেন, "তোদের জন্যে রোজ রোজ এত গল্প কোথায় পাই বল্ তো? আজ সবাই যা। কাল আসিস্। ঝুলিটা হাঁতড়ে দেখতে হবে, যদি দুটো-একটা কোথাও—"

ছেলেমেয়েরা বলে ওঠে, "না, না, আমাদের সামনেই ঝুলি হাঁতড়ান। আমরা ততক্ষণ চুপ করে বস্ছি। গল্প শুনবোই।"

ঠাকুরদা হুঁকো টানতে টানতে হঠাৎ বলেন, "পেয়েছি—পেয়েছি—একটা গল্প পেয়েছি। তখন আমি ছোটনাগপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশে বন কেটে, পাথর সরিয়ে সড়ক তৈরির ভার নিয়েছি, সেই সময়কার। সে মস্ত বন। মনে পড়ছে, তার মাঝ থেকে এধারে-ওধারে দু-একটা পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।"

ছেলেমেয়েরা বলে, "মোটে দু-একটা পাহাড়?"

ঠাকুরদা বলেন, "বনের ফাঁক থেকে যেগুলো দেখা যেত সেগুলোর কথাই বলছি। সেগুলো ছাড়া টিলার মতো আরও অনেক পাহাড় ছিল যেগুলোর ওপর দিয়েই সড়কটা তৈরী হচ্ছিল। আমার সঙ্গে লোক-জন ছিল অনেক। তারা সব মজুর। তাদের মধ্যে কতক ছিল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা, কতক বাইরের।

"কাজ করতে করতে যেখানে দিন শেষ হোত সাধারণতঃ সেখানেই আমরা আস্তানা পাততাম। বনের শুকনো কাঠ-কুটো জড় করে চুলো ধরিয়ে মজুরেরা রান্না চড়িয়ে দিত, কেউ কেউ মাদল বাজিয়ে দেহাতি গান

ধরতো, কেউ কেউ কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমতো। আর, চার ধার থেকে ঝাঁক বেঁধে মশা উড়ে আসতো রক্তের লোভে। বন জুড়ে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ ঝঙ্কার দিত, বুনো ইঁদুরের খোঁজে গাছের কোটর থেকে পেঁচা বেরিয়ে আসতো, মাঝে মাঝে বিশ্রী স্বরে ডেকে উঠতো। দূর থেকে শিয়ালের পালের ডাক ভেসে আসতো। অন্ধকারে উড়তো বাদুড়। আমাদের চারধারে বন আর অন্ধকার। সে অন্ধকারে একমাত্র আলো, মজুরদের চুল্লির আগুন আর লক্ষ লক্ষ জোনাকি—"

ছেলেমেয়েরা বলে ওঠে, "আর আকাশের তারা—"

ঠাকুরদা বলেন, "ঠিক—ঠিক।"

"আচ্ছা ঠাকুরদা, আপনাদের ভয় করতো না?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "আমার ভয় করতো না। মজুরদের কারো কারো যে ভয় করতো না, এমন নয়। ওদের আবার ভূতের বড় ভয়।" বলে ঠাকুরদা হা-হা করে হাসেন। তারপর বলেন, "আগুনের কাছে কোন বুনো জন্তুই ঘেঁষে না। তার ওপর আমাদের দলে লোকও তো কম ছিল না। কাজেই ভয় করবে কেন? বুনো জন্তুরা মানুষকেও ভয় করে।

"তখন শীতের শেষ। গাছভরা আমলকি, ডালভরা বুনো পাকা কুল, দু-একটা পলাশ গাছ ফুলে ফুলে রাঙা হয়ে উঠছে। মহুয়া ফুল তখনও ফোটেনি। একদিন দুপুরে বাইসাইকিলে চড়ে বনের বাইরে ক্রোশ দুই তফাতে এক গাঁয়ে যাচ্ছি। সেখানে ছিল একটা ছোট ডাকঘর আর খান দুই মুদির দোকান। চড়াই ঠেলে, উৎরাইয়ে গড়িয়ে বাইসাইকিল চালাচ্ছি। দু-একটা খাড়া চড়াই এমন যে বাইসাইকিল থেকে নেমে গাড়ি ঠেলে তুলতে হচ্ছে। নির্জন পথ, দু পাশে ঘন বন। শীতের হিমেল হাওয়ায় শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। একটা ছোট উৎরাই থেকে নেমে খানিক হেঁটে গিয়ে একটা চড়াইয়ে উঠছি।

"হঠাৎ দেখি সামনে ডান ধার থেকে বেরিয়ে এলো গায়ে ডোরা-কাটা একজোড়া হায়েনা। হ্যাঁ, হায়েনাই। সেই বড় মাথা, পিছনের পা দুখানা ছোট, লম্বা লোমে ঢাকা ছোট লেজ।

"ওরা সাধারণতঃ রাতে বার হয়। গাঁয়ে ঢুকে ছাগল-বাছুর, ছোট ছেলেমেয়েদের বাগে পেলে ধরে। কবর খুঁড়ে মড়া বার করে খায়। ঘুমন্ত মানুষকে আক্রমণ করতেও ছাড়ে না। ওদের দাঁত খুব শক্ত। মোটা মোটা হাড় কড় কড় করে ভেঙ্গে খায়। গভীর রাতে এক একবার ডেকে

ওঠে। শুনে মনে হয়; কে যেন হা-হা করে হাসছে। কিন্তু এমন দিনের বেলায় দুটিতে বার হলো কেন? হয়তো রাতে খাবার জোটেনি, দিনের বেলা তার খোঁজে বেরিয়ে সামনে আমায় দেখে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে; নড়বার নামটি নেই। এদিকে বনের ছায়াও আড় হয়ে পথে পড়েছে। সূর্য ডুবতে ডুবতেই অন্ধকার নামবে। সন্ধ্যের আগেই গাঁয়ে পৌঁছতে হবে। বাইসাইকিল থেকে নেমে প্রাণপণে চীৎকার করলাম। আমার গলার এই গুরু গম্ভীর স্বর আরও গম্ভীর করে চীৎকার করলাম। কিন্তু টানা বাতাসে তা হাল্‌কা হয়ে উড়ে গেল! হায়েনা যুগল তাতে একটুও বিচলিত হলো না বরং একসঙ্গে দু' পা, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো যেন তাদের কাছে আসতে ডেকেছি। জায়গাটা উৎরাই হোলে ওদের সামনে দিয়ে তীরবেগে গ্যাড়ি চালিয়ে নেমে যেতে পারতাম। কিন্তু ওরা রয়েছে চড়াইটার প্রায় মাথায়। ওদের তাড়াবার উপায় খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কাছে ছুঁড়ে মারবার মতো কোন পাথর চোখে পড়লো না। পথের ধারে, বনের কিনারে যে পাথরগুলো পড়েছিল সেগুলো বেশ বড়। দু' হাতে তোলাই কষ্টকর। তাই পাথর ছুঁড়ে মারার চেষ্টা ছাড়তে হলো। গায়ে ছিল কালো রঙের গরম কোট। খুলে খুব জোরে নাড়তে নাড়তে চীৎকার করতে করতে তিন-চার পা এগিয়ে গেলাম। এবার আমার অদ্ভুত চেষ্টায় কাজ হোল। কিন্তু হায়েনা দুটো তাতে যে ভয় পেল এমন কথা বলতে পারি না। দুটিতেই এমন ভাবে দাঁত বার করে পথ ছেড়ে দিয়ে বনে ঢুকে অদৃশ্য হোল যে মনে হোল, হাসতে হাসতে চলে গেল। যেন বলতে চায়, "অত বড় মানুষটা আমাদের মতো ছোট দুটি জন্তুকে দেখে ভয় পেয়েছে। হা-হা-হা"—

ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করে, "আপনার সত্যি ভয় করেনি?"

ঠাকুরদা বলেন, "একটুও না। তারা চলে যেতেই আমিও সোঁ সোঁ করে গাড়ি চালিয়ে দিলাম। গাঁয়ে যখন পৌঁছলাম, সন্ধ্যা লাগে লাগে।"

ছেলেমেয়েরা বলে, "তারপর?"

ঠাকুরদা বলেন, "তখন ডাকঘর বন্ধ হয়ে গেছে। একজন মুদীর সঙ্গে পরিচয় ছিল। তার দোকানে উঠলাম। সে বললে, রাতে আমার দোকানেই থাকুন। সন্ধ্যে লাগলো। এখন কোথায় যাবেন? আমিও দোকান বন্ধ করে দেবো। সন্ধ্যের পর এখানে কেনাকাটা হয় না।"

"লোকটি বড় ভাল ছিল। সে দোকানে একা থাকতো। দোকানের পিছন দিকে তার রান্না হোত। সে চা তৈরি করে দিলে। চা খেয়ে

দিব্যি আরাম করে তার খাটিয়ায় বসে চুরুট টানতে টানতে পথের কাহিনী বললাম। সে মেঝেয় উবু হয়ে বসে কাঁসিতে আটা মাখতে মাখতে বলে, 'হায়েনারা বড় মানুষকে সহজে আক্রমণ করে না। আমি একদিন ভারি ঝকমারিতে পড়েছিলাম, বাবু।'

জিগ্যেস করি, 'কি রকম?'

'বল্ছি'। সে চুলো ধরাবার জন্যে লাকড়ি আনতে আঙিনায় নেমে গেল। একটু পরে খানকয়েক শালের রলা বগলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর লেচি কাটতে কাটতে বলে,—কিন্তু তোরা আজ বাড়ি যা, গল্পটা কাল শুনিস্।"

ছেলেমেয়েরা বলে, "না, না—আমরা আজই শুনবো।"

ঠাকুরদা বলেন, "তবে একটু সবুর কর্। কল্কেটা ভরে নি।"

ঠাকুরদা কল্কে ভরে নিয়ে হুঁকোয় বসিয়ে দু-এক টান দিলেন। তারপর আবার গল্প শুরু করলেন।

॥ ২ ॥

"শাল রলাগুলো চুল্লীতে ফুটফাট ফাটছে, ধোঁয়ার সঙ্গে মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। বনোয়ারীলাল বলতে থাকে। কিন্তু লোকটির ঐ নামই ছিল কি? হাঁ, হাঁ, বনোয়ারীই বটে। সে বলে, 'এই চৌমাথা সড়কের ধারে এই গাঁ আগে ছিল আরও ছোট। তখন ডাকঘর বসেনি, চার ধারের বন-জঙ্গল ছিল আরও ঘন। কোন কাঠুরে একা বনে ঢুকতে সাহস করতো না, চার-পাঁচজন মিলে কাঠ কাটতে যেত। তবু দুটো-একটাকে বাঘে ধরতো। এখন সেদিন নেই, বন-জঙ্গল পাতলা, মাঝে মাঝে আবাদ, দু-চার ঘর লোকের বসতিও হয়েছে। কিন্তু হরিণের উৎপাত বেড়েছে। মকাই আর গম পাকতে শুরু হোলে দল বেঁধে ওরা আসে। আবার, ওদের লোভে দু-একটা বাঘও এসে পড়ে। তখন শিকারীর আনাগোনা হয়।

আপনি তো দেখেছেন, এদিককার বনে জায়গায় জায়গায় দু' চারটে টোপাকুলের গাছ আছে। মাঘ মাসে কুল পাকে। গাছগুলোর কাছাকাছি জায়গা পাকাকুলের টক-মিঠে বাসে ভরে যায়। বাতাসে পাকা কুল ঝরে পড়ে! পাখিতে খায়। আর কারা খায় জানেন? শিয়াল আর ভালুকে।'

বনোয়ারীলালের কথা শুনে অবাক হই। বলি, 'ভালুক তো মহুয়া ফুল, মৌচাক থেকে মধু খায়, পাকা কুলেও ওদের লোভ এটা তো জানতাম না।'

বনোয়ারী বলে, 'পাকা টোপাকুল ওরা খুব ভালবাসে। ও-সব ছাড়া পোকামাকড়ও খায়। তবে রাতে বার হয় না। বছর চার-পাঁচ আগের কথা। আমার বাবা তখন বেঁচে। দোকানে তিনিই বসতেন। আমিও মাঝে মাঝে বসতাম।

'মাঘ মাসে একদিন গেলাম, ঝুড়ি আর টাঙি নিয়ে পশ্চিম দিকের জঙ্গলে। ওদিককার জঙ্গল বরাবরই পাতলা। বেলা তখন একপ্রহর হবে। ক'দিন মেঘ করবার পর আগের দিন শেষবেলায় এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তাতে বন-জঙ্গল ভিজে ছিল। বনে ঢুকে চলেছি। সিকি ক্রোশটাক যাবার পর এক জায়গায় একটা আমলকী গাছ পেলাম। তাতে বেশ বড় বড় আমলকী ফলেছিল। ভাবলাম, এক ঝুড়ি আমলকী পেড়ে নিয়ে যাই। আট-দশ মাইল দূরে শহরের বাজারে ওর দাম পাওয়া যাবে। হঠাৎ দেখি, সামনের দিকে এক জায়গায় একটা মস্ত কুল গাছ। পাকা কুলে গাছতলা ছেয়ে আছে, গাছের ডাল পাকা কুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। বাতাসে দু-চারটে কুল টপটাপ ঝরে পড়ছে। আমাদের গাঁয়ে মেয়েরা নুন মাখিয়ে কুল শুকিয়ে রাখে, কেউ কেউ গুড় দিয়ে মিঠে আচার বানায়। শহরের বাজারে এসবও বিকোয়। ভাবলাম, আমলকী আর কুল দুই-ই নিয়ে যাবো। একটা বস্তা সঙ্গে আনলে বেশ বুদ্ধিমানের কাজ হোত। কিন্তু যখন আনিনি তখন আর আফশোস করে লাভ কি ?

'কিন্তু কয়েকটা কুল আগে পরখ করতে হবে মিঠে কি না। কোন কোন বুনো কুল একটু তেতোও হয়। ওদিকে আর একজনও যে আমার আগেই কুলতলায় এসেছে তা তখনও বুঝতে পারিনি। একটা কুল কুড়িয়ে মুখে দিতে যাবো, অমনি দেখি, সামনে একটা ভালুক দুপায়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে 'বদ্ বদ্' শব্দ করলে। তার কুৎকুতে চোখ দুটো ক্ষুদে ছুরির ফলার মতো চিক্ চিক্ করে উঠলো। সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করলে দুর্দান্ত বুনো জন্তুকে কাবু করা যায়। চাই সাহস, গায়ে শক্তি আর কৌশল। কিন্তু সাহস না থাকলে শক্তি বৃথা, কৌশল জানা না-জানা সমান। শুনেছিলাম, ভালুক আক্রমণ করবার সময় পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, দুহাতে নাক ঢাকে আর এগিয়ে আসে। নাক

ওদের দুর্বল জায়গা। খুব জোরে নাকে আঘাত করতে পারলে ওরা কাবু হয়। তবে বন্দুকের গুলিতে কাবু হয় না কোন্ জন্তু? কিন্তু গুলিটা শরীরে তেমন জায়গায় লাগা চাই।"

বনোয়ারীকে জিগ্যেস করি, 'তুমি কখনো শিকার করেছো?'

সে বলে, 'না। ও শখ্ আমার নেই। আর তাতে আমার দরকারই বা কি? তারপর কি হোল শুনুন। দেখলাম, পালাবার উপায় নেই। ছুটলে ভালুকটাও আমাকে তাড়া করবে। ওর সঙ্গে ছুটে পারবো না। গাছে চড়লে ভালুকটাও গাছে চড়বে। গাছে চড়তে ওরা ওস্তাদ। এখন একমাত্র বাঁচবার উপায় ওর নাকে টাঙির এক কোপ দেওয়া। সেটাও সহজ ব্যাপার নয়, বুঝতেই পারছেন। ভালুকটা ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে আর সেই রকম বিশ্রী শব্দ করছে। সরু ঠোঁট দুখানা নড়ছে। ওর লক্ষ্য যেন আমার মুখ আর গলা। একটা চড় যদি আমার মুখে বসায় তাহলে আমার নাক চোখ মুখ তালগোল পাকিয়ে যাবে। তারপরই দুহাতে জাপটে ধরে গলায় কামড় দিলে আমার দফারফা। কিন্তু আমি জোয়ান মরদ ভালুকের হাতে অসহায়ের মতো মরবো কেন? সে আমার সামনে হাত দুয়েকের মধ্যে আসতেই দিলাম টাঙির এক কোপ। কপালগুণে কোপটাও লাগলো ঠিক তার নাকে। সেই আঘাতে সে ঘোঁৎ করে উঠলো, কিন্তু আর এগোলো না। আমিও অমনি দিলাম ছুট্—ছুট্—ছুট্। অনেক দূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখলাম। ভালুকটাকে দেখতে পেলাম না। একখানা বড় পাথরের ধারে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগলাম। ওদিকে সামনেই গাঁ দেখা যাচ্ছে। সড়ক দিয়ে একখানা মালবোঝাই ট্রাক চলে গেল। বুঝলাম, আমার মারটা বেশ গুরুতর হয়েছে। নাহোলে কি আমার সেদিন রক্ষা ছিল? বাবা শুনে খুব বকলেন। গাঁয়ের যে সব ছেলে বনে কুল খাবার মতলব করেছিল তারা সাবধান হয়ে গেল। বনের কুল বনেই রইলো।'—বলে বনোয়ারী হাতে লেচি নিয়ে চাপড়ে রুটি বানাতে লাগলো। পরদিন ডাকঘরে আমার দরকারী কাজ সেরে দুপুরে কাজের জায়গায় ফিরে এলাম।"

ছেলেমেয়েরা বলে, "ঠাকুরদা, বাঘের মুখে পড়েননি কোনদিন?"

ঠাকুরদা বলেন, "না। তবে, বাঘের অনেক গল্প শুনেছি।"

"বলুন—বলুন।"

"আজ নয়, কাল বলবো।"

বেলা গড়িয়ে আসে। ছেলে-মেয়েরা আনন্দে বাড়ি চলে যায়।

॥ ৩ ॥

পরদিন দুপুরে শ্রোতারা দলে কিছু ভারী হয়ে এসে হৈ-হল্লা বাধিয়েছে। কয়েকজন গাছে চড়ে কাঁচা আম খাবার মতলব করছে। কয়েকজন তাদের বাধা দিচ্ছে। বাগানখানি ঠাকুরদার। এবার মাত্র দু-তিনটি গাছে আম ফলেছে। এমন সময়ে ঠাকুরদাকে দেখা গেল, হুঁকো হাতে আসছেন। দুটি ছেলে ছুটতে ছুটতে তাঁর বাড়ি থেকে মস্ত শীতলপাটি এনে গাছতলায় বিছিয়ে দিলে। খানিক তফাতে একটা গাছে পাতার আড়ালে বসে একটা কোকিল ডেকে ডেকে সারা হচ্ছিল।

সকলে হুটোপুটি করতে করতে ঠাকুরদার সামনে বসে পড়ে বলে, "বলুন, বাঘের গল্প বলুন।"

ঠাকুরদা বলেন, "ভয় পাবি না তো?"

সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, "ভয় আবার কি?"

"আচ্ছা, তবে শোন্।"

"ঠাকুরদা, কোকিলটাও আপনার গল্প শুনবে বলে চুপ করেছে।" বলে একজন।

সকলে হেসে ওঠে।

ঠাকুরদা বলতে শুরু করেন, "অনেকদিন আগে আমার সঙ্গে একজনের আলাপ হয়েছিল। তিনিও সরকারী বন-বিভাগে চাকরি করতেন। তখন তিনি অবসর নিয়েছেন। ভারি আমুদে মানুষ। বন-জঙ্গলে কত রকমের পশুপাখীর দেখা যে পেয়েছেন!

"একদিন বললেন, 'লোকে বাঘকে-এত ভয় করে কেন? সব বাঘই কি মানুষ খায়? তিন রকমের বাঘ আছে। এক ধরনের বাঘ আছে যারা বুনো জন্তু যেমন হরিণ, মোষ, মাছ, বাঁদর ইত্যাদি শিকার করে খায়। এই ধরনের বাঘ খুব চট্‌পটে হয় আর এদের গায়ে খুব জোর। এরা গহন বনে থাকে।

'আর এক ধরনের বাঘ আছে যারা গাঁয়ের গরু-বাছুর-ছাগল ইত্যাদি ধরে খায়। এরা সাধারণতঃ গাঁয়ের কাছাকাছিই চলাফেরা করে।

'আর এক ধরনের বাঘ আছে যারা সাধারণতঃ মানুষ খায়। এই মানুষখেকোগুলোর বয়স অনেক। এরা হচ্ছে বুড়ো বাঘ। এদের দাঁত-

নখ ঐ দু'রকমের বাঘের মতো চোখা নয়। এরা খুব চট্‌পটে হয় না। কিন্তু আকারে হয় বড়। এরা সাধারণতঃ লোকালয়ের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করে। কিন্তু আমার ধারণা, সব বাঘই সুযোগ পেলে মানুষ খায়। কথাটা কেন বলছি শুনুন ?

'বাঘ অল্প বয়সে প্রথমে তার মায়ের কাছে পশু শিকার করতে শেখে। বনের পশু যেমন হরিণ, শিকার করতে কম শক্তির দরকার হয় না। হরিণের প্রধান আত্মরক্ষার অস্ত্র শিঙ। আবার, ওদের ক্ষুরেও খুব ধার। ছুটতেও পারে ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল। তবে এর মধ্যে কথা আছে। প্রাণের ভয়ে ছোটা এক, নির্ভয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে যাওয়া আর এক। হরিণ বড় ভীরু প্রাণী। বাঘ অত জোরে ছুটতে পারে না। ওরা সাধারণতঃ হঠাৎ হরিণের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। হরিণ ধরা বুড়ো বাঘের কর্ম নয়। তবে বাগে পেলে ছাড়ে না।

'তা' আমি বলি, বুনো-জন্তু-শিকারী বাঘই বুড়ো হলে গাঁয়ের ধারে আসে। বাগে পেলে পোষা গরু-বাছুর-ছাগল ধরে। বুনো হরিণ, বুনো মোষ ধরার চেয়ে ওদের ধরা খুব সহজ। তারপর যখন তাও পারে না তখন মানুষ ধরে খায়। মানুষ-খেকোগুলো সাধারণতঃ আর কোন প্রাণী ধরে না।'

"ভদ্রলোকের কথায় বাধা দিয়ে বলি, 'কিন্তু মশাই সুন্দরবনের বাঘে মাছ ধরে খায়। জোয়ারের জল খাড়ি-খানা-খন্দে ঢোকে। তখন নানা রকমের মাছও জলের সঙ্গে ঐসব জায়গায় এসে পড়ে। ভাটার টানে জলের সঙ্গে সব মাছ বেরিয়ে যায় না, অল্প জল-কাদায় কিছু কিছু থাকে। বাঘে তাদের ধরে খায়। সুন্দরবনের 'রয়াল বেঙ্গল টাইগারের' মানুষ-খেকো বলে ভারি বদনাম। ওরা বাগে পেলে হরিণ আর বাঁদর ধরেও খায়।"

"তিনি বলেন, বটে। ওরা আকারেও খুব বড় হয়। গায়ে শক্তিও ভীষণ। কিন্তু আমি বলছি, যাদের বয়স অল্প তারাই বুনো পশু-প্রাণী ধরে খায়। তবে সেই সময়ে যদি কোনক্রমে মানুষের রক্ত-মাংসের স্বাদ পায় তাহলে মানুষ ধরবার দিকেও তার ঝোঁক হয়, আর কিছু চায় না।

"বললাম, 'আপনি বলছিলেন, মানুষ বাঘকে এত ভয় করে কেন ? তাই না ? কিন্তু না করে কি করবে ? কে মানুষখেকো আর কে অন্য প্রাণীর ভক্ত তা কি করে জানা যায় ? তাই লোকের ধারণা সব বাঘই মানুষখেকো।'

"তিনি বলেন, 'তা বলতে পারেন।'

"আমি বলি, 'সাঁওতালদের মধ্যে এমন দু-একজন আছে যারা লাঠিপেটা করে বাঘ মেরেছে।'

"তিনি বলেন, 'সে মানুষ-খেকো বাঘ নয়, চিতা বাঘ। আমাদের গাঁয়ের এক চাষী-বউ একবার সন্ধ্যেবেলায় জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ দিয়ে ডোরাকাটা বাঘ ঠেঙিয়েছিল। বাঘটা ভরসন্ধ্যেয় উঠোনে এসে চুপচাপ বসে ছিল। চাষী তখন বাড়ি ছিল না, গিয়েছিল হাটে। চাষী-বউ তার দু-তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে রান্না ঘরে রান্না করছিল। আর গরু-বাছুর ছিল গোয়ালে। বাঘটা চোরের মতো চুপি চুপি গিয়ে উঠোনে বসে ছিল। তার মনে কি মতলব ছিল কে জানে! চাষীর মেয়ে ঘর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে "বাঘ" বলে চীৎকার করে ওঠে। চাষী-বউ বাঘটাকে দেখেই জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তাড়া করতেই ব্যাঘ্রমশাই লম্বা।

'আবার, বড় বড় শিকারীও বাঘের মুখে প্রাণ হারিয়েছে। সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করতে গিয়েও কেউ কেউ প্রাণ হারায়। তাই বলে কি সুন্দরবনের বাঘ মারা পড়ে না? শিকারীরাই ওদের মারে। সুন্দরবনে, শুধু সুন্দরবনে, কেন, আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে যে সব দেশী শিকারী বাঘ শিকার করে তাদের দুর্দান্ত সাহস। কখন একজন কখন কখন দুজন বন্দুক নিয়ে শিকার করে। তারা কখন কখন বাঘকে ভুলিয়ে সামনে এনে পাঁচ-ছ হাত দূর থেকে বন্দুক দিয়ে মারে। এক গুলিতেই অমন হিংস্র, চতুর, নির্ভীক জানোয়ার কাৎ। মারতে না পারলে শিকারীরও শেষ। এ হচ্ছে, মানুষের এক ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে রীতিমতো লড়াই। তবে বাঘ মানুষের উপকারও করে'।

ছেলেমেয়েরা বলে ওঠে, "বাঘ আবার কি উপকার করে?"

ঠাকুরদা বলেন, "বনের ধারে শস্যক্ষেতের বড় শত্রু হচ্ছে হরিণ, বুনো শূওর, ইঁদুর আর চড়ুই, বুলবুলি, পায়রা প্রভৃতি পাখী। বাঘ হচ্ছে হরিণ আর শূওরের শত্রু। ওরা এলেই ওদের লোভে বাঘ আসে। বাঘ না থাকলে বুনো হরিণ আর বুনো শূওরের সংখ্যা এত বাড়তো যে শস্যক্ষেতে শস্য রাখা অসম্ভব হোত।"

একটি ছেলে বলে, "আচ্ছা ঠাকুরদা, বইয়ে পড়েছি, বাঘ বিড়াল জাতীয় প্রাণী। কিন্তু বিড়াল জলকে ভয় করে, সাঁতার দিতে পারে না। বাঘও তাই করে?"

ঠাকুরদা বলেন, "মোটেই না। ওরা আগুন ছাড়া আর কিছু ভয় করে

না। দিব্যি নদী সাঁতরে পার হয়। ওরা নদীপাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারের একটা নিশানা ঠিক করে তার দিকে সোজা সাঁতার দেয়। সাঁতরাতে সাঁতরাতে বেঁকে গেলে ফিরে গিয়ে যেখান থেকে জলে নেমেছিল ঠিক সেইখান থেকে জলে নেমে আবার নিশানার দিকে সাঁতরে চলে।"

"আচ্ছা ঠাকুরদা, বাঘ আর বুনো শুওরে কখনও লড়াই হয় না? আপনি দেখেছেন কখনও?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "না ভাই আমি দেখিনি। তবে সেই ভদ্রলোকটি বলেছিলেন, তিনি একবার আসামের এক জঙ্গলে বাঘে-শূওরে লড়াই দেখেছিলেন।"

"বলুন না—বলুন না গল্পটা।" বলে ওঠে সকলে।

ঠাকুরদা বলেন, "তবে কাল হবে। আজ সবাই বাড়ি যা।"

ছেলেমেয়েরা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে যায়।

॥ ৪ ॥

পরদিন ছেলেমেয়েদের দল আরও ভারি। আজ হবে, বুনো বাঘ আর বুনো শূওরের লড়াইয়ের গল্প। কয়েকজন ঠাকুরদাকে বাড়ি থেকে ধরে এনে আসরে বসিয়েছে।

ঠাকুরদা বলেন, "সেই ভদ্রলোকটি শিকারও করতে পারতেন। তিনি একদিন বললেন, 'তখনও আমি চাকরি নিইনি। একবার শীতকালে গাঁয়ের কাছে এক জঙ্গলে বাঘ শিকারের ব্যবস্থা করলাম। জায়গাটায় ক'দিন ধরে বাঘের উৎপাত শুরু হয়েছিল। কাছেই বিশাল ধানক্ষেত। তাই বুনোশূওরও আসতো। তারা চাষীদের বড় ক্ষতি করতো। বাঘও একদিন একটা বাছুর ধরে নিয়ে গেল। বাঘ-শূওরের উৎপাতে চাষীদের খুব ক্ষতি হতে লাগলো। তাই ঠিক করলাম, প্রথমে বাঘটাকে মারতে হবে। শিকারের দিন ঠিক করে চাষীদের কয়েকজনকে দিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গলা-সমান গর্ত খোঁড়ালাম। পরদিন সন্ধ্যের একটু আগে খানিক তফাতে একটা ছাগল বেঁধে রাখা হোল। আমিও বন্দুক নিয়ে সেখানে পৌঁছে গর্তর মধ্যে নামলাম।

'ছাগলটা প্রাণভয়ে মাঝে মাঝে ডাকতে লাগলো। চারিদিক থেকে অন্ধকার আর মশার ঝাঁক এসে আমাকে ঘিরে ধরলো। এলো কৃষ্ণপক্ষের

রাত। কি তিথি মনে নেই। তবে মনে আছে তখন শেষ রাত, চাঁদ উঠেছিল আকাশে। কারণ ঘটনাটা ঘটেছিল তার কিছু আগে।

'সেই নির্জন জায়গায় গর্তের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছি। আকাশ থেকে তারার আলো ঝরে পড়ছে। চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্কাই লাইন' মানে দিকরেখা, আমার দৃষ্টি তার সমান্তরাল পথে ঘুরছে। সুতরাং সেই ঘন অন্ধকার মাঠের-ওপর দিয়ে কোন বড় প্রাণী চলাফেরা করলে আমার চোখে পড়বেই। আমি কতকটা মশার আক্রমণ থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে, কতকটা নজর রাখবার জন্যে গর্তর মধ্যে ঘুরপাক দিচ্ছি। ছাগলটা সম্ভবতঃ ক্লান্ত হয়ে আর ডাকছে না, বসে বসে জাবর কাটছে। একবার তার কাসি আর হাঁচির, বার দুই ঢোক গেলার শব্দ শুনতে পেলাম।

'রাত এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বাদুড় উড়ে গেল। আজকাল যে রাডার যন্ত্রের সাহায্যে দূর আকাশে বিমানের গতিবিধি জানতে পারা যায় বাদুড়ের মুখে প্রকৃতি সেই রকমের একটি যন্ত্র দিয়েছে। সেই প্রাকৃতিক রাডার-যন্ত্রের সাহায্যে ওরা গাঢ় অন্ধকারে পথ আর লক্ষ্যবস্তুর নির্ভুল নিশানা করতে পারে। তারই সাহায্যে পাতার রাশি, ফলের মেলায়ও ওরা ঠিক পাকা ফলটি দেখতে পায়। পেয়ারা, আম, লিচু পাকতে শুরু করলেই ওরা আসে, আর ঠিক পাকা ফলটিতে কামড় দেয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি, বনের পাখি গাছের যে ফলটি খায় সেটি কিন্তু সবচেয়ে ভাল। খারাপ ফলে ওরা ঠোঁটই ঠেকায় না। যাক, তারপর শুনুন।

'রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে। না আসে বাঘ, না আসে শূওর। এমন কি একটা শিয়ালেরও দেখা পাই না। দূরে কোথায় যেন তারা কয়েকবার ডেকে উঠেছে। তারপর সব চুপচাপ। ঘুরে ঘুরে চারধারে দেখছি। হঠাৎ মনে হোল কুকুরের মতো একটা প্রাণী পুব দিক থেকে আসছে। চলার সময় বাঘ শরীরকে কিছু সঙ্কুচিত করে। তাই তফাৎ থেকে দেখলে কুকুর কি বাঘ তা বোঝা যায় না। মনে করলাম, কুকুর আসছে কিন্তু ছাগলটা খুব চঞ্চল হয়ে এধার-ওধার ছোটাছুটি করায় বুঝতে দেরি হোল না যে ওটা বাঘ। বন্দুক বাগিয়ে আমিও তৈরী হয়ে দাঁড়ালাম। সামনে হাত কয়েকের মধ্যে এলে ওর আর রক্ষা নেই। কিন্তু হঠাৎ আর একটি প্রাণী তার বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসতে আসতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলো। বুঝলাম, বুনো শূওর। ও বোধ হয় বাঘের উপস্থিতি

জানতে পারে নি। আবার বাঘও তার উপস্থিতি আন্দাজ করতে পারে নি, মনে হয়। নাহলে দুই শত্রু পরস্পরের সম্মুখীন হবে কেন? তারপরই উভয়েরই ভয়ঙ্কর গর্জন, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ। মাটিতে দুপদাপ, খস্ খস্ শব্দ। এক মুহূর্তের জন্যেও কেউ কাউকে ছাড়লে না। কিছুক্ষণ দুই হিংস্র বন্যের দ্বন্দ্ব চলার পর সব শান্ত, নীরব হোল। ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ধীরে ধীরে উঠলো। সে যেটুকু আলো ছড়িয়ে দিলে তাতে অন্ধকার বিশেষ দূর হোল না। কাজেই বুঝতে পারলাম না দ্বন্দ্বের পরিণাম কি হোল। আর ছাগলটারই বা কি হোল তাও জানতে পারলাম না। সেও চুপচাপ। হয়তো ভয়ে মরে গিয়ে থাকবে। সঙ্গে টরচ্ থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম।

'অবশেষে পুবদিকে শুকতারা উঠলো, ক্রমে সেদিকটা ফর্সা হয়ে এলো। বনে-জঙ্গলে পাখি ডাকতে লাগলো। ভোরের আলোয় এবার দেখলাম, বাঘ-শুওর দুইটিতেই মরে পড়ে আছে। দুটিরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। মাটিতেও রক্ত। ছাগলটা নেই।'

"ভদ্রলোকটি আরও বললেন, 'এমন দ্বন্দ্ব সচরাচর হয় না। শুওরটা ছিল দাঁতালো, প্রকাণ্ড, বাঘটাও ছিল মস্ত। এই দ্বন্দ্বের ফলে গাঁয়ের লোকেরা বাঘের অত্যাচার থেকে বাঁচলো। ছাগলটাকে পরে এক চাষীর বাড়িতে পাওয়া যায়। একবার বুনো মোষ আর বাঘের লড়াইয়েরও গল্প শুনেছিলাম। গহন বনে এমন কাণ্ড কখন কখন হয়।'

॥ ৫ ॥

ক্ষুদে শ্রোতারা বলে, "ঠাকুরদা, চিতাবাঘের গল্প বলুন। চিতাবাঘ মানুষ খায়?"

ঠাকুরদা বললেন, "সে কথা বড় একটা শোনা যায় না। তবে ওরা মানুষের খুব ক্ষতি করে। গাঁয়ে ঢুকে ছাগল-বাছুর-হাঁস-মুরগী, এমন কি, ছোট ছেলেমেয়েদেরও ধরে। সুবিধে পেলে মানুষকেও ছাড়ে না। জিম করবেট রুদ্রপ্রয়াগে যে চিতাটার শিকারের কাহিনী লিখেছেন, সেটা ছিল মানুষখেকো। তার মতো সাংঘাতিক চিতার কথা কোথাও শুনিনি। কিন্তু চিতা আকারে খুব বড় হয় না। বাঘের গায়ে হলদের ওপর কালো ডোরা। অবশ্য সাদা ভালুকের মতো সাদা বাঘও আছে। এই

তো সেদিন আমাদের মধ্য প্রদেশের বন থেকে এক জোড়া সাদা বাঘ ধরে সকলকে দেখানো হয়েছে। চিতার গায়ে থাকে হলুদের ওপর কালো ছাপ। ওদের মধ্যে আছে দুটি জাত।

"যাদের গায়ে কাছাকাছি কয়েকটা করে কালো ছাপ থাকে, তাদের বলে গুলবাঘা। আর এক ধরনের আছে, তাদের মুখ অনেকটা ছুঁচলো, পা সরু। এদের বলে শিকারী চিতা। বাঘের চেয়েও চিতাবাঘ চতুর আর চটপটে। ওরা আবার গাছে চড়ে শিকারের আশায় বসে থাকে। তলা দিয়ে শিকার গেলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। ওদের ডাক অনেকটা বিড়ালের মতো, তবে বেশ জোরালো।

"আমাদের দেশের সাঁওতালরা লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে চিতাবাঘ মেরেছে এমন ঘটনা কখন কখন শোনা যায়। ভীল, কোল, ওঁরাও প্রভৃতি পাহাড়-জঙ্গলবাসীরা তীর-ধনুক দিয়েও বাঘ-চিতা শিকার করে।"

"আচ্ছা, ঠাকুরদা, বাঘ আর চিতা পোষ মানে না?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "শুনি নি তো। পোষা প্রাণী শান্ত হয়। তাকে কি শক্ত লোহার খাঁচায় কেউ বন্দী করে রাখে? তার কাছে কেউ ঘেঁষে না? অথচ ওদের সকলকেই খাঁচায় বন্দী করে রাখা হয়। সার্কাসের বাঘেরও এই দশা। তবে চিতাবাঘের খেলা কেউ দেখায় না। ওরা ভারি বেয়াড়া। বাঘা যতীনের নাম শুনেছিস্ তো? তিনি চিতাবাঘের বুকে চেপে বসে ছোরা দিয়ে তাকে মেরে ফেলেছিলেন। তাই তাঁর নাম হয়েছে, 'বাঘা যতীন।' চিতাটাও তাঁকে ছাড়ে নি, আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। তাতে তিনি কত দিন ভুগেছিলেন! আমি তাঁকে দেখেছি। সিংহের মতো সাহসী ছিলেন। গায়ে শক্তি ছিল প্রচুর।

"শিকারী চিতা ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল ছুটতে পারে। তবে সব সময়ে দৌড়ের ঐ বেগ থাকে না, মাইলের প্রথম সিকি মাইল ঐভাবে পার হয়। যেমন শিকারীরা শিকারী বাজকে দিয়ে আকাশে পায়রা শিকার করায় শিকারী চিতাকে দিয়েও বনবাসী শিকারীরা বুনো হরিণ শিকার করিয়ে থাকে। এই জাতের চিতা প্রধানতঃ মধ্য প্রদেশের বনে থাকে।

"তখন আমি থাকি মধ্য প্রদেশে। মধ্য প্রদেশ পাহাড়-জঙ্গলময়। রাজ্যটির প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। আমাদের বাংলাদেশের মতোই সেখানে বর্ষামেঘের কী ঘটা! আর বসন্তে বনের সে কী বাহার

হয়! বনে বনে ফুল ফোটে। ফুলের রসে-গন্ধে মৌমাছিরা আসে, মধু খায়। চাক বেঁধে তাতে বনফুলমধু জমা করে। আমাদের বাংলাদেশেও সেই রাঙা মধু বেচতে আসে ওখানকার মেয়েরা।

"একদিন আমার সেখানকার এক বন্ধু বললেন, 'আপনাকে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখাবো। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে কিছু কষ্ট স্বীকার করতে হবে আর সাহস করে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

"বললাম, 'কি রকমের কষ্ট? আর সাহসই বা কিসের জন্যে?'"

"'গরুর গাড়িতে বাঘের পাশে বসে গভীর জঙ্গলে যাবার জন্যে।'"

'আপনি যাবেন তো? আপনি পারলে আমিও পারবো। সঙ্গে বন্দুক নিতে হবে কি?'

"তিনি বলেন, 'না। আমরা সে ব্যাপারে দর্শক মাত্র।'

"পরদিনই ভোরে মস্ত এক গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো আমার আস্তানার সামনে। দেখি,লম্বা শিঙওয়ালা সাদা রঙের হৃষ্টপুষ্ট এক জোড়া বলদ তাতে জোড়া রয়েছে। গাড়িতে বসে আছেন, আমার বন্ধু আর চারটি কালো জোয়ান লোক। তাদের মাথায় পাগড়ি, পাশে লাঠি, তীর-ধনুক। তাদের একজন গাড়ি হাঁকাচ্ছিল। তাদের চারজনের মাঝখানে কুকুরের মতো থাবায় ভর দিয়ে বসে ছিল চোখ বাঁধা, গলায় শিকল একটি শিকারী চিতাবাঘ। বন্ধু বললেন, 'ভয় পাবেন না। জোয়ালে ভর দিয়ে আমার কাছে উঠে এসে বসুন।'

"তাঁর কথায় মনে যে সাহস হোল তা বলতে পারি না। তবে ভাবলাম, 'তাঁরা যখন ওকে ঘিরে নির্ভয়ে বসে আছেন তখন ওখানে গিয়ে বসলে যত বিপদ কি আমারই হবে?' উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে লাগলো। গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে বন, বন ছাড়িয়ে আবার লম্বা ঘাসে ছাওয়া মাঠে পৌঁছলাম। সকলে চুপচাপ। গাড়িতে উঠতেই বন্ধু আমাকে ফিস্ ফিস্ করে বলেছিলেন, 'আমরা সকলে এখন বোবা আর পঙ্গুর মতো। কথা কইবেন না, নড়াচড়া করবেন না।' কাজটি অবশ্য সহজ নয়। তবু নিয়ম মেনে চলতে হোল। সব কাজেরই নিয়ম আছে।

"ঘড়িতে দেখলাম, বেলা তখন দুটো। হঠাৎ আমাদের গাড়ি থেমে গেল, লোক কয়জন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাদের চঞ্চলতার কারণ জানবার জন্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, মাঠের ডান ধারে জঙ্গলের সীমানায় কয়েকটা কালসার হরিণ চরছে। হরিণগুলো তখনও আমাদের

দেখতে পায় নি। বাতাসও বয়ে আসছিল তাদের দিক থেকে। হঠাৎ আমাদের গাড়ি থেকে শিকারী চিতাটা এক লাফে মাঠে নেমে তীরবেগে হরিণগুলোর দিকে ছুটে গেল। চক্ষের পলকে সে একটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। বাকি যারা তারা নিমেষে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"আমরা সকলেই গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি হরিণটা মরে গেছে। তার কণ্ঠনালী ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, রক্তাক্ত। চিতাটার চোখে কাপড় বাঁধা নেই।

"বন্ধু বললেন, 'খুব ছোটবেলা থেকে এই ধরনের চিতাবাঘকে হরিণ শিকার করতে শিখানো হয়। ঐ দেখুন ওকে হরিণটার খানিকটা মাংস খেতে দেওয়া হচ্ছে। ওরা যাতে কেবল হরিণকেই চিনতে পারে সেই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তারপর আবার ওর চোখ বেঁধে গলায় শিকল পরিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক যেন একটা শিকারী কুকুর। তাই নয়?"

"আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হবে। আমাদের দেশের লোকে হিংস্র পশুকেও পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়।"

শ্রোতাদের একজন জিগ্যেস করে, "আচ্ছা ঠাকুরদা, কেউ বাঘ-সিংহকে দিয়ে শিকার করাতে পারে না?"

"এ পর্যন্ত তো পারে নি। তোরা কেউ চেষ্টা করে দেখিস।"

একজন বলে, "আচ্ছা, আমাদের দেশে সিংহ নেই?"

ঠাকুরদা বলেন, "অনেক কাল আগে অনেক ছিল। এখনও কাথিওয়াড়ে গির অরণ্যে অল্প-স্বল্প আছে। তবে তারা আফ্রিকার সিংহের মতো আকারে প্রকাণ্ড নয়। তাদের কেশর ছোট।"

"একটা সিংহের গল্প বলুন। সিংহকে কেন পশুরাজ বলে?"

ঠাকুরদা বলেন, "আজকের আসর এই পর্যন্ত। আবার কাল।"

ছেলেমেয়েরা অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে যায়।

॥ ৬ ॥

পরদিন আসরে এসেই ঠাকুরদা বলেন, "কাল তোদের মধ্যে কে যেন প্রশ্ন করেছিল, সিংহকে পশুরাজ বলে কেন? কিন্তু ভাই, প্রশ্নটার ঠিকমতো উত্তর কেউ কোথাও দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। শক্তিতে সিংহ আমাদের বেঙ্গল রয়াল টাইগারকে হার মানাতে পারে এমন কথা

কেউ বলে না। ঠিক মনে করতে পারছিনা, কোন এক বিদেশী পশু-বিশেষজ্ঞের বইতে যেন পড়েছিলাম, বাঘ-সিংহের এক দ্বন্দ্বের ঘটনার বিবরণ। তাতে তিনি বলছেন, 'সিংহটা বেঙ্গল রয়াল টাইগারের কাছে হার মানে। বাঘটার শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা সিংহটার চেয়ে বেশি ছিল।' কথাটা আমার বিশ্বাস হয়েছিল।"

একজন বলে, "ঠাকুরদা, সিংহ ক্ষিদে না পেলে শিকার করে না?"

ঠাকুরদা বললেন, "কথাটা একদম ভুল। সিংহও শিকার সামনে দেখলেই তাকে আক্রমণ করে। সিংহীনী বেশি হিংস্র হয়। ওরা বাচ্চা-কাচ্ছা সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অনেক সময়ে সিংহ-সিংহীনী জোড়ায় থাকে। ওরাও বাঘের মতো চতুর, চুপিচুপি চলাফেরা করে শিকারের পিছু নেয় আর বাগে পেলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। বিড়ালজাতীয় প্রাণী যে। ওরা পচা মাংসের ভক্ত। তাই শিকারকে মেরে তার কিছু খেয়ে কয়েক দিন ফেলে রাখে। বাঘের মতো সিংহও হিংস্র। তবে হাঁ, সিংহমশাইয়ের মূর্তি দেখলে সম্ভ্রম জাগে বটে। লম্বা কেশর ভরা মস্ত মাথা, ঘাড়, গম্ভীর মুখ, সরু কোমর, লেজের আগায় লম্বা লোমের গোছা দেখবার মতো। সিংহমশাই রাগলে কেশর রাশি ফুলে ওঠে, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ে। তখন ঘন ঘন ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছাড়ে। তাই শুনে বনের নিরীহ পশুর দল ভয়ে কাঁপে, নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে পালায়। সিংহ যখন শিকার ধরে তখন মাটিতে থাবা গেড়ে বসে, হুঙ্কার ছাড়ে আর এমন ভাবে লেজ এদিক-ওদিক করে যে, তা ওর দুপাশের পাঁজরায় চাবুকের মতো সজোরে লাগে। তাতে ধপ্ ধপ্ শব্দ হয়। আমার মনে হয়, গম্ভীর মূর্তি, বসা আর দাঁড়ানোর ভঙ্গীর জন্যেই সিংহকে বলা হয়, পশুরাজ। কিন্তু পশুরাজও মানুষের কাছে পরাস্ত হন। কাফ্রিমুলুকের অধিবাসীরা তো ওদের বল্লম দিয়ে শিকার করে। সিংহীনীর অবশ্য কেশর নেই, ওরা আকারে ছোট।

"আমাদের গির অঞ্চলে জঙ্গলের যে সব সিংহ এখনও পাওয়া যায় তাদের বংশ যাতে লোপ না পায় সেজন্যে সিংহ শিকার করা, ধরা সরকার নিষিদ্ধ করেছেন। পৃথিবীতে আমাদের ভারত আর আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও সিংহ নেই তবে আরব দেশেও সিংহ থাকার কথা শোনা যায়। আর একটা মজার কথা কি জানিস্, আফ্রিকাতে ডোরাদার বাঘ নেই। তবে চিতাবাঘ আছে অনেক। যাক্ সে কথা। আমাদের বন-জঙ্গলের কথাই শোন্।"

একজন জিগ্যেস করে, "আচ্ছা, ঠাকুরদা সিংহের সামনে পড়েও কেউ বেঁচে ফিরে এসেছে ?"

ঠাকুরদা বলেন, "শুনিনি তো। তবে বেঁচে ফিরে আসার গল্প আছে অনেক। কিন্তু মনে হয়, সে সব গল্পই। অবশ্য ঘোর বনপথে মোটর চালিয়ে যাবার সময়ে কখন কখন সিংহের দেখা পাওয়া যায়। তখন গাড়ি আক্রমণের কোন ঘটনার কথা শোনা যায় না। কারণ, গাড়ির আকার, ইনিজিনের গোঙানি, চার-পাঁচটি মানুষের সমাবেশ প্রবল পরাক্রান্ত পশুরাজকেও হতভম্ব করে দেয়। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে পথিকদের দেখেন। গির অঞ্চলের বনে এ রকম ঘটনা ঘটেছে। তার ওপর একটা কথা এই, শত্রু ভাব মনে না রাখলে অপর পক্ষ থেকে হিংস্রতা প্রকাশ খুব কমই ঘটে। তাই বলে তোরা যেন কেউ বাঘ-সিংহের খাঁচার একেবারে কাছে গিয়ে শান্ত-শিষ্টের মতো দাঁড়াস নি। আমাদের দেশের উত্তর, মধ্য, পূর্ব অঞ্চলে সংরক্ষিত বনভূমি আছে। সেগুলো আমাদের জাতীয় উদ্যান বা বনভূমি। সেখানে বন্য পশু শিকার করা নিষেধ! তাই সেখানকার বন্য পশুরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। গির-বনের সিংহরাও নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানে ঘোরা-ফেরা করে। তবে সংখ্যায় তারা কম বলে সাহসী পথিকের সামনে পড়ে না। কিন্তু একেবারেই যে পড়ে না, তা বলি কি করে ? আমি নিজে একবার ঐ বনে বেড়াতে গিয়ে এক জোড়া সিংহ দেখেছি। বেলা তখন দুপুর। আমাদের জীপ আস্তে আস্তে চলেছে। গাড়ির চালক একজায়গায় আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখিয়েই গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে। ইনজিন গর্জে উঠলো, গাড়ি সামনের দিকে ছুট দিলে।

"চালকের নিশানা মতো তাকিয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় সিংহ-দম্পতী স-কৌতূহলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তাদের বসার ভঙ্গী দেখে অনুমান করলাম, তারা দুপুরের খর তাপে ঐ গাছটির শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিল। গাড়ির শব্দে জেগে উঠেছে। কিন্তু তাদের ভাব-ভঙ্গীতে আক্রমণের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

"খানিকদূর যাবার পর আমরা কথাবার্তা বলতে লাগলাম। চালক সেই অঞ্চলের লোক। বললে, 'ওরা উৎপাত করে না, কিন্তু বাগে পেলে শিকার ছাড়ে না। এ বনে হরিণ পাবেন না বেশি! সিংহরা অনেককে সাবাড় করেছে। হরিণগুলো চাষীদের বড় ক্ষতি করতো।'

"জিগ্যেস করি, "যখন সব হরিণ শেষ হবে তখন খাবে কি ?"

সে বলে, "হরিণের পালও বছরে বছরে খুব বাড়ে। ওদের কি শেষ করা যায়? ঐ দেখুন কয়েকটা চিতেল হরিণ—ঐ ছুটে পালাচ্ছে।"

"দেখলাম, কী সুন্দর তাদের দৌড়ের ভঙ্গী। যেন শূন্যপথে উড়ে চলেছে। পা চারখানা মাটি ছুঁয়েই আবার শূন্যে পেটের কাছে গুটিয়ে থাকছে আবার থামছে, আবার উঠছে। দেখতে দেখতে তারা বনে অদৃশ্য হোল! ঠিক বুঝলাম না, তাদের ভয়ের কারণ কী। মনে হোল, সম্ভবতঃ আমরা। ওদের কান বড় সজাগ, দৃষ্টিও প্রখর। হরিণ গান আর রঙীন জিনিস বড় ভালোবাসে।"

শ্রোতারা বলে, "সিংহকে হরিণ ধরতে দেখেছেন?"

ঠাকুরদা বলেন, "না।"

"কি করে ধরে তা শোনেনও নি?"

"শুনেছি। কিন্তু তাতে মজার কিছু নেই। যদি সিংহে সিংহে বা বাঘ-সিংহের লড়াই দেখতাম তাহলে বলবার আর মনে রাখাবার মতো একটা ঘটনা হতো বটে! এমন ব্যাপার জীবনে একবারই দেখা যায়। আমাদের দেশের ললিতাদিত্য নামে এক রাজকুমার নাকি তলোয়ার দিয়ে সিংহ বধ করেছিলেন। সিংহটা লোকের ওপর খুব অত্যাচার করতো। কেউ তাকে বধ করতে পারতো না। তিনি একদিন একাই তাকে বধ করেন। তাঁর বাঁ হাতে ছিল তীক্ষ্ণ কাঁটা লাগানো লোহার বর্ম, ডান হাতে তলোয়ার। সিংহ তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি বর্মঢাকা বাঁ হাতখানি তার মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ডান হাতে তলোয়ারের আঘাতে তাকে বধ করেন। এটা অনেক—অনেক কাল আগের ঘটনা। তখন ভারতের উত্তরাঞ্চলে সিংহ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, এটা নিছক গল্প।"

একজন বলে, "সিংহ নাকি মাটিতে মুখ দিয়ে ডাকে। তাতে সেখানকার মাটি ফেটে যায়?"

ঠাকুরদা বলেন, "আমাদের কোলকাতার চিড়িয়াখানায় অনেকদিন আগে একটা সদ্য ধরে আনা সিংহ ঘন ঘন ডাকতো। তাকে তো দাঁড়িয়েই ডাকতে দেখেছি। তখন মাটিও ফাটে নি, খাঁচাও ভাঙেনি। তবে ডাকটা গম্ভীর, ভয়ঙ্কর বটে। লোকে ভূত-প্রেত দৈত্য-দানা কল্পনা করে তাদের আর জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধেও কত যে আজগুবী গল্প তৈরী করে তার ঠিক নেই।

"তবে কোনও কোনও পশুবিশেষজ্ঞ বলেন, সিংহেরও স্মরণশক্তি

প্রখর। ওরা শব্দ মনে রাখে। একবার একজন পশু-শিক্ষক তাঁর বন্ধুর সঙ্গে একটি সারকাসদলের বাঘ-সিংহ কয়টিকে দেখতে যান। সারকাসদলের ম্যানেজার তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে বলেন, 'ঐ সিংহটা নতুন এসেছে। কিন্তু বড্ড বদ্‌রাগী। ওটাকে দলে রাখবো না। ওকে শিখিয়ে খেলা দেখানো তো যাবে না।'

"পশু-শিক্ষক এক দৃষ্টিতে সিংহটিকে দেখছিলেন। সিংহটি হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকালো। কিন্তু শিক্ষকমশাই তাকে চিনতে পারলেন, সিংহটা তাঁকে চিনতে পারলো না। সে ঘাড় ফিরিয়ে নিলে।

"তিনি ডাকলেন, 'রাজা!'"

"সিংহটি কিন্তু অস্থির হয়ে পায়চারী করতে লাগলো। তিনি আবার ডাকলেন, 'রাজা।' সিংহটা এবার থমকে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইল। তিনি খাঁচার আর একটু কাছে সরে গিয়ে ডাকলেন, 'রাজা।' এবার সিংহ তাঁর দিকে ফিরে তাকালো। তার চোখে-মুখে পরিচয়ের চিহ্ন ফুটে উঠলো। সে শিক্ষকের কাছে আসবার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। শিক্ষক ম্যানেজারকে বললেন, 'তিন বছর আগে ওকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিছু দিন খেলা দেখাবার পর ওর বদমেজাজের জন্যেই ম্যানেজার ওকে বেচে ফেলেন। যাহোক, ও আমার গলার স্বর আর ওর নাম মনে রেখেছে। সব পশুই তাই রাখে, ওরা চেহারা মনে রাখতে পারে না।'

"ভদ্রলোকটি ঠিক বলেছিলেন। বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে ব্যাপারটি রোজই দেখা যায়!'

"ঠাকুরদা, ও ঠাকুরদা কুকুরের গল্প বলুন।" বলতে বলতে সকলে ঠাকুরদাকে আঁকড়ে ধরে। সকলেই, এক সঙ্গে বলে ওঠে, "কুকুরের গল্পও খুব ভাল লাগে।"

ঠাকুরদা বলেন, "আচ্ছা, তবে কাল হবে। আজ সিংহতে শেষ—"

ছেলেমেয়েরা হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি যায়।

॥ ৭ ॥

আজকের আসরটা আরও বড়। কিন্তু ঠাকুরদার আজ দেখা নেই। ছেলেমেয়েরা ঠাকুরদাকে বাড়িতে ডাকতে গিয়ে দেখে তিনি একখানা

ফটো হাতে করে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। তাঁর হাসি-খুশি ভরা মুখখানি ম্লান।

ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে ঝুঁকে দেখে, একটি সাদা কুকুরের ছবি। তার মাথা ও পিঠ কালো।

ছেলেমেয়েরা বলে, "ঠাকুরদা, আজ কতজন এসেছে! আর আপনি বসে বসে কুকুরের ছবি দেখছেন। এটা কার কুকুর?"

ঠাকুরদা বলেন, "আমার।"

"কুকুরটা কোথায়, তার ফটো তুলেছেন যে?"

"চল্, গল্পটা বলবো।"

ঠাকুরদা ছবিখানি হাতে নিয়ে ছেলেমেয়ে কটির সঙ্গে আসরে এসে বসলেন। বসেই বললেন, "আজ দেখছি আসর সরগরম। বোঝা যাচ্ছে তোরা কুকুর ভালবাসিস।"

একজন জিগ্যেস করে, "আচ্ছা ঠাকুরদা, কুকুরকে অস্পৃশ্য বলে কেন?"

ঠাকুরদা বলেন, "তার কারণ, ওরা অখাদ্য-কুখাদ্য সব খায়।"

"বিলিতী কুকুরেরও এই স্বভাব?"

"সব কুকুরের এক স্বভাব।"

"আচ্ছা ঠাকুরদা, নেড়ী কুকুরের মতো বিলিতী কুকুর ঝগড়াটে হয় না, না?"

"বললাম যে, সব কুকুরের এক স্বভাব। তবে পুরুষ-কুকুর আর মেয়ে-কুকুরে ঝগড়া হয় না। ঝগড়া-ঝাঁটি, কামড়া-কামড়ি করে পুরুষে-পুরুষে, মেয়েতে-মেয়েতে। মানুষ যত রকমের পশু-পাখী পোষে তাদের কাউকে সদ্য বন-জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়, কারো বা পূর্বপুরুষ ছিল বন-জঙ্গল-বাসী, বুনো। কুকুরের বেলাতেও ঐ একই কথা। কিন্তু আমরা যে সব কুকুর লোকের বাড়িতে আর পথে-ঘাটে দেখি, ওদের কোনটাই বুনো নয়, বন থেকে সদ্য ধরে আনাও নয়। প্রাণিতত্ত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁরা বলেন, যীশুখ্রীস্টের জন্মেরও সাতহাজার বছর আগেও যে আদিম মানুষেরা কুকুর পুষতো তার প্রমাণ ইজিপট, বাবিলোন প্রভৃতি প্রাচীন দেশে পাওয়া গেছে। আমাদের বেদেও কুকুরের কথা আছে। আমাদের কালে, আমাদের ভারতেব দু-এক অঞ্চলের যেমন তরাইয়ের গহন বন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বুনো কুকুর দেখা যায় না।

"এই কুকুরগুলো দল বেঁধে আক্রমণ করে; দূর থেকে ওদের ডাক

শুনলে মনে হয়, যেন একসঙ্গে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘণ্টা বাজছে। ওরা শত্রুর গায়ে এমন এক রকমের রস ছড়িয়ে দেয় যার বিশ্রী, উৎকট গন্ধে শত্রু পালাতে পথ পায় না। ওদের পায়ের নখে খুব ধার। ওদের ধরাও শক্ত, ধরে পোষ মানানোও অসম্ভব। আফ্রিকার জেব্রা যেমন কিছুতেই পোষ মানে না, ওরাও তেমনি।"

চার-পাঁচ জন জিগ্যেস করে, "আচ্ছা ঠাকুরদা, বিলিতী কুকুর যেমন ভাল হয় আমাদের দেশী কুকুর তেমন ভাল হয় না কেন? ওদের বুদ্ধিও কম, শিকার করতে পারে না।"

ঠাকুরদা বলেন, "আমাদের দেশের সাঁওতালেরা যে কুকুর নিয়ে শিকার করে তাদের যদি দেখিস্! যেন এক একটা নেকড়ে বাঘ! হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর, মোটা ঘাড়, চওড়া থাবা। হাউ হাউ করে ডাকে, শুনলে ভয় হয়। ওরা বনে ঢুকে শিকারের সন্ধান দেয়, শিকার তাড়িয়ে আনে, সুযোগ পেলে তার টুঁটিও চেপে ধরে। আসল কথা, কুকুরের যত্ন করা, তাকে মাছ-মাংস-দুধ খাওয়ানো, ধৈর্য ধরে শিখানো দরকার। কুকুর তার বাপ-মার গুণ পায়। পথের কুকুর, যে আঁস্তাকুড়ে জীবন কাটায়, সর্বদা মানুষের ঘৃণা অবহেলা পায়, মার-ধোর খায় সে কি শিখবে? বিলিতী কুকুরদের, বিশেষ করে যে সব কুকুরের ব্যবসা করা হয়, সে সব কুকুরের যত্ন, খাওয়া-দাওয়া শিক্ষা যদি দেখিস্ তো চোখ কপালে উঠ্‌বে। তাছাড়া ওদের সন্তান-সন্ততি যাতে আরও ভাল, আরও রকমারি হয় সেজন্য কি কম চেষ্টা চলে?

"ঐ যে বললি বুদ্ধির কথা, সব বিলিতী কুকুর কি বুদ্ধিমান হয়? অ্যালসেসিয়ান কুকুর বুদ্ধিমান, সহজে শিখতে পারে, দৌত্যকাজেও খুব দক্ষ হয়। ঘ্রাণ-শক্তিও প্রখর বলে ওদের খুব আদর। কুকুরগুলো দেখতেও সুন্দর। ওদের ঐ সব গুণ কি বুলডগ, গ্রেট ডেন, বরজোয়া, নিউফাউন-ডল্যানড্ বা সেনট্ বারনারডে অথবা পুড্‌লে্ পাওয়া যায়?

"সব কুকুরের ঘ্রাণশক্তি প্রখর নয়। কোন জাতের কুকুরের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ, কোন জাতের কুকুরের দৃষ্টিশক্তি প্রখর, কোন জাতের কুকুর শিকারী, কোন জাতের কুকুর কাজে সাহায্য করে। আমাদের দেশে কেউ দেশী কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করে না। করলে যে ভাল কুকুর পাওয়া যেতো না, এমন কথা কে বলতে পারে?"

"আচ্ছা, নেকড়ে আর কুকুর এক জাতের প্রাণী, না?"

"ভালুক, নেকড়ে, শিয়াল, কুকুর, এরা এক জাতের হলেও পরস্পরের ভীষণ শত্রু। কিন্তু মজার কথা এই, গ্রীনল্যানডের এসকিমোরা ভয়ঙ্কর স্বভাব কুকুর পাবার জন্যে নেকড়ে আর কুকুরের কখনও কখনও পরীক্ষা করে, এ কথা কুকুর-তত্ত্ববিশারদেরা বলেন।

"আমাদের বাংলা দেশের এক মনীষী তাঁর ছেলেবেলার একটি ঘটনায় বলেছেন, তাঁরা দুই বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে চড়ুই ধরতেন। তোরা তো দেখেছিস্ ঘরে কখন কখন চড়ুইপাখি ঢোকে। তাঁদেরও পাকা বৈঠকখানায় দুপুরে মাঝে মাঝে চড়ুই ঢুকতো। আর, তাঁরা তাড়াতাড়ি জানালা দরজা বন্ধ করে চড়ুইটাকে ধরে ফেলতেন। তাঁদের বাড়িতে একটি দেশী কুকুর ছিল। সেও তাঁদের সঙ্গে খেলা করতো, ছুটতো, লাফাতো। আর চড়ুই-ধরা খেলায় সাহায্য করতো। বৈঠকখানাটির একটি দরজার পাল্লায় পাখি পালাবার মতো একটি ছিদ্র ছিল। তাঁরা চড়ুই ধরবার জন্যে দরজা-জানালা বন্ধ করবার সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটিও লেজ দিয়ে ছিদ্রটি বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতো। এ কি বুদ্ধির কাজ নয়?"

"আর, এই যে কুকুরটির ছবি দেখছিস্ এটিও দেশী কুকুর, কিন্তু দেখতে বিলিতী ফক্স্ টেরিয়ারের মতো। কুকুরটি ছিল আমার। বাচ্চাবেলায় ওর মা মরে যায়। সেও আমাদের বাড়িতে থাকতো, খেতো, বাড়ি পাহারা দিত। বাচ্চাটি ছিল মেয়ে। নাম রেখেছিলাম, লুসি। লুসিকে সকলেই ভালবাসতো। সে বাড়ি পাহারা দিত, বিড়াল, কাক তাড়াতো, ইঁদুর ধরতো। আমি বনবিভাগে চাকরি নিয়ে যাবার সময়ে তাকে সঙ্গে নিতে পারি না। কর্মস্থলে যাবার কয়েক দিন পরে বাড়ির চিঠি পাই। তাতে আমার মা লেখেন, 'লুসি তোমার জন্য কাঁদে, কিছু খায় না। পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। সে রোগা হয়ে গেছে।' প্রাণীদের মধ্যে কুকুর আর ঘোড়া সবচেয়ে প্রভুভক্ত আর বিশ্বাসী। ওরা প্রভুর জন্যে প্রাণও দেয়। এ কথাটা কেবল লোকমুখে শোনা আর বইয়ে পড়া ছিল। আমাদের লুসি তা কাজে দেখায়। ঘটনাটা বলি।"

ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করে, "ঠাকুরদা, আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন?"

ঠাকুরদা বলেন, "এক সময়ে অভ্যাস ছিল। কিন্তু নিজের ঘোড়া ছিল না। তারপর শোন্ তো। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে লুসিকে সঙ্গে করে আমার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম। লুসির সে কী আনন্দ! এক দিন তাকে নিয়ে গেলাম দীঘিতে স্নান করতে। লুসি জলে না নেমে পাড়ে

ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দীঘির একদিকে ছিল মস্ত পদ্মবন। তখন শরৎ কাল। পদ্মফুটে বন আলো হয়ে আছে। গন্ধে বাতাস আমোদিত। সেই বনে মৌমাছিরা উড়ে উড়ে পদ্মে বসে, মধু খায়, আর নিয়ে গিয়ে কাছেই চাকে জমা করে। দীঘিটা নাকি কোন এক জমিদারের ছিল। কাছাকাছি তার একটা বাড়িও ছিল। তখন সেখানে ছিল কেবল ইটের পাঁজা আর বন-জঙ্গল। দীঘিটাতে বড় বড় মাছও ছিল।

"আমি জলে নেমে সাঁতরাতে সাঁতরাতে পদ্মবনটার কাছাকাছি যেতেই লুসি বিষম চীৎকার করতে লাগলো। তারপরই ঝপ করে জলে নেমে সোজা আমার দিকে সাঁতরে আসতে লাগলো। তখনও বুঝি নি ব্যাপার কী। হঠাৎ পদ্মবনের দিকে নজর পড়তেই দেখি, একটা পদ্মফুলের ওপর দিয়ে মস্ত ফণা দেখা যাচ্ছে আর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হচ্ছে। লুসি ডাঙা থেকে ওকে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে আমায় সাবধান করে দিচ্ছিল। আমি তাতে কান না দিয়ে পদ্মবনের আরো কাছে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই ও আমায় বাঁচাতে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে আসি।"

ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করে, "কি সাপ ঠাকুরদা ?"

"পদ্মগোখরো। ওরা পদ্মফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পদ্ম বনে যায়। ওখানে লুকিয়ে থাকে। আর মাছ-ব্যাঙ খায়। পদ্মফুল তুলতে গিয়ে কেউ কেউ ওদের কামড়ে মরে।"

"আচ্ছা, লুসি কি সাপটার সঙ্গে লড়াই করতো ?"

"হয়তো করতো। সে তো একটা হায়েনার সঙ্গে লড়াই করে মরে। হায়েনাটাকে লাঠিপেটা করে মারে আমার পিয়াদা বনমালী। ভারী জোয়ান আর সাহসী ছিল সে। হায়েনাটা এসেছিল আমার রাজহাঁস জোড়ার লোভে।"

"বলুন, ঠাকুরদা, গল্পটা বলুন।" শ্রোতার দল চেপে ধরে।

ঠাকুরদা বলেন, "আজ আর নয়, আর একদিন। শখ করে এক দিন ওর ছবি তুলেছিলাম। এখন ওর স্মৃতিচিহ্ন বলতে এই ছবিখানি।"

ছেলেমেয়েরা মনোযোগ দিয়ে দেখে। তারপর বলে, "ঠাকুরদা, ঘোড়ার গল্প বলুন।"

ঠাকুরদা বলেন, "আমাদের দেশে তো বুনো ঘোড়া পাওয়া যায় না। আর একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর গল্প বলবো, তবে কাল। তারা বন-জঙ্গল, নগর-গ্রাম সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, আর গাছে থাকে। বলতো সেটা কী ?"

"কাঠবেরালী।"

"না রে! লালমুখো আর কালোমুখো, লম্বা লেজওয়ালা"—বলে ঠাকুরদা হাসেন!

ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বলে, "ও বুঝেছি—বুঝেছি।"

॥ ৮ ॥

সেদিনের আসর আরও বড়। ঠাকুরদার গল্প বলার খবর পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়ো মহলে ছড়িয়ে গেছে কিনা। বন-জঙ্গলের, জন্তু-জানোয়ারের গল্প ছেলেমেয়েদের মধ্যে কে না ভালবাসে?

ঠাকুরদা বলেন, "শোন ভাইসব। আসর দিন দিন যে রকম বড় হচ্ছে তাতে দেখছি একটা মাইক্রোফোনের দরকার হবে। কিন্তু তা যখন পাবার কোন সম্ভাবনা নেই তখন সকলে আমার আরও কাছে সরে এসে বসো। নাহলে আমার গলা সকলের কাছে পৌঁছবে না।"

সকলে ঠাকুরদাকে ঘিরে বসে।

ঠাকুরদা বলেন, "আমাদের ভারতের উত্তরে, দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, মাঝেও বন-জঙ্গলের অভাব নেই। সব বন-জঙ্গল এক ধরনের নয়। এর কারণ, আবহাওয়া আর মাটি। আর সব বন-জঙ্গলে সব রকমের পশু-পাখী পাওয়াও যায় না। কিন্তু নানা রকমের পশু-পাখী বাস করে আসামের জঙ্গলে। ওখানকার কাজিরঙার জঙ্গল যেন ভারতের চিড়িয়াখানা। হাতী, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক, হরিণ, শূওর, চিতা—যা চাও সব আছে সে বনে। আর কত বিচিত্র পাখীরও বাসা আসামের জঙ্গলে তার হদিস্ দেয় কে? কিন্তু আজকের গল্প কোন এক রাজ্যের বন-জঙ্গলের নয়। যাদের গল্প বলছি, তারা ভারতের সব রাজ্যের বন-জঙ্গলে থাকে।

"আচ্ছা! তোরা ঝোপো খোকা-খুকুর নাম শুনেছিস্?"

"ঝোপো খোকা-খুকু? সে আবার কি?" বলে সকলে হাহা করে হাসে।

কয়েকজন বলে, "ও বুঝেছি, যে সব খোকা-খুকু ঝোপে থাকে। জঙ্গলীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তো?"

ঠাকুরদা বলেন, "না রে না। এরা হচ্ছে, বানরের এক জাত। এদের বলে, লেমুর। আকারে বড় জোর বন বিড়াল, আবার বেজী-ইঁদুরের

মতো ছোটও হয়। এরা গাছে থাকে। ভারি লাজুক প্রাণী। পোকা-মাকড়, ফল আর ওদের চেয়েও ছোট ছোট প্রাণী যেমন পাখী, পাখীর ডিম খায়। ওদের মুখ অনেকটা খ্যাঁকশিয়ালীর মতো ছুঁচলো। প্রাণীগুলো হচ্ছে নিশাচর। রাতে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। দিনের বেলা দেখাই যায় না, পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। তাই ওদের কেউ কেউ বলে, লজ্জাবতী। কিন্তু লজ্জাটা পুরুষ আর মেয়ের সমান। কাজেই লজ্জাবতী নামটা ঠিক মানায় না। যাহোক, ওদেরই এক জাত রাতের বেলা ঝোপের ভেতর থেকে এমন করে কাঁদে আর শব্দ করে যে শুনে মনে হয়, কচি ছেলে কাঁদছে। ওরা থাকেও ঝোপে-ঝাপে। তাই ওদের ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে কিন্তু ঐ ধরনের লেমুর নেই। ওদের পাওয়া যায় আফ্রিকায়।"

"আপনি লেমুর দেখেছেন, ঠাকুরদা ?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "দেখেছি বৈ কি ? দক্ষিণ ভারতে, আসামে, এমন কি তরাইয়েরও দক্ষিণ অঞ্চলে। একদিন তো দেখেই ভড়কে গিয়েছিলাম! কী বড় বড় চোখ আর খরখরে চাউনী! সন্ধ্যে বেলা জঙ্গলের মধ্যে ঐ মূর্তি দেখলে কার না ভয় করে রে ভাই ?

"পৃথিবীতে অনেক রকমের বানর আছে। গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংউটাং, উল্লুক, বেবুন, গিবন, লালমুখো আর কালোমুখো এমনি কত নামের, কত আকারের। কারো লেজ লম্বা, কারো লেজ প্রায় নেই, কারো বুকের ছাতি পালোয়ানের মতো ষাট ইঞ্চি, যেমন গোরিলাদের! বানরজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে বিরাট আর ভয়ঙ্কর। আবার, কোন জাতীয় বানরের বুকের ছাতি বত্রিশ ইঞ্চি কি তারও কম। কারো হাত লম্বা, কারো হাত মাঝারি, কারো হাত-পা দুই-ই লম্বা। কারো হাতে এত জোর যেমন গোরিলাদের যে এক ঘুষি বা চড়ে মাথার খুলি চুরমার হয়ে যাবে। গোরিলাদের পা ছোট, হাত লম্বা। তবে গোরিলা, শিম্পাঞ্জী, বেবুন, ওরাংউটাং আমাদের দেশের জঙ্গলে নেই। প্রথম তিনটি আফ্রিকার প্রাণী। শিম্পাঞ্জীগুলোকে লোকে বলে, বনমানুষ। ওরা মানুষের কাজ-কর্মের চমৎকার নকল করে, কিছু করতে শেখালে শিখতে পারে। ওদের বুদ্ধির জন্যেই লোকে বলে, 'ট্যাক্‌সো দেবার ভয়ে বনমানুষ কথা কয় না।' ওদের তোরা চিড়িয়ানায় দেখে থাকবি। আর পথে ঘাটে লালমুখো মর্কট বানরের খেলা দেখিস্ নি ? বাজিকর 'ডিগি ডিগি' শব্দে ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে পাড়ার পথ দিয়ে

চলে। সঙ্গে থাকে দুটো লালমুখো মর্কট। কখন কখন ভালুক আর রাম-ছাগলও থাকে। ভালুক আর ছাগলের খেলায় তেমন বুদ্ধির পরিচয় মেলে না, কিন্তু বানরের খেলায় এমন কিছু থাকে যা দেখে ভারি আমোদ হয়। তাই নয়?

"বানরেরা দল বেঁধে থাকে। দল ছাড়া হয়ে কেউ থাকতে পারে না। তাই যেখানে যায় দল বেঁধে যায়। সেখানে ফল-পাকুড় খেয়ে সব সাফ করে দেয়। তাড়াতে গেলেই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে। সুবিধে পেলে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়, চড়-চাপড়ও মারে। ছোট ছেলেমেয়েদের তো গ্রাহ্যই করে না। তাদের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিয়ে পালায়। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে জিনিস-পত্র চুরি করে। কোন কোন দুষ্ট লোক বানরকে চুরি করতে শেখায়।

"ওদের দলের সর্দার হয় সবচেয়ে বড়-সড় আর শক্তিশালী যে সে। তাকে লোকে বলে, বীর। আমি একবার দুইবীরের লড়াই দেখেছিলাম। দলপতি বুড়ো হয়ে গেলে তরুণ-বীর তার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। তখনই লড়াই বাধে। দলের সকলে চুপচাপ বসে লড়াই দেখে। কিন্তু তরুণ সব সময়ে জয়ী হয় না। যে যুদ্ধে পরাজিত হয় সে দল ছেড়ে চলে যায়। অন্য দলেও তার ঠাঁই হয় না।

"এবার দুই বীরের লড়াইয়ের গল্পটা বলি শোন্। একদিন দুপুরে বনের এক অংশে কাজ সেরে ফিরছি। সঙ্গে আমার দুজন চৌকিদার। হঠাৎ দেখি, একটা ফাঁকা জায়গায় কালো মুখো বানরের মানে হনুমানের মেলা বসেছে। আমরা আর না এগিয়ে গাছের আড়াল থেকে দেখতে লাগলাম। মনে করলাম, তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু মাথার ওপর ডালপালার খসখস আওয়াজ শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, কয়েকটা হনুমান বসে আছে, কয়েকটা বাচ্চা লাফালাফি করছে। বুঝলাম, তারাও ঐ দলের। তারাও আমাদের দিকে কয়েকবার মিটমিট করে তাকালো।

"সামনে ছোট, মাঝারি আকারের প্রায় শ' খানেক হনুমান বসে ছিল। তাদের মধ্যে বাচ্চা-কাচ্চাও ছিল। কেউ লাফাচ্ছিল, কেউ মায়ের পিঠে চড়ছিল। মা হয়তো আর কারো মায়ের গা থেকে উকুন বেছে মুখে পুরছিল। আর সামনে দুই বীরের লড়াই হচ্ছে যেন বালী আর সুগ্রীবের লড়াই। সে কী ধস্তাধস্তি, আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, চড়-চাপড়। দুটিরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। দুটির মধ্যে যেটি আকারে বড় সেটি

চন্তু সুবিধা করতে পারলে না! কিছুক্ষণের মধ্যেই রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ লে ছুটে পালালো। আমাদের ধারণা হোল সেটিই ছিল পালের গোদা, খন তার নেতৃত্ব গেল! বিজয়ী সম্ভবতঃ তরুণ। সেও একদিকে াফিয়ে চললো। অমনি সকলে তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। আমরাও র্ভয়ে ফিরে চললাম।

"হনুমান খাবার সঞ্চয় করে না, যা পায় তখনই খেয়ে ফেলে। ালমুখো বানরগুলো খায় তো বটেই আবার গালেও খাবার পুরে রাখে। সজন্যে প্রকৃতি ওদের গালের মধ্যে থলে সৃষ্টি করে সুবিধে করে দিয়েছে। ানরগুলোর পিছুন লাল হয় আর সেখানে কড়া থাকে।

কয়েকজন জিগ্যেস করে, "ঠাকুরদা, উল্লুক কী?"

ঠাকুরদা বলেন, "এক জাতের বানর! ওদের হাত-পা লম্বা হয়। রাও দল বেঁধে থাকে। বড় বড় গাছের ডাল ধরে একসঙ্গে দোল খেতে তে 'হুকু হুকু' শব্দে এমন ডাক আরম্ভ করে যে, কান পাতা দায় হয়। ামাদের ভারতের পূর্ব দিকে গভীর জঙ্গলে ওরা থাকে, লোকালয়ে চরাচর আসে না।"

চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে জিগ্যেস করে, "আচ্ছা ঠাকুরদা, শুনেছি ানরেরা নাকি মানুষের পূর্ব পুরুষ? বানর থেকে মানুষ হয়েছে?"

তাদের কথা শুনে আর সকলে বিদ্রূপের হাসি হাসে!

ঠাকুরদা বলেন, 'হাসির কথাই বটে। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, ানর মানুষের পূর্বপুরুষ নয়। বানরজাতীয় বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাণী থকেই মানুষের উৎপত্তি। বানরেরাও এসেছে সেখান থেকে। ওদের ধ্যে এক শ্রেণী মানুষের জ্ঞাতি!"

আবার সকলে হাসে।

ঠাকুরদা বলেন, "এমন কথায় আমারই হাসি পাচ্ছে। আমার কী নে হয় জানিস্? মানুষের সঙ্গে শরীরের দিক থেকে বানরের সম্পর্ক াকলেও স্বভাবের দিক থেকে কতকগুলো ছেলেমেয়ের সঙ্গে ওদের ম্পর্ক বেশী! তাদের দুষ্টুমী নষ্টামী, চাঞ্চল্য ওদের মতোই। কী লিস্?"

সকলে বলে ওঠে, "না-না-না। তাহলে কেন বলে, বনমানুষের বুদ্ধি ানুষের মতো?"

ঠাকুরদা বলেন, "আর লোক ঐ সব ছেলেমেয়েদের কেনই বা বলে, াদর? নষ্টামীতে অতীষ্ঠ হয়ে বলে, বাঁদরামি করতে হবে না? উত্তর দে।"

তারা উত্তর দেবে কি ? হেসেই সারা।

ঠাকুরদা বলেন, "চিড়িয়াখানায় গেলে কত রকমের বানর দেখতে পাবি। কিন্তু গোরিলাদের দেখা সচরাচর পাবি না। ওরা বন্দিদশায় বেশী দিন বাঁচে না। গহন বনের স্বাধীন জীবন, শ্যামল, সুন্দর, ছায়াঘন পরিবেশ আর নির্জনতা কী লোকালয়ের লোহার খাঁচায় থাকে ? সব জাতের বানর ফাঁদে ধরা যায়, ওদের ফাঁদে ধরা যায় না ওদের ধরা এক রকম অসম্ভব। ওরা যেখানে থাকে সেখানে যেতে হলে অসম্ভব কষ্ট স্বীকার, অসম সাহস আর রাইফেল দরকার। জঙ্গলে ওদের একমাত্র শত্রু হচ্ছে চিতাবাঘ। ওই রকমের বানর আমাদের দেশের বন-জঙ্গলে থাকলে কত গল্পই যে শোনা যেত !

"আমি একবার জঙ্গলে একজায়গায় উল্লুক ধরা দেখেছিলাম। ভারি মজার ব্যাপার সে। বানরে চাল খেতে ভালবাসে। ওরাও কাঁচা চালের ভক্ত। সেখান দিয়ে যেতে যেতে দেখি, চার পাঁচটা উল্লুক মাটিতে বসে এদিক-ওদিক করছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে নারকোল। তারা হাত তুলছে, মাটিতে আছড়াচ্ছে, শূন্যে নাড়ছে যেন নারকোলের খেলা দেখাচ্ছে। তবু নারকোল পড়ছে না। দেখে ভারি মজা লাগলো। সঙ্গে দুজন বন্দুকধারী সঙ্গী ছিল। জঙ্গলে গিয়েছিলাম খবরদারি করতে। উল্লুকগুলোর কাণ্ড দেখে আমাদের ভারি হাসি পেল। ব্যাপারটা ঘটছিল জঙ্গলের কাছাকাছি। সে অঞ্চলে নতুন গেছি। তাই তখনও জানতে পারিনি আসলে ঘটনাটা কী। দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

"আমার এক সঙ্গী বললে, 'ঐ দেখুন তীর-ধনুক হাতে চার-পাঁচটি স্থানীয় লোক এদিকে আসছে। না, না, ওরা ছুটে পালাচ্ছে। কী ব্যাপার ?'

"বললাম, 'বোধহয় আমাদের দেখে।'

"আমার সঙ্গীরা ছিল উর্দিপরা, আমিও পরেছিলাম সাহেবী পোশাক। মনে হোল, উল্লুকগুলোর ঐ অবস্থা আর লোকগুলোর পালানোর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন যোগ আছে। চীৎকার করে ডাকতে ডাকতে সঙ্গীরা তাদের পিছু নিলে। খানিক দূর গিয়ে লোক কয়টি দাঁড়ালো এবং ভয়ে ভয়ে আমাদের দিকে আসতে লাগলো। তারা কাছে এলে জিগ্যেস করলাম, 'তোমরা এদিকে কি করতে আসছিলে ? ঐ উল্লুকগুলো ও রকম করছে কেন ?'

"তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি বললে, 'উল্লুকগুলো আমাদের গ্রামের ফুল-ফল, গাছপালা নষ্ট করে। তাই ওদের ধরেছি।'

"কী করে ?"

'নারকোল দিয়ে।'

"কী রকম ?"

"নারকেলগুলোর মুখ কেটে মধ্যে কাঁচা চাল রেখেছিলাম। ওরা চাল খাবার লোভে নারকোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে চালগুলো ধরেছে! ঐ অবস্থায়ই হাত বার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঐ গর্ত দিয়ে মুঠো কী বার হয় ?"

"যদি মুঠো খুলে হাত বার করবার চেষ্টা করে ?"

"তা কী আর করে ? উল্লুকগুলো ভারি লোভী আর বোকা। ঐ দেখুন, এক একটা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।"

"এখন ওদের কী করবে ?"

লোকটা ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলো।

"বললাম, 'উল্লুক ধরা, আর মেরে ফেলার হুকুম নেই। ওদের ছেড়ে দাও।'

"সে বললে, 'আমরা তো ওদের ধরিনি। ওরা নিজেরাই ধরা পড়েছে। পারে তো চলে যাক। আমাদের কোন দায় নেই।" বলে তারা চলে যায় আর কী।

"বললাম, 'সর্দার, ওরা নির্বোধ প্রাণী। যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। ছেড়ে দাও। তোমাদের বখশিষ দেবো।'

তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করে উল্লুকগুলোর কাছে গেল। তারপর তাদের এক একটার হাত ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে ধারালো ছুরি দিয়ে নারকোলের মুখ বড় করে দিলে। তারপর পটাপট বাঁধন কেটেই দিলে ছুট। উল্লুকগুলোও মুঠোভরা চাল মুখে পুরতে পুরতে লাফাতে লাফাতে হাওয়া হয়ে গেল।"

ছেলেমেয়েরা বলে, "ভারি মজার তো ?"

"বানরও বোকা হয় ?" একজন বলে।

ঠাকুরদা বলেন, "সমস্ত পশু-পাখীই বুদ্ধিতে মানুষের কাছে হার মানে।"

"ঠাকুরদা, আর একটা গল্প বলুন।" বলে সকলে।

ঠাকুরদা বলেন, "আবার কাল। আজ বেলা পড়ে এল, ছায়া নামছে, চল নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।"

সকলে চলে ঠাকুরদার সঙ্গে।

॥ ৯ ॥

পরদিনের আসরও সরগরম। ওদিক আকাশের ঈশানকোণে নদী-পারে মেঘ জমেছে। বাতাসে থমথমে ভাব, নদীর জল যেন আরও নীল দেখাচ্ছে।

ঠাকুরদা বলেন, "ঝড় উঠবে রে! গল্পটা তাড়াতাড়ি সেরে নিই। তোরা কেউ হাতীতে সওয়ার হয়েছিস্?"

কেউ কেউ বলে, "হ্যাঁ, চিড়িয়াখানায়। আচ্ছা, ঠাকুরদা, হাতীতে চড়লে নাকি রাজা হয়?"

ঠাকুরদা বলেন, "তাহলে দেশে কত রাজা যে হোত তার ঠিক নেই।"

"আপনি হাতীতে চড়েছেন?"

"অনেকবার। একবার তো মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলাম। সেবার কয়েকজন মিলে উত্তরের এক গহন বনে গিয়েছিলাম বাঘ শিকারে। সঙ্গে লোকজন ছিল অনেক। তারা বন ঠেঙিয়ে আমাদের সামনে বাঘ তাড়িয়ে আনবে। আর আমরা হাতীর পিঠে হাওদায় বসে তাকে গুলি করে মারবো। এই ছিল পরিকল্পনা। সঙ্গে ছিল তিনটি শিক্ষিত হাতী। তাদের মধ্যে দুটি ছিল পুরুষ। লম্বা তাদের দাঁত। শরীর যেমন বিশাল আর উঁচু, রঙ ছিল তেমনি কালো। আমি বসেছি তাদের একটার পিঠে। দুলতে দুলতে চলেছি তো চলেছিই। অত বড় জন্তু কিন্তু চলায় বিশেষ শব্দ নেই। ওরাও বুঝতে পেরেছে, বাঘশিকারে চলেছে। তাই সতর্ক নিঃশব্দ চলা-ফেরা। ওরা চোখে খুব কম দেখে, কিন্তু ঘ্রাণ আর শ্রবণ-শক্তি ভারি প্রখর। ঐ দুটির সাহায্যে গহন বনে, বিশাল তৃণপ্রান্তরে, দুর্গম জলা ভূমিতে আর কঠিন পাহাড়ীয়া অঞ্চলে ওরা দল বেঁধে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। সাঁতারেও ওরা বেশ পটু। তখন দেখতে ভারি মজা।

"যাহোক, আমরা তো চলেছি। সকলেই সতর্ক, কারো মুখে কথা নেই। কেবল দূর থেকে মাঝে মাঝে বন তাড়ুয়াদের চীৎকার, ঢাক-ঢোল আর কানেস্তারা বাজানোর শব্দ আস্ছে। এক্‌খানি লম্বা ঘাসে ঢাকা ছোট মাঠে এসে পৌঁছতেই হাতীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠলো। বুঝলাম,

ওরা বাঘের গায়ের গন্ধ পেয়েছে। আমরাও তৈরী হলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বাঘ সেই মাঠখানা, এধার থেকে ওধারে লাফে লাফে পার হয়ে যেতে লাগলো। অমনি একজনের রাইফেল ফট্ করে উঠলো, বাঘও দিলে হুঙ্কার। আর আমাদের হাতীটি মাহুত আর আমাদের দুজনকে পিঠে নিয়ে দিলে ছুট। ছুট, ছুট, ছুট। ছুটে চললো বনজঙ্গল ভেঙে, নুইয়ে, সমান করে. গাছের তলা দিয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্য দিয়ে। আমাদের তখন মাথা বাঁচানো দায় হয়ে উঠলো। বাঁশ-কঞ্চির খোঁচা, গাছের ডালের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে হাওদায় মাথা লুকোই। এক একবার মনে হয়, এই বুঝি মাথা গুঁড়ো হয়ে গেল। শেষে খানিক দূর যাবার পর মাহুতের অনেক চেষ্টায় হাতীটা শান্ত হোল।"

ছেলেমেয়েরা জিগ্যেস করে "ঠাকুরদা, হাতী অত বড় জন্তু, গায়ে অমন জোর, আর বাঘকে ভয় করে?"

"বাঘকে ভয় করে না কে? বাঘ হাতীর পিছন দিয়ে তার ঘাড়ে উঠে মাথায় থাবা আর দাঁত বসিয়ে দেয়। হাতীর অস্ত্র শুঁড়, লম্বা ছুঁচলো দাঁত আর গোদা পা। কিন্তু আমাদের ভারতীয় মেয়ে হাতীর দাঁত লম্বা হয় না, আফ্রিকার মেয়ে-পুরুষ দুজাতের হাতীরই মুখে লম্বা দাঁত থাকে। বাঘের লক্ষ্য থাকে হাতীর শুঁড়কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। আর হাতীর চেষ্টা থাকে শুঁড়কে রক্ষা, তাই দিয়ে বাঘকে আঘাত করা বা জড়িয়ে ধরা। তাই সে মাথার ওপর শুঁড় তুলে অবিরাম দোলায়। অবশ্য হাতীর শুঁড়ের আগা কখনও স্থির থাকে না, কেবল নড়ে।

"হাতী কলাগাছ, শস্য, কচি ডাল-পালা, পাকা কলা, ডুমুর, বাঁশের কোঁড়া খেতে ভালবাসে। ওরাও হরিণের মতো দল বেঁধে বেড়ায়। দলের সর্দার কে হয় বল তো?"

ছেলেমেয়েরা বলে, "যে পুরুষ হাতীটার গায়ে খুব জোর, দেখতে খুব বড় আর তেজী সে।"

ঠাকুরদা বলেন, "না, প্রবীণা মেয়ে হাতী। পুরুষ হাতী সব সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাই কোন পুরুষ হাতী দলের সর্দার হতে পারে না। ওরা বাচ্চা পুরুষ হাতীর শত্রু। সুবিধে পেলেই তাকে মেরে ফেলে। কিন্তু মেয়ে হাতীরা তাকে আগলে রাখে। মেয়ে হাতীর সন্তানের প্রতি বড় মায়া। এক হাতী নিজের সন্তান না থাকলে কখন কখন আর এক হাতীর বাচ্চাকে পালন করে। সে কেবল দুধ খাবার সময় মায়ের কাছে যায়, আর অন্যসময়ে পালিকা মায়ের কাছে থাকে। আমাদের আলিপুরের

চিড়িয়াখানায় ফুলমালা নামে যে মেয়ে হাতীটা ছিল তারও কোন সন্তান ছিল না। সে অন্যের সন্তান পালন করতো। মাহুত বেচারীকে হাতীটার কোপে পড়ে প্রাণ হারাতে হয়।"

"আচ্ছা ঠাকুরদা, কুকুরকে মানুষ হাজার হাজার বছর আগে থেকে পোষ মানাচ্ছে, আর হাতীকে কতদিন আগে থেকে পোষ মানিয়েছে?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের দেশের লোকে হাতীকে পোষ মানিয়ে তাকে দিয়ে কত রকমের কাজ করিয়ে আসছে। কিন্তু হাতীর বিশ্বস্ততা আর বুদ্ধির কথা বড় একটা শোনা যায় না। বরং লোকে বলে, হাতী বোকা। কুকুরকে আর বন থেকে ধরে এনে পোষ মানানো হয় না, কিন্তু হাতীকে এখনও বন থেকে ধরে আনা হয়। আমাদের দেশের উত্তরের, পূবের আর সম্বলপুরের জঙ্গলে হাতীর পাল থাকে। হাতী যেমন উপকার করে তেমনি ক্ষেত-খামারের শস্য, কলা-বাগান খেয়ে, পায়ে দলে, ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দিয়ে যায়।"

"ঠাকুরদা; হাতী ধরে কি করে?"

"সে এক বিষম ব্যাপার রে ভাই। বলতে গেলে অনেক হবে। তবে এইটুকু শুনে রাখ্ তাতে অনেক লোক লাগে! যারা হাতী ধরতে যায় তারা প্রাণ হাতে করে গিয়ে থাকে। তবু যায়। মানুষ কোন কাজেই নিরস্ত হয় না, কোন বিপদ-বাধা মানে না। হাতী-ধরার কয়েক রকমের কৌশল আছে।"

"আমাদের ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে হাতী নেই?" দু-তিন জন জিগ্যেস করে।

ঠাকুরদা বলেন "আছে বৈ কি! আফ্রিকার পুব-পশ্চিমের জঙ্গলে, ব্রহ্মদেশে, সিংহলে, মালয় আর সুমাত্রার গহন বনেও হাতীর পাল থাকে। কিন্তু কোন শীত-প্রধান দেশে হাতী নেই। আকারে সব চেয়ে বড় হচ্ছে আফ্রিকার হাতী। ওদের শুঁড়ের আগায় দুটো আঙুল বা ঐ ধরনের কিছু থাকে। সব হাতীরই শুঁড় তাদের হাত আর নাক। শুঁড় দিয়ে জল শোষণ করে, নিঃশ্বাস নেয়, খাবার মুখে পোরে, শুঁড় দিয়েই বোঝা তোলে। ওদের পূর্বপুরুষেরা ছিল আকারে ওদের দ্বিগুণ কি তারও বেশী। তারা ছিল হাজার হাজার বছর আগে বিশাল ঘোর অরণ্যে। কিন্তু এক হিমযুগে সব শেষ হয়ে যায়। এখন মাটি খুঁড়ে পাওয়া যাচ্ছে সেই সব অতিকায় হাতীদের পাথর হয়ে-যাওয়া কঙ্কাল।"

"আচ্ছা, ঠাকুরদা, আমাদের দেশে জলহস্তী নেই? ওরাও তো হাতী?" জিজ্ঞেস করে একটি মেয়ে।

ঠাকুরদা বলেন, "আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে জলহস্তী নেই। ওরা আকারে হাতীর মতো না হলেও নেহাৎ কম নয়, ছ'ফুট উঁচু, চৌদ্দ ফুট লম্বা হয়। ওরাও ঘাস-পাতা খায়। তবে সে সব জলজ আর জলের কিনারায় জন্মায়। ওরা সারাদিন নদী বা জলায় কাটায় আর রাতে জল থেকে উঠে কূলে কূলে খাবার চেষ্টা করে। হাতীর মতো ওদেরও দাঁতের অনেক দাম। কেবল তাই নয় ওদেরও মাংসের বেশ আদর। কাজেই মানুষের হাত থেকে ওদের নিস্তার নেই! তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ নামক উচ্চ প্রাণীর হাত থেকে কোন ইতর প্রাণীই নিরাপদ নয়। যেমন হাতীর, তেমনি জল-হাতী আর গণ্ডারের বংশ— ওরে ঐ ঝড় আসছে। আসর গোটা, আসর গোটা—ঐ কটা রঙের মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গেল। ধুলো বালি উড়ছে—"

তাড়াতাড়ি আসর গুটিয়ে ছেলেমেয়েরা ঠাকুরদার বাড়ির দিকে ছোটে। ঠাকুরদা বয়সে বুড়ো হলেও শরীর বেশ মজবুৎ। তিনিও ছোটেন।

এদিকে গাছপালা সর্ সর্ মড়্ মড়্ করে। নদী ওঠে ক্ষেপে। মেঘের বুকে ঝিলিক হানে, শব্দ হয় গুড়্ গুড়্ গুড়ুম। ধুলোয় বালিতে সব ঢেকে যায়। বাতাস অট্টহাস্যে ছুটে চলে।

॥ ১০ ॥

পরদিন—

বৃষ্টির জল পেয়ে গাছপালাকে বেশ সবুজ আর সুন্দর দেখাচ্ছে। আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা। নদীর জলে কেমন একটু পরিবর্তন! জ্যৈষ্ঠের মাঝ থেকে তার রং বদলাতে শুরু করে। নতুন জল আসে যে। ঠাকুরদার যে কটি গাছে যে অল্প পরিমাণ আম ফলেছিল গতকালের ঝড়ে তার অর্ধেক পড়ে গেছে। শূন্য বোঁটাগুলো যেন সরু আঙুলের মতো আকাশকে দেখিয়ে ইঙ্গিত করছে—'ওখান থেকে—ওখান থেকেই আলোও আসে, ঝঞ্ঝাও আসে। সেই ঝঞ্ঝায় আমাদের এই দশা।'

ছেলেমেয়েরা আসর বিছিয়ে বসে কেউ কেউ ঝাল-নুন দিয়ে ঠাকুরদার গাছের ঝরে পড়া কাঁচা আম খাচ্ছে। একজন একটা বাঁশের বাঁশি

এনেছে। কিছু বাজাতেও জানে। টানা সুর বাজাচ্ছেও। সে সুর বাতাসে উড়ে চলেছে।

ঠাকুরদা হুঁকো হাতে এসে বসতেই ছেলেমেয়েরা বলে, "ঠাকুরদা, কালকের সেই গণ্ডারের গল্পটা শেষ হয়নি।"

আর একজন বলে, "গণ্ডার খুব রাগী আর জেদী, না ? মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে ?"

ঠাকুরদা বলেন, "ঠিক তার উল্টো ! ভারী শান্ত-শিষ্ঠ প্রাণী, ঘাস-পাতা খায়, ছায়াশীতল, বিশেষ করে জলকাদায় থাকতে ভালবাসে, গোলমাল পছন্দ করে না, আর চোখে খুব কম দেখে। তবে হ্যাঁ, উত্যক্ত করলে কার না রাগ হয় ? রাগ হলে তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না খড়্গ নিচু করে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শত্রুর দিকে সোজা এগিয়ে যায় এবং তাকে এক গুঁতোয় শূন্যে তুলে ফেলে।"

"আপনি বুনো গণ্ডার দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ। তরাইয়ের এক অংশে আর আসামের কাজিরঙার জঙ্গলে। আমাদের ভারতের আর কোনও বনে গণ্ডার নেই। তবে এক সময়ে সুন্দরবনে নাকি ছিল। ওদের বংশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বললাম যে, মানুষ-নামক উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর হাত থেকে কোন ইতর প্রাণীর রক্ষা নেই। ওদের খড়্গ, মাংস, চামড়া, নখের লোভে অমন নিরীহ জীবকেও হত্যা করে। তাই আইন করে গণ্ডার শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ওরা ভারি সন্তান-বৎসল। বছর দুই আগে জলপাইগুড়ি জেলার এক ছোট শহরে যে গণ্ডারটি বন থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল যাকে আবার বনে ফিরিয়ে নেবার সময়ে পথেই মারা গেল লোকে তো তার গায়ে হাত দিতো। সে কাউকে কিছু বলতো না। ওখানকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তার ভাবও হয়ে গিয়েছিল বেশ। সেটা বুনো ছিল। লোকে তাকে বলতো, 'বুড়ি'।"

"আচ্ছা, গণ্ডারের খড়্গতে খুব ধার, না ?" একটি মেয়ে জিগ্যেস করে।

ঠাকুরদা বলেন, "খড়্গ হচ্ছে লোমের মতো এক রকম আঁশের গোছা। বাচ্চা গণ্ডারের খড়্গ নরম তুলতুলে থাকে। তাই অনেক সময়ে ভেঙেও যায়। খড়্গ দিয়ে একরকম ওষুধ তৈরি হয়। ওর খুব দাম। সেকালে গণ্ডারের চামড়া দিয়ে ঢাল তৈরি করা হোত। কিন্তু আধুনিক রাইফেলের গুলিতে লোহার বর্ম ভেদ হয়ে যায় তাতে গণ্ডারের

পুরু চামড়া। খড়্গ গণ্ডারের অস্ত্র বিশেষ। বাঘ ওদের কাছে ঘেঁষে না। ওদের গায়ের চামড়ায় বাঘেরও নখ আর দাঁত বসে না। তবে তলপেটের চামড়া শক্ত নয়। শত্রুর সুবিধের ঐ একটা জায়গা আছে বটে।"

"পৃথিবীর আর কোন্ কোন্ দেশে গণ্ডার আছে, ঠাকুরদা?" দু'-তিন-জন বলে ওঠে।

ঠাকুরদা বলেন, "আমাদের ভারত আর আফ্রিকা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন দেশে গণ্ডার নেই। আফ্রিকার গণ্ডারগুলো আমাদের দেশের গণ্ডারগুলোর চেয়ে আকারে বড়। আর তাদের নাকের ডগায় দুটো করে খড়্গ থাকে। সে দেশে বনবাসীরা গণ্ডারের খড়্গ দিয়ে নব-কেরি তৈরি করে। ওটা এক রকমের অস্ত্র। ওখানেও গণ্ডারের বংশ নির্বংশ হতে চলেছে। তারও কারণ মানুষ।"

"আপনি জঙ্গলের মধ্যে গণ্ডার দেখেছেন, ঠাকুরদা?"

"হ্যাঁ, একেবারে তার সামনে গিয়ে পড়েছি। ওখন গণ্ডারটির পিঠে এক জোড়া পাখী বসে পোকা খুঁটে খাচ্ছিল। তারা আমাদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উড়তে লাগলো। আমার সঙ্গী বললে, 'হুঁশিয়ার সাহেব! গণ্ডার।'

"সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা গণ্ডার জল-কাদা ভেঙে এগিয়ে চলেছে। আমাদের দিকে সে ভ্রূক্ষেপেও করলে না।

"সঙ্গী বললে, 'ঐ পাখীগুলো গণ্ডারের গায়ে বসে পোকা খুঁটে খায় আর শিকারী দেখলে ঐ ভাবে ডাকতে ডাকতে গণ্ডারকে সাবধান করে দেয়।"

"পাখীগুলোর নাম কি?"

"ভুলে গেছি, ভাই। কুমীরের দাঁতেও পোকা খায় এক ধরনের ছোট পাখী। কুমীর শীতকালে নদীর চরে হাঁ করে চোখ বুজে শুয়ে রোদ পোহায়। আর কয়েকটা পাখী নির্ভয়ে তার মুখে ঢুকে দাঁতের গোড়া থেকে পোকা খুঁটে খায়। কুমীর যদি তখন হঠাৎ মুখ বন্ধ করে তাহলে তারা একেবারে তার পেটে। কিন্তু তা করে না। বোধ হয় আরাম লাগে। কুমীরও উপকারী অনুপকারী বোঝে রে" বলে ঠাকুরদা হা হা করে হাসেন।

তারপর বলেন, "গণ্ডার অতবড় প্রাণী কিন্তু হাতীর চেয়ে ওদের পরমায়ু অনেক কম। হাতী বাঁচে সত্তর-পঁচাত্তর বছর, ওরা তারও কম সময়।

"কখন কখন হাতীর পালের পিছনে দু-একটা গণ্ডার থাকে। ওরা হাতীর লাদ খেতে ভালোবাসে।"

"সব চেয়ে বেশি দিন বাঁচে কোন্ প্রাণী, ঠাকুরদা ?"

"সে জলচরও নয়, স্থলচরও নয়, উভচর—কাছিম। ওরা তিন শ' বছরও বেঁচে থাকে বলে শোনা যায়। তবে কুমীরও কম বাঁচে না। কুমীর হলো কাছিমের মত উভচর, জলে থাকে, ডাঙায় বালিতে ডিম পাড়ে। আর স্থলচর, জলচর প্রাণীদের বাগে পেলে গিলে খায়। আমাদের সুন্দরবনের খাড়ি আর নদীতে অনেক বড় বড় কুমীর আছে। তারা খাড়ির ধারে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। হরিণ, কখন কখন বাঘ জল খেতে এলে খপ্ করে তাকে চেপে ধরে জলে টেনে নিয়ে যায়। তারপর মজা করে ভোজ।

"কুমীরদেরও পূর্বপুরুষেরা হাজার হাজার বছর আগে ছিল। তাদের পাথর-হয়ে-যাওয়া কঙ্কাল ভূ-তাত্ত্বিকেরা মাটির তলা থেকে সংগ্রহ করছেন। আর ওদের জ্ঞাতি হচ্ছে, গোসাপ, গিরিগিটি ইত্যাদি।

"কুমীরের ডাক শুনেছিস্ ? বছরে এক সময়ে পুরুষ কুমীর ডাক ছাড়ে। সে ডাক প্রায় এক মাইল দূর থেকেও শোনা যায়। আমি শুনেছি। মেঘনার তীরে তখন থাকি। প্রথমে বুঝতে পারি না। মনে হয়, হ্রেষারব—ঘোড়ার ডাক; কিন্তু একজন স্থানীয় লোক আমার ভুল শুধরে দেয়। বলে, 'পুরুষ কুমীরের ডাক।' যেমন বাঘের, তেমনি কুমীরের ডাক শুনেও ভয় করে।

"কিন্তু আজ আমার জরুরি একটা কাজ আছে। এইখানেই 'আমার গল্পটি ফুরলো—'

ছেলেমেয়েরা বলে, "নটে গাছটি মুড়লো—"। বলেই হাহা, হোহো করে হাসতে হাসতে উঠে পড়ে।

যেতে যেতে ঠাকুরদা বলেন, "আবার কাল—"

॥ ১১ ॥

পরদিন সকাল থেকে মেঘলা আবহাওয়া, মাঝে মাঝে বাতাসের পাগলামি জেগে উঠ্ছে। গাছপালা থেকে থেকে সর্ সর্ করছে!

ঠাকুরদা বলেন, "অনেক দিন আগের কথা। তখন থাকি রংপুর জেলার এক অংশে। সেদিনও এই রকম আবহাওয়া ছিল। দুপুরের

দিকে জঙ্গলে ঢুকেছি। হঠাৎ বহুলোকের চীৎকার শুনে প্রথমটা কেমন চমকে গেলাম। মনে করলাম, বুনোরা হয়তো শুওর বা চিতাবাঘ শিকার করছে। জন্তুটা যে কোন মুহূর্তে আমার সামনে এসে পড়তে পারে। নিরস্ত্র হয়ে একা বনে ঢুকে বুদ্ধিমানের কাজ করি নি। কিন্তু আমি বরাবরই বেপরোয়া গোছের। বিপদের সামনাসামনি পড়তে আমার আনন্দ বোধ হয়।

"চারধারে বড় বড় গাছ, তলায় এধারে-ওধারে ঝোপ-ঝাড়। গাছের আঠা আর পাতার মিশ্র গন্ধে বাতাস ভারি। চীৎকারটা ক্রমেই কাছে আসছে আর স্পষ্ট হচ্ছে। আমি নিরাপদ হবার জন্যে একটা গাছে উঠতে যাবো, যদিও চিতাবাঘের কবল থেকে গাছে চড়েও নিস্তার নেই, হঠাৎ দেখি সামনে একটা বনরুই, যাকে ইংরেজীতে বলে আরমাডিলো। আর তার পিছন পিছন এলো লাঠি-সড়কি হাতে একদল বুনো।

"বনরুইটা প্রবল শত্রুর হাত থেকে আর পালাবার উপার না দেখে বলের মতো গোল হয়ে গাছতলায় পড়ে রইলো। তার গায়ের বড় বড় ধারালো আঁশগুলো বর্মের কাজ করতে লাগলো। আর, বুনোরা তার ওপর ধপাধপ লাঠি চালাতে শুরু করলো। বেচারী একটু পরেই মরে গেল। তখন শিকারীরা তার চার পা মোটা লাঠি সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চললো। তাদের মধ্যে একটা লোক আমায় চিনতো। সে একগলে হেসে আমায় সেলাম করলে।

"বুঝলাম, বনরুইটার মাংসে তাদের ভোজ হবে, তাই এত হাসি।"

ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে গল্পটি শুনছিল, জিগ্যেস করে, "কত বড় জন্তু? কামড়ায় না?"

ঠাকুরদা বলেন, "শরীরটা হবে হাত খানেক লম্বা, লেজটা তার দেড় কি দুগুণ, মুখ ছুঁচলো, চারপায়ে লম্বা ধারালো নখ, মাথা থেকে আরম্ভ করে সারা গা রুইমাছের মতো বড়ো বড়ো আঁশে ঢাকা। পিঁপড়ে, উই বা ঐ ধরনের পোকা, গাছের তলায় যে-সব ফল পড়ে, গাছের শিকড়, ওদের চেয়েও ছোট ছোট প্রাণী, কখন কখন মরা পশুপাখীর মাংস খায়। ওদের শরীরের নরম অংশ হচ্ছে, চোখ আর তলপেট। তাই শত্রু আক্রমণ করলে নাক-মুখ-চোখ ঢেকে বলের মতো গোল হয়ে পড়ে থাকে। ঐ আঁশগুলো হচ্ছে ওদের বর্ম। বাঘের দাঁতও সে বর্ম ভেদ করতে পারে না।

"আমাদের দেশের জঙ্গলে দু-তিন রকমের বনরুই আছে। কিন্তু

আমি ঐ এক রকমের বনরুই দেখেছি। মালয়' ব্রহ্মদেশ আর বোর্নিওর জঙ্গলেও ওদের পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় বনরুই থাকে ব্রেজিলের বনে। তারা লম্বায় চার ফুট উঁচুতে দেড় হাত হয়। কিন্তু ঐ অঞ্চলে যে সব বনরুই আছে তারা দেখতে আমাদের দেশের বনরুইগুলোর মতো নয়। তবে সব রকমের বনরুই স্থলচর। এমন দু-এক ধরনের আছে যারা যেমন করে লাঙল দেয় তেমনিভাবে মাটির তলায় গর্ত করে তার মধ্যে থাকে। সেগুলো আধহাত বা তার চেয়ে কিছু বেশী লম্বা হয়।

"কিছুদিন আগে এক জন লোক সংবাদ-পত্রে একটি বনরুইয়ের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, তাঁদের গ্রামের ঝোপ-জঙ্গলে এই আশ্চর্য প্রাণীটিকে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। এর আগে এ রকম প্রাণী সে অঞ্চলে ছিল না। বিবরণটি পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, সেটি বনরুই ছাড়া আর কিছু নয়, কোনক্রমে সে অঞ্চলে এসে পড়েছে। ওদের অদ্ভুত শরীর, আর ওরা ঝোপে জঙ্গলে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে বলে প্রথমে দেখে লোকের ভারি আশ্চর্য বোধ হয়; মনে করে, দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। কিন্তু আসলে তা নয়। ওরা কামড়ায় না।"

চার-পাঁচ জন বলে ওঠে, "ঠাকুরদা, সজারুর গায়েও তো বর্ম আছে। তাহলে তারা ঐ জাতের?"

ঠাকুরদা হেসে ওঠেন, বলেন, "বর্ম থাকলেই এক জাতের হবে? রুই-কাতলার বর্ম ওদের আঁশ। তাহলে আরমাডিলো আর বড় রুই-কাতলা পরস্পরের জাত-ভাই, কেমন?" ঠাকুরদার কথায় সকলে হেসে ওঠে।

ঠাকুরদা আবার বলেন, "সজারু হচ্ছে দন্তুর প্রাণী। ওদের দাঁতে ভারি ধার। ওরা খায় ফল-মূল আর শস্য। মাটি খুঁড়ে মানকচু, ওল, আলুও খেয়ে থাকে, শস্যক্ষেত খুঁড়ে চষে একাকার করে। তাড়া করলে গায়ের চোখা চোখা কাঁটাগুলো খাড়া করে শত্রুর দিকে পিছিয়ে আসে। তখন দু'একটা কাঁটা শত্রুর গায়ে ফুটে যাবেই। তার যা জ্বলুনি রে ভাই! একবার আমার পায়ে ফুটে গিয়েছিল।

"মোটে তো আড়াই ফুট লম্বা প্রাণী। চলা-ফেরায় অলস, ঘণ্টায় হাঁটে মাত্র দু মাইল। তার আবার দাপট! রাতের বেলা বার হয়, যখন চলে তখন কাঁটায় কাঁটায় আঘাতে বাজনা বাজে ঝুম্ ঝুম্।

"বাড়ির ধারে বেশ বড় মানকচু হয়েছিল। ঠিক করেছিলাম, পরদিন তুলবো। আরে ভাই, গভীর রাতে কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কানে এলো ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ যেন কে ঘুঙুর বাজিয়ে চলেছে। অত

রাতে কার আবার ঘুঙুর বাজিয়ে বেড়াবার শখ হল রে বাবা? চোর নাকি? চোরের কত রকমের ফন্দি-ফিকির আছে। আস্তে দরজা খুলে লাঠি আর টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর টর্চের আলো ফেলে দেখি একটা সজারু আমার সাধের মানকচু খুঁড়ে খাবার যোগাড় করছে। রাগে আমারও মেজাজ কুটকুট করে উঠলো। গেলাম তেড়ে। সেও কি পিছপা হয়? ঘুরে এলো আমার একেবারে পায়ের ওপর। ফুটে গেল এক জোড়া কাঁটা। জ্বলে মরি। সেই ফাঁকে সজারুটা প-এ-আকার। কিন্তু আমার মান রক্ষা পেয়ে গেল।

"তার কয়েকদিন পরে আমাদের পাড়ার চার-পাঁচজনে সজারুটাকে শিকার করে। কি করে জানিস্? কলাগাছের গোড়া তার গায়ে ছুড়ে মেরে। গোড়াটা সজারুর গায়ে আটকে যাওয়ায় সে আর পালাতে পারে না। বুনোরা সজারুর মাংস আগুনে ঝলসে খায়। আর, তোদের মতো খোকাখুকুরা ওদের লম্বা কাঁটা দিয়ে পেনহোলডার তৈরি করে।"

একজন বলে ওঠে, "আমার দাদার সজারুর কাঁটার একটা পেনহোলডার ছিল।" একটি মেয়ে বলে ওঠে, "ঠাকুরদা, ঠাকুরদা, ঐ দেখুন দুটো কাঠবেরালী লেজ তুলে গাছের ওপর লাফিয়ে উঠছে।"

আর একজন বলে, "ঐ ওরা কিচির মিচির করে ডাকছে যেন পাখী। ওদের গায়ে রামচন্দ্রের পাঁচ আঙ্গুলের দাগ। ওরাই তো সেই নেউলের বংশধর যে সমুদ্রে সেতু বেঁধেছিল?"

তার কথা শুনে ঠাকুরদা হেসে বলেন, "অনেক কাঠবেরালীর গায়ে ওরকম দাগ নেই। কোনজাতের কাঠবেরালীর গায়ের রঙ কালো, কোন জাতের লাল, কোন জাতের রং ধূসর। তারা থাকে নানা দেশে। কিন্তু সকল জাতের কাঠবেরালীর লেজে ঐ রকম লোম। শরীর যতটা লম্বা লেজও হয় ততখানি। আমাদের দক্ষিণ ভারতের কাঠবেরালীরা আকারে সব চেয়ে বড়। তারা থাকে মালাবার উপকূলে।"

"ওরা কি খায়, কোথায় থাকে ঠাকুরদা?"

ঠাকুরদা বলেন, "ওদের এক শ্রেণী বাসা বাঁধে গাছের ডালে। এক শ্রেণী থাকে গাছের খোঁদলে, আর এক শ্রেণী থাকে মাটিতে গর্ত করে। তারা গাছে চড়ে না! ওরা সারা দিন খাবারের খোঁজে গাছে গাছে বা মাটিতে এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে। খায় ফুলের কুঁড়ি, ফল, বাদাম, পোকামাকড়, পাখীর ডিম আর ছোট ছোট পাখী। কাঠবেরালী ইঁদুরের মতো ছোট্ট, আবার বিড়ালের মতো কি তার চেয়েও বড়ও হয়। কাঠবেরালীদের ছুটোছুটি দেখতে মজার। তাই নয়?

সকলেই বলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ওরা লাফ দিয়ে ওধারের গাছে চলে গেল।"

ঠাকুরদা বলেন, "কিন্তু ভাই আজ এই পর্যন্ত। আবার কাল।"

সকলে বলে, "কাল শুনবো খরগোসের গল্প।"

ঠাকুরদা বলেন, "ঐ সঙ্গে আরও দু-একটা মজার গল্প বলবো। আজকের আসর ভাঙলো।"

॥ ১২ ॥

পরদিনের আসরে ঠাকুরদা বলেন, "খরগোস্ ভারি নিরীহ প্রাণী। সেই খরগোস আর কাছিমের দৌড়ের গল্পটা সকলেই তো জানিস্? ওরা ঘণ্টায় ছোটে পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে, আর কাছিম চলে ঘণ্টায় সিকি মাইল। তবু সে খরগোসকে দৌড়ের পাল্লায় হারিয়ে দিয়েছিল। এ হচ্ছে অহঙ্কার আর বোকামির ফল।"

একজন বলে, "আবার ছোট্ট খরগোসের বুদ্ধিতে পশুরাজ সিংহও তো প্রাণ হারিয়েছিল।"

ঠাকুরদা বলেন, "ঠিক ঠিক। পৃথিবীর সব দেশে খরগোশ পাওয়া যায়। লম্বা কান, বড় বড় চোখ আর লম্বা ঠ্যাং, গায়ের রং বাদামী বা দুধের মতো সাদা। এই হচ্ছে ওদের সাধারণ চেহারা। জাপানী খরগোসগুলোর কিন্তু সবই ছোট। খরগোসের আত্মরক্ষার উপায় হচ্ছে চারখানি ঠ্যাং। তাদের সাহায্যে শত্রুর সামনে থেকে ছুট্ ছুট্ ছুট্। আবার যখন পালাবার পথ পায় না তখন পাথরের মত স্থির হয়ে পড়ে থাকে। শত্রু চলে গেলেই আবার ছুট। ভারি ভীরু প্রাণী, ধরলে ভয়ে থর্থর্ করে কাঁপে। কিন্তু চাষীর ভারি ক্ষতি করে। ঘাস-পাতা আর ফসল খেয়ে সব ফাঁকা করে দেয়। মানুষ খায় ওদের মাংস, আর ওদের লোম ও চামড়া কাজে লাগায়।

"আমি একবার একবার বন্দুক দিয়ে খরগোস শিকার করেছিলাম। সঙ্গে ছিল আমার একটা ফক্স টেরিয়ার। সেদিন খরগোস শিকার করবো বলেই বেরিয়েছিলাম। বন্দুক কাঁধে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কুকুরটা এদিক-ওদিক শুঁকে বেড়াচ্ছে। এক জায়গায় গিয়ে সে হঠাৎ 'ঘেউ' করে উঠলো। আমিও তৈরি হলাম। আর সামনে ঝোপের ভেতর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এল একটা বাদামী রঙের খরগোস। তার পেট আর পা চারখানা সাদা। সে বেরিয়েই আর একটা ঝোপে ঢোকবার আগেই গুলি করলাম। তাতেই কাৎ।

"ওদের অনেক শত্রু যেমন শিয়াল, বিড়াল, ঈগল, বাজপাখী, কুকুর, ইত্যাদি। মাটির তলায় ওদের বাসা। তার সাত-আটটা মুখ। সেখানেই বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে থাকে।"

"আচ্ছা ঠাকুরদা, আপনি যে বললেন, ওদের এক শত্রু বিড়াল। কিন্তু পোষা বিড়াল কি ওদের বনে শিকার করতে যায়?"

ঠাকুরদা বলেন, "পোষা বিড়ালের কথা বলছি না। বন-বিড়াল ওদের শত্রু। তারা রীতিমতো শিকার করে, এই যেমন করে বাঘ শিকার ধরে তাদেরও শিকার ধরার রীতি সেই রকম। দেখলেই মনে হবে ডোরাদার বাঘের ছানা। তারা গাছের ডালে ডালে বেড়ায়, ম্যাও ম্যাও করে ডাকে। ওরাই নাকি পোষাবিড়ালের পূর্বপুরুষ। কিন্তু একটা কথা আমার কি মনে হচ্ছে জানিস্? তোদের গরমের ছুটি ফুরিয়ে আসছে। অথচ এখনও কত বুনো পশুর কথা বলতে বাকি।" ছেলেমেয়েরা বলে, "এখনও যে কটা দিন বাকি আছে তার মধ্যেই আরও কয়েকটার গল্প বলুন।"

ঠাকুরদা বলেন, "তাহলে সাপের আর গোসাপের গল্প শোন। সাপ আর গোসাপ কিন্তু এক নয়, ওরা হচ্ছে পরস্পরের জাতভাই। গিরগিটি আর কুমীরের, এমন কি পাখীর পূর্বপুরুষ আর সাপের পূর্বপুরুষও এক। যাক সে কথা। গরমদেশে সাপের বাস বেশি। খুব শীতের দেশে ওরা থাকে না, বাঁচতেও পারে না। কত রকমের, কত আকারের, কত রঙের সাপ আছে। কেউ গর্তে, কেউ গাছে, কেউ বা জলে থাকে। কিন্তু সব সাপই মাংসাশী—খায় পোকা-মাকড়, ব্যাং, ইঁদুর, পাখী, পাখীর ডিম, মাছ। বড় বড় সাপে ছাগল, হরিণ পর্যন্ত গিলে খায়। আবার কোন কোন সাপ সজাতিকেও গিলে খেয়ে থাকে, যেমন গোখরো। সাপেরা বুকে হেঁটে চলে, বছরে একবার খোলস ছাড়ে। আমাদের দেশের করেত, কেউটে, গোখরে, ভারি বিষাক্ত সাপ। ওদের মাথায় থাকে ফণা। ছোবল দিয়ে যদি রক্তের সঙ্গে এক ফোঁটা বিষ মেশাতে পারে তাহ'লে আর রক্ষা নেই। কিন্তু সাপ দেখলেই ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ সব সাপের বিষ থাকে না। আবার, এই সাপকেই খায় আমাদের দেশের এক জাতের মানুষ। বিদেশেও কোথাও কোথাও লোকে বেশ তারিফ করে সাপের মাংসে ভোজ করে। আমাদের দেশের বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে কত রকমের বড় বড় সাপ যে আছে বলে শেষ করা যায় না। তারা হচ্ছে ময়াল, অজগর, পাহাড়ী ইত্যাদি—এরা আকারে মস্ত। লম্বায় বিশ-ত্রিশ ফুটও হয়, ওজনে তিন চার মণও হয়ে থাকে।

"আচ্ছা ঠাকুরদা, সাপের নাকি কান নেই, ওরা চোখ দিয়ে শোনে ?" জিগ্যেস করে একজন।

ঠাকুরদা বলেন, "কতকটা তাই-ই বটে। তবে জিভ দিয়ে ওরা গন্ধ অনুভব করে। সাপ দেখলেই গা শিউরে ওঠে। কিন্তু সাপ ইঁদুর খেয়ে চাষীর খুব উপকার করে। আবার, কোন কোন জাতের সাপের চামড়ায় জুতো, মেয়েদের হাতব্যাগ তৈরি হয়। সাপের বিষ থেকে ওষুধও তৈরি করা হয়ে থাকে। বিষাক্ত সাপ সত্যি ভয়ঙ্কর। কিন্তু তারাও গান আর ফুলের সুগন্ধে মুগ্ধ হয়। গান ভালবাসে বলেই সাপুড়েরা বাঁশী বাজিয়ে ওদের গর্ত থেকে বার করে আনে। সে গর্ত আবার নিজের নয়। ওরা গর্ত তৈরি করতে পারে না। ইঁদুরের গর্তে ঢুকে তাকে খেয়ে সেই গর্ত দখল করে থাকে। সাপদের শত্রু হচ্ছে গোসাপ। দেখতে কতকটা কুমীর, আর কতকটা প্রকাণ্ড গিরগিটির মতো। কিন্তু জিভ সাপের জিভের মতো চেরা। ওরা বনে-বাদাড়ে, বাঁশ ঝাড়ে, ডোবার কিনারে, জলার ধারে সারাদিন সাপ বা অন্য খাবারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। সাপ ওদের এড়িয়ে চলে। আমাদের সুন্দরবন এলাকায় খুব সাপের উৎপাত। ওরা সাপের শত্রু। তাই সেখানে গোসাপ মারা নিষিদ্ধ। তবু লোকে চামড়ার লোভে ওদের গোপনে শিকার করে। ওদের চামড়ায় সুন্দর জুতো হয়। কেউ কেউ আবার ওদের মাংসও খায়।"

"আর বেজী কি সাপের শত্রু নয় ?" বলে একটি মেয়ে।

ঠাকুরদা বলেন, "তা বটে। কিন্তু বেজী হচ্ছে ইঁদুরের পরম শত্রু। কখন কখন ধেড়ে ইঁদুর কি খরগোসকেও ওরা আক্রমণ করে। ওরা সারাদিন, এমন কি রাতেও ঝোপ-ঝাড়ে, শস্যক্ষেতে ইঁদুরের খোঁজে ঘুর ঘুর করে আর বাগে পেলেই ধরে। তখন ছোট-খাট সাপ দেখলেও তাকে ছাড়ে না। আবার, বড় সাপ যেমন গোখরো বা কেউটেকেও খাতির করে না। কারণ সাপ যে ওদের শত্রু। তারাও বেজীকে বাগে পেলে ছাড়ে না কিন্তু ওরকম চটপটে প্রাণীকে বাগে পাওয়াই শক্ত। ওরা কাঠবেরালীর চেয়েও চঞ্চল। ঐ দেখ, এক জোড়া বেজী ছুটে চলেছে খাবারের খোঁজে।" ছেলেমেয়েরা হাততালি দেয়। বেজী দুটো ঝোপে ঢুকে পড়ে।

ঠাকুরদার গল্প সাঙ্গ করে সকলকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরেন। যেতে যেতে বলেন, "আবার বুনো গল্পের আসর বসবে পুজোর ছুটিতে। এবারের মতো এ আসর শেষ।"

পাথরের ফুল

॥ এক ॥

নীল পাহাড়ের সারি। তার কোলে গাঁ। গাঁয়ে থাকে চাষী, মজুর, শিল্পী!

গাঁয়ের বাইরে একটি টিলা। টিলায় মাথায় একখানি ছোট ঘর—কাঠ ও টিন দিয়ে তৈরী। ঘরের ছেঁচ থেকে ঝুলচে একটি লোহার নল। ঐ ঘরে থাকে গাঁয়ের বুড়ো চৌকিদার। সে প্রহরে প্রহরে ঐ নলটি বাজায়, ঠং ঠং ঠং। সবাইকে জানায়, সময় চলে যাচ্চো।

বুড়োর চেহারা ঠিক পাকা আমের মতো, ভারী সুন্দর। মাথায় শাদা লম্বা চুল, মুখে শাদা লম্বা দাড়ি, একটিও দাঁত নেই, চোখ দু'টি কোমল। গাঁয়ের ছেলেমেয়ে সকলে তাকে ভালবাসে। তারা বুড়োর কাছে গেলে বুড়োও ভারী খুশি হয়। বুড়োর গল্পের ঝুলি অফুরন্ত।

সেদিন নীল পাহাড়ের পিছনের আকাশখানি রাঙিয়ে, বকের সারির শাদা পাখায় রাঙা আবির মাখিয়ে সূর্য গেল ডুবে। বুড়ো অমনি ঠং ঠং ঠং করে বেলা-শেষের ঘন্টাখানি বাজিয়ে যেমনি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমেচে, অমনি গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা এসে তাকে ঘিরে ধরলো।

বুড়ো তাদের ধমক দিয়ে বললে, "তোরা এ সময়ে কেন এসেচিস? যা বাড়ি যা। বাপ-মা ভাববে।"

ছেলেমেয়েরা বললে, "ঠাকুরদা! আমরা বাড়িতে বলে এসেচি, তোমার কাছে যাচ্ছি।"

বুড়ো হাতের লম্বা লাঠিখানা দিয়ে সামনে আগুনের কুণ্ডটি উস্কে দিতে দিতে বললে, "বাড়িতে বলে এসেচি। এমন সময় কি চাস্?"

সবাই বলে উঠলো, "ঠাকুরদা! একটা গল্প বল। গল্প না শুনে আমরা যাবো না।"

বুড়ো বললে, "রোজ রোজ তোদের জন্যে কোথায় এত গল্প পাবো?"

সবাই তবুও তাকে রেহাই দিলে না।

বুড়ো বললে, "হুঁ। তবে সবাই বস্ এখানে।"

সেদিন আবার শীতও পড়েছিল বেশ। বুড়ো আগুনের সামনে একখানি পাথরে বসলো ; ছেলেমেয়েরা বসলো তার গা ঘেঁষে।

॥ দুই ॥

বুড়ো চৌকিদার মুখের পাইপে আগুন দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "শোন্। অনেক দিন আগে এক গাঁয়ে এক কারিগর থাকতো।"

ছেলেমেয়েরা বলে উঠলো, "মোটে একজন কারিগর? আমাদের গাঁয়ে তো রয়েচে অনেক জন।"

বুড়ো চৌকিদার বললে—"সে গাঁয়েও ছিল। এখন একজনের কথাই শোন্! তা, কারিগরটি ছিল খুব গরীব। তার বয়সও হয়েছিল অনেক। আমারই মতো বুড়ো হ'য়ে গিয়েছিল সে! কিন্তু ছিল ভারী ওস্তাদ। তার হাতে পাথর যেন মোমের মতো হ'য়ে যেত। পাথরকে কেটে, কুঁদে, পালিশ করে সে এমন সব জিনিষ বানাতো যে লোক দেখে বিল্‌কুল তাজ্জব বনে যেত। চারধারে ছিল তার ভারী নাম।

বুড়োর একটি ছেলে ছিল। বুড়ো তার নাম রেখেছিল দানিলা। ছেলেটি যেমন ছিল দেখতে তেমনই ছিল তার গুণ। বুড়ো তাকে খুব ভালবাসতো।

"তোরা যেমন আজকাল লেখাপড়া শিখচিস্ তখন ছোট ছেলেমেয়েরা তা শিখতে পেত না। তারা একটু বড় হলেই সংসারে যাতে দু'পয়সা সাহায্য করতে পারে সে জন্যে বাপ-মা তাদের কাজ করতে পাঠাতো। দানিলাও তাই রাখালি করতো। লোকের গরু-ছাগল-ভেড়া নিয়ে চরাতে যেত পাহাড়ের ধারে উপত্যকায়, বনে, ঘাসে ছাওয়া সবুজ মাঠে।

"তার বাপ ভাল কারিগর হ'লে কি হবে, পয়সা-কড়ি তেমন পেত না। সে যা গড়তো তা বেচে যা পেত তাই দিয়ে কোন রকমে তাদের দিন চলতো। বুড়ো জমিদারের খাজনা ঠিক মতো দিতে পারতো না। ঘর-দোর ঝড়-ঝাপটায় ভেঙে গেলে মেরামত করবার মতো পয়সাও জোগাড় করতে পারতো না। এমন লোকের ছেলে একটু বড় হ'লে রোজগার না করে কি করবে? বাঁচতে হ'লে খাওয়া তো চাই-ই। রোজগার না করলে খাবার আসবে কোথা থেকে? বুড়োর জমি-জায়গাও কিছু ছিল না যে, চাষ-আবাদ করে তা থেকে কিছু পাবে। শরীরই ছিল একমাত্র সম্বল। যতক্ষণ খাটতে পারবে ততক্ষণই পয়সা-কড়ি কিছু আসবে। শরীর অপটু হলো কি আর রক্ষে নেই! শুকিয়ে মর।

সে গাঁয়ের জমিদার ছিলেন ভারী জবরদস্ত। কিন্তু সে দেশে বড় একটা থাকতো না, বিদেশে আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াতো। জমিদারী দেখা-শুনা করতো তার আম্‌লারা। তারা প্রজাদের রক্ত শুষে খেত আর মনিবকে খানিকটা করে ঠিক মতো পাঠিয়ে দিত।

"বুড়োর দিন যায়। সে ঘরখানির জানালাটির ধারে বসে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে কাজ করে। কাজ করতে করতে তার বুক-পিঠ কন্ কন করে, কোমর ধরে আসে, চোখে অন্ধকার দেখে, হাত দু'খানি ভারী হয়ে ওঠে। সবুজ পাইন বনের ওধারে নীল পাহাড়ের আড়ালে সোনা ছড়িয়ে সূর্য যায় ডুবে, নীল আকাশে সাঁতার কাটতে কাটতে পাখিরা ফেরে বাসায়, রাখাল কিষাণেরা মাঠ থেকে ফেরে ঘরে, সন্ধ্যার ছায়া আসে ঘনিয়ে। তারপর রাত হয়, ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, জোনাকির ঝাঁক উড়ে বেড়ায়, তবুও কি তার নিস্তার আছে? কাজ তাকে করতেই হবে! সে মোমবাতি জ্বেলে কাজ করে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্।

"ওদিকে দানিলা রাখালি করতে যায় বনে। বুড়ো তাকে কিছু বলে না, নিজের বিদ্যা তাকে শেখায়ও না। শেখাতে গেলেও দানিলা তাতে মন দেয় না। তার মন পড়ে থাকে বাইরে, পাহাড়ে, উপত্যকায়, বনে, হ্রদের ধারে—যেখানে বুনো ফুল ফুটে গন্ধ বিলিয়ে ঝরে যায়, বুনো পাখির গান পাতায় পাতায়, ডালে ডালে বেজে হাওয়ায় যায় উড়ে। বনের যত পশু-পাখি সকলের সঙ্গে দানিলার ভাব। তার টানা টানা চোখ দু'টিতে একটু স্বপ্ন লেগে থাকে। ভোরের আলোয় মনে হয় তার মাথার লম্বা কোঁকড়া চুলের ওপরে যেন সোনার গুঁড়ো ঝরে পড়েছে। তার লম্বা নরম চটুল আঙুলগুলো সদাই একটা কিছু গড়তে অধীর। সে গরু-ভেড়াগুলো ছেড়ে দিয়ে গাছের ডালে বসে ছুরি দিয়ে ডাল কেটে সুন্দর বাঁশি তৈরি করে বাজায়। বুনো হাওয়ায়, পাহাড়ে হাওয়ায়, মেঠো হাওয়ায়, হ্রদের ভিজে হাওয়ায় গাছের ডাল দোলে। দানিলা ডালে বসে দোল খায় আর তার বাঁশিটি বাজায়।

॥ তিন ॥

"দানিলা বাঁশি বাজায়। তার বাঁশি শোনে বনের পশু-পাখি, শোনে কীট-পতঙ্গ, শোনে ফুলের বনে মৌমাছি-ভোমরা-প্রজাপতি। শুনতে শুনতে তারা মুগ্ধ হ'য়ে যায়। সব ছবির মতো, ছায়ার মতো, পুতুলের মতো স্থির হয়ে শোনে।

বনদেবীও তার কাছে গাছের ডালে শুয়ে, কি গুঁড়িতে হেলান দিয়ে এক মনে শোনেন। দানিলা বাঁশি হাতে করে যখন উন্মনা হয়ে থাকে, তখন বনদেবী বলেন : 'দানিলা বাজাও, বাঁশি বাজাও, দানিলা।'

"দানিলা কিন্তু বনদেবীকে দেখ্‌তে পায় না, কেবল তাঁর মিষ্টি স্বর শোনে। তার মনে হয়, গাছের পাতা মর্মরিয়ে বলচে : 'বাজাও দানিলা।' মনে হয় হ্রদের ছোট ছোট ঢেউগুলি ছলছলিয়ে বলে উঠ্‌চে, 'দানিলা, বাজাও।' পাখির গানেও সেই মিনতিই ঝরে পড়ে : 'বাঁশি বাজাও দানিলা।'

"দানিলাও বাঁশিটি ঠোঁটে তুলে বাজায়। আর, সারা বনে নেমে আসে সুরের, মধুর সুরের স্বপ্ন। দানিলা চায় সৃষ্টি করতে, এমন কিছু গড়ে তুলতে যা কেউ কোন দিন পারেনি। তার বাঁশির সুরে সেই কথাটিই ঝরে পড়ে। কখন কখন সে বাঁশিটি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে। বনের ফুলগুলোকে এক দৃষ্টিতে দেখে।

"ঘরে তার বুড়ো বাপ কাজ করে। এক এক সময় ক্ষোরী এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে যে তার হাত চলে না। সে উঠে টল্‌তে টল্‌তে গিয়ে বিছানায় শোয়। শুয়ে ভাবে, আর বুঝি উঠ্‌তে পারবে না।

"দানিলা ঘরে ফিরে এসে দেখে তার বাবা শুয়ে আছে। দেখে তার বড় দুঃখ হয়। বলে, 'বাবা, তুমি আর কাজ ক'র না।'

"বুড়ো কিন্তু তার কথা শোনেনা। আবার উঠে গিয়ে টুলে বসে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে পাথর কাটে, পালিশ কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে পালিশ করে, আর নিজের মনে মাথা নাড়ে, বিড় বিড় করে কি বলে। এমনি করে দিন যায়।

"একদিন জমিদারের পেয়াদা এল। বুড়ো তাকে দেখেই তো ভয়ে কাঠ।

"সে ঘরে ঢুকে বললে, 'কি করচিস্ রে বুড়ো?'

"বুড়ো পাথর কেটে একটি ফুল তৈরি করছিল। পেয়াদা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আবার বললে, 'তোর ছেলেটা তো ডাগর হয়েছে। শুনেছি, ছোঁড়াটা কাজকর্মও কিছু পারে। ও তোকে সাহায্য করতে পারে না?'

"বুড়ো বললে, 'ও ছেলেমানুষ। এ কাজে তো ও বয়সে পাকা হওয়া যায় না।'

"পেয়াদা বললে, 'তোর দানিলা ছেলেমানুষ! হোঃ! তা যাক্।

ভোর বেটা। তুই বুঝবি। কর্তা এসেচেন। তোকে ডেকেচেন। কাল হাজির হওয়া চাই-ই। না গেলে কর্তাকে চেনো তো?' বলে সে হাতের চাবুকে একটু ঝাঁকুনি দিলে।

"বুড়ো ঢোক গিলে বললে, 'নিশ্চয়ই যাবো হুজুর।'

"পেয়াদা 'হুঁ' বলে চলে গেল। বুড়ো বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, কর্তা কেন ডেকেচেন। ভাবতে ভাবতে কাজ করতে লাগলো, কিন্তু তার মাথা গেল গুলিয়ে। কাজটি জরুরি। ভাল হলে একটু বেশি মজুরি পাবে। তবুও সে কিছুতেই সুন্দর করতে পারচে না। মনে হচ্চে, পারবেও না।

"এমন সময় দানিলা এল ঘরে। সে দেখলে, তার বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। সামনে টেবিলে আধ-কাটা একখানি পাথর। পাথরখানি থেকে তার বাবা একটি ফুল তৈরি করছিল। দেখেই সে বুঝতে পারলে, তার বাবা ঠাহর করতে পারচে না কোন্‌খানে কাটলে ফুলটি সুন্দর হবে।

"সে আস্তে আস্তে বললে, 'ওখান থেকে না কেটে আর এক জায়গা দিয়ে কাটলে ফুলটা সুন্দর হয়ে উঠবে।'

"বুড়ো তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালো। সে পাকা কারিগর, এই কাজে বুড়ো হয়ে গেল, আর ও কালকের ছেলে। তার চেয়ে ও বেশি জানে? কর্কশ স্বরে বললে, 'কোন্‌খানটা কাটলে?'

"দানিলা বললে, 'আমি তা বললে তুমি আমায় মারবে।'

"বুড়ো রাগের মাথায় কখনো কখনো তাকে মারতো। গরিবের ঘরে এমন তো হামেশাই হয়। ভাল গুণও জ্বলে-পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

"বুড়ো বললে, 'না, মারবো না। বল্‌—'

"দানিলা পাথরখানি হাতে তুলে নিয়ে তাতে ছেনির দাগ দিয়ে বললে, 'এইখান দিয়ে—'

"বুড়ো তাই দেখে চম্‌কে উঠলো।

"দানিলা পাথরখানি টেবিলে রেখেই সেখান থেকে সরে গেল।

"বুড়ো পাথরখানি তুলে নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, 'ঠিক। ছেলেটার মাথা ভারী সাফ্‌।'

বুড়ো খুশি হলো। ছেলে-মেয়ে গুণী হ'লে বাপ-মা বড় খুশি হয়।"

॥ চার ॥

কুণ্ডের আগুন একটু নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। আগুনটা লাঠি দিয়ে উস্কে দিতেই কতকগুলো ফুলকি উঠে জোনাকির মতো ফুর্ ফুর্ করে উড়ে গেল। বুড়ো পাইপে একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, বুড়ো ছেনি দিয়ে ঠিক সেই জায়গাটি কাটতে কাটতে আবার ভাবতে লাগলো, হুজুর তাকে কেন ডেকেচেন? সে সামান্য কারিগর, তার মতো তাঁর কত শত প্রজা আছে। তার কথা তিনি কেন ভাববেন? আর, তাকে তিনি চিনবেনই বা কেমন করে? বাকি খাজনার কথা তো ভাবে নায়েব-গোমস্তা। তাদের তাগাদার চোটে কারো এক আধ্‌লা বাকি রাখবার জো নেই। দানিলার জন্যে হুজুর তাকে ডেকেচেন কি? কিন্তু দানিলা কার কি করেচে যে তার জন্যে হুজুরে তলব পড়বে? দানিলাকে গোমস্তা-পেয়াদারা দেখতে পারে না। কারণ ছেলেটা খেয়ালি; নিজের মনে থাকে কারো তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু সে তা কারোই ক্ষতি করে না। ওর মন ভারী নরম। তবে মাথা ভারী সাফ্।"

বুড়ো পাথরখানি চোখের সামনে তুলে ধরে নিজের মনে হাসলে। তারপর বিড় বিড় করে বললে, 'এইখান দিয়ে কাটতে বলেছিল, কেটেচি। পাথরে চমৎকার ফুল ফুটেচে। কিন্তু কর্তা ডাকলেন কেন?, বুড়ো কিছুতেই তা ঠিক করতে পারলে না। কাজ করতে তার হাতের অঙুল-গুলো কন্ কন্ করতে লাগলো, চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, পিঠ ব্যথা করে উঠ্‌লো। বহুকাল ধরে সে এই টেবিলের ধারে বসে কাজ করচে। আরাম পাবার জন্যে সে কখন কখন জানালা দিয়ে বাইরের সবুজ গাছ-পালা, কোমল নীল আকাশ, ভেসে যাওয়া মেঘের দল, দূর মাঠের গরু-ভেড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন কি তার কাজের বয়স? এখন সে চায়, রোদে পিঠে দিয়ে বসে পাইপ টানতে টানতে ঐ প্রকাণ্ড মাঠ-খানির দিকে, ঐ পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে, চায় ঘরের পাশে ঝাঁকড়া বাদাম গাছটির তলায় বসে পথ দিয়ে চেনা-অচেনা লোকের আনাগোনা দেখতে, কারো সঙ্গে বসে একটু গল্প করতে। ছেলেটা যদি কাজ করতো! কিন্তু ওকে খাটাতে, সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবাতে তার মন চায় না। আর, ওরও যেন কাজে মন নেই; সঙ্গী-সাথীও নেই কেউ।

ওর ভাব ওরই প্রায় সমবয়সী কাটিয়ার সঙ্গে। কাটিয়াও এক কারিগরের মেয়ে। মেয়েটি বড় ভাল, ভারী লক্ষ্মী, বড় সুশ্রী।"

"এমনই সব কথা ভাবতে ভাবতে বুড়ো টুল থেকে উঠে আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ক্লান্তিতে তার শরীর-মন যেন ভেঙে পড়চে।

"ওদিকে দানিলা তখন কাটিয়ার সঙ্গে হ্রদের ধারে একটি গাছতলায় চুপ করে বসে। নিঝুম দুপুর। পাখি ডাকচে, বাতাস বইচে, হ্রদের জল ছল্ ছল্ করে উঠচে! দূরে কোথায় যেন একটি বাছুর হাম্বা রবে তার মাকে ডেকে উঠ্লো। গাছ থেকে একটি হলদে রঙের পাতা খসে ঘুরতে ঘুরতে টুপ্ করে পড়লো নিচে। একটি ফড়িং একটি পাতা থেকে ফররর্ করে উড়ে গিয়ে আর একটি পাতায় বসলো। দানিলা আর কাটিয়া তেমনি চুপ করে বসে রয়েচে। ওরা দু'জনে এমনি চুপচাপ বসে থাকে। কথা কয় অল্প, দেখে অনেক, শোনে বেশি। কাটিয়া যেন দানিলার মনের কথা বুঝতে পারে। সে বোঝে দানিলা শিল্পী, দানিলা চায় গড়তে। ও প্রকৃতির রূপে-রসে একেবারে তলিয়ে যেতে চায়। ও শিল্প নিয়ে একেবারে মেতে থাকতে চায়। ওর কাছে শিল্প ছাড়া আর কিছু বড় নয়। ওকে তার খুব ভাল লাগে।

"দানিলাও কাটিয়ার ফোলা ঠোট দু'খানি, উঁচু নাক, ডাগর চোখ দু'টি আর চলার মধ্যে এমন কিছু দেখে যা তার খুব ভাল লাগে। কাটিয়াকে দেখলে সে বড় খুশী হয়। সে কাটিয়াকে বলে, 'আমি এমন জিনিস গড়বো যা কেউ কোনদিন দেখেনি, কেউ কোনদিন তৈরি করতে পারেনি।'

"কিন্তু তা যে কি, সে নিজেও জানে না। কেবল মনের মধ্যে তার তাগিদ পায়। এখনও সে তেমনি মনের ভাব নিয়ে বসে আছে। তার বাবার মনে যে ভাবনার ঝড় উঠেচে, বুড়ো কতকটা সেই জন্যেই যে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়েচে তা সে জানতে পারলে না।

।। পাঁচ ।।

চৌকিদার বললে, "শেষ বেলায় দানিলা ফিরে এল ঘরে। কাটিয়াও ফিরে গেল বাড়ি।

"দানিলা এসে দেখে তার বাবা বিছানায় শুয়ে।

"সে আস্তে আস্তে তার বাবার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার বাবা এ সময়ে কোনদিন শোয় না। কিন্তু সে তার বাবাকে কিছু জিগ্যেস করবার আগেই বুড়ো বললে, 'আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগচে।'

"দানিলার মন খারাপ হয়ে গেল। মনে একটু ভয় হলো। যদি বাবা আর না ওঠে! সে ফিরে দেখে টেবিলের ওপর একটি পাথরের ফুল রয়েচে। সে বুঝতে পারলে, তার বাবা ফুলটি তৈরি করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েচে। ফুলটির এখানে-সেখানে তখনও একটু-আধটু কাজ বাকি। কাজগুলি একটুও কঠিন নয়, সে নিজেই করতে পারবে।

"সে তার বাবাকে বললে : 'তুমি শুয়ে থাকো। কাজটা আমিই শেষ করবো।' বলে, সে যে জায়গাগুলি স্পষ্ট ও সুন্দর করা দরকার সে জায়গাগুলি ছেনি দিয়ে খুব হাল্কা হাতে কাটলো। তারপর ঘষে ঘষে পালিশ করে তার বাবার হাতের কাজটি শেষ আর সুন্দর করে তুললো।

"এদিকে সূর্য গেল ডুবে। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে পথের ওপর দিয়ে মাঠে নেমে কখন এক সময়ে সচল অন্ধকারে গেল মিশে। কিছুই আর দেখা যায় না। ঘরের কোণ থেকে ছায়া বার হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে বাইরের সঙ্গে মিশে জমে রইলো। দানিলা মোমবাতি জ্বাললো। গ্রামে কারিগর ও কৃষকদের ঘরে দু'টি একটি আলো জ্বলে উঠতে লাগ্‌লো; আকাশে তারার ফুল ফুটলো। বুড়ো লেপখানি বেশ করে মুড়ি দিয়ে আরও ভাল করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

"পরদিন সকালে উঠে সে চললো জমিদার বাড়ি।

"জমিদার আর জমিদার-গিন্নী তখন বারান্দায় টেবিলের ধারে জলযোগ করতে বসেচেন। বারান্দার শাদা পাথরের জাফরি ছেয়ে লতানো গোলাপ গাছটি ফোটা-আধফোটা ফুলে ফুলে গেছে ভরে।

"টেবিলে রুপোর কেটলি, রুপোর বাসনে মুচ্‌মুচে বিস্কুট্, টাটকা সুগন্ধী কেক্, ক্ষীর আর মাখন সাজানো। দামী চীনা-মাটির ফুটফুটে সাদা পেয়ালায় ঢালা হয়েছে চা। টেবিলের একধারে ঝক্‌ঝকে স্যামোভারে গরম হ'চ্ছে চায়ের জল।

"হুজুরের চেহারা সত্যিই বড় ঘরের মানুষের মতো। মস্ত ভুঁড়ি; মাথায় পরিপাটী সিঁথি; কানের দু'পাশ থেকে ফোলা গালে জুলপি নেমে এসেচে; গায়ে দামী পোশাক; বয়স হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি। গিন্নীর খাশা চেহারা—যেন পরী। তাঁর ফুলদার রেশমী কাপড়ের পোশাকটিও খাশা, বয়স হবে তিরিশের নীচে। দু'জনে বসেচেন টেবিলের দু'ধারে।

"চাকর একখানি ট্রেতে করে লবণ মাখানো কাজু বাদাম ভাজা এনে খুব সাবধানে টেবিলের ওপর রাখলো। তারও গায়ে চটকদার পোশাক, পায়ে চকচকে জুতো।

"কর্তা মোটা মোটা আঙুল দিয়ে দিয়ে একখানি কেক্ তুলে গালে পুরতেই মুন্সি এসে সেলাম করে খাটো গলায় নিবেদন করলে, 'বুড়ো কারিগরটা এসেছে, হুজুর।'

"কর্তা কেক্ চিবোতে চিবোতে বললেন, 'এখানে আসতে বল।'

"বুড়ো ভয়ে ভয়ে বারান্দায় ঢুকে মাটি অবধি নুয়ে লম্বা সেলাম দিয়ে কুঁজো হ'য়ে দাঁড়ালো। সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার শক্তি থাকলেও হুজুরের সামনে কি বুক টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায়?

"কর্তা তার দিকে একটু ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'তোকে কেন ডেকেচি জানিস্?'

"বুড়ো হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, 'না ধর্মাবতার।'

"কর্তা বললেন, 'জানিস্ তো আমি বড় শহরে থাকি? সেখানে একদিন মজ্‌লিশে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে পাথরের শিল্প নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। একজন একটি পাথরের বাক্স দেখিয়ে বললেন, 'এ রকম কাজ আমাদের এই শহরের কারিগর ছাড়া দুনিয়ার আর কেউই করতে পারে না।' আমি বললাম, 'আমার জমিদারির এক গাঁয়ে ওর চেয়েও ঢের ভাল কারিগর আছে। সে এমন জিনিস তৈরি করে দেবে যা দেখে এই শহরের কারিগরও মাথা হেঁট্ করবে।' তা, তুই তো একজন ভাল কারিগর! খুব নাম করেচিস্। তোকে এমন একটা পাথরের বাক্স তৈরি করে দিতে হবে যার কাছে আর কোন কারিগরের কাজ লাগবেই না—বুঝলি? আমি তার মধ্যে চুরুট রাখবো। যে-সে চুরুট নয়। তার একটার দামই পাঁচ টাকা। আমি এখান থেকে যাবার আগেই জিনিসটি চাই। যদি না তৈরি করে দিতে পারিস তাহ'লে ফল কি হবে বুঝতেই পারচিস্। আমাকে চিনিস্ তো?'

"বুড়ো হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বললে, 'হুজুরের হুকুম।' কিন্তু মনে মনে সে ভেঙে পড়লো। সে নাম করেচে বটে কিন্তু বিদেশী কারিগরকে হার মানাবে এত শক্তি ধরে কি?'

"কর্তা বললেন, 'এখন যা। মনে থাকে যেন।'

"বুড়ো লম্বা সেলাম দিয়ে বেরিয়ে এল। গিন্নী তখন বললেন, 'আর কতদিন এই অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবো? এখানে আমার একটুও ভাল লাগেনা, খালি হাঁফিয়ে উঠি। কবে যাবে?'

কর্তা বললেন, "এখানে কাজ রয়েচে যে! কাজ শেষ না করে যাই কি করে?'

"গিন্নী বললেন, 'তোমার খালি কাজ আর কাজ। কাজ কাজ করে তুমি কি রকম রোগা হ'য়ে গিয়েচো জান?' বলে ঠোঁট দু'খানি একটু ফোলালেন।

"কর্তা গম্ভীর হ'য়ে এক চামচ ক্ষীর তুলে খেতে লাগলেন।

'ওদিকে বুড়ো তখন ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে চলেচে। তার পা দুখানি যেন ভেঙে পড়‍্চে।

॥ ছয় ॥

"বুড়ো বাড়ি এল! সে টুলে বসে ভাবতে লাগলো, কি করে বাক্সটি তৈরি করবে?

"বাক্সটি তৈরি করতে গেলে তাকে আর সব কাজ ফেলে রেখে কেবল সেইটি নিয়েই থাকতে হবে। আর সব কাজ ফেলে রাখলে তাদের বাপ-বেটার দিন চলবে কি করে?

"এ যেন একটা দৈব বিপদ। এ বিপদ এড়ানোর শক্তি তাদের নেই। নিরুপায়ের মতো সইতেই হবে!

"বাক্সটি তৈরি করতে লাগবে অনেক সময়! এর জন্যে সে কত পারিশ্রমিক পাবে হুজুর তা বললেন না। তবে সবাই, সব গরিবই যেমন দরদস্তুর না করে বড়লোকের কাজ করে দিয়ে আশা করে পাবে অনেক, সেও তেমনি তখন থেকে মস্ত আশা মনে মনে পুষতে লাগলো। তার একবারও মনে হলো না, শ্রমের ঠিক দাম বড়লোকেরা কোনদিনই দেয় না। সে অনেক পাবে এই আশায় সেই অবস্থায়ও খুশী হয়ে ভাবতে লাগলো, জিনিসটি কেমন দেখতে হবে। বাক্সটির মধ্যে হুজুর চুরুট রাখবেন। যে-সে চুরুট নয়, এক একটা চুরুটের দামই পাঁচ টাকা—তার দুদিনের রোজ। কাজেই বাক্সটি সেই মতোই হওয়া চাই। কিন্তু ঠিক কি রকম হ'লে শিল্পটি সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে তা সে ধারণা করতে পারলে না।,

বুড়ো কিন্তু সেদিন দানিলাকে সব কথা বললে। আরও বললে, 'তুই কিছু কিছু কাজ কর্।'

দানিলা বললে, 'বেশ। তুমিও বেশি খেটো না।'

বুড়ো বললে, 'না খাটলে হুজুরের কাজটা হবে কেমন করে শুনি?'

দানিলা কোন উত্তর দিলে না, বাঁশিটি নিয়ে বনের দিকে চলে গেল।

বুড়ো অনেক খুঁজে একখানি পাথর জোগাড় করে আনলো। সেই পাথরখানি কেটে বাক্সটি তৈরি হবে। কিন্তু জিনিসটি কেমন হবে তখনও সে বুঝতে পারলে না। শেষে তার মাথায় জিনিসটির একটি ছবি এল। অমনি সে তরুণের মতো উৎসাহে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে কাজে বসলো।

ওদিকে দানিলা বনে বাঁশি বাজাচ্চে। সেই সুরে তার মনের কথা সারা বনে ছড়িয়ে পড়চে, বাতাসে উড়ে যাচ্চে। বনদেবী তার কাছে একখানি পাথরে শুয়ে শুনচেন আর খুশি হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকাচ্চেন। তাঁর গায়ে ঝলমলে পোশাক, মাথায় ঝক্‌ঝকে মুকুট, হাতে একটি কচি ডাল, ডালের আগায় দু'টি কচি পাতা।

কিন্তু দানিলার সেদিন আর বাঁশি বাজাতে ভাল লাগলো না। সে তো কতদিন বাঁশি বাজিয়ে গেল। যা সে চায় তা-তো পেল না। সে ঘরে ফিরে এল। দেখলে, তার বাবা একমনে কাজ করচে। সেও তার বাবার অন্য কাজ শেষ করতে বসলো। তাকে বেশি ভাবতে হয় না, চেষ্টাও করতে হয় না, তার হাতে কঠিন পাথর মোমের মতো হ'য়ে যায়। তাকে কাজ করতে দেখে বুড়ো মনে মনে ভারী খুশী হলো। কিন্তু মুখে কিছু বললে না।

"তারপর থেকে সে রোজ কিছু কিছু কাজ করে, তার বাবার কাজ দেখে, আবার বনে যায়, মাঠে যায়। কিন্তু বুড়োর হাত তেমন চলে না। তার মনে হয়, তার শক্তিতে যে কাজ কুলোয় না সেই কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েচে। কাজ করতে করতে এক একদিন রাত প্রায় ভোর হ'য়ে আসে। এক এক সময় তার মনে হয়, সে কাজ করতে করতে কোনদিন হঠাৎ টুলের ওপরেই মরে যাবে। এক এক রাতে কাজ করতে করতে সে টেবিলে মাথা রেখে টুলে বসেই ঘুমিয়ে পড়ে। তবুও তার কাজটি এগোয় না। তার মাথার কাছে মোমবাতিটি জ্বলে জ্বলে এক সময়ে নিঃশেষ হ'য়ে যায়।

"ওদিকে জমিদার মশাই অধীর হ'য়ে উঠলেন। অজ পাড়াগাঁ। এখানে না আছে বড় রাস্তা, না চলে গাড়ি। শহুরে জীবনের কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। সব কেমন নিঝুম, ঘুমন্ত, ফাঁকা ফাঁকা, এমন একটিও ভদ্রলোক পাওয়া যায় না যাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করা চলে। এখানে সময়ের দাম নেই, ভদ্রতার চিহ্নমাত্র নেই। এখানকার সব বিশ্রী। হোক্ না তাঁর জমিদারি, এমন জায়গায় কোন ভদ্রলোক দু' ঘন্টার বেশী থাকতে পারে না। তিনি নিতান্ত কাজের খাতিরেই একমাস রয়ে গেচেন

আর থাকতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী তো একেবারে অস্থির হ'য়ে পড়েচেন। হুজুর গ্রাম ছেড়ে যে শহরে কোথাও বেড়াতে যাবেন তারও ভরসা হয় না। বুড়োটা তখন হয়তো কাজে ঢিলা দেবে। সে আবার আর এক ফ্যাসাদ। তার জন্যে ওকে মার-ধোর করলেই যে অবস্থার উন্নতি হবে তাও নয়। যে-ঘোড়া চলতে নারাজ তাকে পিটুলে মনের ঝাল মিটতে পারে বটে, কিন্তু পশুটিকে এক পাও নড়ানো যাবে না। মারের চোটে তার না চলবার জেদ যাবে বেড়ে, হয়তো বা সে মরেও যেতে পারে। তবে টানা-হেঁচড়া করা দরকার, ভয়ও দেখাতে হবে, দরকার হ'লে দু'চার ঘা....!

"হুজুর তাই একদিন একজন জবরদস্ত পেয়াদাকে পাঠালেন বুড়োর খবর নিতে।

"বিকেলের দিকে চাবুক হাতে পেয়াদা এল। কিন্তু সে বুড়োর ঘরে ঢুকবে কি? দোর গোড়ায় বসেছিল এক জোড়া বাঘা কুকুর। কুকুর দু'টি দানিলার বন্ধু। ও তাদের পথ থেকে নিয়ে এসে দোর গোড়ায় বাসা করে দিয়েচে। সেই থেকে কুকুর দু'টি সেখানেই থাকে। বুড়োর ঘরে চৌকি দেবার মতো কোন জিনিস নেই। তাই তারা দরজা আগলায়।

"পেয়াদা চাবুক হাতে বুক ফুলিয়ে ভেতরে ঢুকতে যেতেই কুকুর দুটো দাঁত বার করে ডাকতে ডাকতে এল তেড়ে। কিন্তু সে জমিদারের পেয়াদা, অনেককে শায়েস্তা করেচে, কুকুর দেখে ভয় পাবে কেন? আর, পেলেই বা চলবে কেন? তাও আবার এক গরিব প্রজার ভাঙা ঘর আগলায় যে কুকুর সেই কুকুরকে। সে ভীষণ রাগে চাবুক চালাতে লাগলো। তাতে কুকুর দু'টো গেল আরও ক্ষেপে। তারাও জোরে ডাকতে লাগলো। তাদের মূর্তিও হ'য়ে উঠলো ভয়ঙ্কর। পেয়াদাকে কামড়ায় আর কি! কিন্তু সে কৌশলে তাদের মুখ এড়িয়ে দরজায় ঢুকেই চাবুক চালাতে চালাতে পিছু হটতে হটতে একেবারে ঘরের ভেতর যেখানে বুড়ো বসে কাজ করছিল সেখানে এসেই হাঁক দিলে, 'ও কুকুর দু'টো কার রে বুড়ো?'

"বুড়ো একমনে কাজ করছিল, বললে, জানি না হুজুর। পথের কুকুর হবে।'

"পেয়াদা বললে, 'পথের কুকুর তো তোর দরজায় থাকে কেন?'

"বুড়ো বিড় বিড় করে কি একটা বললে।

"পেয়াদা ধমক দিয়ে বললে, 'হুজুরের কাজ শেষ করেচিস্?'

"বুড়ো বললে, 'কাজটি তো সামান্য নয়। আমি বড্ড বুড়ো হ'য়ে গেচি। চোখে ভাল দেখতে পাই না; হাত চলে না। তবুও দিনরাত খাটচি—'

"পেয়াদা টেবিলের দিকে তাকিয়ে বললে, 'যা দেখচি তাতে তো মনে হ'চ্চে সারা জীবনেও তুই কাজটি শেষ করতে পারবি না। তুই কি চাস্ হুজুর এখানে থেকে পচে মরুন, অ্যাঁ?'

"এমন সময় দানিলা ঘরে ঢুকলো। তার হাতে একটি বাঁশের খাঁচা। খাঁচায় একটি হলদে রঙের বুনোপাখি। সে পেয়াদাকে দেখেই খাঁচাটি লুকোবার চেষ্টা করলে কিন্তু পেয়াদার চোখ এড়ালো না। সে বললে, 'কি? বুড়ো, তোর এত বড় ছেলে কাজ না করে পাখি ধরে বেড়ায়? আমি হ'লে ওর পিঠের চামড়া তুলে দিতাম!' ব'লে হাতের চাবুকে ঝাঁকি দিলে।

"দানিলা তাড়াতাড়ি খাঁচাটা তাকের ওপর তুলে তার বাবার কাছে এগিয়ে এল।

পেয়াদা বললে, "আচ্ছা, আমি গিয়ে হুজুরকে সব কথা জানাচ্চি। দেখিস্ তোর কি হাল করে ছাড়েন।"

"শুনে বুড়ো ভয় পেয়ে গেল। দানিলা স্থিরদৃষ্টিতে পেয়াদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আর, ওদিকে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখিটি বেরিয়ে এসে জানালা দিয়ে মুক্ত আকাশে গেল উড়ে।

"পেয়াদা হাতের চাবুক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বেরিয়ে যেতেই দানিলা বললে, 'বাবা, তুমি বিশ্রাম করগে। ও কাজ আমিই করবো।'

"বুড়ো ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিছানার দিকে এগিয়ে চললো। সে আজ যেমন ক্লান্ত তেমনি নিশ্চিন্ত আর সুখী। তার ছেলে তার কাজের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েচে!

॥ সাত ॥

'দানিলা হাতে কাজ করে আর গুন গুন সুরে গান গায়। বড় করুণ, বড় মিঠে সুর।

"সে আর রাখালি করে না কিন্তু কাজ করতে করতে ক্লান্ত হলেই বাঁশিটি নিয়ে বনে চলে যায়। সেখানে কাটিয়া আসে।

"এমন করে দিন কাটে। বুড়ো ছোটখাটো কাজ করে, মাঝে

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের কাজ দেখে আর মনে মনে তারিফ করে বলে—ওর মতো কারিগর এ তল্লাটে হবে না।

"তবুও দানিলা মনে মনে তৃপ্ত হয় না। সে যা করতে চায়, তা তো এ নয়।

"তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কাটিয়া কখনও কখনও জিগ্যেস করে, 'দানিলা, তুমি কি ভাবচো?'

"দানিলা বলে, 'এই বনে আমি যেন কার কথা শুনতে পাই। কে যেন আমায় ডেকে বলে, দানিলা, তুমি যে শিল্প গড়তে চাও তোমার সে শিল্প কোথায়? কিন্তু সে যে কি তা-তো আমিই জানি না।'

এদিকে দানিলার ধারালো ছেনির মুখে রামধনু রঙের সেই পাথরের রূপ ফুটতে লাগলো। শেষে তা থেকে বার হলো এক অতুলনীয় শিল্প—একটি বাক্স। বাক্সটির ঢাকনির ওপর একটি কালো রঙের সরীসৃপ! তার চোখ দু'টি আধেক বোজা, যেন সে পাথরের ওপর শুয়ে ভাবচে, যেন সে তন্দ্রায় নতুন বনের স্বপ্ন দেখচে, যেন সে বনের নিঝুমতায় গেচে ডুবে।

"ওদিকে কর্তা একদিন গিন্নীর কথায় এমন অধীর হ'য়ে উঠলেন যে, ঠিক করে বসলেন, নিজেই বুড়োর বাড়ি খোঁজ নিতে যাবেন। আর তর সয় না। কাজটি যদি না হয়ে থাকে তাহ'লে!....

"কর্তার চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠলো।

"গিন্নী কর্তাকে ধরে বসলেন, 'আমিও যাবো।'

"কর্তা বললেন, 'চল।'

"দু'জনেই পরিপাটি করে সাজগোজ করলেন। কর্তাকে জামা পরিয়ে দিলে চাকর। তারপর গায়ে দামী খুশবু মেখে দু'জনে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল দু-ঘোড়ার ছিমছাম ফিটন। দু'জনে তাতে চড়ে চললেন বুড়ো কারিগরের বাড়ি।"

এই পর্যন্ত বলে বুড়ো চৌকিদার থামলো।

পুব-আকাশে তখন গোল হয়ে সন্ধ্যার চাঁদ উঠচে। বুড়ো সেইদিকে তাকিয়ে রইলো। চারধারে, মাঠের ঘাসে ঘাসে, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়, গাছের মাথায়, পাতায় পাতায় জ্যোৎস্না চিক্ চিক্ করচে। সব নিঝুম! একটা ফড়িং ঘাসের বনে ফর্‌র্ করে উঠলো, সামনে আগুনের কুণ্ডে একটি ছোট ডাল ফট্ করে ফেটে তাই থেকে একটু আগুনের শিখা বেরিয়ে পড়লো যেন সে ধারালো টকটকে লাল জিভ দিয়ে জ্যোৎস্নার স্বাদ পেতে চায়।

ছেলেমেয়েরা অধীর কণ্ঠে বলে উঠলো, "ও ঠাকুর্দা ! থামলে কেন ? তারপর—তারপর বলো।"

চৌকিদার আবার বলতে আরম্ভ করলে—"তারপর গাড়ি ছুটলো গাঁয়ের ছায়া-ঢাকা কাঁচা পথ দিয়ে। বুড়ো থাকতো গাঁয়ের শেষ দিকে কারিগর পাড়ার দক্ষিণে মাঠের ধারে। সেখান থেকে গাঁয়ের বাইরে পাহাড়ের সারি দেখা যেত পরিষ্কার। গাড়ি চলচে। গাঁয়ের লোক পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্চে, গাড়িকে সেলাম করচে, কেউ কেউ হুজুরের ঘোড়া দু'টোকেও সেলাম করচে। ভয়ে ভয়ে গাড়ির ভেতরটা লক্ষ্য করচে।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো বুড়োর বাড়ির দরজায়। কর্তা নামলেন, গিন্নী নামলেন। কর্তা সোনা বাঁধানো ছড়ি হাতে যেমনি দরজায় ঢুকতে যাবেন অমনি সেই কুকুর দু'টো দাঁত বার করে তাঁকে তেড়ে এল। হুজুর ছড়ি উঁচিয়ে তাদের রুখতে গেলেন। কিন্তু তারা গ্রাহ্যই করলে না। পেয়াদা ছুটে এসে কর্তাকে আগলে দাঁড়ালো। তিনি সেই সুযোগে ভিতরে ঢুকে পড়লেন ; গিন্নীও ঢুকলেন তাঁর পিছন পিছন। কিন্তু হাত দুই গিয়েই তিনি নাকে দিলেন খুশবু মাখা রুমাল চাপা। একটা বিশ্রী নোংরা ভাপ্‌সা টোকো গন্ধে তাঁর দম বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো। এমন জায়গায় কোন ভদ্রলোক আসে ? যাহোক করে নাক-মুখ সিঁটকে দু'জনে একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে হুজুর হাঁক দিলেন, 'এই !'

"বুড়ো চম্‌কে উঠলো। দানিলা টেবিল থেকে সরে দাঁড়ালো। কর্তা-গিন্নীর পিছনে এসে দাঁড়ালো চাবুক হাতে পেয়াদা।

"কর্তা চড়া গলায় বললেন, 'তোকে যা গড়তে দিয়েছিলাম সেটা কোথায় ? অ্যাঁ ?'

"বুড়ো ভয়ে ভয়ে টেবিলের ওপরটা দেখিয়ে দিলে। কর্তা, গিন্নী, পেয়াদা অবাক হ'য়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন, চোখ ফেরাতে পারলেন না।

"একটু পরে কর্তা এগিয়ে গিয়ে বাক্সটি হাতে তুলে নিলেন। বার-কোষের মতো তাঁর মুখখানা হাসিতে খুশিতে আরও চওড়া, কুৎকুতে চোখ দু'টোও আরও কুৎকুতে হয়ে গেল। হুজুর হাসচেন ! বাক্সটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, 'হ্যাঁ, তারিফ করবার মতো জিনিস বটে ! কে তৈরি করেছে, সত্যি করে বল্। তুই ?'

"বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

"কর্তা ধমক দিলেন, 'বল্!'

"পেয়াদা হুঙ্কার দিলে, 'বল্।'

"বুড়ো দানিলাকে দেখিয়ে বললে, 'এ তৈরী করেচে।'

"কর্তা দানিলার দিকে তাকিয়ে ভারিক্কী চালে বললেন, 'বটে! বটে! ও কে? তোর ছেলে? আচ্ছা, এই নে সন্দেশ কিনে খাস্?' বলে একটি টাকা বার করে দানিলার হাতে দিয়ে বাক্সটি বগলে চেপে হাসতে হাসতে দরজার দিকে এগিয়ে চললেন।

"গিন্নী অমনি দানিলার দিকে ফিরে আহ্লাদীর মতো বললেন, 'দেখ, তুমি আমার জন্যে একটি পাথরের ফুল তৈরী করে দিও। আমি শহর থেকে ফিরে এসে জিনিসটি চাই। যেন ভুল না হয়।'

"দানিলা মুখে কিছু না বলে, কেবল মাথা নাড়লে।

"কর্তা-গিন্নী চলে গেলেন। বুড়ো একটি নিঃশ্বাস ফেললে। তার আর তার ছেলের এতদিনের পরিশ্রম আর ভাবনার আজ শেষ হলো আর পুরস্কার মিললো মাত্র একটি টাকা!

॥ আট ॥

"দিন যায়।

"দানিলা ভাল কারিগর, তার এই সুখ্যাতি চারধারে ছড়িয়ে পড়লো! এত অল্পবয়সে এতখানি সুখ্যাতি লাভ সহজ কথা নয়।

"তার বুড়ো বাবার বুক ছাপিয়ে ওঠে আনন্দে! সে ছেলের মুখের দিকে তাকায় আর গর্বে তার বুক ভরে ওঠে। সে হঠাৎ একদিন যেন দেখতে পেল, দানিলার বয়স কিছু বেড়েচে। সে মাথায় তার চেয়েও লম্বা হয়ে উঠেচে। তার বুকের ছাতিখানি বেশ চওড়া হয়েচে, হাত দু'খানিও লম্বা আর পুষ্ট। তার চাহনিতে মনে হয় ও যেন নতুন জগতের খোঁজ পেয়েচে; মাথার চুলগুলিও আগের মতো করে আঁচড়ায় না। ওর কৈশোর কেটে গেল।

"দানিলা কাজ করে আর যে শিল্প কেউ কোন দিন গড়ে নি তাই গড়বার স্বপ্ন দেখে। সে ভাবে জমিদার-গিন্নীর পাথরের ফুলের কথা।

"একদিন সে আর কাটিয়া বনে সেই ছোট হ্রদটির ধারে গাছের ছায়ায় বসে।

"কাটিয়া জিগোস করলে, 'তুমি পাথরের ফুল তৈরীর ফরমাস পেয়েচ?"

"দানিলা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ফরমাস নয় কাটিয়া, হুকুম !'

"কাটিয়া তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সেখান থেকে উঠে গেল ! বসন্ত এসেচে। বনের গাছে গাছে অজস্র ফুল ফুটেচে। তাদের সুবাস বাতাস যেন আর বইতে পারে না। তাই চলতে চলতে যেখানে-সেখানে টলে পড়চে। মৌমাছিদের গুনগুনানির অন্ত নেই। তারা ফুলে ফুলে মধুপান করচে আর রেণুতে গড়াগড়ি দিচ্চে; পাখিরা সব বাসা তৈরির কাজে ব্যস্ত। কাটিয়া একটি গাছ থেকে তার প্রিয় ফুলটিকে পাতাসমেত ভেঙে এনে গন্ধ শুঁকে দানিলার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, 'তবে সেই ফুলটিকেও এইটির মতো করে গড়ে দিও।'

"দানিলা ফুলটি তার হাত থেকে নিয়ে গন্ধ শুঁকে বললে, 'তাই হবে।' তারপর সে ফুলটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো।

"তাদের দু'জনের মধ্যে ভাব আগের চেয়ে আরও জমে উঠেচে। কাটিয়াও এখন বেশ ডাগর। তারও দেহে স্বাস্থ্য উপ্‌চে পড়চে।

"শোনা যায়, তাদের দু'জনের সঙ্গে বিয়ে হবে। দানিলার বাবা আর কাটিয়ার বাবার এতে খুব মত ! দানিলা আর কাটিয়াও ঠিক করে রেখেচে তারা আর কাউকে বিয়ে করবে না। পল্লীর সকলে একথা জানে। তারাও ভারী খুশি। সবাই বলে, 'ওদের দু'টিকে মানাবে চমৎকার !'

"কিছুদিন পরে কাটিয়ার বাবা আর দানিলার বাবা ছেলে-মেয়ের বিয়ের কথা পাকাপাকি করবার আয়োজন করলে। একদিন কাটিয়ার বাবা গাঁয়ের সব মাতব্বর কারিগর আর তার আত্মীয়-কুটুমদের তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে এল। সে অতিথিদের তার বাড়িতে যথাসাধ্য আদর-আপ্যায়ন আর ভোজের ব্যবস্থা করলে।

"সন্ধ্যার পর সেদিন অতিথিরা তার বাড়িতে আসতে লাগলো। গাঁয়ের সব চেয়ে বুড়ো কারিগরও এলেন। সকলের তিনি 'ঠাকুরদা'। তাঁর চেয়ে কম বয়সের বুড়ো কারিগরেরাও তাঁকে বলে 'ঠাকুরদা' ! তিনি এখন কাজ-কর্ম করেন না, করতেও পারেন না। তাঁকে সকলেই খাতির করে, সকলেই তাঁর কথা শোনে।

"লম্বা টেবিলের দু'ধারে সবাই বসলেন। টেবিলের ওপর সাজানো নানা রকমের খাবার, ফল, কেক, রুটি, মাংস, পানীয়।

"দানিলাও তার বাবার সঙ্গে এসেছিল। সকলেই দানিলাকে বাহবা দিতে লাগলো। বললে, 'দানিলা, তুমি আমাদের গাঁয়ের নাম রাখবে। বেশ, বাবা বেশ !'

"পাঁচটা কারিগর আমোদ-আহ্লাদ করবার জন্য একত্র হ'লে যেমন হয় তেমনই হ'তে লাগলো। কথা আলোচনা ও হট্টগোল শুরু হলো। এরই মধ্যে বিয়ের কথাও পাকাপাকি হ'য়ে গেল।

"কথায় কথায় পাথরের শিল্প গড়ার কথা উঠলো।

কাটিয়ার বাবা সেই বুড়ো কারিগরটিকে জিগ্যেস করলে, "ঠাকুরদা, শুনেচি পাথরের ফুল ফোটে। এ কথা কি সত্যি ?'

পাথরের ফুলের নাম শুনে দানিলা উঠে গিয়ে ঠাকুরদার কাছে বসলো।

ঠাকুরদা বললেন, 'সত্যি—চন্দ্র-সূর্যের মতো সত্যি।'

দানিলা জিগ্যেস করলে, 'এ ফুল ফোটে কোথায় ?'

ঠাকুরদা বললেন, 'পাহাড়ে।'

দানিলার বাবা জিগ্যেস করলে, 'এ ফুলের নামই আমরা শুনেচি। আপনি দেখেচেন ? কেমন দেখতে' ?,

ঠাকুরদা বললেন, 'আমি ? এ ফুল যে দেখেচে সে আর ফিরে আসেনি। কাজে কাজেই কে বলবে কেমন সে ফুল। তবে শুনেচি, কেউ কেউ দেখেছে। আমরা যে-সব পাথরের শিল্প গড়ি তার কাছে সে-সব কিছুই না।'

"কাটিয়ার মামা বললে, 'ঠাকুরদা, এ একদম বাজে গল্প!'

ঠাকুরদার শাদা লম্বা দাড়ি ঝলমল করে উঠলো, চোখে কেমন এক রকম আলো দেখা দিলে, বললেন, 'একেবারে সত্যি।'

"দানিলা বুড়োর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

"ঘরের বাইরে একটি ছোট বারান্দা। তার সামনে বন ও পাহাড়। জ্যোৎস্না আর গাছপালার ছায়া সেখানে ঘুমিয়ে আছে। দানিলা বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তার মনে প্রতিজ্ঞা 'আমি পাথরের ফুল দেখবো। ঠিক তেমনি একটি ফুল তৈরী করবো।'

"সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো পাহাড়ের গায়ে যেখানে বনের ডালে পাতায় জ্যোৎস্না ঝক্ ঝক্ করচে। তার পাশে এসে বসলো কাটিয়া। সে আস্তে আস্তে ডাকলো, 'দানিলা।'

কিন্তু দানিলা শুনতে পেল না। সে দেখলো, তার সামনে চাঁদের আলো যেন আরও ছড়িয়ে গিয়ে সব ছায়া মুছে দিলে। সেই আলোয় পাথরের ভেতর থেকে ফুটে উঠতে লাগলো রাশি রাশি ফুল। তেমন সুন্দর ফুল সে কখন দেখেনি। দানিলা ভাবে ভোর হ'য়ে গেল। দেখলো

সেই ফুলের বনে বনদেবী দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসচেন। তিনি বললেন: 'পাথরের ফুল দেখবে দানিলা? আমার সঙ্গে এস। আমি তোমায় পাথরের ফুল দেখাবো। এস।'

"দানিলা তাড়াতাড়ি নেমে গেল। যেখানে ফুলগুলি ফুটে উঠেছিল, বনদেবী যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে গেল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। সব মিলিয়ে গেল। আবার সেই ছায়া আর জ্যোৎস্না।

"সে ফিরে এল। কাটিয়া তার ভাব দেখে মনে বড় দুঃখ পেল।

"সে জিগ্যেস করলে, 'কি ভাবচো দানিলা? কি হয়েচে তোমার?'

"দানিলা কোন উত্তর দিলে না। যে ভাবতে লাগলো, পাথরের ফুলের কথা।

"কাটিয়া তার মনের কথা না বুঝে আরও দুঃখ বোধ করতে লাগলো।

"সে বললে, 'দানিলা, তুমি কি তবে চাও না যে আমাদের বিয়ে হয়?'

"দানিলা তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে, 'নিশ্চয়ই চাই। তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না।'

"এমন সময় অন্দর থেকে একজন এসে কাটিয়াকে ডেকে নিয়ে গেল। দানিলাও উঠে গেল সকলে যেখানে হট্টগোল করছিল সেখানে। তার চোখে সেই দৃশ্য ভাসচে, মনে বনদেবীর কথাগুলো বাজচে—'আমি তোমায় পাথরের ফুল দেখাবো দানিলা। এস।'

॥ নয় ॥

"দানিলা বাড়ি ফিরে এল। কিন্তু সে আজ অবধি যত শিল্প গড়েছিল সবই তার মনে হ'তে লাগলো কিছুই না। এ যেন ছেলেখেলা হ'য়েচে। সত্যিকারের শিল্প এ নয়।

"সে কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়লো। তার বাবা তা লক্ষ্য করলো। বুড়ো মনে করলো, ছেলে বোধ হয় বিয়ের জন্য মনমরা হ'য়েচে।

"একদিন সে কাটিয়ার কাছে মনের কথাটি বলে ফেলেছিল। কাজেই এক কাটিয়া ছাড়া আর কেউ সে কথা জানতো না। বুড়ো তাই তার মনের কথা বুঝতে পারলো না।

"দানিলা বসে বসে জমিদার-গিন্নীর জন্য পাথরের ফুলটি তৈরী করে। কাটিয়া তাকে যে ফুলটি দিয়েছিল, শিল্পটি হ'য়ে উঠেচে ঠিক সেই ফুলটির

মতো। দেখলে চমক লাগে। মনে হয় যেন একটি জীবন্ত ফুল। দানিলা সেদিন আবার তার বাঁশিটি নিয়ে গেল বনে। তখন গাছের পাতায়, জলে, মাঠে মাঠে, বাতাসে, আকাশে, সোনালী রোদে, শিরশিরে বাতাসে, শাদা মেঘের ভেলায় শরতের খবর এসেচে। বেলা দ্বিপ্রহর। দানিলা এক মনে বাঁশি বাজাতে লাগলো। বনদেবী ধীরে ধীরে এসে একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। দানিলা বাঁশী থামাতেই তিনি হেসে বললেন: 'আমি তোমাকে পাথরের ফুল দেখাবো দানিলা। এস।'

"দানিলা কথাগুলি শুনতে পেল, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখতে পেল না। সে পাথরের ফুলের জন্য অস্থির হ'য়ে উঠলো। বাড়ি ফিরে এসে হাতুড়ি দিয়ে তার তৈরী ফুলটি ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়িয়ে ফেললো!'

এদিকে শরৎ এল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি ঝরে, কখনো আকাশ মেঘে মেঘে থম্‌থমে হ'য়ে থাকে, কখনো রোদ ওঠে। মাঠে মাঠে, বনে বনে আলো-ছায়ার খেলা চলে। রাতের বেলা কনকনে বাতাস হাহাকার করে ছুটে বেড়ায়। গাছের পাতা হলদে হ'য়ে আসচে; শীতের আগেই শুকিয়ে ডাল থেকে খসে পড়বে। পাতাহীন গাছগুলো দাঁড়িয়ে থাকবে কঙ্কালের মতো। তার শাখায় শাখায় পড়বে তুষার—কখনো তুলোর মতো, কখনো ময়দার গুঁড়োর মতো। তুষার-প্রান্তরে ও তুষার-ঢাকা বন-শাখায় শীতের বাতাস হাহাকার করে ছুটবে। দূর থেকে ভেসে আসবে ক্ষুধার্ত নেকড়েপালের ক্ষুধার জ্বালায় ভয়ঙ্কর কান্না। কখনো কখনো ঘরের পাশে এসেও তারা হানা দেবে।

"দানিলা আর কাটিয়ার বিয়ের দিনটিও আসতে লাগলো এগিয়ে। বর-কনের বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। শরৎ যখন শেষ হলো সেই সময় একদিন বরযাত্রীদের নিয়ে কয়েকখানি যানে চড়ে বর চললো কনের বাড়ি বিয়ে করতে। তখন তুষার পড়া শুরু হয়েচে। পথে পথে তুষার, বাড়ির চালে, গাছের পাতায় তুষার—শাদা। চারধার শাদা।

ওদিকে কনেকে সকলে তখন সাজাচ্চে। কাটিয়া খুব খুশী। আনন্দে সে হাসি চাপতে পারচে না। তার সুন্দর ঠোঁট দু'খানিতে থেকে থেকে হাসি ফুটে উঠেচে। নানা বয়সের মেয়ে এসেচে। সবাই এক সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করচে। প্রত্যেকেই নিজেকে খুব দরকারী করে তুলতে ব্যস্ত। তাতে হট্টগোলের সৃষ্টি হ'চ্চে। হাসি, কথা, জিনিসপত্র নাড়া-চাড়া আর চলা-ফেরার শব্দে ঘর মুখরিত। সবাই পরেচে রঙচঙে সুন্দর পোশাক, গলায় দিয়েচে নকল মোতির মালা, কানে ঝুলিয়েছে দুল।

'কনের সাজ-গোজ শেষ হয়েছে এমন সময় বাইরে রব উঠলো, 'বর এসেচে।' অমনি মেয়েরা সকলে কনেকে আড়ালে নিয়ে গেল। একটু পরেই সেই ঘরে ঢুকলো বর, বরযাত্রী, বরের বাবা। দানিলাকে বরের বেশে মানিয়েচে চমৎকার।

তারপরই কনের বাবার সঙ্গে বরের বাবার কথাবার্তা শুরু হলো। একটু পরেই কনেকে আনা হলো সেখানে! কাটিয়া তো লজ্জায় জড়-সড়! শেষে দু'জনের বিয়ে হ'য়ে গেল।

"বর-কনে পাশাপাশি বসেচে। কনে বরের দিকে তাকায়, বর কনের দিকে তাকায়। দু'জনে ভারী খুশি।

"তাদের সামনে নাচ শুরু হলো। বুড়ো-বুড়ীরাও নাচতে লাগলো। সব চেয়ে বেশি নাচলো কাটিয়ার দিদিমা আর দাদামশায়! সারা ঘরে নাচ-গানের যেন বান ছুটে এল। বর-কনের কথা কারোরই মনে রইলো না। কাটিয়া এক দৃষ্টিতে নাচ দেখচে। দানিলাও চুপ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় বনদেবীর কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এল :—'দানিলা, আজ রাতেই ভাল সময়! তুমি যদি পাথরের ফুল দেখতে চাও তাহ'লে চন্দ্রমৌলী পাহাড়ে চল। আমি তোমার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।'

"নাচ-গান তখন বেশ জমে উঠেচে। বনদেবীর কণ্ঠস্বর কারো কারো কানে পৌঁছলো। কিন্তু কেউ তাতে মন দিলে না। কাটিয়াও যেন তা শুনতে পেল, কিন্তু বুঝতে পারলে না। যখন সে সহাস্যে দানিলার মুখের দিকে আবার তাকাতে যাবে, তখন দেখলে তার পাশের আসন শূন্য—দানিলা নেই! সে এদিক ওদিক তাকালো। কোথাও তাকে দেখতে পেলনা। তখন সকলেরই সেদিকে চোখ পড়লো। সবাই দেখলো কনের পাশে বর নেই!

"নাচ-গান গেল থেমে। বাসরে দুঃখের ছায়া এল নেমে। আলো হলো ম্লান, হাসি গেল মিলিয়ে, চোখে এল জল।

চারধারে খোঁজা শুরু হলো। কিন্তু দানিলাকে আর পাওয়া গেল না।"

॥ দশ ॥

যারা গল্প শুনছিল সেই ছেলেমেয়েরা ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করলে, "দানিলা কোথায় গেল ঠাকুরদা?"

বুড়ো চৌকিদার বললে, "দানিলা চললো চন্দ্রমৌলী পাহাড়ে। সে

পাহাড় সেখান থেকে অনেক—দূর ! তার মাথায় বরফ চাঁদের মতো ঝক্ ঝক্ করে।

"সে রাতে চাঁদের আলোয় পৃথিবীকে দিনের মতো মনে হচ্ছিল। দানিলা আলোয় আলোয় চললো। সে বন পার হলো, মাঠ পার হলো, জলা পার হলো, পার হলো উপত্যকা। তার মনে হ'তে লাগলো সব যেন তাকে পথ ছেড়ে দিচ্চে। সামনে পাহাড়ের সারি ক্রমে স্পষ্ট হ'য়ে উঠচে। এমনি করে চ'লে চ'লে সে তিনদিন তিনরাত পরে গিয়ে পৌঁছলো চন্দ্রমৌলী পাহাড়ের কাছে। সেখান থেকে পাহাড়ে পৌঁছতে আর মোটে একবেলার পথ, এমন সময় বরফ পড়া শুরু হলো। দানিলার গায়ে পাতলা পোশাক, বরের পোশাক। কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই নেই। সে সমানে চলেচে; তার কাঁধে, মাথায় বরফ জমচে। পথে, পাথরে, গাছে বরফ। সে তার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সামনে পাহাড়ের যে গুহাটি দেখতে পেল তার ভেতর ঢুকে পড়লো।

অন্ধকার গুহার একেবারে ভেতরের দিকে একটু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছিল। দানিলা সেই আলোর রেখার দিকে চলতে লাগলো। এমন সময় সে শুনতে পেল কে যেন বললে, 'এস দানিলা।'

আলোর রেখাটি ক্রমে বড় হ'তে হ'তে গুহা শেষ হ'য়ে গেল। দানিলা অবাক হ'য়ে দেখলো সেখানে একখানি স্ফটিক পাথরে হেলান দিয়ে বনদেবী তার দিকে তাকিয়ে হাসচেন। তারপর একটি ছোট কচি ডাল দুলিয়ে তাকে বললেন, 'এস।'

"দানিলা তাঁর পেছন পেছন চলতে লাগলো। তারা কখনো চলে স্ফটিকের গুহার ভেতর দিয়ে, কখনো চলে সোনালী-পাথরের পাশ দিয়ে, কখনো চলে রুপালী ঝর্নার ধারে ধারে। বনদেবী চলতে চলতে এক একবার অদৃশ্য হ'য়ে যান, আবার আসেন নতুন সাজে। দানিলা কখনো চলে বনদেবীর পেছন পেছন। তার চোখ দু'টি কেবলই খুঁজে বেড়াচ্চে, পাথরের ফুল। কিন্তু কোথাও তার দেখা পায় না। তার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, ভয় নেই, হতাশা নেই। সে খুঁজে বেড়াচ্চে, পাথরের ফুল। কোথায় ফুটেচে সেই অপরূপ ফুলটি ?

সেই সুন্দর, দুর্গম পথে চলতে তার এক একবার মনে হয়, এই বুঝি ফুলটিকে দেখতে পাবে। কিন্তু দেখতে পায় না। তার বদলে দেখে এমন সুন্দর দৃশ্য যা সে জীবনে কখনো দেখেনি। এমনি করে কয়েকটি দিন কেটে গেল।

"শেষে বনদেবী একদিন চোখ ঝলসানো সাজে তার সামনে এসে বললেন, 'কেন মিছে ঘুরে বেড়াচ্চো দানিলা ? পাথরের ফুল দিয়ে কি হবে ? আমায় বিয়ে কর। এখানে অফুরন্ত ধনদৌলৎ আছে। আমরা দু'জনে এখানে সুখে থাকবো। আমি কি কাটিয়ার চেয়ে সুন্দরী নই ?' বলে তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"দানিলা বললে, 'পাথরের ফুল আমি দেখবোই। তাতে আমার জীবন যায় যাক। আমি এসেচি শিল্পের জন্যে। আর, কাটিয়া ছাড়া কোন মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে চাই না। তাকে আমি ছেড়ে এসেচি। সে বড় দুঃখে দিন কাটাচ্চে।'

"বনদেবী বললেন, 'কিন্তু তুমি তো আর ফিরে যেতে পারবে না।'

"দানিলা বললে, 'আমি শিল্পী। শিল্পের জন্যে জীবন যায় যাক।'

"বনদেবী হেসে বললেন, 'তোমার কথায়, তুমি প্রতিজ্ঞা পালনে প্রাণও পণ করেচো দেখে আমি বড় খুশি হ'য়েচি দানিলা। চল, তোমায় সেখানে নিয়ে যাই যেখানে ফুটে আছে পাথরের ফুল।'

বনদেবী চললেন তার আগে আগে। দানিলা আশায় আকুল হ'য়ে চললো তাঁর পেছন পেছন। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ আলোর ছটায় তার চোখ গেল ধেঁধে। সে দেখলো, পাথরের গায়ে সত্যিই ফুল ফুটেচে। তার মাঝে থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে আলো।

বনদেবী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তারপরই দানিলা দেখতে পেল, প্রকাণ্ড পাথরের গুহায় পাথরের মধ্য থেকে ফুটে, উঠেচে এক ফুল। তার রঙে, রূপে দানিলা মুগ্ধ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে বহুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। এমন জিনিস সে কোথাও দেখেনি, কল্পনাও করতে পারেনি। এই ফুলটি তৈরি করেচে প্রকৃতি কত দিন কত রাতের অবিরাম চেষ্টায় তা কে বলবে ? সে দু'চোখ ভরে তার রূপ দেখতে লাগলো, দেখতে লাগলো তার গড়ন। ধন্য শিল্পী!

"দানিলা ফিরে দেখে তার পাশে একখানি পাথরের ওপর রয়েচে একটি হাতুড়ি আর একখানি ছেনি। যেন বনদেবী ইঙ্গিত করচেন, 'তুমিও ঐ ফুলটির মতো একটি ফুল গড়ে তোল দানিলা।' সেও তৎক্ষণাৎ তেমনি পাথরের ফুল তৈরি শুরু করলো। বনদেবী আড়ালে দাঁড়িয়ে হাসলেন।

"এমনি ভাবে তার কাটতে লাগলো দিন।

॥ এগার ॥

"এদিকে মাসের পর মাস যায়, দানিলার কোন খবর কেউ পায় না। সকলেরই ধারণা, সে আর বেঁচে নেই।

"কাটিয়া তার বুড়ো শ্বশুরের কাছে থাকে। সংসারে সে আর তার শ্বশুর। বুড়ো যেন আরও বুড়ো হ'য়ে পড়েচে; চোখে দেখে অতি কম, কানে শোনে আরও কম, কাজও করে খুব অল্প। কাজ না করলে তারা দু'টিতে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে যে! তাই কাজ করে। আর, তার শুকনো গাল দু'খানি বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়ে। তার অমন ছেলে! সে ছেলের জুড়ি পাওয়া ভার। কোথায় গেল সে? কি তার মনে উদয় হলো?

"বুড়ো বসে বসে ভাবে ছেলের কথা। ভাবে সে ছেলেবেলায় কি করতো, কি ভালবাসতো। বুড়োর কানে বাজে ছেলের কণ্ঠস্বর, মনে ভেসে ওঠে তার সুন্দর মুখখানি, তার হাসি, তার বুদ্ধিমাখা, স্বপ্নে-ভরা চোখ দু'টি। সে কোন্‌দিন তাকে কি বলেছিল, কোনদিন তার কাছে কি আবদার করেছিল, সে স্মৃতি তার মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, সে কতদিন তাকে তাড়না, অযথা তাড়না করেছিল। সে চলে যাবে জানতে পারলে বুড়ো কি তাকে কোনদিন কিছু বলতো? বুড়ো ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার কথা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবতে পারে না।

"কাটিয়া শ্বশুরের এই ভাব দেখে আড়ালে দাঁড়িয়ে চোখের জল মোছে। তার বুক ফেটে গেলেও বুড়োর সামনে কাঁদেনা। সামনে কাঁদলে বুড়ো মানুষ আরও কাতর হ'য়ে পড়বে।

"একদিন বুড়ো কাজ করতে করতে এলিয়ে পড়লো।

"কাটিয়া তাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'বাবা, তুমি আর কাজ করো না। তোমায় আমি আর কাজ করতে দেবো না।'

"বুড়ো নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কাজ না করলে, চলবে কি করে মা?'

"কাটিয়া বললে, 'বাবা, তুমি তো দেখোনি আমিও কি রকম পাথরের কাজ শিখেছি। দেখবে? এই দেখো'—ব'লে সে খানকয়েক পাথরের ছোট ছোট রেকাবি এনে বুড়োকে দেখালো।

"বুড়ো বললে, 'বাঃ! যেমন পালিশ, তেমনি গড়ন। হুঁ। এ জিনিসের আদর আছে।'

"কাটিয়া বললে, 'এই সব আমি মেলায় গিয়ে বেচে আসবো তাতে অনেক দাম পাবো। আমাদের দু'জনের চলে যাবে। আমার কাজের ভুল হ'লে তুমি দেখিয়ে দিও বাবা।'

"বুড়ো কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কাটিয়া বুড়োর সেবা করে, পাথরের জিনিস গড়ে, রাঁধে-বাড়ে, ঘর-সংসার গুছোয়, হাট-বাজার করে আনে। বুড়ো তার দিকে তাকায় আর চোখের জল ফেলে। এক তাজা লতা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চে!

"এমনি করে দিন যায়।

একদিন বুড়ো বললে, 'মা, তুমি কেন আমার ঘরে থেকে দুঃখ পাও? তুমি বাপের ঘরে চলে যাও। মিছে আশা। দানিলা আর বেঁচে নেই। থাকলে সে এতদিনে ফিরে আসতো।'

"কাটিয়া বললে, 'তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না বাবা। দানিলা বেঁচে আছে।'

"বুড়ো বললে, 'সে আর বেঁচে নেই! শোননি, দিন কয়েক আগে নদীর জলে একটি দেহ ভেসে এসেচে? সে দানিলা ছাড়া আর কেউ নয়।'

"কাটিয়া বললে, 'ওটা একদম ভুল খবর। সে দানিলার দেহ নয়। আমি দেখেচি। দানিলা বেঁচে আছে।'

"বুড়ো আর কিছু বললে না, পথের দিকে চুপ করে তাকিয়ে রইলো।

পরদিন শহরের বাইরে মেলা বসলো। মস্ত মেলা। কত গাঁ থেকে কত জিনিষ-পত্র এল। লোকে-লোকারণ্য। মেলায় কোথাও ভানুমতীর খেলা, কোথাও গান-বাজনা, কোথাও কুস্তি হ'চ্চে। মেলায় বাঁশি বাজচে, ডুগডুগি বাজচে। চারধারে দোকান-পসার, হট্টগোল। মেলাটি থাকবে একমাস।

"কাটিয়া পাথরের রেকাবিগুলি নিয়ে গেল মেলায়। মেলায় এক জায়গায় ছিল পাথরের জিনিষপত্রের কতকগুলি দোকান। কাটিয়া একজন দোকানদারকে রেকাবিগুলো দেখাতেই সে চমকে উঠে জিগ্যেস করলে, 'কোথা থেকে হাতিয়েচো?'

"কাটিয়া তাকে ধমক দিয়ে বললে, 'এর দাম দিতে পারবে না তাই বল।'

"দোকানদার বললে, 'বটে! তোমার কাছে এ রকম রেকাবি কত আছে?'

"কাটিয়া বললে, 'যত চাও।'

দোকানদার জিগ্যেস করলে, 'কে তৈরি করেচে এগুলো ?'

কাটিয়া বললে, 'আমি।'

"দোকানদার অবাক হয়ে গেল, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলে না। রেকাবিগুলোর দাম গুণে দিয়ে বললে, 'আরও এনো।'

"কাটিয়া দাম নিয়ে খুশী হ'য়ে বাড়ি ফিরে গেল।

॥ বারো ॥

পরদিন কাটিয়া গেল সেই বনে হ্রদের ধারে যেখানে দানিলা আর সে কতদিন বসে কাটিয়েচে। সে গেল পাথর কুড়োতে।

"কাটিয়া বনে ঢুকে হ্রদের ধারে চুপ করে দাঁড়ালো। শরৎ এসে চলে গেচে, তারপর এসেচে শীত। শীতও চলে গেচে। এখন আবার সেই বসন্ত। এ বনে দানিলার বাঁশি আর শোনা যায় না। সেখান থেকে দেখা যায় দূরে, অনেক দূরে চন্দ্রমৌলী পাহাড়ের উজ্জ্বল চূড়াটি। কাটিয়া সেই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

তার মনে পড়লো দানিলা একদিন বলেছিল, ঐখানে ফোটে পাথরের ফুল। পাথরের ফুল সে দেখবেই। দানিলা কি ওর মধ্যে কোথাও ফুল খুঁজে বেড়াচ্চে ?

এদিকে বেলা পড়ে আসচে। সে রেকাবি তৈরির যোগ্য একখানি চমৎকার পাথর সামনের গাছটির গোড়া থেকে তুলে নিতেই তারই বয়সী একটি মেয়ে হঠাৎ তার সামনে এসে চোখ লাল করে বললে, 'পাথর চুরি করচিস ?'

তার কথায় কাটিয়ার মনে যেমন হলো রাগ, সে তাতে যেমন বোধ করলো অপমান, তেমনি হলো আশ্চর্য। মেয়েটিকে সে তো কোনদিন দেখেনি। ও নিশ্চয়ই এ অঞ্চলের নয়। মনে হ'চ্চে, ও খুব সুন্দরী বলে মনে দেমাক ধরে না।

কাটিয়া বললে, 'তুই কে যে বারণ করতে এসেচিস ?'

মেয়েটি বললে, 'আমি এ বনের রানী। তুই কে ?'

কাটিয়া বললে, 'যেই হই না, তোর তাতে কি ? উনি বনের রানী— কোথাকার কে তার ঠিক নেই!'

মেয়েটি ভ্রূকুটি করে এমন ভারিক্কী চালে বললে, 'আমার অনুমতি

ছাড়া এখান থেকে এক টুকরোও পাথর নিতে পারবি না।'—কাটিয়া পাথরখানি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'চাই না, তোর পাথর।'

সে রাগে, দুঃখে বাড়ি ফিরে চললো। কিন্তু আড়চোখে দেখলো মেয়েটি একটি খুব বড় গাছের গায়ে হেলান দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসচে। তার গায়ে এখন অন্য পোশাক, হাতে গাছের ছোট একটি ডাল। তার আগায় দু'টি কচি পাতা।

কাটিয়া অবাক হ'য়ে থমকে দাঁড়ালো।

মেয়েটি বললে, 'তোর দানিলাকে আমি লুকিয়ে রেখেচি। আর ছাড়বো না। তাকে আমি বিয়ে করবো। সে আছে ঐ চন্দ্রমৌলী পাহাড়ে।'

তার মুখে দানিলার কথা শুনে কাটিয়া চমকে উঠলো। মেয়েটা কে? সে তখনই ছুটলো দানিলার খোঁজে চন্দ্রমৌলী পাহাড়ে।

মেয়েটিও যেন তার মনের কথা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বললে, 'আমি ঐ পাহাড়েই যাচ্চি।'

কিন্তু সেদিকে যেতে গেলেই প্রথমে পার হ'তে হয় হাত দশেক চওড়া একটি গভীর খাদ। মেয়েটি যে গাছটির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটির গায়ে তার হাতের ছোট ডালটুকু ছোঁয়াতেই তা খাদের ওপর আড় হ'য়ে সাঁকোর মতো পড়লো। সে তার ওপর দিয়ে ছুটে খাদটি পার হ'য়ে গেল। কাটিয়াও তার পেছন পেছন খাদটি পার হ'য়ে যেতেই গাছটি আবার উঠে দাঁড়ালো!

তবুও কাটিয়া থামলো না, সে ঘুরে অন্য পথে সেদিকে যেতেই একটি গাছের পাতাশূন্য সরু ডালগুলো তাকে কংকালের আঙুলের মতো আঁচড়ে দিলে। সে গাছটি ঘুরে আবার এগোলো। এবার সে চললো একটি টিলার তলা দিয়ে। অমনি পাথরের টিলাটি হুড়মুড় করে তার সামনে ভেঙে পড়লো, কিন্তু তার গায়ে একখানি পাথরও লাগল না। কাটিয়া যেমন ভয়ে জড়সড় হলো তেমনি অবাকও হ'য়ে গেল। এর মানে কি? তবুও সে ছুটলো। দানিলার কাছে যাবেই। সে বুঝতে পারলো, ঐ মেয়েটি সামান্য নয়। কিন্তু ও কিছুতেই দানিলাকে ধরে রাখতে পারবে না।

সে ছুটলো। মেয়েটি কতবার পথে তার সামনে এসে বললে, 'তুই ফিরে যা। তোর দানিলাকে দেবো না। তাকে আমি বিয়ে করবো।'

কাটিয়াও বললে, 'কিছুতেই তা হ'তে দেবো না।'

এমনি করে সে সেই মেয়েটির পেছন পেছন গিয়ে চন্দ্রমৌলী পাহাড়ের

সেই গুহায় ঢুকে চলতে লাগলো। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেল না। সে গুহার যত ভেতরে যায় ততই তার ভেতরকার অপরূপ দৃশ্যে মুগ্ধ হয়। আর তার বিশ্বাস হয়, এরই মধ্যে দানিলা কোথাও আছে। সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। পাথরের ফুলের রাজ্যে সে তার কথা, তার বাবার কথা ভুলে গেচে।

যে পথে দানিলা গিয়েছিল সেও চললো সেই পথে। কিন্তু তার পথে পদে পদে পড়তে লাগলো বাধা। একবার সে শুনতে পেল, কে যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখে একটি স্ফটিকের ওপর সোনালী পোশাক পরে সেই মেয়েটি। তার পায়ের তলা দিয়ে বয়ে চলেচে রুপালী স্রোতের ধারা। সেই ধারাটির পাশ দিয়ে পথ।

কাটিয়া সে পথে ছুটে যেতেই ওপর থেকে বড় বড় পাথর ভেঙে পড়ে পথ হ'য়ে গেল বন্ধ। সে সেই পাথরগুলোর ওপর উঠতেই সামনে গহ্বর থেকে আগুনের লক্ লকে শিখা এল বেরিয়ে।

কাটিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু পরক্ষণেই দেখলো বাঁ-দিকে গুহার ভেতর দিয়ে একটি পথ চলে গেচে। সে ছুটলো সেই পথে। গুহা পার হ'য়ে মর্মর পাথরের ওপর দিয়ে একটি হ্রদের তীর দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো, 'দানিলা—দা-নি-লা—'

তার ডাক গুহায় প্রতিধ্বনি তুললো, '—দা নি লা—নি লা—'

ওদিকে দানিলারও ফুল তৈরি শেষ হ'য়েচে। সে অবাক হ'য়ে তার নিজের গড়া ফুলটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার জীবনের ব্রত আজ শেষ। মনে পড়লো, বুড়ো বাবা আর কাটিয়ার কথা। সে কতদিন তাদের ছেড়ে এসেচে! মনে পড়লো, তাদের সেই ছায়াঢাকা ছোট গাঁখানিকে। ফুলটিকে সে আরও ভাল করে দেখে ফিরে চললো বাড়ি।

"কিন্তু যে-পথে এসেছিল সে পথ তার মনে নেই। তাই যেটিকেই মনে হয় বেরিয়ে যাবার পথ, সেই পথ ধরেই চলে। কিন্তু তারও সামনে কখনো পাহাড় ভেঙে পড়ে, কখনো পাথরের ফাটল থেকে আগুনের শিখা লক্ লক্ করে ওঠে, কখন গুহামুখে পথটি যায় বন্ধ হ'য়ে, কখনো পায়ের তলা থেকে পাথর সরে গিয়ে সেখানে বেরিয়ে আসে হ্রদ। তবুও সে যেখানেই পথ পায় সে পথ দিয়েই এগিয়ে চলে।

"এমনি কষ্ট সয়ে চলতে চলতে তার কানে এল কাটিয়ার ডাক। প্রথমে সে ভাবলে মনের ভুল। কিন্তু আবার, আবার সেই ডাক, —'দা-নি-লা—'

"না, ভুল নয়। এ কাটিয়ারই কণ্ঠস্বর। কাটিয়া তাকে খুঁজতে চন্দ্রমৌলী পাহাড় এসেচে। সেও সাড়া দিলে,—'কাটিয়া—কা-টি-য়া।'

"কিন্তু এগোতে পারলে না। তার সামনে গুহার ভেতর দিয়ে যে পথটি ছিল হঠাৎ বড় বড় পাথরে তা বন্ধ হ'য়ে গেল। দানিলা আর কোথাও পথ দেখতে পেল না। তার চারধারে কঠিন পাথর, মাথার ওপর পাথরের খিলান। সে পাষাণ পুরীতে বন্দী।

"এমন সময় সামনের পাথরের দেওয়াল সরে গিয়ে দেখা দিলে একটি স্বচ্ছ হ্রদ, তার পাড় স্ফটিকের। আর সেই হ্রদের ধারে এসে দাঁড়ালো কাটিয়া। দেখলো, হ্রদের ওপারে দাঁড়িয়ে দানিলা। কিন্তু দু'জনের কেউ কারো কাছে যেতে পারচে না।

"ঠিক সেই সময়ে হ্রদের স্ফটিকের তীরে এসে দাঁড়ালেন বনদেবী। তিনি একবার কাটিয়া, একবার দানিলার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর হাতখানি একটু দোলাতেই হ্রদের মাঝ থেকে উঠলো স্ফটিকের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে দানিলা আর কাটিয়া পরস্পরের দিকে ছুটে এল।

"বনদেবী আবার হাসলেন। বললেন, 'তোমাদের দু'জনের ওপর আমি বড় খুশী হ'য়েচি। এই উপহারটি নাও'—বলে একটি পাথরের বাক্স তাদের সামনে ডালা খুলে ধরলেন। অমনি তার ভেতর আলো ঝলমল করে উঠলো। বনদেবী তাদের উপহার দিলেন অমূল্য মণি-মুক্তা-রত্ন। তারা দু'জনে খুব খুশী হ'য়ে বাক্সটি হাতে নিতেই বনদেবী হেসে অদৃশ্য হলেন।

"তাতে দু'জনেরই মনে কষ্ট হলো। কিন্তু তিনি নিজে দেখা না দিলে তাঁর দেখা তো পাওয়া যাবে না! তাই দু'জনে ক্ষুণ্ণ মনে এগিয়ে চললো।

"সামনের গুহাটির ভেতর দিয়ে তারা এসে পড়লো পাহাড়ের ধারে সবুজ উপত্যকায়। তখন মাঠের শেষে সোনার বরণ সূর্য উঠচে, বনে বনে পাখি ডাকচে। তাদের গাঁয়ের পথটি চলে গেচে পুবে সেই উদয়ের পথে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে চললো সেই পথে।"

বুড়ো চৌকিদার বললে, "তোরা এবার বাড়ি যা।"

একটি কিশোর বললে, আমি ঐ দানিলার মতো হবো।"

বুড়ো মই বেয়ে তার ছাপ্পড়ে উঠতে উঠতে বললে, "সাবাস্।"

ছেলেমেয়েরা জ্যোৎস্নাধোয়া উপত্যকার ওপর দিয়ে বাড়ি ফিরে চললো, ঠাকুরদা ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্চে, সময় চলে যাচ্চে! *

গড় জঙ্গলের কাহিনী

॥ এক ॥

ফাঁসুড়ের খালে

নবাব সিরাজউদ্দৌলা তখন সিংহাসনচ্যুত ও নিহত, মীরজাফর সুবে বাংলার নবাব, ইংরেজ কোম্পানি বাংলার ধন-দৌলত শোষণের উদ্দেশ্যে চারধারে অক্টোপাসের মতো সাংঘাতিক শুঁড় বিস্তার করেছে, সেই সময়ে একদিন বেলা-শেষে রূপনারায়ণের পশ্চিম কূল ঘেঁষে, একখানি ডিঙি খুব সন্তর্পণে উজানে আসছিল। ডাঙায় জঙ্গলের ধারে একটি বড় ছাতিম গাছের আড়াল থেকে একটি লোক খুব মনোযোগ দিয়ে নৌকোখানি লক্ষ্য করছিল। কারণ, সময়টা তখন এমনই যে কে শত্রু, কে মিত্র সহসা বোঝা সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ উদ্দেশ্য গোপন করে চলে। নৌকোখানি দেখে মনে হয়, সাধারণ জেলে ডিঙি, তবে আকারে কিছু বড়। আবার, সওয়ারি নৌকো হওয়াও অসম্ভব নয়। কারণ, সেকালে জলপথে অনেক সময় নানা আকারের সওয়ারি নৌকো চলাচল করতো। নৌকাখানি যত কাছে আসে জঙ্গলের ধারের লোকটি ততই চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু আসতে আসতে নৌকোখানিকে হঠাৎ আর দেখা গেল না। লোকটিও নিমেষে অদৃশ্য হলো। সেই লোকটি ও নৌকোখানিকে যে আরও একজন লোক একটি ঝাঁকড়া আমগাছের ডালে বসে পাতার আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিল তা সেই লোকটি বুঝতে পারে নি। সেও লোকটি ও নৌকাখানিকে অদৃশ্য হতে দেখে গাছ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে জঙ্গলের পথ ধরে ছুটলো। লোকটির পিঠে তূণ, হাতে ধনুক, কোমরে টাঙি।

তখন শীতের সবে শুরু। তাই নদী ও খালে কিছু জল আছে। আর, ঘটনাটিও দু শো বছর আগের। তখন রূপনারায়ণের এখনকার মতো হীন অবস্থা হয় নি। নৌকোখানি অদৃশ্য হলেও যে লোকটি ছাতিমগাছের আড়াল থেকে তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিল সে তার গন্তব্যস্থল অনুমান করে একটি অস্পষ্ট বনপথ ধরে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হাঁটতে একটি সরু খালের ধারে এসে পৌঁছলো। এখানে জঙ্গল খুব ঘন, গাছপালা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ায় জল প্রায় দেখা যায় না। তার ওপর তখন শেষবেলার ছায়ায় খালের কিনারা কিছুটা অন্ধকার। লোকটি খালের ধারে একটি ঝোপের

মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন শুনতে লাগলো। সাধারণতঃ সে বন প্রায় সকল সময়েই নিস্তব্ধ ও নির্জন। আসন্ন সন্ধ্যায় তা আরও শব্দহীন। বুনো ঝিঁঝিঁ ও বড় বড় গাছের কোটরে কাঠ-কোরা পোকার অবিরাম উৎকট শব্দে, দুটি-একটি পাখির হঠাৎ ডাকে, শীতের বাতাসে গাছ থেকে দু-চারটি শুকনো পাতা খসে পড়ার আওয়াজে, বনটি যেন আরও ভয়ঙ্কর। লোকটি এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রথমে আস্তে, পরে জোরে ফিঙের মতো দু'বার শব্দ করলে—চিঁউ—চিঁউ।

পরক্ষণেই খালের দিকে টিয়ার ডাক শোনা গেল—টিয়া—টিয়া—টিয়া। এ জঙ্গলে টিয়া ও ফিঙে অনেক।

লোকটি তৎক্ষণাৎ দু'হাতে ঝোপ-ঝাড় সরাতে সরাতে খালের ধারে নেমে দেখলে, বাঁ ধারে হাত পঞ্চাশেক তফাতে একটি হিজলগাছের গুঁড়িতে সেই নৌকোখানি বাঁধা। গাছের ছায়ায় ও ঝোপের আওতায় সেখান থেকে তার বেশি আর কিছু দেখা গেল না। সংকেতে নৌকোর আরোহীদের চিনতে পারলেও লোকটি খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলো। শত্রুও মিত্রবেশে আসা অসম্ভব কী?

নৌকোর মাল্লা ক'জন ততক্ষণে ডাঙায় নেমেছে, মাঝি কেবল হালে বসে আর আরোহীরা ছইয়ের তলা থেকে বেরিয়ে আসছেন! সকলেরই দেহ বলিষ্ঠ, মুখে-চোখে দৃঢ়তা এবং চলাফেরায় তৎপরতা। আরোহীদের মধ্যে একজনের চেহারা ও পোশাকে বৈশিষ্ট্য। তাঁর মাথায় হলদে পাগড়ি, গায়ে সাদা মেরজাই, পায়ে জরিদার নাগরা, কোমরে দীর্ঘ তলোয়ার। লোকটি ছইয়ের তলা থেকে বেরিয়ে আগ-গলুইয়ের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই জঙ্গলের ধারের সেই লোকটি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই বিশিষ্ট আরোহী তার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রূঢ় স্বরে বললেন, 'তোকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তা ঠিকমতো করেছিস?'

'হাঁ, ধর্মাবতার।'

'মিথ্যা কথা। তোকে এদিকে শত্রুর গতিবিধির ওপর নজর রাখবার ভার দেওয়া হয়েছিল। তুই কি জানিস তোকে একটা গাছের ডাল থেকে একটা লোক লক্ষ্য করছিল?'

'হুজুর—'

'সে আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে গাছ থেকে নিরাপদে নেমে তাদের ঘাঁটিতে খবর দিতে ছুটেছে। কাজেই আমাদেরও এখনই সরে পড়তে

হবে। এবারও আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। তুই চরের কাজ করার অনুপযুক্ত। বরখাস্ত।'

'হুজুর—আমি—' বলেই লোকটি কেঁদে ফেললে।

'এঁটাকে সামনে থেকে নিয়ে যা। শেষ কর্।' বলে বিশিষ্ট আরোহী আদেশ দিতেই দু'জন মাল্লা এসে লোকটিকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ছইয়ের মধ্য থেকে আর একজন নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর গায়ে একখানি সামান্য চাদর, পরনে সামান্য বস্ত্র, খালি পা. মাথার চুল গোল করে ছাঁটা ও কাঁচা-পাকা, গায়ের রং ফর্সা, নাকটি খাঁড়ার মতো, চোখ দুটি উজ্জ্বল, চাদরের তলা থেকে পৈতার একটু দেখা যাচ্ছে। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'মহেশ্বর, ক্ষান্ত হও।'

তাঁর কথামতো সেই বিশিষ্ট লোকটি বা মহেশ্বর, মাল্লা দুজনকে ইঙ্গিত করতে তারা বন্দীকে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

মহেশ্বর বললেন, 'সূর্যপণ্ডিতের অভিপ্রায় কী?'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'লোকটি সত্যই কী চরম দণ্ড পাবার যোগ্য? আমাদের আজকের উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থই হয়, তা হোলে সেজন্য ওকে দায়ী করবার মতো কারণ আছে বলে তো মনে হয় না।'

মহেশ্বর বললেন. 'কেন?'

'ও যা করেছে তাতে শৈথিল্যের চেয়ে সতর্কতারই অভাব ঘটেছে। ওর পক্ষে চারধার ভাল করে দেখার প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, আমি ওকে প্রশ্ন করছি। এই, তোমার নাম কী?'

'বাসুদেব।'

'কতক্ষণ এই অঞ্চলে এসেছো?'

'আমাকে পাঠিয়েছে দু'পহরে।'

'কে?'

'সর্দার।'

'তার আগে কোথায় ছিলে?'

'গ্রামে।'

'যখন এখানে এলে তখন গাছে যে একটি লোক বসে আছে তা লক্ষ্য করলে না কেন?' বলে পণ্ডিত বাসুদেবের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

বাসুদেব বললে, 'ছাতিমগাছটির গুঁড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াবার আগে আমি চারধারটা ভাল করে দেখেছিলাম ধর্মাবতার। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে গাঙের দিক ছাড়া আশপাশ ভাল নজর করা যায় না।'

'গাঙে কি দেখলে?'

'একখানা ছিপ উত্তরে যাচ্ছে। দু'খানা ডিঙি গেছে দক্ষিণে।'

'ছিপ কার?'

'নবাবের। পাছগলুইয়ে নিশান ছিল।'

'ডিঙি দু'খানা চিনেছো?'

'হাঁ হুজুর! আমাদের।'

'চিহ্ন কী?'

'হালের মুঠি ত্রিশূলের মতো।'

এই নৌকোখানিরও তাই ছিল।

পণ্ডিত বললেন, 'তবু তোমার অপরাধ হাল্‌কা হয় না।'

মহেশ্বর বললেন, 'এখন আমায় কি মরতে বলেন?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই চারজন যোদ্ধা একটি লোককে বেঁধে নিয়ে এলো। লোকটির কাপড়ে ও গায়ে রক্ত। যোদ্ধারা বলে উঠলো, 'রাজার জয় হোক। হুজুর! শত্রুর চর। কিন্তু লোকটি সশস্ত্র ছিল। এই ওর অস্ত্র-শস্ত্র! কী আজ্ঞা হয়?'

মহেশ্বর ও পণ্ডিতের মুখে নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠলো।

মহেশ্বর বললেন, 'একে কোথায় কী অবস্থায় পেয়েছো, বলভদ্র?'

'হুজুর, গাঙের দিক থেকে লোকটা শিয়ালের মতো চুপি চুপি পালাচ্ছিল। আমরা আসছিলাম হুজুরের, চরণ দর্শন করতে।'

'তারপর?'

'হুজুর, ওকে দেখেই চিনেছিলাম, ক্ষ্যাপা কুকুরের জাত। কামড়াতে এসেছিল। টাঙি চালিয়েছিল। হাবলার বাঁ কানটা—'

হাবলা বললে, 'ও কিছু না।'

কাটা কান থেকে তখনও অল্প রক্ত ঝরছিল। বাঁ কাঁধে রক্তের দাগ!

বলভদ্র আবার বললে, 'যে হাতে কাজটা করেছে সে হাতে বংশীবদনের বর্শা ঢুকে গেছে। তবুও কুকুরটা পালাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা যমের দোসর। পালায় সাধ্য কী?'

মহেশ্বর বললেন, 'সাবাস। পরিচয় কী দিয়েছে?'

'বোবা হয়ে আছে। মানে আবার কামড়াবে। ক্ষ্যাপা কুকুরের যা দস্তুর।

'বটে! এই! তোর নাম কী?'

লোকটি কোন উত্তর দিলে না।

বংশীবদন তার পিঠে বর্শার একটা খোঁচা দিয়ে বললে, 'জবাব দে।' লোকটা বর্শার খোঁচায় লাফিয়ে উঠলো।

পণ্ডিত বললেন, 'মহেশ্বর, প্রশ্নের ভার আমি নিচ্ছি। প্রয়োজন-মতো শাস্তি তুমি দিও। এই! নদীর ধারে গাছে কতক্ষণ বসেছিলি?'

লোকটা তবু জবাব দিলে না।

'তুই কে? জবাব দিলে হয়তো বাঁচতে পারতিস্। জবাব না দিলে ঐ বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ঐ দেখ, দুটো মড়া ঝুলছে। পাখিতে ওদের চোখ ঠুকরে খেয়েছে।'

লোকটা সভয়ে সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে। জায়গাটাকে লোকে বলে, ফাঁসুড়ের খাল। খালের ধারে এমন বীভৎস দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখা যায়। দিনের বেলায়ও কেউ আসতে সাহস করে না এধারে।

এদিকে বেলা ডুবতেও আর বেশি দেরি নেই। অন্ধকারে প্রত্যেকটি ছোট বড় গাছ যেন গলে মিলিয়ে যাচ্ছে। জলচর পাখিরা বাসায় ফিরছে. যেন এক একটা ইংরেজি ভী V অক্ষর, কিন্তু কাক তখনও এদিক-ওদিক খাবার খুঁজছে।

পণ্ডিত বললেন, 'আর একবার জিগ্যেস করবো। তুই কে?'

লোকটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'হুজুর, আমি—আমি কেউ না।'

'তোর সঙ্গে তীর-ধনুক টাঙি ছিল কেন?'

'খাবার জন্যে।'

তার কথা শুনে সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, কেবল পণ্ডিত ও মহেশ্বর গম্ভীর।

পণ্ডিত বললেন, 'গাছে চড়ে কি দেখছিলি?'

'হাওয়া খাচ্ছিলাম, হুজুর।'

'শীতের হাওয়া, তার ওপর রূপনারাণের জোলো হাওয়া খেলে যে পেট ফোলে। ওরে, কাশী! তোরা এর পেট ছেঁদা করে হাওয়া বার করে ঐ গাছে কানে ছেঁদা করে ঝুলিয়ে দে। না হলে দড়ি ছিঁড়ে বেচারি গাছ থেকে পড়ে মাথা ভাঙবে। মহেশ্বর! লোকটাকে বোধ হচ্ছে কোম্পানির

চর। তবে তা না হতেও পারে। আমাদের গড়-জঙ্গলের অন্য শত্রুর হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য, যারই হোক, আমাদের শত্রুপক্ষের। অতএব বধ্য। আমাদের গতিবিধির সংবাদ ও নিশ্চিত দিতে পারে নি। তার আগেই ধরা পড়েছে। লোকটা কাজের।'

মহেশ্বর বললেন, 'হাঁ, মৃত্যুভয় করে না। যাই হোক, মৃত্যুই ওর যোগ্য শাস্তি। এটাকে নিয়ে গিয়ে মাথা কেটে জলে ভাসিয়ে দে।'

লোকটা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো; বললে, 'সত্যি কথা বলছি, আমায় ছেড়ে দিন, হুজুর। পেটের দায়ে একাজ হাতে নিয়েছি। ঘরে আমার তিনটে ছেলেমেয়ে আর বউ। তাদের খেতে দিতে পারি নে। তাই কোম্পানির চর-পাইকের কাজ নিয়েছি।'

'আগে কি করতিস?'

'চাষ। সে জমি ওরা কেড়ে নিয়ে চাকরি দিয়েছে। বলেছে ফেরৎ দেবে। হুজুর, মাফ করুন। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে ঐ গাছে গিয়ে উঠে গাঙে নজর রাখছিলাম। সেখান থেকে দেখলাম, ঐ লোকটাও জঙ্গলে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে। মনে করলাম, ও আমাদের লোক। তাই ওকে মারিনি।'

'তোমাদের দলের লোকের চিহ্ন কী?'

'কথা—কোম্পানি।'

'আমাদের চেনো?'

'গড়-জঙ্গলের দলের লোক—'

'তোদের শত্রু?'

লোকটা মাথা নীচু করে রইলো।

মহেশ্বর ইঙ্গিত করতেই তাঁর পাইকরা লোকটাকে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়েছে।

মহেশ্বর ও পণ্ডিত নৌকোর ছইয়ের নিচে আবার চলে গেলেন।

মহেশ্বর বললেন, 'বাসুদেবের হাত-পা বেঁধে পাছ-গলুইয়ে ফেলে রাখ্। ও কী! বন্দুকের আওয়াজ নয়?'

পণ্ডিত বললেন, 'হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, উত্তর দিক থেকে আসছে। ঐ আবার!'

মহেশ্বর বললেন, 'নৌকো খালের মুখে নিয়ে চল। মনে হচ্ছে কোম্পানির ফৌজ।'

'আমাদের পক্ষেও বন্দুক আছে। তাদেরও সংকেত হতে পারে।'

ইতিমধ্যে বংশীবদনরাও শত্রু-চরকে নিকাশ করে ফিরে এসে নৌকোয় উঠলো। নৌকো নিঃশব্দে খালের মুখে চললো।

বনভূমি অন্ধকারে ঢেকে গেল।

॥ দুই ॥

পূর্ব কথা

যে বনভূমির এক অংশে খালের মধ্যে সেই নৌকোখানি দেখা গিয়েছিল এবং সামান্য ঘটনাটি ঘটেছিল তা বহুদূর, প্রায় সারা দক্ষিণ বাংলা জুড়েই বিস্তৃত ছিল। আর, এই অঞ্চলটি কখন ছিল কলিঙ্গ রাজ্যে, কখন ছিল বাংলা-সীমান্তে। এখন তো বাংলার মধ্যেই, মেদিনীপুর জেলায়। এখানে এক সময়ে ছিল গঙ্গার মোহনা--সমুদ্রের সঙ্গে সঙ্গমস্থল। কিন্তু সে প্রাচীনকালের কথা। এখন সে গঙ্গাও নেই, সমুদ্রও সরে গেছে, এগিয়ে এসেছে রূপা—রূপনারায়ণ নদ।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেই সময়ে এই বিশাল বনভূমি ছিল হিংস্র জন্তুর বাসভূমি, নানা রকমের মূল্যবান বৃক্ষলতায় ভরা। আর, এরই মধ্যে মধ্যে ছিল বসতি—ছোট-বড় ভূস্বামীর অধিকার। তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন. নিজেদের মনে করতো—রাজা। সেই মতো থাকতো, অন্ততঃ সেই রকম চেষ্টা করতো। ভূস্বামীরা নিজেদের অধিকার নিরাপদ করবার উদ্দেশ্যে গড় বা দুর্গ রাখতো। বসতির চারধারে ছিল দুর্ভেদ্য বন। গড়ের চারধারে ছিল ঘন কাঁটাগাছের জঙ্গল বা নিবিড় বাঁশঝাড় যার মধ্য দিয়ে মানুষের বিশেষ করে ঘোড়সওয়ারদের চলাচল ছিল দুঃসাধ্য। এই অঞ্চলে বর্গীদের অত্যাচার ছিল খুব বেশি। হাজার হাজার মারাঠা ঘোড়সওয়ার লুঠ-পাট করতে আসতো। কিন্তু কাঁটাগাছের জঙ্গল ও বাশঝাড় ভেদ করে তারা গড় আক্রমণ করতে গিয়ে অনেক শক্তি অপচয় করতো। কখন কখন ঐ সব জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে দিত। জঙ্গলের পর থাকতো দুটি পরিখা। তাদের একটি শুকনো, অপরটিতে থাকতো জল ও কুমীর। কাজেই কেবল 'আলিবর্দি খাঁ' যে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন তা নয়, ঐ সব ক্ষুদে রাজারাও তাদের ঠেকাবার চেষ্টা করতো, কিন্তু এক সঙ্গে মিলে করতো না। ফলে অনেক সময়েই ধনে-প্রাণে মারা যেতো। একতাই যে শত্রুকে হঠাবার ও উন্নতি করবার একটি প্রধান উপায় ও শক্তি তা তারা বুঝতো না। কিন্তু তখন

আর বর্গীর হাঙ্গামা ছিল না, আরম্ভ হয়েছিল কোম্পানির আমল। তখনও ঐসব ক্ষুদে রাজা পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করতো, সুযোগ পেলে গড় দখল করে নিজ অধিকারে আনতো। তবে কাজটা তেমন সহজ ছিল না। তারা পাইক-বরকন্দাজ রাখতো। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তীর-ধনুক, টাঙি-বর্শা, তলোয়ার-খাঁড়া আর পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বন্দুক-কামান বড় একটা রাখতে পারতো না। যারা পারতো তারা হতো ওদের মধ্যে প্রবলপ্রতাপ।

মহেশ্বরের বাবা ভুবনেশ্বর ছিলেন ঐ ধরনের এক ভূস্বামী। সূর্যপণ্ডিত ছিলেন তাঁর কর্মচারী—বন্ধু ও মন্ত্রীস্বরূপ। তিনি মধ্যপ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ। ভুবনেশ্বরের দুই ছেলে, মহেশ্বর ও দেবেশ্বর। কোম্পানি সকলের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে। যে না দেয় তার ভিটে-মাটি চাটি করে দেয়। ঐ সব ক্ষুদে রাজারাও ভয়ে ভয়ে খাজনা দিয়ে থাকে। কিন্তু ভুবনেশ্বর সাফ জবাব দেন—খাজনা দেবেন না, তিনি স্বাধীন। এই থেকে কোম্পানি ও নবাবের সঙ্গে তাঁর ঘোর বিবাদ বাধে। তার ফল কি হয় পরে বলছি। আগে বলি, তিনি রাজা হলেন কি করে। তারও আগে বলি সূর্যপণ্ডিতের কথা।

সূর্যপণ্ডিতের কাকা ঐ অঞ্চলে কোন এক মন্দিরে পূজারী ছিলেন। সূর্যপণ্ডিত যখন ছ'-সাত বছরের তখন তাঁর বাবা-মা প্লেগে মারা যান। কাকা ছাড়া তাঁর আপনজন কেউ ছিল না। কাকা বিয়ে-থা করেন নি, ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনায় খুব অনুরাগ থাকায় সংস্কৃতভাষা শিখে নানা শাস্ত্র পাঠ করেছিলেন। তারপর যৌবনেই একদিন গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে যান। সূর্যপণ্ডিতের বাবা ছোট ভাইটিকে খুব ভালবাসতেন। তিনি নিজেও সংস্কৃত জানতেন, শরীরচর্চা করতেন, অস্ত্রবিদ্যাও শিখেছিলেন। তাঁর কিছু জমি-জমা ছিল। তাই চাষ-আবাদের ও গো-পালনের কাজকর্মও জানতেন ভাল। কিন্তু ভাইয়ের পড়াশুনা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগতো না। সূর্যপণ্ডিতের বাবা রবিপণ্ডিত তাতে আপত্তি করতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। নিজে যতটা সংস্কৃত জানতেন ততটাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন। তাঁর বিয়ের ঠিক করছিলেন, এমন সময় একদিন গাঁয়ের জনকয়েক তীর্থযাত্রীর সঙ্গে তিনি নিরুদ্দেশ হন। সেই তীর্থ-যাত্রীরা বছর দুই পরে নানা তীর্থ ঘুরে দেশে ফিরে যায়। রবিপণ্ডিত তাদের কাছ থেকে ভাইয়ের এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন যে, তাঁর ভাই বারাণসী থেকে পূর্বদিকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন।

সম্ভবতঃ আর দেশে ফিরবেন না। এই ঘটনার বছর চারেক পরে দারুণ প্লেগে রবিপণ্ডিত সস্ত্রীক মারা যান। তাঁদের এক বুড়ি দাসী ছিল। সে শিশু সূর্যের দেখাশোনা করতে থাকে। তার ষোল-সতের বছরের একটি ছেলে ছিল। সে তার সমবয়সী জনকয়েক ছেলেকে নিয়ে একটি দল তৈরী করেছিল। তারা কয়েকটা ঘোড়া যোগাড় করে পালা করে তাতে চড়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতো। গ্রাম থেকে চার-পাঁচ ক্রোশ দূরে ছিল কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড় ও জঙ্গল। সেখানে ছিল ডাকাতের আড্ডা। গ্রামে ছিল এক ধনী মহাজন। ডাকাতরা একদিন তার বাড়ি লুঠ করতে এলে বড়দের সঙ্গে সেই কিশোরদলও বাধা দেয় এবং ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতদের পিছনে ধাওয়া করে তাদের আড্ডা জ্বালিয়ে দিয়ে আসে। ডাকাতরা আড্ডা ছেড়ে পালায় কিন্তু দল ভাঙে না। এদিকে গ্রামের লোকেরা কিশোর-যোদ্ধাদের খুব বাহবা দেয়। ডাকাতরাও তাদের প্রলোভন দেখিয়ে ভুলিয়ে নিজেদের দল ভারী করে আর বলে, ছোট ছোট যোগাড় করে তাদের চুরি ডাকাতিতে তালিম দিতে। অসহায় সূর্যও তাদের হাতে গিয়ে পড়ে কিন্তু সৌভাগ্যবশে তার সুন্দর চেহারা দেখে এক বেদে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। তারপর নানা জায়গা ঘুরে বছর খানেক পরে বাংলাদেশে এক মন্দিরের কাছে এসে তারা আস্তানা গাড়ে। সূর্যপণ্ডিতের কাকা তখন সেই মন্দিরেরই পূজারী ছিলেন। ছেলেটিকে বেদেদের দলে দেখে তাঁর সন্দেহ হয়, মুখখানাও চেনা চেনা ঠেকে। তাকে প্রশ্ন করে তার পরিচয় জানতে পারেন এবং তখনই প্রথমে জানতে পারেন তাঁর বড় ভাই ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে আর ছেলেটি তাঁরই মাতাপিতৃহীন ভাই-পো। এদিকে বেদেরা ছেলেটিকে দাবি করে। কিন্তু ছেলেটিও তার কাকাকে চিনতে পেরে আর তাদের সঙ্গে যেতে রাজী হয় না। তবু বেদের দল কি ছাড়ে? তখন সেখানকার ভূস্বামীর পাইকরা এসে বেদেদের আস্তানা ভেঙে তাদের তাড়িয়ে দেয়। বেদেরা এর প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে যায়। কিন্তু আর ফেরে না।

সূর্যপণ্ডিত কাকার কাছ থেকে লেখাপড়া শেখেন আর ভূ-স্বামীর পাইক-সর্দারের কাছে শেখেন অস্ত্র-বিদ্যা। সেই সময়ে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তখন দুজনেই কিশোর। ভুবনেশ্বরদের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। কিন্তু ভূ-স্বামীর সঙ্গে বিরোধে তাঁর বাবা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় ভুবনেশ্বর এমন উত্তেজিত হন যে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনিও একটা রাজ্যের পত্তন করবেন আর এই ভূ-স্বামীর অধিকার দখল

করে প্রতিশোধ নেবেন। তাঁর বাবা পরিবারের সকলকে নিয়ে এবং যতটা সম্ভব ধন-দৌলৎ সংগ্রহ করে কটকের দিকে রওনা হন। পথে বাংলা ও ওড়িষ্যার সীমান্তে পৌঁছুলে দস্যুদের হাতে পড়েন। কেউ কেউ বলতো, ঐসব দস্যুকে নিযুক্ত করে ভুবনেশ্বরের বাবার বিরোধী পক্ষ। কারণ, দস্যুদের মধ্যে দু-একজন ছিল যাদের ভুবনেশ্বরের বাবা ও রক্ষীরা চিনতে পারেন। কিন্তু তারা তাঁদের বিশেষ ক্ষতি করতে না পারলেও ভুবনেশ্বরের বাবার বুকে এমন চোট লাগে যে, কটকে পৌঁছবার মাস কয়েক পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে ভুবনেশ্বরের সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

এই ঘটনার বছর তিন-চার পরে সূর্যপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শন করতে গেলে সেখানে একদিন ভুবনেশ্বরের সঙ্গে দৈবাৎ তাঁর দেখা হয়। সূর্যপণ্ডিত তাঁর কাকার কাছে বিদ্যাশিক্ষা করলেও তাঁর বাবার মতো তাঁরও অন্তরে ছিল যোদ্ধৃসুলভ ভাব। ভুবনেশ্বর তা জানতেন। দুই বন্ধু গোপনে পরামর্শ করে একটি দল গড়ে তুলে তাদের নিয়ে একদিন বাংলার এই অঞ্চলের দিকে রওনা হয়ে গড়-জঙ্গলে এসে পৌঁছন। সে-সময়ে দু-একজন দুঃসাহসী আফগান সর্দার আরও দক্ষিণে সমুদ্রতীরে গিয়ে জনপদ স্থাপন ও সুলতানের মতো থাকবার চেষ্টা করছিলেন। ভুবনেশ্বর খুব চালাক লোক ছিলেন বলে আলিবর্দির নবাব-সরকারের ওপরওয়ালা কর্মচারীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এখানে এসে জঙ্গল কেটে বসতি পত্তন করেন, আর তার নাম দেন 'গড়-জঙ্গল'। সূর্যপণ্ডিত হন তাঁর মন্ত্রী। এ কথা ক্রমে ভুবনেশ্বরের বাবার বিরোধী ভূ-স্বামী জানতে পারেন। সূর্যপণ্ডিতের কাকাও শোনেন, কিন্তু তিনি আর কি করবেন? আশা করেছিলেন, তাঁর অবর্তমানে ভাই-পো সেই মন্দিরে পূজারীর পদে বসবে। ব্যাপার দেখে হতাশ হন। যা আশা করা যায় সাধারণত সকলের তা পূর্ণ হয় না, কারো কারো হয়। চেষ্টা করলেই যে সব সময় সফল হওয়া যায় তাও নয়। যাদের আশা পূর্ণ ও চেষ্টা সফল হয় তাদেরই লোকে বলে ভাগ্যবান।

যা হোক, গড়-জঙ্গলের জন্মলগ্ন থেকেই তার শত্রু দেখা দেয়। ক্রমে গড়ের শক্তি বৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক আকাশেও পরিবর্তন ঘটে। কি পরিবর্তন গল্পটির আরম্ভেই বলেছি। গড়-জঙ্গলের শত্রুপক্ষেরও সংসারে পরিবর্তন হয়। ভূ-স্বামীটির মৃত্যু হলে তাঁর ছেলে কর্তা হন। তিনি ভুবনেশ্বরেরই সমবয়সী। ভুবনেশ্বরের দুই ছেলের নামও আগে বলেছি। ভুবনেশ্বর হঠাৎ একদিন মারা যান। তাঁর শত্রুপক্ষ সুযোগ

মনে করে গড় জঙ্গল আক্রমণ করে কিন্তু সূর্যপণ্ডিতের কৌশলে বিফল হয়ে ফিরে যায়। তার ফলে তাদের জেদ আরও বাড়ে। মহেশ্বর তখন কিশোর, দেবেশ্বর বালক।

গল্পটির পাঠক-পাঠিকারা হয়তো ভুবনেশ্বরের শত্রুপক্ষের ও তাদের বাসভূমির নাম জানতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। আমাদের গল্পটি বলার সুবিধার জন্য এখানে তা ব্যক্ত করাও দরকার। স্থানটির নাম রূপাগড়, অধিকারীর নাম গড়ুরধ্বজ রায়। রূপাগড়ের সম্পদ ও শক্তি প্রচুর, ভূ-স্বামী গড়ুরধ্বজও চতুর, কিন্তু সাহসী ও যোদ্ধা নন। তিনি কোম্পানি ও নবাব সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে, খাজনাপত্র মিটিয়ে শক্তি ও সম্পদ আরও বাড়িয়ে নির্বিঘ্নে বাস করছিলেন। ওদিকে গড়-জঙ্গলও বেশ বিখ্যাত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তার একটা বিশেষ সুবিধা ছিল জলপথ। ফাঁসুড়ের খাল দিয়ে বিশেষ করে জোয়ারের সময়ে গড়-জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছানো যেত। বর্ষায় খালটি কানায় কানায় ভরে উঠতো। তখন অনেক নৌকো আসতো, যেতো, ব্যবসাবাণিজ্য হতো। তাই খালের শেষ মুখে গড়ে উঠেছিল একটা বড় গঞ্জ। লোকে তার নাম দিয়েছিল, ভুবনপুর। ভুবনেশ্বরের আর একটা সুবিধা ছিল প্রজারা তাঁকে ভালবাসতো। তারাই বলতো, ভুবন-রাজা। ভুবনেশ্বরও স্বাধীন রাজার মতো চলবার চেষ্টা করতেন। এটা গড়ুরধ্বজ, কোম্প্যানি বা নবাব সরকার কেউ পছন্দ করতো না। শেষের দু পক্ষ চাইতো গড়ুরধ্বজকে দিয়ে ভুবনেশ্বরকে উৎখাত করতে। কোম্পানির উস্কানি ও সহায়তায় গড়ুরধ্বজ আবার একদিন অতর্কিতে গড়-জঙ্গল আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, ভুবনেশ্বর যুদ্ধে মারা যান, দেবেশ্বর শত্রুর হাতে পড়ে, সূর্যপণ্ডিত ও মহেশ্বর বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কটকের দিকে পালিয়ে যান। কিছু কিছু প্রজাও দেশান্তরী হয়। নবাব সরকার গড়-জঙ্গল বাজেয়াপ্ত করতে গিয়েও কি ভেবে তা করে না, কোম্পানি তাদের অনুগত একটা লোককে সেখানে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত করে। গড়ুরধ্বজের লোভ ছিল গড়-জঙ্গল গ্রাস করার, কিন্তু তা হয়ে ওঠে না। তিনি লুঠের মাল ও দেবেশ্বরকে গুম করে রেখে তখনকার মতো চুপচাপ থাকতে বাধ্য হন। সূর্যপণ্ডিতকে নিয়ে মহেশ্বর কিছুকাল অজ্ঞাতবাস করে ফিরে আসেন, ছোট ভাইটিকে ও রাজ্য উদ্ধার করতে। তাঁরা অনুগত প্রজা ও বেতনভুক পাইকদের নিয়ে দল গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁদের শত্রুপক্ষ গুপ্তচরমুখে তা জানতে পারে। তারাও তাঁদের ধরবার জন্য সচেষ্ট হয়।

পয়সার লোভে মহেশ্বরের প্রজাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ শত্রুপক্ষে যোগ দেয় ও তাদের চরের কাজ করতে থাকে।

পথে আসতে আসতে সূর্যপণ্ডিত মহেশ্বরকে বলেন, 'সমস্ত দিক বিবেচনা করে মনে হয়, স্বাধীনতার দিন ফুরিয়েছে।'

মহেশ্বর বলেন, 'আপনার মুখে এ কথা?'

পণ্ডিত বলেন, 'অবস্থা এমন যে এ রকমের দুঃখের কথা না বলে উপায় নেই। দেখ, মোগল-শক্তির কাছে চিতোর ও যশোর পরাজিত হয়েছে। তোমার গড়-জঙ্গল তাদের তুলনায় কিছুই নয়। তুমি কোম্পানির সঙ্গে পারবে না। ওরা শক্তিমান চতুর বিদেশী। এদেশকে বশ ও শোষণ করতেই এসেছে। সিরাজউদ্দৌলা আজ কোথায়? কাজেই রাজ্য উদ্ধার করতে হলে ওদের বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া আর পথ কি?'

'স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে আমি রাজ্য চাই না।'

'সাধু! সাধু!'

'রাণা প্রতাপ, রায় প্রতাপ মোগল-শক্তির সঙ্গে না পারতে পারেন, তাই বলে মহেশ্বর রায় বিদেশী সঙ্গে শক্তির এঁটে উঠতে পারবে না কেন? আর, আমার ভাই শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে থাকবে? রাজ্য ও ভাই দুটিকেই উদ্ধার করবো।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'তোমায় নিরুৎসাহ করছি না। বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। যদি কোন রকমে কোম্পানির সঙ্গে মিত্রতা করে রাজ্য ফিরে পাও ভাইটিকে ফিরে পাবে কি না সন্দেহ।'

'কেন?'

'দেখ, আমরা এই নৌকোয় আমাদেরই লোকের মধ্যে থাকলেও এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাদের মিত্র মনে করা যায় তারা তা না হতেও পারে। এ সম্বন্ধে পরে অন্যত্র কথা হবে।'

তাঁরা খাটো গলায় কথাবার্তা বললেও মেয়েদের দু-একজনের কানে তার দুটি-চারটি পৌঁছচ্ছিল। তারাও কান খাড়া করে শুনছিল।

মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত নীরবে বসে থাকেন। নৌকো কখন অনুকূল বাতাসে, কখন দাঁড়ে, কখন বা গুণের টানে এগিয়ে চলে এবং এক জায়গায় পেঁছলে সেখানকার খেয়ামাঝিকে তাঁদের দলের লোক বলে চিনতে পারেন। তার কাছে খবর পান, দেবেশ্বরকে রূপাগড় থেকে মাদলপুরের মাটির নিচের ঘরে রাখা হয়েছে। মাদলপুর গড়-জঙ্গল থেকে পাঁচ ক্রোশ

তফাতে। দেবেশ্বরকে দেখে পর্যন্ত রানীমার কেমন মায়া পড়েছিল। তিনি নাকি বলেছিলেন, 'অমন চাঁদের মতো ছেলেটাকে কেন কষ্ট দিচ্ছিস্? ছেড়ে দে। ও আমার কাছে থাক্। আদর-যত্ন করলে কোথাও পালাবে না।'

গড়ুরধ্বজ তাই শুনে তাকে সরিয়ে দিয়েছে। সেই খবর পেয়ে মহেশ্বররা তাকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টা গোড়াতেই ব্যর্থ হয়। তাঁদের এবারকার পরিকল্পনা অন্য রকমের। এবারও হয়তো ব্যর্থ হবেন, এই ভেবে খালের মুখে গিয়ে নৌকো বাঁধলেন, কিন্তু আশা ছাড়লেন না।

তিন

ঘটনার ঘূর্ণি

দুদিন পরে—

রূপাগড়ের ক্ষুদে রাজা গড়ুরধ্বজ মন্ত্রণা-কক্ষে বসে মন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রণা করছেন।

মন্ত্রী বললেন, 'আমাদের পাঁচখানা ছিপ গেছে খালের মুখ আটকাতে; আর দু'শো বরকন্দাজ মাদলপুরের পথে উত্তরের জঙ্গল ধরে এগোচ্ছে—'

গড়ুরধ্বজ বললেন, 'তাতে কি লাভ হবে? ওরা চরমুখে খবর পেয়ে —কে? কি চাই?'

তখন একজন পাইক দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে থেকে চাপা-গলায় বললে, 'ধর্মাবতার, একটি লোক এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আপনি ব্যস্ত একথা শুনেও সে নাছোড়বান্দা।'

রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন; রাজা বললেন, 'পরিচয়?'

পাইক বললে,' শঙ্খচুড়।'

'নিয়ে এসো।'

তারপরই সাধারণ এক গ্রামবাসী ঘরে ঢুকে রাজাকে নমস্কার করলে।

গড়ুরধ্বজ তার মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকালেন।

লোকটি বললে, 'হিজলির দিকে দুশো পাঠান সাতখানা ছিপে উজানে আসছে।'

মন্ত্রী বললেন, 'লক্ষ্য?'

'মনে হচ্ছে খাল।'

মন্ত্রী বললেন, 'যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই ঘটতে চলেছে। চতুর সূর্যপণ্ডিতের পরামর্শে মহেশ্বর মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

গড়ুরধ্বজ বললেন; 'এতে ওদের কি স্বার্থ? বিবাদ মহেশ্বর আর আমার মধ্যে—'

'ওদের স্বার্থ এই সুযোগে লুঠতরাজ। ওরা রূপাগড় পর্যন্ত যেতে সাহস করবে না, মাদলপুরের ধানের গোলা, বাজার, কাছারি লুঠবে।'

'আমার এতটা বিশ্বাস হয় না।'

'তবে আপনার কি আজ্ঞা হয়?'

গড়ুরধ্বজ মন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর?'

'মহেশ্বর ওপারে রাধাপুরের ঘাটে নৌকো নোঙর করেছে।'

রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই বলে উঠলেন, 'জাল কেটে পালালো!'

মন্ত্রী বললেন, 'এবার ও অবাধে পাঠানদের সঙ্গে মিলে আমাদের ওপর চড়াও হবে।'

রাজা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কি বলার আছে?'

'বেদেনীর হাটের পুব মাঠে একদল বেদে মস্ত ছাউনি ফেলেছে।'

রাজা বললেন, 'তাতে কি? প্রতি বছরই তো মাদলপুরের মেলায় বেদেরা সাপ-খেলা দেখাতে আসে। তারা বুলবুলের, মোরগের লড়াই দেখায়! আমি নিজেই একবার দেখেছি, বখশিশও দিয়েছি।'

লোকটি বললে, 'ধর্মাবতার, এবার ওরা একপাল ঘোড়া এনেছে, সঙ্গে ছেলে-মেয়ে নেই। চেহারা রুক্ষ, চালচলন বেপরোয়া। যে ভাষায় কথাবার্তা বলে তা উৎকলী।'

রাজা বললেন, 'এর মধ্যে আমাদের ক্ষতির কি আছে?'

লোকটি বললে, 'ধর্মাবতার, আমি আপনার চর মাত্র। বিচার করবেন আপনি।'

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, 'কি চতুর্মুখ, আপনি চুপ করে আছেন কেন?'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ! শঙ্কার কারণ আছে। মনে হয়, বেদেনীর হাটের সেই লোকগুলো বেদে নয়, ছদ্মবেশী শত্রু-সৈন্য।'

'কি রকম?'

'চরকে জিজ্ঞেস করুন ওর আর কোন সংবাদ দেবার আছে কি না।'

গড়ুরধ্বজের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'উপস্থিত এর বেশি আর কিছু বলার নেই।'

'উত্তম। বিশ্রাম কর গে।'

লোকটি নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী বললেন, 'এক সময়ে উৎকল বা কলিঙ্গ থেকে কোন রাজা বা নায়কের অধীনে কলিঙ্গ সেনা এ দেশ জয় করেছে। তবে সে অনেককাল আগের কথা! আপনি তো জানেন, ভুবনেশ্বর কটকে ছিল। ঐ অঞ্চলের বন্য সর্দারদের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব থাকা অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব নয় বটে, কিন্তু আমি যতদূর জানি, আপনিও জানেন, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে তার পক্ষে একটিও কলিঙ্গবাসী যুদ্ধ করতে আসে নি।

'তখন না এলেও এখন যে আসবে না, এমন কথা কি আছে? মহেশ্বর, বিশেষ করে ঐ মধ্যপ্রদেশী ব্রাহ্মণটা অত্যন্ত চতুর। সর্দারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, লুঠতরাজের লোভ দেখিয়ে—'

'কিন্তু এটা যে নবাব আর কোম্পানির দখলী জায়গা!'

'সেটা হলো ভুবনপুর আর গড়-জঙ্গল; রূপাগড়, মাদলপুর, বেদেনীর হাট নয়—'

রাজা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি বলতে চান, ওরা আমার রাজ্য—'

'ধৈর্য ধারণ করুন, মহারাজ, এটা আমার অনুমান মাত্র। মহেশ্বর ভুবনপুরের পাশ কাটিয়ে বেদেনীর হাট বেষ্টন করে মাদলপুরে হানা দেবে মনে হয়।'

'কারণ?'

'তার ভাই।'

'অসম্ভব! মাদলপুর আর বেদেনীর হাট সুরক্ষিত, পথ দুর্গম। তাকে একেবারে মৃত্যুর সামনাসামনি গিয়ে পড়তে হবে।'

'বীর যোদ্ধা বুদ্ধি আর শক্তি এ দুয়ের ওপর ভরসা করে মৃত্যুর সামনেই এগিয়ে যায় মহারাজ। মৃত্যুর এক আশ্চর্য খেলা এই, অনেক সময়ই তাকে গ্রাস করে না বরং সাফল্যের দিকে এগিয়ে দেয়।'

আবার মন্ত্রণা-কক্ষের দরজায় আঘাত হলো। রাজার আজ্ঞায় একজন এসে নমস্কার করলে; লোকটির পোশাক কাঠুরের মতো। তথাপি দুজনেই তাকে চিনতে পারলেন।

রাজা চতুর্মুখকে বললেন, 'আপনি প্রশ্ন করুন।'

চতুর্মুখ সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, 'কি পরিমাণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করেছো, মহিম সামন্ত?'

'সামান্য তবে মূল্যবান।' বলে লোকটি একখানি চিরকুট কোমর থেকে বার করে তাঁর হাতে দিলে।

চতুর্মুখ চিরকুটখানি দু-তিনবার পাঠ করে গড়ুরধ্বজের হাতে দিলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর।

গড়ুরধ্বজও চিরকুটখানি তিনবার পাঠ করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'বন্দী দেবেশ্বর পালিয়েছে! রূপনারায়ণের জলকরে আমার অধিকারে পাঠানদের ছিপ এসে ভিড়েছে! সেনাপতি—সেনাপতি—না, থাক্! এর মধ্যে আমার গৃহশত্রু আছে। কে সে? তার মৃত্যু নিশ্চিত। সামন্ত, তুমি চতুর। জানো, মহেশ্বর এখন কোথায়?'

'মহারাজ, শুনেছি রাধাপুরের ঘাট থেকে পাঠানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'আমার বিশ্বাস সে মাদলপুরে—'

'অসম্ভব। পরশু সে ফাঁসুড়ের খালের মুখে ছিল। চারধারে চর। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে—তবে কি সে-ই দেবেশ্বরকে মুক্ত করেছে? অসম্ভব—অসম্ভব। এ আমার গৃহশত্রুর কাজ।' কথাগুলো বলতে বলতে রানীমার শান্ত, সুন্দর মুখখানি তাঁর মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যাও।'

সামন্ত চলে গেলে গড়ুরধ্বজ চতুর্মুখকে বললেন, 'এখন কি কর্তব্য?'

'সেনাপতিকে তিন শ সৈন্য নিয়ে মাদলপুর-বেদেনীর হাট-রূপাগড় সড়ক রক্ষা করতে আদেশ দিন। বেদেদের ছাউনি এখনই উৎখাত করা হোক।'

'কিন্তু এতে যে শত্রুবৃদ্ধি হবে! মহেশ্বর-সূর্য মস্ত চাল চেলেছে। সে নিজে আছে এদের পিছনে। তার গায়ে আঁচড়ও লাগবে না।'

'মহারাজ! মহেশ্বরের গা কোথায়? সে তো রাজ্যহীন, যাযাবর।' তাকে বিনষ্ট করবোই; কিন্তু তার শক্তিকে ছোট করে দেখলে ভুল হবে।

'আর দেবেশ্বরের পলায়ন?'

'ঘটনাটির বিষয় অনুসন্ধান সাপেক্ষ।'

গড়ুরধ্বজ সেনাপতিকে ডাকিয়ে আদেশ দিলেন পথ রক্ষা ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করতে এবং প্রয়োজন বুঝলে সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধাতে। কোম্পানি বা নবাব কেউই পাঠানদের পছন্দ করে না।

আদেশ দিয়ে গড়ুরধ্বজ স্নানাহারে গেলেন, চতুর্মুখ গেলেন অন্যত্র।

ওদিকে মহেশ্বর রাধাপুরের ঘাটে থাকতে থাকতেই চরমুখে সংবাদ

পান, শত্রু তাঁকে বেষ্টন করছে। এই চক্রটি গড়ুরধ্বজেরই। তাঁর লোকেরা তাকে বন্দী করে। আর শুনেছিলেন বাসুদেবের মুখে। সূর্যপণ্ডিতের পরামর্শে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এই কড়ারে যে, সে এমন একটি কাজ করবে যাতে মহেশ্বরের পরম উপকার হবে। বাসুদেব আরও জানিয়েছিল, রাধাপুরের ঘাটও নিরাপদ নয়। অপর পারে শত্রুর ছিপ খালের মুখ আটকেছে। এ খবর সে সংগ্রহ করেছিল, গড়ুরধ্বজের পাইক হরেকৃষ্ণের কাছ থেকে। হরেকৃষ্ণ বাসুদেবের ভগিনীপতি।

মহেশ্বর রাধাপুরের ঘাট থেকে রাত্রির অন্ধকারে এপারে এক জায়গায় নেমে বিশজন অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেদের ছদ্মবেশে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দুর্গম রাস্তা ধরে বেদেনীর হাটে বেদেদের আস্তানায় এসে পৌঁছেছিলেন। আর, সূর্যপণ্ডিত এসেছিলেন মাদলপুরের কাছে।

মাদলপুরকে গড়ুরধ্বজ যতটা সুরক্ষিত মনে করেছিলেন, বসতিটা বাস্তবিক ততটা সুরক্ষিত নয়। তবে তার চারধারে গভীর বন ছিল বটে। সেকালে সকল বসতিই জলবেষ্টিত ছিল। বসতিটার উত্তরে ছিল একটা অনেককাল আগের মস্ত ঢিপি। সেখানে অমন একটা ঢিপি থাকার কারণ কি, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। তবে তার সম্বন্ধে লোমহর্ষক গল্প তৈরি হয়েছিল অনেক। ঢিপির মাথায় ছিল একটা ইমারতের ধ্বংসস্তূপ। হাত-পা-ভাঙা, নাকছ্যাঁচা, মুণ্ডহীন কয়েকটা মূর্তিও সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল প্রায় আস্ত, আকারে ছোট, পোড়ামাটির তৈরী। ধ্বংসাবশেষের ইঁটগুলো লোকেরা নিয়ে গিয়ে ঘর-বাড়িতে লাগিয়েছিল, ভাঙা মূর্তিগুলোও কারা যেন নিয়ে যায়। আস্ত মূর্তিটা একজন ভবঘুরের হাতে পড়ে। সে আর কোথাও যায় না। মূর্তিটাকে ঢিপির মাথায় বটতলায় প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে আরম্ভ করে। তার নাম দেয় মঙ্গলঠাকুর। ক্রমে দুটি একটি করে ভক্ত আসতে থাকে। তাদের পুজোয় ও দানে লোকটার বেশ আয় হতে থাকে। কিন্তু বেশিদিন তার ভাগ্যে সুখ ভোগ হয় না; একদিন সাপে কামড়ে তাকে মেরে ফেলে। তখন রাজসরকার তার মালিক হয়।

গড়ুরধ্বজ ঢিপির অপর পিঠে সুড়ঙ্গ কেটে চোরা কুঠরি তৈরি করবার হুকুম দেন। শ্রমিকেরা ঢিপির মধ্যে নানা রকমের ইটের সন্ধান পায়। সেই সব ইটই তারা কুঠরিতে ব্যবহার করে। ওখানে আগে কি ছিল, মূর্তিগুলো কোন হিন্দু দেবতার বা জৈন অথবা বৌদ্ধ সাধুদের কিনা তা জানতে কারোরই আগ্রহ হয় না। ঐ অঞ্চলটায়, দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় এক

সময়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব ছিল। তার ফলে জায়গায় জায়গায় জৈন মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছিল। কোন্ রাজা বা কারা সেসব গড়েছিলেন তাও জানা যায় না।

আমরা যখনকার কথা বলছি তখনও লোকে জানতো না। জানলে আমরাও আজ জানতে পারতাম। যাহোক, ঐ মাদলপুরের ঐ চোরা কুঠরিতেই দেবেশ্বর বন্দী ছিল।

কুঠরির সামনে ও টিপির চারধারে ছিল সশস্ত্র কড়া পাহারা। তাদের চোখ এড়িয়ে কুঠরিতে যাতায়াত সম্ভব নয়। সেই কুঠরি থেকেই দেবেশ্বর পলায়ন করেছে। এ যে আশ্চর্য ঘটনা! গড়ুরধ্বজের লোকেরা সাহায্য না করলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না।

কিন্তু দেবেশ্বর কিশোর হলেও সে যে সাহসী, বুদ্ধিমান ও শক্তিমান একথা কারোরই মনে হয় নি।

সূর্যপণ্ডিত মাদলপুরে গোপনে পৌঁছে পাইকদের দুজন সর্দারকে অনেক মোহর দিয়ে হাত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাদের সাহায্যে দেবেশ্বরকে উদ্ধার করবার আগেই সে পলায়ন করে। সর্দারদের একজন গিয়ে দেখে কুঠুরি খালি। সবই ঠিক আছে কেবল দেবেশ্বর যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। লোকটা তাই দেখে চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে আসে। চারধারে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, রাজার কাছে খবর নিয়ে লোক ছোটে।

সূর্যপণ্ডিত তখন সেখান থেকে সিকি ক্রোশ দক্ষিণে একটা পুরোনো পুষ্করিণীতে স্নান সেরে জলে দাঁড়িয়ে আহ্নিক করছিলেন। হঠাৎ দেখেন, একটি কিশোর মাঝপুকুরে হুশ্ করে ভেসে উঠলো এবং এদিক-ওদিক তাকিয়ে সূর্যপণ্ডিতকে দেখে সে সভয়ে ওপারের দিকে সাঁতরে চলতে লাগলো। সূর্যপণ্ডিতও তাকে প্রথমটা চিনতে পারেন না। এমন আর্যশ্চ কাণ্ড তিনি কখন দেখেন নি। কিন্তু বিস্ময় ও ভয়ের ঘোর কাটিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে চিনতে পারলেন এবং তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তার দিকে সাঁতরে চললেন আর বলতে লাগলেন, 'দেবেশ, ভয় নেই। আমি সূর্যপণ্ডিত।'

দেবেশ্বর ফিরে দেখলে সত্যই তাই। তারপর দুজনে পারে উঠে তাড়াতাড়ি একরকম ছুটে চললেন। সেখানে তাঁদের সশস্ত্র অনুচরেরা ছদ্মবেশে প্রতীক্ষায় ছিল।

চলতে চলতে সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'সাবাস ছেলে! কিন্তু তোমার কাহিনী শোনবার সময় এ নয়। আরও পা চালাও—ঐ দেখা যায় জঙ্গল।'

এদিকে ঠিক তখনই পিছনে কারা যেন চীৎকার করতে করতে সেদিকে আসছিল। তাই শুনে দুজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন।

॥ চার ॥

শত্রুজাল ও সংঘাত

মন্ত্রী চতুর্মুখ ভারি চতুর। তিনি যে সব চর নিযুক্ত করেছিলেন তারাও খুব দক্ষ। মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিতের গতিবিধির সকল খবর তারা সংগ্রহ করে চতুর্মুখকে দিয়েছিল। সেই মতো তিনি এমন একখানি জাল পেতেছিলেন যা ছিন্ন করে পালানো মহেশ্বরদের পক্ষে খুবই শক্ত। এই জাল অবশ্য সৈন্য, পাইক, বরকন্দাজ ও প্রলোভনে বশীভূত দস্যুদল দিয়ে তৈরী। চতুর্মুখ দেবেশ্বরের পলায়নকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেননি। তার পলায়নে রূপাগড়ের অসাবধানতা ও তার নিজের অসমসাহস এবং বুদ্ধি ছাড়া আর কি প্রকাশ পেয়েছে? এতে ক্ষতির কিছু নেই। বরং একটু লাভ হয়েছে এই যে, রাজ্যের যে কজন প্রভাবশালী ব্যক্তি যেমন রানীমা, এই কিশোরকে অযথা বন্দী করার বিরোধী ছিলেন, তাঁরা এতে খুশী হয়েছেন। তাঁদের মনে রাজার প্রতি যে একটু বিরূপতা দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়েছে। এটাই ভাল। সাধারণ লোকে কি বলে না বলে তাতে রাজার কি এসে যায়? যার হাতে ডাণ্ডা ওরা তার কাছে ঠাণ্ডা। তবে এই ঘটনায় রাজা কিছু অসম্মানিত ও ক্ষুণ্ণ বোধ করছেন। কিন্তু তার ফলে মহেশ্বরকে বিনষ্ট করতে তাঁর জেদ আরও বেড়ে গেছে। ওরা বিনষ্ট হলে রাজার মনে আর কোন দুঃখ, অপমান থাকবে না। সেদিনের আর দেরী নেই।

চতুর্মুখ উঠে পায়চারী করতে লাগলেন। তিনি মহেশ্বরের যতটা বিপক্ষে তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি বিপক্ষে সূর্যপণ্ডিতের। কারণ, গড়ুরধ্বজ একদিন অসাবধানতাবশে তাঁর সম্মুখে সূর্যপণ্ডিতের একটু প্রশংসা করে ফেলেছিলেন। তার ওপর সূর্যপণ্ডিত বিদেশী। ও না থাকলে মহেশ্বর কবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো। রাজার নামে মন্ত্রীই রাজত্ব করে। ভাল মন্ত্রী পাওয়া রাজার ভাগ্য। সেদিকে মহেশ্বরকে ভাগ্যবান বলতে হবে। এমনি নানা কথা চতুর্মুখ পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগলেন এবং নিজের মনে একবার বলে উঠলেন, 'সূর্য, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।' তিনি নিজে গোপনে সেনাপতিকে রাজার নামে করে পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বেড়াজালের মতো বেষ্টন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় বাধা পড়লো।

হঠাৎ পিছনে একটু শব্দ হলো। ফিরে তাকালেন। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। জায়গাটি গাছপালায় ভরা ও নির্জন। একটু কিছু ঘটলেই তার শব্দটা বেশি মনে হয়। শত্রুর এমন দুঃসাহস হবে না যে বাঘের ঘরে সেঁধোয়। চারধারে সশস্ত্র কড়া পাহারা। অথচ তিনি ভেবে দেখলেন না, বাঘের ঘরেই ঘোগের বাসা হয়; সর্ষের মধ্যেই ভূত থাকে। তিনি অধীরভাবে শত্রুপক্ষের সংবাদের প্রতীক্ষা করছেন।

ওদিকে মহেশ্বর বেদেদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেদিনীর হাট ও মাদলপুর আক্রমণের উদ্যোগও করছিলেন, এমন সময়ে চরমুখে খবর পেলেন, গড়ুরধ্বজের বাহিনী তাঁদের ঘিরে বিনষ্ট করতে আসছে।

চতুর্মুখ যা অনুমান করেছিলেন, তা সত্য। বেদেরা ছদ্মবেশী কলিঙ্গ-যোদ্ধা। কিন্তু কেন তারা রাজ্যহীন মহেশ্বরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তা তিনি অনুমান করতে পারেননি। সূর্যপণ্ডিত তাদের রূপাগড়ের ধনৈশ্বর্যের লোভ দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আমাদের রূপাগড়ের ওপর কোন লোভ নেই। আমাদের রাজত্ব ফিরে পেলেই আমরা সন্তুষ্ট। রূপাগড়, মাদলপুর, বেদেনীর হাট তোমাদের।'

কলিঙ্গসর্দার বলে, 'কিন্তু কোম্পানি যদি ওদের সঙ্গে যোগ দেয়? তাদের কামান-বন্দুক আছে। আমাদের এই সব হাতিয়ার তার বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারবে না।'

সূর্যপণ্ডিত বলেন, 'কোম্পানী এ অঞ্চলে এখন দুর্বল। তা ছাড়া রূপাগড় থাক বা যাক তাদের তাতে কিছু যায় আসে না। তারা চায় টাকা। যে টাকা দেবে সেই তাদের আপন। তুমি যদি তাদের বল, ও রাজ্য তোমার ঠাকুরদাদার ছিল, এখন সুযোগমত বে-আইনি দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করতে এসেছো; উদ্ধার করে নবাব ও কোম্পানির বশে থাকবে তা হলে তারা তোমার কথা শুনতে পারে। তাদের কাছে তুমি আর গড়ুরধ্বজ সমান, দুজনই বিদেশী।'

সর্দার বলে, 'তুমি কি বলতে চাও? এখানে রাজা হয়ে বসবো?'

যদি পারো ক্ষতি কি? আমরা তো তোমার মিত্র রইলামই। বিপদে পড়লে আমরা তোমার পাশে দাঁড়াবো।'

'না গা বাঁচাবে?'

'আমরা অকৃতজ্ঞ নয়। তোমরা আমাদের জন্যে প্রাণ দিতে এসেছো আর আমরা প্রাণের মায়া করবো? এটা কি বন্ধুর মতো কথা হলো? যদি রাজ্য না চাও লুঠপাট করে চলে যাও।'

'যেমন বর্গীরা করতো ?'

'তারা বার বার আসতো, বাংলার পশ্চিম আর দক্ষিণ অঞ্চল লুঠ করতো। তোমরা তো একবারই, আর একটা শত্রুরাজ্য লুঠ করবে।"

"রাজ্য চাই না, ধন-দৌলত চাই।'

সূর্যপণ্ডিত সর্দারের মুখ থেকে এই কথাই শুনতে চেয়েছিলেন, বললেন, 'যা তোমার ইচ্ছা।'

সর্দার বললে, 'সেইমতো আমাকে দল ভাগ করতে হবে।'

কিন্তু বেদেনীর হাটে এসে সর্দার দেখে, কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল তত সহজ নয়; রূপাগড়ের সৈন্য অনেক। মহেশ্বরের পক্ষে পাঠানদের যোগ দেওয়ার খবর সর্দার পেয়েছিল। কিন্তু তাদের সে বা তার দলের কেউ পছন্দ করতো না। তবে ওড়িষ্যায়, বিশেষ করে কটক অঞ্চলে তাদের কার্য-কলাপের ইতিহাস তাদের কিছু কিছু জানা ছিল। সর্দার তাদের বিশ্বাস করে না। তার ধারণা, ওরা বিশ্বাসঘাতক। নির্ভর এখন তার নিজের বাহুবল ও মহেশ্বরের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য। তবে সর্দার এটা দেখেছে, মহেশ্বরের দলের লোকের প্রায় সকলেই খুব বিশ্বাসী, সাহসী ও বুদ্ধিমান।

সূর্যপণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে এবং যেখানে পৌঁছেছে তা আগেই বলেছি।

এদিকে রূপাগড়ের বাহিনী ক্রমেই মহেশ্বরের দলকে বেড়াজালের মতো বেড়িয়ে ধরে একটু একটু করে সঙ্কুচিত হচ্ছে।

মাছ যেমন জলের মধ্যে তার বিপদ সম্বন্ধে হঠাৎ সচেতন হয়, সিংহ যেমন হঠাৎ শিকারীর সন্ধান পায়, বুনো হাতীর পাল যেমন শত্রুর সাড়া পেয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠে, মহেশ্বরও বেদেনীর হাটে পৌঁছে বিপদের সংবাদ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সর্দার, আক্রমণ তো দূরের কথা, এখন এই বেষ্টনী ভেঙে বার হওয়া—'

সর্দার বললে, 'ধৈর্য ধারণ কর। পণ্ডিত কোথায় ?'

'জানি নে।'

'ক্ষতি নেই। তোমার-আমার সৈন্যসংখ্যা এখন পাঁচ হাজারের বেশি নয়। একে তিন ভাগে ভাগ করে, তোমার অধীনে দু'হাজার দিলাম। দু'হাজার থাকবে আমার সেনাপতির অধীনে। আমি নেবো মাত্র এক হাজার। তোমরা পশ্চিমে ও উত্তরে অগ্রসর হও। আমি যাচ্ছি রূপাগড়ের দিকে। তোমরা ওদের জালের দুর্বল জায়গায় ছিদ্র করে

বেরিয়ে যাও। তারপর পিছন থেকে ওদের আক্রমণ করো, সম্মুখযুদ্ধ করো না। এই যুদ্ধের সেনাপতি আমি, তুমি নয়।'

'শত্রু-সৈন্যসংখ্যা কত জানা আছে কি ?'

'বিশ হাজারের বেশি নয়।'

'আর, আমরা তার সিকি।'

'ভুলে যাচ্ছ, পণ্ডিত আর পাঠানদের কথা। শত্রু আমাদের হাতে প্রচণ্ড মার খাবে। যাও, রাজা যাও। তুমি তো যুদ্ধ জানো। সংখ্যা বড় কথা নয়, সাহস, বুদ্ধি আর মরিয়া হয়ে লড়ে যাওয়াই দরকার। রূপাগড় এবার দস্তাগড় হবে।'

সর্দারের পরিকল্পনা মতো কাজ করতে মহেশ্বর ও সর্দারের সেনাপতি দুদিকে যাত্রা করলেন। তবে মহেশ্বর গেলেন কিছু আগে, সেনাপতি রওনা হলেন তাঁর কয়েক ঘণ্টা পরে। সর্দার রয়ে গেল। তাঁরা চলে যেতে সর্দার তাদের পিছনে কয়েকজন চর পাঠালো।

এদিকে সূর্যপণ্ডিত দেবেশ্বরকে নিয়ে যখন জঙ্গল থেকে বার হচ্ছেন, এমন সময়ে খবর পেলেন, শত্রুসৈন্য জঙ্গলে ঢুকছে। তারা খবর পেয়েছে পণ্ডিত এই বনে লুকিয়ে আছেন। তবে দেবেশ্বরের খবর তারা জানে না।

সেই বনের নাড়ি-নক্ষত্র জানে এমন একটি লোক সূর্যপণ্ডিতের দলে ছিল। সে বললে, 'রূপনারাণের দিকে পা বাড়ান, ঠাকুর। ঐ দিক।'

তার নির্দেশমতো সকলে তাড়াতাড়ি সেইদিকে চললেন। কিন্তু খানিকদূর যেতেই শত্রুর এক অগ্রগামী দলের সামনাসামনি তাঁরা পড়ে গেলেন। তখন হয় যুদ্ধ অথবা পলায়ন এ দুটির একটিকে বেছে নেওয়া ছাড়া আর উপায় রইলো না। পলায়ন মানেই মৃত্যু বা বন্ধন। যুদ্ধে মৃত্যু বা আহত হওয়া অথবা জয় সম্ভব। বীর যুদ্ধই করে ; কৌশল হিসাবে পিছু হটে সত্য, কিন্তু আবার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে।

সূর্যপণ্ডিতরা সকলেই সশস্ত্র ছিলেন, এমন কি দেবেশ্বরের হাতেও তলোয়ার ছিল।

শত্রুরা তাদের দেখেই ভয়ঙ্কর চীৎকার করে উঠলো। তাদের মধ্যে কয়েকজন দেবেশ্বরকে চিনতো। তারা চীৎকার করে বলতে লাগলো, 'ঐ সেই ছোঁড়া। সেই দেবেশ্বর। ধরো—ধরো।'

অন্যেরা বলতে লাগলো, 'ঐ সূর্যঠাকুর। দুটোকে এক সঙ্গে পাওয়া গেছে।'

তাদের দলপতি চীৎকার করে বললে, 'সূর্যঠাকুর, দেবেশ্বর, যদি ধরা দাও, প্রাণে বাঁচবে, না হলে—'

কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইলো, শেষ হলো না; একটি তীর গিয়ে তার বুকে বিঁধলো। দলপতি মারা যেতে দলের সকলে ভয় পেয়ে গেল। তবু একজন সূর্যকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ে মারলো। বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশের গাছের গুঁড়িতে গিয়ে খচ্ করে বিঁধে গেল। দেবেশ্বরও লোকটির দিকে তলোয়ার হাতে ছুটে যেতেই পিছনে বহুকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। তাতে দুদলই থমকে দাঁড়ালো।

আবার চীৎকার উঠলো, 'দীন—দীন!'

এবার দুদলই বুঝলো পাঠানরা আসছে। অমনি রূপাগড়ের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে দিলে ছুট। যে লোকটি সূর্যপণ্ডিতকে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছিল দেবেশ্বর তাকে এমন আহত করলো যে, সে খানিক দূর গিয়েই মাটিতে পড়ে গেল। দেবেশ্বর ছুটে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলে। এই লোকটাই মাদলপুরের বন্দীশালায় দেবেশ্বরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, এক একদিন তার বরাদ্দ খাবার তার সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিত; আর বলতো, 'রাজভোগ খা।'

আজ লোকটার চরম শাস্তি হলো।

পাঠানদের চীৎকার আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়েছে এবং যখন সূর্যপণ্ডিতদের সামনাসামনি হলো তখন তাদের হাতে তিনজন বন্দী। তাদের প্রধান দল আসছে পিছনে! চরমুখে খবর পেয়ে তাদের একটি দল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছে।

সূর্যপণ্ডিতকে তারা বললে, 'তাদের লক্ষ্য মাদলপুর।'

কিন্তু আবার বনের একদিকে বহু লোকের চীৎকার শোনা গেল। এবার তা আর এগোলো না।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'আমরা এখানেই থাকবো। বনই নিরাপদ। বুদ্ধিমান সেনাপতি বনে যুদ্ধ করে না। ওরা কে দেখে এসো। মনে হচ্ছে রূপাগড়ের লোকেরা। ওরা আমাদের খোলা জায়গায় টেনে নিয়ে মারতে চায়। মহেশ্বর আর সর্দারের অবস্থা কি তা বুঝতে পারছি না। খবরের অপেক্ষায় এখানেই থাকবো। তারপর কর্তব্য স্থির করবো। সাহেব, তোমরা কি করবে?'

'আমরা?—সে জানে ফৌজদার' বলে পাঠান-সেনা-সর্দার তার দলের লোকদেরও সেখানে থাকতে হুকুম দিলে।

চর চলে গেল।

সূর্য বললেন, 'দেবেশ, তোমার পলায়নের কাহিনীটা শেষ করো।'

দেবেশ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে তার কাহিনী আবার বলতে শুরু করলো।

বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। কিন্তু বনভূমি ছায়াময় ও শীতল।

॥ পাঁচ ॥

দেবেশ্বরের কাহিনী

দেবেশ্বর বললে, 'ঘরখানার ভেতর যেটুকু আলো-বাতাস আসতো অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারি নি কোন্ পথে তা আসে যায়; সেই পথেই হয়তো যেতো বাইরের জগতের শব্দ। কিন্তু তা অস্পষ্ট, ক্ষীণ। আমায় ঘিরে থাকতো তরল রাত্রি। যখন তা জমাট হয়ে উঠতো, শব্দের ক্ষীণ ধারা মিলিয়ে যেতো তখনই বুঝতাম, পৃথিবীতে রাত্রি নেমেছে। খুব হতাশ বোধ করতাম। প্রহরীরা দিনে একবার মাত্র খাবার দিতে আসতো। কিন্তু কেউই ঘরে ঢুকতো না। এক একদিন এক একজন আসতো। কেউ খাবার ছুঁড়ে দিত, কেউ দরজায় রেখে চলে যেতো। ঘরের কোণে একটা ভাঁড়ে থাকতো জল। এক একদিন খুব পিপাসা পেতো—'

সূর্যপণ্ডিত কোমল স্বরে বলেন, 'বন্দী জীবন বড় দুঃখের এবং তোমার ওপর যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছিল তা না বললেও আমি জানি। তুমি কেবল বল, কি করে ওদের কবল থেকে মুক্ত হলে।'

দেবেশ্বর বললে, 'দৈবাৎ মুক্তি পেয়েছি। একদিন দেখি, ঘরের কোণে একটা গর্ত। গর্তটা আগে ছিল বলে মনে করতে পারলাম না। একবার ভাবলাম, হয়তো ছিল, লক্ষ্য করি নি। আবার ভাবলাম, এই আবছা আলোয় ঘরখানার মধ্যে কতবার ঘুরেছি, তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি, যদি বাইরে যাবার, মুক্ত হবার সামান্য সূত্রও কোথাও দেখতে পাই। কিন্তু ইট-পাথরে গড়া কঠিন দেয়াল আর মেঝে ছাড়া কিছুই তো চোখে পড়ে নি। তবে আজ ওটা দেখছি কেন? কিসেই বা তৈরি করেছে? যদি সাপে তৈরি করে থাকে—কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো, সাপে গর্ত তৈরি করতে পারে না। ও দখল করে ইঁদুর বা ব্যাঙের গর্ত। ব্যাঙের গর্ত নয়। কারণ, বাইরে কোথাও জলাশয় থাকলেও এখানে জল নেই। স্যাঁৎসেঁতে জায়গাতেই ব্যাঙের বাসা। ধরে নেওয়া যাক, ব্যাঙেরই গর্ত।

তা হলে সে এল কোথা দিয়ে ? তার ডাক তো একবারও শুনতে পাই না। এখন শীতকাল। শীতে ব্যাঙ ডাকে না, যদি না বাদলার লক্ষণ দেখা দেয়।'

সূর্যপণ্ডিত বলেন, 'সাধু সাধু। দেবেশ, প্রাকৃতিক বিষয়ে তোমার পর্যবেক্ষণ-শক্তি প্রশংসার। তারপর ?'

'তারপর মনে হোল, ইঁদুর হওয়াও সম্ভব। আমার উচ্ছিষ্ট, এক একদিনের নিকৃষ্ট খাবারগুলোই পড়ে থাকে। তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে প্রহরীদের সঙ্গে ও অলক্ষ্যে একটা ইঁদুর হয়তো ঢুকে পড়েছে। তারপর আর বাইরে যায়নি, ঐখানেই গর্ত করেছে। কিন্তু সেই গর্তের মাটিই বা গেল কোথায় ? সেগুলো তো ওরই মুখে থাকবার কথা। তবে কি পিঁপড়ের গর্ত ? পিঁপড়েও মাটি তুলে গর্ত করে। চুন-সুরকি বা পচা বাঁশ কাঠেও পিঁপড়ের বাসা দেখা যায়। কিন্তু তার মুখে ঝুর-ঝুরে সুরকি বা বাঁশকাঠের গুঁড়ো থাকে। এ জায়গাটিতে ওসবের কিছুই নেই। তবে গর্তটা কিসের ? খাবারের বাটিতে তখনও কয়েকটা ডাল-মাখা ভাত লেগেছিল। বাটিটা গর্তের মুখের কাছে রেখে এক পাশে চুপ করে বসে রইলাম। খানিক বাদেই গর্তের মধ্যে খুস্-খুস্ শব্দ হতে লাগলো। তারপরই বেরিয়ে এলো খোঁচা-খোঁচা গোঁফ, ছুঁচলো মুখ আর কালো মটরের মতো চোখ। তাই দেখে সেটা ইঁদুরের গর্ত তা বুঝলাম। ইঁদুরটা আমাকে দেখেই পালালো। সেই নির্জন, নিস্তব্ধ কুঠুরিতে যে আর একটি প্রাণী আছে তা মনে করে আরাম বোধ হলো। যা হোক, একটা সঙ্গী তো পাওয়া গেল। তারপর—' কিন্তু দেবেশ্বরের কাহিনীতে বাধা পড়লো।

সূর্যপণ্ডিতের কয়েকজন অনুচর একটি লোককে বন্দী অবস্থায় এনে তাঁর সমুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

সূর্যপণ্ডিত জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে ?'

একজন বললে, 'আমাদের কোন প্রশ্নেরই জবাব দেয় নি। এখন আপনার কাছে যদি কিছু বলে।'

সূর্যপণ্ডিত লোকটির আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে ? কোথায় থাকো ?'

লোকটি বললে, 'পথিক।'

'কোথা থেকে আসছো ? যাচ্ছো কোথায় ?'

'ঠাকুর। এদের সরে যেতে বলুন। নিরালায় দু-একটি কথা বলতে চাই।'

'তুমি আমার, এদের সকলেরই অপরিচিত। এখন যুদ্ধের সময়। আমরা শত্রুবেষ্টিত। এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে নিরালায় আলাপ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বাপু। যা বলবে, এখানেই বল।'

'তার মানে আমাকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু আপনার সঙ্গীদের মধ্যে সকলেই কি বিশ্বাসী ?'

সূর্যপণ্ডিত বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'তোমাকে প্রশ্ন করার অধিকার দিই নি। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার মতো সময়ও আমার নেই। আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে শত্রু সন্দেহে তোমার প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে! নিজ পরিচয় দাও।'

লোকটি বললে, 'রূপাগড় কোম্পানির শরণাপন্ন।'

'তুমি এ খবর জানলে কোথা থেকে ? তোমাকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠালে কে ?'

'কেউ পাঠায় নি। আমি স্বেচ্ছায় এসেছি। মহারাজ মহেশ্বর শত্রুবেষ্টিত। তিনি জীবিত কি মৃত জানি না। আপনার সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এই বনে এসেছি।'

'বটে! এই কিশোরকে চেন ?'

'না।'

'মহারাজকে কখন দেখেছো ?'

'দেখেছি।'

'বুঝলাম! কোথায়, কতদিন আগে ?'

'যখন ভুবনপুরে তাঁর সেবা করতাম।'

'ওহে! তোমরা একে এখনই বাঁধো।'

তাঁর হুকুম মাত্র কয়েকজন অনুচর লোকটিকে শক্ত লতা দিয়ে বেঁধে ফেললো।

সূর্যপণ্ডিত আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর ?"

"হুজুর! আমাকে মিছে সন্দেহ করছেন।'

'আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নি। শীঘ্র বল, রূপাগড় কোম্পানির শরণাপন্ন এ কথা জানলে কোথা থেকে ?'

'মন্ত্রী চতুর্মুখ মেদিনীপুরে যে চর পাঠিয়েছিল সে আমার মাসতুতো ভাই। সে বলেছে!'

'বটে! খবরটা মূল্যবান। তুমি নিশ্চয় রূপাগড়ের নিমক খাও? খাও না? তা হলে উপবাসী? খবরটা আমায় দিয়ে কিছু চাও কি? উত্তর দাও।

নিছক পরোপকারের উদ্দেশ্যে প্রাণ বিপন্ন করে শত্রুমধ্যে এসেছো, এ কথা কে বিশ্বাস করবে ? কিন্তু আমরা সহায়-সম্বলহীন। মহেশ্বর এখন কোথায়, জানা আছে কি ? জবাব না দিলে মৃত্যু নিশ্চিত।'

লোকটি নীরবে হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখিয়ে দিলে।

'বৃথা সময় নষ্ট হলো। একে নিয়ে গিয়ে গুপ্তচরের যে শাস্তি তাই দাও গে।'

যারা তাকে ধরে এনেছিল তারাই তাকে ধরে নিয়ে গেল।

দেবেশ্বর বললেন, 'লোকটির উদ্দেশ্য সৎ হতে পারে।'

সূর্যপণ্ডিত বলেন, 'দেবেশ! তুমি কিশোর। নিছক পরোপকারী সংসারে খুবই কম। যার মনে পরোপকারবৃত্তি থাকে সে তো তার চারধারে যারা বাস করে তাদেরও উপকার করতে পারে। পরোপকারে আনন্দ লাভ হয়। পরোপকারীর পক্ষে তাই যথেষ্ট। লোকটা প্রাণ হাতে নিয়ে এই বনে বহু কষ্ট স্বীকার করে আমাদের উপকার করতে এলো কেন ? আমার সম্মুখে ওর আসার উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল আমাদের গতিবিধি, অবস্থান, সৈন্যসংখ্যা, অবস্থা—এই সব জানতে এসে ধরা পড়েছে। যদি ধরা না পড়তো তা হলে যা দেখেছিল গিয়ে তা জানাতো। বিনিময়ে পুরস্কার পেতো। কিন্তু আমাদের লোকদের সতর্কতায় আর ওর অসাবধানতায় ওর প্রাণটিই গেল। উপায় নেই, দেবেশ! যুদ্ধ মানুষকে নিষ্ঠুর করে। প্রাণদানই অতি মহৎ কর্ম। আমাদের এই দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী রূপাগড়। ওরা যে কোম্পানি, আর নবাবের শরণাপন্ন হয়েছে সে সংবাদ আমরা রাখি। তারা এখনও নিরপেক্ষ। কিন্তু কতদিন এ অবস্থা চলবে জানি না। যা হোক—তোমার কথা শেষ করো।'

দেবেশ্বরের মন কিন্তু এই ছোট ঘটনাটির পর আগের মতো প্রসন্ন ও উৎসাহী ছিল না ; তবু বললে—'সেই নির্জন কুঠুরিতে আমার সঙ্গীটি খাবারের সন্ধানে গর্ত থেকে বার হয়, ঘুরে বেড়ায়, এক এক সময়ে শান্ত হয়ে বসে থাকে, কখন কখন সামনের পা দিয়ে গোঁফ পরিষ্কার করে এবং রাতের অন্ধকারে এমন ভাবে ডাকে যেন মনে হয় কে মৃদু মৃদু হাসছে। কয়েক দিন পরেই দেখি, আরও কয়েকটা এসেছে। তারা আকারেও বড়। শুনেছিলাম ধেড়ে ইঁদুরে মানুষ খায়! ঘুমন্ত মানুষের অচেতন বা অসাড় দেহ, রোগীর কিংবা শবদেহের মাংস খেতে ওরা কসুর করে না। তাই ভয় হলো। যখন ঘুমিয়ে থাকবো তখন যদি আমার গা থেকে মাংস তুলে নেয় ? সেই সঙ্গে এই প্রশ্নও মনে জাগলো, এত ইঁদুর এলো কোথা থেকে ?

প্রহরীরা কি ছেড়ে দিয়ে গেল ? অথবা ঐ গর্তটা কোন গহ্বরের মুখ ? তা হওয়া অসম্ভব কি ? স্তূপের গোড়ায় তৈরী কুঠুরিটার তলার খবর কেউ জানে না। আমি গর্তটার মুখে ঘা দিতেই মনে হলো তলায় ফাঁপা। জোরে ঘা দিতে ভয় হলো, যদি প্রহরীরা বাইরে থেকে শুনতে পায়। আস্তে আস্তে ঘা দিতে দিতে কোণে জোড়ের মুখে ফাটল দেখা গেল। আবার ঘা দিলাম। খানিকটা পলেস্তারা খুলে ভেতরে ঠক্ করে কোথায় যেন পড়লো, ঠিক তখনই আমার ঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। তাড়াতাড়ি ঘরের বিছানাটা সেখানে টেনে এনে তার ওপর শুয়ে পড়লাম। পরক্ষণেই খাবার নিয়ে প্রহরী ঘরে ঢুকে বললে, 'ওহে রাজপুত্তুর! এই রাজভোগ এনেছি। খাও। উঃ! কি দুর্গন্ধ রে বাবা!' বলেই সে দরজায় খাবার রেখে দিয়ে চলে গেল।

'কিন্তু তখন আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই। মাটির তলার রহস্য আমার মন দখল করেছে! আগ্রহে উৎসাহে শরীর-মনে শক্তি দেখা দিয়েছে। লোকটা চলে যেতেই বিছানা সরিয়ে অবিরাম চেষ্টায় ফাটলের একখানা ইট সরিয়ে ফেললাম! তারপর আর একখানা, এমনি করে কয়েকখানা ইট সরাতেই তলায় এক ধাপ পৈঠা দেখতে পেলাম। পৈঠা দিয়ে নেমে একটা খালি কুঠুরিতে পৌঁছলাম। তলায় অন্ধকার। হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে এগোচ্ছি। পায়ে কি যেন বাধলো—কাঠ, মানুষের কঙ্কাল বা ঐ ধরনের কিছু হওয়া সম্ভব। কিন্তু সেদিকে তখন আমার লক্ষ্য নেই। কয়েক হাত গিয়েই পড়ে গেলাম। গাঢ় অন্ধকার! কিছুই দেখতে পাই না। দু পাশে হাত মেলে দিতেই ঠাণ্ডা দেয়াল হাতে ঠেকলো। উঠে দাঁড়ালাম! সন্তর্পণে পা বাড়িয়ে অনুভব করলাম, আমি পৈঠার ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। পৈঠাগুলো আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, জানি না। হয়তো মাটির তলার এটা সুড়ঙ্গপথ। এর মধ্যে বিষাক্ত সাপ অথবা মুখে কোন হিংস্র জন্তুর বাসাও থাকা সম্ভব। আবার মুখটা বন্ধও থাকতে পারে। হয়তো এই পথেই আমার মৃত্যু হবে। তা হোক। মুক্তির চেষ্টায়, স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ গৌরবের। বন্দী-জীবন কিছুতেই সইবো না।

'দু পাশের দেয়াল ধরে হাঁতড়ে হাঁতড়ে পৈঠা বেয়ে নামতে নামতে শেষে এক সমতল মাটিতে পৌঁছলাম। পায়ের তলায়, মনে হলো, ইট-বাঁধানো মেঝে, ওপর থেকে টপ টপ্ করে জল পড়ছে। সেই পথে কতক্ষণ ও কতদূর চলেছিলাম, জানি না। হঠাৎ একজায়গায় পৌঁছে দূরে দেখলাম আলোর আভাস। আমার মন নেচে উঠলো। ঐ যে মুক্তি!

ঐ পথেই বাইরের জগতের সঙ্গে আবার আমার যোগ হবে! আমার মুক্তির মূলে সেই সামান্য প্রাণীটি।

'তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। কিন্তু পায়ে পায়ে বাধা। পথ পিছল, মাঝে মাঝে দেয়াল ও খিলান ভাঙা ইটের স্তূপ, আগাছার জঙ্গল। অথচ সামনে আলো—আরও স্পষ্ট, উজ্জ্বল। শেষে এক জায়গায় সে পথের শেষ হলো। সমুখে খাদ। খাদের পর উঁচু বাঁধ। সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো পড়লো। লোকের চোখ এড়াবার জন্যে সুড়ঙ্গের জঙ্গলে ঢুকে খানিক গিয়েই হঠাৎ নিচে পড়ে গেলাম। মনে হলো, হাত-পা বুঝি ভেঙে গেল। কিন্তু দেখলাম, জলের মধ্যে পড়েছি; পড়েই খানিক তলিয়ে গেলাম। বুকে চোট লাগলো। তখন শারীরিক দুঃখ-যন্ত্রণা আমার কাছে তুচ্ছ। ভেসে উঠে আপনাকে দেখে, প্রথমটা ভয় হয়েছিল। তারপর—'

সূর্যপণ্ডিত বলে উঠলেন, 'এ কি? জঙ্গলে ধোঁয়া কেন?'

এমন সময় রব উঠলো, 'শত্রুপক্ষ জঙ্গলে আগুন দিয়েছে।'

বাস্তবিকই উত্তুরে বাতাসে বনভূমি ক্রমেই ধোঁয়ায় ভরে আসতে লাগলো।

পাঠান ফৌজদার ব্যস্ত হয়ে বললে, 'পণ্ডিত, ওরা আমাদের এখান থেকে বার করে খোলা জায়গায় নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলবার মতলব করেছে।' আমি ফৌজ নিয়ে দক্ষিণ দিকে রূপনারায়ণের ধারে চললাম।'

তারই একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'শত্রু দক্ষিণ আর পুবের পথ আগলেছে। সংখ্যায় অনেক।'

ফৌজদারের মূল বাহিনীই তখন বনে ছাউনি ফেলেছে।

ফৌজদার বললে, 'পণ্ডিত, আমার সৈন্যরা অর্ধ-চক্রাকারে পুব আর দক্ষিণেই অগ্রসর হবে। তুমি?'

পণ্ডিত বললেন, 'আমার সৈন্যসংখ্যা মাত্র পাঁচ শ'। তবু চেষ্টা করবো ওদের পিছনে গিয়ে আক্রমণ করতে। চললাম, পশ্চিমে—' এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর দলকে বিদ্যুৎবেগে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। পাঠানেরাও ফৌজদারের হুকুমে তড়িৎগতিতে ছাউনি তুলে অর্ধ-চক্রাকারে এগিয়ে চললো। তাদের মধ্যে ছিল একদল বন্দুকধারী।

এদিকে উত্তুরে বাতাসে ভর করে ধোঁয়া আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। এক একবার পশ্চিম দিক থেকেও আসছে। সূর্যপণ্ডিত তার মধ্য দিয়েই চললেন। তাঁদের বিপদ সবচেয়ে বেশি।

॥ ছয় ॥

আলো ও আঁধার

কলিঙ্গ-সর্দারের পরিকল্পনা অনুসারে মহেশ্বর ও কলিঙ্গ-সেনাপতি দু'দিকে খুব সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রূপাগড়ের সেনাপতিও খুব চতুর। তিনিও মহেশ্বরের শক্তির মোটামুটি সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। কলিঙ্গ সর্দার ও পাঠানদের তিনি মনে করেছিলেন লুঠেরা। লুঠেরারা সু-সংবদ্ধ ও শিক্ষিত সৈন্যদলের প্রতিরোধের সামনে দাঁড়াতে পারে না, তাদের লক্ষ্য থাকে কম যুদ্ধ করে বা এক রকম নির্বিঘ্নে লুঠপাট করে পালানো। বর্গীরা তাই করেছে। তবে তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত সৈন্য ছিল। সেজন্য আলীবর্দিকেও তারা ভয় করতো না। বাস্তবিক পক্ষে আলীবর্দিরও তখন এমন সৈন্যবাহিনী ছিল না, যারা দুর্ধর্ষ, সুশিক্ষিত ও সুসংবদ্ধ। তবু আলীবর্দি যেখানে তাদের প্রবলভাবে বাধা দিয়েছিলেন সেখানেই তারা প্রতিহিত হয়েছে। বর্গীদের রণকৌশল ছিল লুঠেরাদের রণকৌশল। পাঠান ও কলিঙ্গ-সর্দারেরও কিছুটা তাই। তবে এখানে একটা কথা বিবেচনার আছে এই যে, মহেশ্বর তাদের যুদ্ধে প্ররোচিত করবেন। কিন্তু লুঠেরারা কতক্ষণ লড়বে? রূপাগড়ের সেনাপতির এ অনুমান পুরোপুরি ঠিক না হলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। সুতরাং তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বেষ্টনী সংকুচিত করে আনছিলেন এবং এগিয়ে যেতে মহেশ্বর ও কলিঙ্গ-সেনাপতি তাঁর বাহিনীর সামনা-সামনি গিয়ে পড়লেন। অবিলম্বে লড়াই শুরু হলো। রূপাগড়-সেনাপতিই বনে আগুন দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি, পাঠান ফৌজদার পূর্ব আর দক্ষিণে এবং সূর্যপণ্ডিত বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁরা প্রায় নির্বিঘ্নে বন থেকে বার হয়ে শত্রু-সৈন্যের পিছনে যখন পৌঁছলেন, তখন উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। উভয়পক্ষেই বহুলোক হতাহত হতে লাগলো। এক এক সময়ে মনে হচ্ছে, মহেশ্বরেরপক্ষ পরাভূত হবে, এই সন্ধিক্ষণে তিন দিক থেকে পাঠান ও সূর্যপণ্ডিতের সেনাদের আক্রমণ! একটি কথা এখানে বলা দরকার যে, মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিতের যোদ্ধারা প্রায় সকলেই বাঙালি, রূপাগড়েরও তাই এবং তাদের অধিকাংশই মেদিনীপুর ও দক্ষিণ বাংলার লোক।

অতর্কিতে পিছন থেকে আক্রমণের জন্য রূপাগড়ের সৈন্যেরা প্রস্তুত ছিল না। এমন সম্ভাবনা ও আশঙ্কার কথা তাদের সেনাপতির চিন্তাও করেন নি। ফলে রূপাগড়ের সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগলো। মহেশ্বর

ও কলিঙ্গ-সেনাপতি প্রথমে বুঝতেই পারেন নি, রূপাগড়ের সেনাদের মধ্যে এমন হঠাৎ বিপর্যয়ের কারণ কি, এবং যখন জানতে পারলেন কি ঘটেছে তখন তাঁদের ও যোদ্ধাদের মনে উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস ও সাহস জেগে উঠলো। যোদ্ধারা আনন্দে ও মদগর্বে রণহুঙ্কার ছাড়তে লাগলো। পাঠান-সেনা ও সূর্যপণ্ডিতের বাহিনীও সেই হুঙ্কারে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে লাগলো, 'ভুবনপুর চল। রূপাগড় কেড়ে নাও।'

তাঁরা শত্রুবেষ্টনী কয়েক জায়গায় ছিন্নভিন্ন করে, বেরিয়ে চললেন বেদেনীর হাটের দিকে।

মহেশ্বর, সূর্যপণ্ডিত, কলিঙ্গ-সেনাপতি ও পাঠান ফৌজদার, এক জায়গায় মিলিত হলেন, বিশ্রামের জন্য নয়, পরামর্শের উদ্দেশ্যে। কারণ বিশ্রামের সময় তখনও দূরে। আর, চর-মুখে সংবাদ এসেছিল যে, রূপাগড়-সেনাপতি বিরাট বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে একটি ছোট গোলন্দাজ বাহিনী ও বন্দুকধারীও আসছে। তবে তারা সাদা কি কালো তা জানতে পারা যায় নি

প্রকাণ্ড বটগাছ। চারধারে ঝুরি নেমেছে। এমনিতে তার তলাটা গাঢ় ছায়াময়। তখন আবার দূরদিগন্তে বনের মাথায় সূর্য পাটে নামছে। তার রাঙা আলোয় রক্তে রাঙা রণভূমি গাঢ় লাল হয়ে উঠেছে। আহতদের করুণ কান্নায় তা এমন নিরানন্দ ও ভীষণ যে তাকানো যায় না। এই বটতলায় হলো যোদ্ধাদের মিলন ও ভাইয়ে ভাইয়ে গাঢ় আলিঙ্গন।

মহেশ্বর জানতেন না, দেবেশ্বর মুক্ত। তাকে দেখে তিনি বিস্মিত, আনন্দিত এবং মর্মাহত হলেন এইজন্য যে দেবেশ্বর আহত। তার দেহের কয়েকটি স্থানে অস্ত্রক্ষত থেকে তখনও রক্ত ঝরছে, মুখে ক্লান্তি ও কষ্টের চিহ্ন। কিন্তু তিনি নিজেও আহত ও রক্তাপ্লুত।

হারানো ভাইকে বুকে জড়িয়ে মহেশ্বর ক্ষণিক নীরব রইলেন। তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও সরলো না, বিশাল চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। দুই সেনাপতি ও সূর্যপণ্ডিত মুগ্ধ চোখে সেই সুন্দর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যোদ্ধারা আনন্দধ্বনি করে উঠলো, 'জয় গড়-জঙ্গল! জয় মহারাজ মহেশ্বরের জয়।'

মহেশ্বর যেন সচেতন হয়ে উঠে দেবেশ্বরকে বললেন, 'ভাই, তুমি আহত, ক্লান্ত, বয়সে কিশোর। তোমার শুশ্রূষা ও বিশ্রামের দরকার। সূর্য ঠাকুরের সঙ্গে রূপার ধারে কমলপুরের ঘাটে আমাদের ঘাটিতে ফিরে যাও।'

দেবেশ্বর বললে, 'আমি মহারাজ ভুবনেশ্বরের ছেলে, মহারাজ মহেশ্বরের ভাই। আমার দেহেও একই রক্ত বইছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হঠতে শিখি নি, অন্যায়কে, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে জানি না। আমায় তোমার পাশে থেকে যুদ্ধ করবার অনুমতি দাও।'

মহেশ্বর বললেন, 'আমি কখনও মনে করি না তুমি কাপুরুষ। তোমায় যে শত্রুপক্ষ স্বেচ্ছায় মুক্তি দিয়েছে এ কথা আমি মনে করতেই পারি না, আমরা চেষ্টা করেও তোমাকে মুক্ত করতে পারি নি। অনুমানে বুঝছি, তোমারই পৌরুষ ও বুদ্ধি-কৌশলে তুমি নিজেকে মুক্ত করেছো।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'এ অনুমান সত্য। দেবেশ্বরের মধ্যে পৌরুষ ও বুদ্ধি দুই-ই সমান বর্তমান। সে কাহিনী যথাসময়ে ব্যক্ত করা যাবে।'

মহেশ্বর বললেন, 'আমরা তো ভাই এমন অসহায় ও শক্তির শেষ সীমায় পৌঁছই নি যে, কিশোরকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হবে। তারপর দেখ, এই যুদ্ধে যদি আমার প্রাণ যায়, আমাদের বংশের তুমি থাকবে যার দ্বারা মহারাজ ভুবনেশ্বরের বংশরক্ষা ও রাজ্য পুনরুদ্ধার হতে পারবে। বুদ্ধিমান তুমি, এই বিষয়টি বিবেচনা করে তোমার আর অগ্রসর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর, সূর্যঠাকুর, উনি আমাদের অভিভাবকের মতো। ওঁর শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধি, পবিত্র চরিত্র এই ঘোর বিপদে আমাদের পরম ভরসা। ওঁকেও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। দূর থেকে উনি আমাদের পরামর্শ দেবেন। তোমার ভার ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি একদিকে নিশ্চিন্ত হতে চাই।'

সূর্যপণ্ডিত কিছুটা পরিহাসের সঙ্গে বললেন, 'আমার শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধি এবং পূত চরিত্র যখন বিপদে পরম ভরসা তখন এই বিপদাচ্ছন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে, এর সাহায্য নেওয়াই তো সমীচীন। তবে কথা এই, রাজাজ্ঞা অমান্যের উৎসাহ আমার নেই। বেশ, তাই হবে। অমি অবিলম্বে দেবেশ্বরকে নিয়ে কমলপুরের পথ ধরছি। সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারের সুযোগ নেওয়াই উচিত।'

শেষের কথাগুলিতে তিনি মহেশ্বরদেরও এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

দেবেশ্বরকে নিয়ে তিনি রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে চললো কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। এবার সূর্যপণ্ডিত ও দেবেশ্বরের জন্য দুটি ঘোড়া সংগৃহীত হলো। ঘোড়া দুটি দু'জন মৃত কলিঙ্গ-সেনার। সন্ধ্যার বাতাসে অশ্বখুরশব্দ মিলিয়ে যেতে যেতেই মহেশ্বর বললেন, 'এখান থেকে রেলেশীর

হাট বেশী দূর নয়। ঘোড়ায় গেলে আমরা শেষ রাত্রেই সেখানে পৌঁছবো।'

সেই মুহূর্তে চর এসে সংবাদ দিলে, শত্রু-সেনা আবার অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে আসছে।

মহেশ্বর তাতে চঞ্চল হলেন না, বললেন, 'এই যুদ্ধের নায়ক আমি।'

পাঠান ফৌজদার বললেন, 'আমাদের খালি লড়াই করতে হচ্ছে। কিসের জন্য আমরা লড়ছি? শুধু শুধু জান দিয়ে ফায়দা কি?'

মহেশ্বর বললেন, 'যা চাইছো তার জন্যেই তো এখানে চেষ্টা। বেদেনীর হাটে বড় বড় গোলা আর মহাজন আছে। একটা খাজাঞ্চী-খানাও রয়েছে।'

ফৌজদার বললেন, 'ব্যস। চলো।'

মহেশ্বর প্রায় নিঃশব্দে সকলকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। বললেন, 'আজকের সংকেত, দেবেশ্বর।'

মহেশ্বরের মিলিত বিজয়বাহিনী অন্ধকারে ছায়ার মতো এগিয়ে চললো। রণ-অশ্বগুলি পর্যন্ত বিপদ অনুমান করে যেন আলগোছে পা ফেলতে লাগলো, হ্রেষারবে পর্যন্ত সতর্ক হলো।

ওদিকে দূতমুখে ততক্ষণে গড়ুরধ্বজ ও চতুর্মুখের কাছে সেই বিপর্যয়ের খবর পৌঁছে গেছে। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ হয়েছিল তার নাম বিহারীর মাঠ। একসময়ে সেখানে কয়েকটা মঠ ও বিহার ছিল। তবে সে অনেক কাল আগের কথা। বিহার থেকে জায়গাটা এখন বিহারীতে দাঁড়িয়েছিল। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে মাটির তলায়, ওপরে, জঙ্গলের মধ্যে কিছু কিছু ইট-পাথর পাওয়া যেতো। আশপাশের গ্রামবাসীরা সে সব তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরে-দরজায় ব্যবহার করতো। তারা সকলেই চাষী। সেখানে কিছু কিছু চাষ-আবাদও করেছিল। কিন্তু সৈন্য ও অশ্বের পায়ের তলায় এখন তাদের শ্রমের ফল, ক্ষুধার অন্ন ধূলিসাৎ। তাদের কথা কে ভাবে?

যাহোক, চতুর্মুখ সত্যই বুদ্ধিমান মন্ত্রী। তিনি গড়ুরধ্বজকে বললেন, 'মহারাজ, শত্রু আমাদের রূপাগড় পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। আমরা এখানে একরকম অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি। যে হাজারখানেক রক্ষী রয়েছে তারা ওদের চেয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ একটি দলের, বিশেষ করে বিজয়ী ও পুরোদস্তুর যোদ্ধাদের সম্মুখে কতক্ষণ টিকবে? ওরা রক্ষীমাত্র। সাধারণ, অশিক্ষিত, বিশৃঙ্খল ও সামান্য অস্ত্রধারী জনতার মহড়া ওরা নিতে পারে-

মাত্র। তার বেশি আর কোন শক্ত কাজ ওদের দিয়ে হবে না। তাছাড়া ওদের মধ্যে—কি সংবাদ ?'

একজন চর ব্যস্ত হয়ে এসে বললে, 'কলিঙ্গ-সর্দারের অশ্বারোহী সৈন্যদল তাড়াতাড়ি রূপাগড়ের পথ ধরে এগিয়ে আসছে।'

চতুর্মুখ বললেন, 'আর ?'

চর বললে, 'এইমাত্র।'

তিনি নীরবে ইঙ্গিত করতেই লোকটি চলে গেল।

গড়ুরধ্বজ পায়চারী করতে করতে বললেন, ' কোম্পানি আর নবাব আমায় ডুবিয়ে দিলে ?'

চতুর্মুখ বললেন, 'আপনি তো গোলন্দাজ পেয়েছেন।'

'এখন তারা কোথায় ?'

'রণক্ষেত্রে।'

তুমি যুদ্ধ চেয়েছিলে তা পেয়েছো। সত্য ও ধর্মের পথে চলতে বলেছিলাম। কিন্তু লোভ—'

দু'জনেই ফিরে দেখেন, রানীমা।

চতুর্মুখ বললেন, 'মা, আপনি এখানে ? অন্তঃপুরে যান।'

গড়ুরধ্বজ বললেন, 'মা, এ জায়গাও তোমার নয়, এ কথাতেও তোমার কাজ নেই।'

'বলিস কি রে ? তোর রাজ্যের সকলের যে আমি মা। তাদের মঙ্গলের কথা কি আমি ভাবি না মনে করিস ? মানুষের মঙ্গল চিন্তাই তো ঈশ্বরের চিন্তা। এই বিপদ কি তোর একার ? এটা ঘটিয়েছিস্ তুই-ই। ওরা এসে এই নগর ছারখার করবে, চারধার শ্মশান হয়ে যাবে ! ঐ শোন্ চীৎকার। আমি যাবো ঐ রাক্ষসগুলোর সামনে, ওই নেকড়েগুলোর মুখে—'

'মা, মা, তুমি যে পাগল হয়ে গেছ। চল—চল—'

'কোথায় যাবি রে মূর্খ, লোভী ? এই কে আছিস তোরা বীর ! কে আছিস্ এই হতভাগিনীর সত্যকারের সন্তান যে আমার সঙ্গে ঐ নেকড়েগুলোর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবি ? আয়, আয়, তোরা—'

'চতুর্মুখ, মন্ত্রি, মাকে নিয়ে চলুন—মা, মা, শান্ত হও। আমি স্বয়ং যাবো অস্ত্রহাতে—'

'অস্ত্র এখন নিষ্ফল। যদি কেউ পারে তো আমি ওদের শান্ত করতে পারবো।'

'কিন্তু আমি থাকতে, আমার মা যাবে শত্রুসৈন্যের সামনে ? তাতে যে আমার অপযশ, আমাদের বংশে চির কলঙ্ক, চির-অপমান !

'শুধু মা কেন, আমরা রাজবাড়ির সকল বধূ যাবো মায়ের সঙ্গে। নগরের সকল অন্তঃপুরিকাকে খবর দিয়েছি। তারাও যাবে। নগরলক্ষ্মীকে আমরা রক্ষা করবো।'

গড়ুরধ্বজ বলে উঠলেন, 'এ কি রানি তুমি ! হায় ! সকলে পাগল হয়ে গেল। সত্যই আমি অপদার্থ—আমি—আমি—'

গড়ুরধ্বজ নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলেন।

চতুর্মুখ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ধীরে ধীরে বললেন, 'মা, আমিও তোমার সন্তান। সকলের আগে তোমার সঙ্গে যাবো আমি। কিন্তু তোমার চরণে আমার একটি নিবেদন আছে। রাজার সাক্ষাতেই আমি সেটি রাখছি। ওরা আসছে ধন-দৌলতের লোভে। আমি রাজভাণ্ডার উজাড় করে ওদের সামনে রাখতে চাই ! বলবো, এতে যদি সম্মত হও, উত্তম, নতুবা এই সোনার নগরের ঘরে ঘরে আমরা আগুন লাগিয়ে দেবো। আর, শেষ মানুষটি পর্যন্ত যতক্ষণ জীবিত থাকবে লড়বে, এমন কি নারীরাও।' বলে গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন।

রানীমা বললেন, 'তা ছাড়া আর পথ কৈ ? তোমার প্রস্তাবের পরিণতি জানতে চাই।'

'অবশ্যই জানবেন। মহারাজ ! আপনার মত কি ?'

'আমি মায়ের চরণের দাস।'

'উত্তম। চল, মায়েরা আমরা প্রস্তুত হই গে।'

রানীমা অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

চতুর্মুখ কলিঙ্গ-সর্দারের কাছে তাঁর প্রস্তাব রচনায় বসলেন। আর কলিঙ্গ-সেনার রণহুঙ্কার ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগলো।

॥ সাত ॥

দুই রণাঙ্গন-দুই ফল

সেকালে আমাদের দেশে 'এক জাতি, একতা' এই ভাব লোকের মনে জাগে নি। এই ভাব জেগেছে ক্রমে, প্রকাশ পেয়েছে ইংরেজ রাজত্বের সময়ে, উনবিংশ শতকে। কিন্তু সেই সময়েও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এমন দু-একজন লোকও ছিলেন, যাঁরা দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভাবতেন। এই রকম একটি মানুষ ছিলেন, তারা নায়েক।

ইতিহাসে তারা নায়েকের নাম নেই। হিজলীর কাছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁর আশ্রম ছিল। পর্তুগীজ জলদস্যুরা সেখানে তাদের যে আস্তানাটা গড়েছিল আশ্রমটি ছিল সেই বাড়িতে। বাড়িটা ছিল পাকা ও অনেকটা দুর্গের মতো করে তৈরী। সামনে একসার শালগাছ। তারপর উঁচু ঢিপি। ঢিপির গোড়ায় দেড়মানুষ সমান উঁচু সুড়ঙ্গপথ। তার মুখে লোহার কবাট বসানো। সারা বাড়িটার চারধারে ঐ রকম ঢিপি। এটাকে দুর্গ-প্রকার বলা যেতে পারে। প্রাকারের পিছনে ছিল কয়েকটা দেওদার ও ঝাউগাছ। বাড়িটাতে ছিল বড় বড় ঘর, মাটির নিচে কয়েকটা কুঠরী। বোধ হয় বন্দী ও লুঠের মাল থাকতো সেখানে। তারা নায়েক যখন সেখানে গিয়ে আশ্রম গড়েন তখন সেটা জঙ্গলাকীর্ণ পোড়ো বাড়ি। তার ছাদ ফেটেছে, দু-একজাগার দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে, আলসেয় বট-অশ্বথের চারা গজিয়েছে, ঘরে-বারান্দায় সাপ-শিয়ালে বাসা বেঁধেছে। তারা নায়েক দক্ষিণের কোণের একখানা ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে আস্তানা করেন। সেই দিকেই সমুদ্রখাড়ি। তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

তারা নায়েক বাঙালী, কি কলিঙ্গবাসী, কিংবা উত্তর প্রদেশের লোক তা জানা যায় না। কিন্তু তিনটি ভাষাতেই ছিল তাঁর চমৎকার দখল। আর জানতেন ফার্সি। তাঁর যেটুকু ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই থেকেই বলছি, তাঁর আশ্রমে কোন বিগ্রহ ছিল না। তিনি কাউকে ধর্মোপদেশও দিতেন না। এমন কি যখন সেখানে আসেন তখন ছিলেন একক। ক্রমে সেই গহন বনেও দুটি-একটি করে লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তারা নায়েকের বেশভূষা কতকটা ছিল মুসলমান ফকিরের, কতকটা ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো। লোকে জায়গাটার নামও দেয় নায়েকপুর। লোকেই তাঁর খ্যাতি রটায়—তারা নায়েকের অলৌকিক শক্তির কথায় পঞ্চমুখ হয়; বলে, 'বাবা মরা মানুষ জীইয়ে দিতে পারেন। ধূলোমুঠো ধরলে সোনা হয়। না খেয়ে মাটির তলায় দু'মাস ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন।'

নায়েকপুর রূপাগড় বা ভুবনপুর কারো এলাকার মধ্যে পড়তো না আবার নবাব সরকার বা কেম্পানি কারোরই জায়গাটার জন্যে মাথাব্যথা ছিল না। কারণ, সেদিকে না ছিল আবাদ, না ছিল বসতি। কাজেই খাজনা, নাজরানা আসবে কোথা থেকে? তারা নায়েককে যারা দর্শন

করতে আসতো তাদের মধ্যে দু-চারজন পাইক-বরকন্দাজ থাকতো। লোক-গুলো বাবার চরণে লড়াইয়ের খবর নিবেদন করতো।

বাবা একদিন বললেন, 'দুপক্ষেই দেশী লোক মরছে। কেন মরছে? যুদ্ধে ওদের লোকসান ছাড়া লাভ নেই। লাভ হবে যে পক্ষ জিতবে তার, আর কেম্পানির। দুইয়েরই শত্রু হচ্ছে কোম্পানি। ওরা ভুবনপুর আর রূপাগড়ের টাকা খেতে চায়। না দিলেই নবাবের নাম করে তাকে উৎখাত করবে। খাজনার টাকা আসবে কোথা থেকে? প্রজাদের ঘর থেকেই তো? এই যুদ্ধে তাদের কি হাল হয়েছে দ্যাখ। মাঠের ফসল ঘোড়ার পায়ে লণ্ড-ভণ্ড, গ্রাম জ্বলে-পুড়ে ছাই, লোকজন মরে ভূত, হাত-পা কাটা হয়ে পঙ্গু!'

তারা বলে, 'বাবা, তুমি তো ইচ্ছে করলে সবই পারো। লড়াই থামিয়ে কোম্পানিকে জব্দ করো না।'

আর একজন বলে, 'আমি মেদিনীপুরে একটা কোম্পানির লোক দেখেছিলাম। বাবা গো, মানুষটা যেন চুন দিয়ে তৈরী, চোখ দুটো বাঘের চোখের মতো, মুখের বুলি যেন গুলি, ফটাফট বেরোয়। কি যে বলে, বোঝে কার সাধ্যি। আচ্ছা বাবা, ওগুলো কি মানুষের বুলি? তা হলে বোঝা যায় না কেন?'

শুনে সকলে হেসে ওঠে। বাবা বলে, 'ওরা সাগরপারে শীতের দেশের লোক। ওদের বুলি ঐ রকম। ওরাও আমাদের বুলি বোঝে না।'

তাদের মধ্যে একটা লোক ছিল বেশ চালাক। সে বলে, 'বাবা ঐ পাঠান আর কলিঙ্গীগুলো কেন লড়ছে, ওরা কি চায়? রূপাগড়ের রাজা তো ওদের ক্ষতি করে নি।'

বাবা বলে, 'ওরাও চায় তোদের টাকা।'

'এত টাকা আমরা কোথায় পাবো?'

আর একজন বলে, 'শুনছি, ওদিকে আবাদ ভাল হয়নি। লোকের ঘরে ভাত নেই।'

বাবা বলে, 'তবু তাদের দিতে হবে। ওরা কেউ শুনবে না, বুঝবেও না।'

তারা বলে, 'বাবা, তুমি মন করলে সবই হয়। ওদের সবাইকে বিদায় করে দাও। ভুবনপুর আর রূপাগড়ে যে যেমন ছিল থাক। আমরা বাঁচি।'

বাবা কোন উত্তর দেয় না। পরদিনই লোকে তাকে আর দেখতে পায় না। তারা নায়কের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে লোকে নানা রকমের অলৌকিক কাহিনী রচনা করতে থাকে।

ওদিকে কোম্পানি যুদ্ধের খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে নবাবকে পরামর্শ দেয়, ভুবনপুর আর রূপাগড় খাস করে নিয়ে কোম্পানির হাতে অঞ্চলটার খাজনা আদায়ের ভার দিতে। কিন্তু নবাব সরকারে যারা ভুবনপুর আর রূপাগড়ের লোক ছিল, তারা কোম্পানির মতলব বুঝতে পেরে নবাবকে বোঝায়, এতে কোম্পানিরই লাভ হবে। ঐ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে হলে, মহেশ্বরের রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়ে সে যে অধিকার ভোগ করছিল, তাকে আবার তা দেওয়া হোক। আর পাঠান-সর্দার ও কলিঙ্গদলকে কড়া ভাষায় সতর্ক করা হোক যে, তারা যেন বাংলার ঐ অঞ্চলে কারোর পক্ষ নিয়ে বা নিজেরাও কোন রকম অশান্তি সৃষ্টি না করে। এর অন্যথা হলে, সুবে বাংলার নবাব তা সহ্য করবেন না। আর, কোম্পানি যেন এ ব্যাপারে নাক গলাতে না আসে। নবাব তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। দুই সর্দারের কাছে যে পত্র যাবে তার মুসাবিদা হতে লাগলো।

এই সময়ের মধ্যে বেদেনীর হাটের ভাগ্য মহেশ্বরের এবং রূপাগড়ের ভাগ্য কলিঙ্গ-সর্দারের দয়ার উপর নির্ভর করতে লাগলো। কারণ, দু'টি জায়গাতে তারাই প্রবল হয়ে উঠেছিল। পাঠান ও কলিঙ্গ সেনাদের লুঠ-তরাজের লোভ এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে, মহেশ্বরের পক্ষে তো বটেই তাদের সর্দারদের পক্ষেও তাদের সংযত রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা এক এক সময়ে ভীষণ চীৎকার করে উঠছিল। অনেকে আনন্দে নাচতে-গাইতেও শুরু করে দিলে। সেই বিকট চীৎকার ও বেতালা গানের আওয়াজে নগর ও আশ-পাশের লোকেরা প্রমাদ গণলো। তাদের পালাবার পথ নেই, বাঁচবারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অনেকে ভয়ে কাঁদতে লাগলো।

সেই সময়ে এক অচেনা সন্ন্যাসী-ফকির বেদেনীর হাটের কয়েকজন মাতব্বরকে ডেকে বললে, 'মহেশ্বর আমাদেরই দেশের লোক। ভুবনপুরের রাজা ছিল। ওকে বলা যাক, সাধারণ লোকের ধন-প্রাণ নষ্ট করে কি লাভ? তুমিই এখানকার রাজা হও। আমরা তোমাকেই মানবো।'

একজন বললে, 'ও যদি এতে রাজী হয়ও এর আসল মালিক শুনবে কেন? আবার সে একদিন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে চড়াও হবে। তখন তো আমাদেরই গলা কাটবে।'

'না কাটতেও পারে। এখন বাঁচলে পরে বাঁচবারও পথ পাবো। আর এক কথা, প্রজারা যদি মরেই যায় তবে রাজ্য কাদের নিয়ে?'

'ঠিক—ঠিক। কিন্তু মহেশ্বরের কাছে যাবে কে?'

'আমি।'

'আপনি কে ?'

তখন লোকের মনের এমন অবস্থা যে লোকটির পরিচয় নিতেও তারা ভুলে গিয়েছিল।

সন্ন্যাসী বললে, 'আমার পরিচয় এই মাত্র যে আমি তোমাদেরই একজন।'

'আশ্রম কোথায় ?'

'যখন যেখানে থাকি। এ সব কথা থাক। আমি চললাম। তোমরা মহেশ্বরকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হও।'

সন্ন্যাসী-ফকির চলে গেল। তবু লোকের মনের সন্দেহ যায় না। নানা লোকে নানা কথা বলতে লাগলো।

এই সময়ে কে একজন বললে, 'লোকটা মহেশ্বরের চর। যার যা আছে সব লুকিয়ে ফেল।'

আর একজন বললে, 'এ লোকটা যা বলছে তা করলে আমরা কেউ বাঁচবো না। মহেশ্বর এসে যদি কিছু না পায় সবাইকে কেটে ফেলবে, ঘর-দোরে আগুন দেবে। লোকটা নিশ্চয়ই গরুড়ধ্বজের চর। আমাদের সর্বনাশের মতলবে ও কথা বলেছে।'

'ধর ওকে—'

'মার ওকে—'

'কোথায় সে ?'

বলতে বলতে সকলে লোকটাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সে বেগতিক দেখে গা ঢাকা দিয়েছিল। জনতা নিস্ফল আক্রোশে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করতে লাগলো। কিন্তু বহুদূর থেকে ভেসে আসা বহু লোকের চীৎকারে ভয়ে ক্ষণিক স্থির হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থেকেই যে যার বাড়ির দিকে দিলে ছুট। আর ঠিক তখনই মহেশ্বর সসৈন্যে বেদেনীর হাটে ঢুকলেন।

কিন্তু রূপাগড়ে ঘটলো আর এক ঘটনা। কলিঙ্গ-সর্দার চতুর্মুখের চিঠি পেয়েও মনে করলো, এটা তাঁর চালাকি।

সে চরমুখে বলে পাঠালো, 'তোমাদের রাজভাণ্ডারে কি আছে তার পরিমাণ কত তা কেবল জানো তোমরা। তোমরা যে সবই দিচ্ছ তার প্রমাণ কি ?'

চর শুষ্কমুখে ফিরে যেতেই কলিঙ্গ-সর্দার তার সৈন্যদের নগর বেষ্টনের

হুকুম দিয়ে স্বয়ং একদল সৈন্য নিয়ে নগরে ঢুকলো। কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হলো না, সেখানে যে শিবমন্দির ছিল তার বিশাল চাতালে বসে গরুড়ধ্বজকে অবিলম্বে তার সমুখে হাজির হতে চরমুখে হুকুম পাঠালো। সেই সঙ্গে আরও বললে, 'এ নগরের রাজা এখন আমি। যদি না আসে তা হলে সমুচিত শাস্তি পাবে।'

কিন্তু চরকে বার্তা আর নিয়ে যেতে হলো না। নগরের ভিতরে বাইরে হঠাৎ এমন একটা শব্দ হতে লাগলো যে, তাতে মনে হতে লাগলো, নদীর বাঁধ ভেঙে প্রবল জলস্রোত ছুটে আসছে।, কলিঙ্গ-সর্দার কিন্তু বুঝতে পারলো, ব্যাপার কি ঘটেছে। সে সৈন্যদের নিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার নগরের দিকে ছুটলো। বাইরে তখন গরুড়ধ্বজের সেনাপতি তার সৈন্যদের নিয়ে সর্দারের সৈন্যদের পশ্চাদভাগ আক্রমণ করেছিলেন। তিনি চরমুখে রূপাগড়ের বিপদের সংবাদ পেয়ে সোজা ও ছোট পথে তাড়াতাড়ি এসে শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করেছিলেন। এই ঘটনার সংবাদ গরুড়ধ্বজ ও চতুর্মুখের কাছেও পৌঁছেছিল। তাঁরা যে অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন, তা কাটিয়ে উঠলেন এবং রক্ষী-বাহিনী নিয়ে কলিঙ্গ-সর্দারকে আক্রমণ করতে আসছিলেন। দুই বাহিনীর মাঝখানে পড়ে কলিঙ্গ-সর্দারের অবস্থা খুব শোচনীয় হলো। তার তখন যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি রইলো না, নিরাপদে পালাবার পথ খুঁজতে লাগলো। কিন্তু সে পথও বন্ধ। তার সামনে, পিছনে মৃত্যু। এর প্রথম ফল ভোগ করতে হলো নগরবাসীকে। সর্দার হুকুম দিলে, 'নগরে আগুন লাগাও।- গরুড়ধ্বজের অর্ধেকের বেশি রক্ষী এখনও নগরে রয়েছে।'

দেখতে দেখতে ঘরের চালে চালে আগুন জ্বলে উঠলো। নগরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে। চারধারে হাহাকার, ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি। রক্ষীদের প্রথম লক্ষ্য হলো, নগর রক্ষা। কলিঙ্গ-সর্দার এই সুযোগে কয়েক শ' সৈন্য হারিয়ে শত্রুর এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে বলে গেল, 'এর প্রতিশোধ নেব। বাংলায় আবার আসবো।'

ওদিকে বেদেনীর হাটে পাঠান-সর্দারের সঙ্গে মহেশ্বরের বিবাদ পাকিয়ে উঠেছিল।

পাঠান-সর্দার চায় লুঠতরাজ করতে। মহেশ্বর তাতে বাধা দিলেন, বললেন, 'তা করতে দেবো না। এই নগর এখন আমার। নিরীহ নগরবাসীদের রক্ষার দায়িত্বও আমি নিয়েছি।'

সর্দার বললে, 'কে তোমায় দায়িত্ব দিয়েছে?'

'আমি স্বয়ং এ দায়িত্ব নিয়েছি।'

'এ যুদ্ধের ফলে যা লাভ করেছো আমি তার বখরা চাই। না দাও নগর লুঠ করবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

'বাধা দেবো।'

'বাধা দিলে লড়াই বাধবে।'

'পিছপা নই।'

'তুমি যা মরদ তা আমার জানা আছে।'

'কী!' মহেশ্বর তলোয়ার খুললেন।

পাঠান-সর্দারও তলোয়ার কোষমুক্ত করে বাঘের মতো হুঙ্কার দিয়ে তাঁর ওপর লাফিয়ে পড়লো।

মহেশ্বর একপাশে সরে গিয়ে তার আঘাত নিস্ফল করলেন এবং বললেন, 'বেইমান!'

পাঠান-সর্দার এবার রাগে, অপমানে দিশেহারা হয়ে আবার আক্রমণে উদ্যত হতেই কার আঘাতে তার তলোয়ার হস্তচ্যুত হলো এবং তাকে কারা যেন বন্দী করে ফেললো। মহেশ্বর ও সর্দার দেখলেন, দেবেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত। দেবেশ্বরের তলোয়ারের আঘাতে সর্দারের তলোয়ার হস্তচ্যুত হয়েছিল।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'মহেশ্বর, সর্দারের মতলব ছিল কেবল লুঠতরাজ নয়, আধিপত্য স্থাপন। এ সংবাদ আমি সংগ্রহ করেছিলাম, ওরই এক অনুচরের কাছ থেকে। তাই কমলপুরের পথ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। খবরটা আমাদের এমন বিচলিত করেছিল যে—'

পাঠান-সর্দার বন্দী হতে তার ফৌজ ক্ষেপে উঠলো। কিন্তু অধ্যক্ষহীন বাহিনী মাঝিহীন নৌকোর মতো। মহেশ্বর বিচলিত হলেন না, সর্দারকে বললেন, 'আমি চুক্তিভঙ্গ করবো না। কিন্তু তুমি আমার বন্দী। এখানকার গোলা থেকে ধান, মহাজনদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে তোমায় দেবো। তুমি নিজের ইচ্ছায় এখান থেকে একমুঠো ছোলাও নিয়ে যেতে পারবে না। সম্মত?'

সর্দার বললে, 'না। তুমি কাপুরুষ! আমাদের শক্তিতেই এ নগর দখল করেছো। আমাদের শক্তিতেই এখানকার ধনসম্পদ লুটে নিয়ে যাবো।'

সেই মুহূর্তে তারা নায়েক এসে বললে, 'এই নগরের আর আশপাশের গ্রামের প্রত্যেকটি জোয়ান, তোমাদের বাধা দেবে। আমরা অন্যায় হতে

দেবো না। রাজা মহেশ্বরের বাহিনীর সঙ্গে আমরা যোগ দিলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমাদের নৌকোগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবো। বিদেশী তোমরা। তোমাদের আমরা এক কণা চালও দেবো না।'

মহেশ্বর বললেন, 'কিন্তু আমি এদের কথা দিয়েছি।'

'রাজার মর্যাদা আমরা রাখবো। কিন্তু আমাদের নিবেদন, সর্দারের সমস্ত লোককে এখান থেকে প্রথমে চলে যেতে হবে।'

মহেশ্বর সর্দারকে বললেন, 'তুমি এ প্রস্তাবে সম্মত?'

'না।'

'বন্দীর আবার মতামত কি?' বলে মহেশ্বর হুকুম দিলেন, 'পাঠানদের তাড়িয়ে দাও। আর সর্দার, তোমায় প্রাণে মারবো না। আমার লোকেরা তোমায় বন্দী অবস্থায় নৌকোয় তুলে দিয়ে আসবে। তুমি হিজলীর দিকে ফিরে যাও। যদি এর অন্যথা হয় তোমার জীবনের জন্য আমরা দায়ী নই।'

সর্দার বললে, 'পাঠান মরতে ভয় পায় না। তুমি বেইমান! কাপুরুষ! পথের কুকুর!'

মহেশ্বর আর রাগ সংবরণ করতে পারলেন না, বললেন, 'এই, কে আছিস? এটাকে শূলে চড়া।'

পাঠান-সর্দার শক্তিমান। এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে মহেশ্বরকে আক্রমণ করতে যেতেই সে ছিন্নশির হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটলো, কিন্তু রূপনারায়ণ সেখান থেকে অনেক দূর।

॥ আট ॥

সূর্যপণ্ডিত, নায়েক ও পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে

নবাবের হুকুমনামা যখন এলো তখন পাঠান-সর্দার পরলোকে, তার সেনাদল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, আর কলিঙ্গ-সর্দারও ততক্ষণে রূপাগড় থেকে অনেক দূরে। কাজেই হুকুমনামাও আর জারি হলো না। নবাবের পিয়াদা তাঁর কাছে এই দুঃসংবাদ নিয়ে ছুটলো যে, রূপাগড়ে আগুন জ্বলছে, যুদ্ধ কোথাও নেই।

ওদিকে কোম্পানির সেরেস্তায় নবাবের কড়া চিঠি পৌঁছতেই কর্তারা জ্বলে উঠলেন। নবাবকে তাঁরা জানালেন, তিনি তাঁর নবাবী নিয়ে

থাকুন, যেখানে খাজনার ক্ষতি হবে সেখানে তাঁরাই সর্বেসর্বা, যাতে সুবিধা হয় তাই করবেন। সুতরাং বাংলার এই অঞ্চল এখনই খাস করে নেওয়া হোক ইত্যাদি আরও দু-চারটি নরম-গরম কথা বলে নবাবকে থামিয়ে দিলেন। নবাবও সে অঞ্চল খাস করলেন না, তা নিয়ে মাথাও ঘামালেন না, চোখ বুজে সিংহাসনে বসে নবাবী করতে লাগলেন।

এর ফল হলো ভারি মজার।

রূপাগড় তো আধপোড়া হয়ে কোন রকমে রক্ষা পেল। গরুড়ধ্বজ বুঝতে পারলেন, তাঁর রাজ্য বুঝি যায়। মহেশ্বরও দেখলেন, যা তাঁর হাতে এসেছে তাও বুঝি থাকে না। গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় কোম্পানির কালো ছায়া বিস্তৃত ও গাঢ় হচ্ছে। স্বাধীনতা-সূর্য অস্তোন্মুখ।

তারা নায়েক এ কথা আগেই আন্দাজ করে নিয়েছিল। তার পরিকল্পনা ছিল, গড়-জঙ্গল আর রূপাগড়ের বিবাদ মিটিয়ে দুজনকে দিয়ে, নবাবকে বুঝিয়ে কোম্পানিকে বাধা দেওয়া। এখন দেখলো রূপাগড়ের অবস্থা শোচনীয়, নবাবের নবাবীই সার, মহেশ্বরও নিরুৎসাহ। সে একটি গাছতলায় বসে একমনে ভাবতে লাগলো।

তখন বেলা দুপুর। সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চল নিঝুম। তার ওপর সময়টা ভাল নয়, লোকের মনে আতঙ্ক, খেত-খামার-মাঠ ফাঁকা। কিন্তু পাখিরা নির্ভয়ে উড়ছে, গান গাইছে, খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে, গরু-বাছুর নিশ্চিন্তমনে চরছে।

তারা নায়েক উঠতে যাবে এমন সময়ে কে তার কাঁধে হাত রেখে গম্ভীরকণ্ঠে বললো 'বসো।'

তারা নায়েক চমকে উঠলো; ফিরে দেখে সূর্যপণ্ডিত। পণ্ডিত বললেন, 'তোমার সঙ্গে নিভৃতে আলাপের সুযোগ খুঁজছিলাম। বসো।'

দুজনে পাশাপাশি বসলেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'প্রথমে আমার পরিচয় দি।'

তারা নায়েক বললে, 'দরকার নেই। আপনি সুপরিচিত। কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনি রাজমন্ত্রী হয়ে আমার মতো সহায়-সম্বলহীন লোকের সঙ্গে নিরালায় আলাপ করতে সুযোগ খুঁজছিলেন কেন?'

'তুমি কে?'

'বলেছি তো সহায়-সম্বলহীন।'

'তোমার সাজ-পোশাক সেই রকমই পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু আসল মানুষটিকে জানতে চাই।'

'আপনি বিচক্ষণ। আমার বিশ্বাস আপনি আমার পরিচয় ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছেন। আমার সম্বন্ধে তার বেশি কিছু বলবার নেই।'

সূর্যপণ্ডিত আর কথা না বাড়িয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'যুদ্ধটা মিটিয়ে তোমার কি মঙ্গল?'

'মঙ্গল আমার নিজের নয়, দেশের লোকের। আমি সন্ন্যাসী-ফকির। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার ঘর, যেটুকু পাই তাই যথেষ্ট। আমরা ঘরে ঘরে যুদ্ধ করে মরছি, সেই সুযোগে চেপে বসছে বিদেশী। ওরা ওদের স্বার্থই দেখবে, আমাদের সুখ-দুঃখের পরোয়া করবে না যতক্ষণ না সেটা ওদের ক্ষতি করছে।'

সূর্যপণ্ডিত বিস্ময়ে তারা নায়েকের মুখের দিকে তাকালেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'মনে কর, ঘরোয়া বিবাদ মিটে গেল, বিদেশীদের হটাবে কি করে?'

'যদি না হটে তবে আপনাদের স্বাধীন রাজ্য থাকবে? সুতরাং হটাতেই হবে।'

'কি উপায়ে?'

'সকলের চেষ্টায়।'

'সেটা কি রকম?'

তারা নায়েক উপায় সম্বন্ধে যা ভেবেছিল তা প্রকাশ করলে না।

সূর্যপণ্ডিত আবার বললেন, 'ওরা অস্ত্রবলে আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিমান। ওদের যুদ্ধকৌশল আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। ওরা সুশৃঙ্খল, বুদ্ধিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নবাব ওদের হাতের পুতুল।'

'তবে কি আপনি বলতে চান আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবো?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। ওদের সঙ্গে আমাদের সামান্য তুলনা করেছি মাত্র।'

তারা নায়েক হঠাৎ প্রশ্ন করলে, 'আপনি কি ভুবনপুর দখলের ইচ্ছা রাখেন?'

'নিজের হারানো জিনিস ফিরে পাবার ইচ্ছা কার না হয়? কিন্তু ইচ্ছা হলেই তো আর পাওয়া যায় না।'

'কেন পাওয়া যাবে না? সন্ধান পেলে, উপায় থাকলে অবশ্যই তা আবার হাতে আসে।'

'উপায় থাকলে! ওটা এখন কোম্পানির অধীনে।'

'কিন্তু অরক্ষিত এবং আপনাদেরই সম্পত্তি।'

'নায়েকজী, তুমি আমাকে এমন সব প্রশ্নের জালে জড়িয়ে ফেলছো যেগুলির উত্তর দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।'

'এই বেদেনীর হাট নিয়েই খুশি থাকবেন?'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'আজ এই পর্যন্ত। পরে আবার সুযোগ পেলে তোমার সঙ্গে আলাপ করবো।'

তিনি চলে যেতে তারা নায়েকও গ্রামের পথ ধরলে।

সেকালে ভাল পথ-ঘাট ছিল না, একথা আগেই বলেছি। তার ওপর তখন চোর-ডাকাত-ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত। মানুষের ধনপ্রাণ তখন ওদের খেয়াল খেলার সামগ্রী মাত্র। একটা পথ ধরে তারা নায়েক তো চলেছে।

মাঘের শেষ। বনে-বাগানে চেনা-অচেনা গাছে-লতায় ফুল ফুটেছে। আম-মউলের গন্ধে বাতাস ভারি। তারা নায়েক চলেছে আর গুন গুন সুরে গান গাইছে, বাউলের সুরে। হাতে কড়ালাগানো লাঠিতে ঠুং ঠুং করে তাল দিচ্ছে।

পথে অন্ধকার নামলো। গ্রাম সেখান থেকে আরও প্রায় ক্রোশটাক। সামনে জোনাকির মতো একটা আলো দেখা যাচ্ছে—বোধ হয় গ্রামের। এমন সময়ে তার সামনে ছায়ার মতো দু-তিনটে মূর্তি এসে দাঁড়ালো। তাদের একজন বললে, 'তুই কে?'

নায়েক বললে, 'তোমরা কে?'

'যে হই সে হই। তুই কে?'

নায়েক বললে, 'দেখতেই পাচ্ছো, দরবেশ।'

'আখড়া কোথায়?'

'ভেঙে গেছে।'

'কোথায় ছিল?'

'ঐ দিকে—'

'ন্যাকরা-মশকরা রাখ্। কোথায় ছিল বল্!'

'যদি না বলি?'

'মেরে পুঁতে ফেলবো।'

'তাতে লাভ কি হবে? যা জানতে চাইছ তা তো জানা হবে না।'

আর একজন বললে, 'তারা নায়েককে চিনিস্? সেও তো শুনেছি তোর মতো ভেখ ধরে থাকে।'

নায়েক বললে, 'তাকে চিনতে পারি নি, তবে জানি বটে।'

তার কথা শুনে লোকগুলো হেসে উঠলো।

নায়েক ফিরে দেখলে, তার পিছনে আরও দুটো লোক। প্রত্যেকের হাতে লাঠি। যে লোকটা প্রথমে কথা কয়েছিল সে বললে, 'তুই তো ভারি রগুড়ে মানুষ। চিনতে পারিস নি, তবু তাকে জানিস? রহস্যটা বল দিকি।'

নায়েক বললে, 'এই মাঘের ঠাণ্ডায় বাদাড়ে দাঁড়িয়ে আমার সারা দেহ অসাড় হয়ে আসছে। যা জানতে চাও ঝটপট বলে ফেল। আমি গাঁয়ে গিয়ে একটু গরম হই। তারা নায়েককে তোমাদের কি দরকার? সে দরবেশ। তার ধন-দৌলত কিছু নেই। তাকে দিয়ে কি কাজ হবে? আর এই বেপট জায়গায় সাঁজ-আঁধারে তোমরা যে তারা নায়ককে খুঁজে বেড়াচ্ছো তা তো মনে হয় না।'

'পাঁচ ঠ্যাঙার নাম শুনেছো? আমরা তারা। ঠ্যাঙাতেই বেরিয়েছি। কিন্তু আমাদের ঐ খেটো বলছে অন্ধকারে এমন করে শ্যাল-কুকুরের মতো খাবার খুঁজে আর ঘুরতে ভাল লাগে না। রাজা-বাদশার মতো নির্ঝঞ্ঝাটে খেয়ে-পরে পায়ের ওপর পা রেখে আরামে থাকতে মন চায়।'

নায়েক বললে, 'তারপর?'

'কিন্তু টাকা-পয়সা না থাকলে সে আরাম আসবে কোথা থেকে?'

'বটেই তো। তারপর?'

'শুনেছি এই বাদাড়ে এক সময়ে রাজার বাড়ি ছিল। রাজার ছেলেপুলে ছিল না।'

নায়েক বললে, 'তবে রাজকন্যা ছিল। তোমার কথা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। সেই রাজার রাজত্ব, রাজকন্যা আর ধনদৌলত সব তার জামাই নিয়ে ভেগেচে। তা তারা নায়েক কি করবে? মন্তর দিয়ে সব ফিরিয়ে এনে তোমাদের মতো গুণীদের হাতে তুলে দেবে?'

'ইয়ারকির কথা নয়। সেই রাজার ধনদৌলত সব নাকি এখানেই কোথায় মাটির তলায় পোঁতা আছে। সে দিব্য চক্ষে দেখে জায়গাটা আমাদের বলে দেবে।'

তারা নায়েক বললে, 'তারা নায়েকের চেয়ে কোন জ্যোতিষী এ বিষয়ে বেশি কাজের হবে। সে খড়ি পেতে বলে দেবে কোন্ কোণে কতটা নিচে নামলে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে। পথ ছাড়, রাত হলো, একটু বিশ্রাম চাই।'

'বিশ্রাম তোমাকে একেবারেই দেবো' বলে খেটে নামধারী বেঁটে ষণ্ডা

লোকটা এগিয়ে এসে বললে। 'আজ ভিক্ষে করে যা আদায় হয়েছে দাও তো চাঁদ। না হলে চকমকি ঠুকে আগে তোমার দাড়ি পোড়াবো।'

তারা নায়েক শান্তকণ্ঠে বললে, 'ভিক্ষুকের চেয়েও তোমাদের হীন অবস্থা দেখছি। আমি ভিক্ষা করি না। যদি কেউ দয়া করে কোনোদিন আহার-আশ্রয় দেয় তো সেদিন সেটুকুই ভোগ করি, না পাই উপবাসে গাছতলায় পড়ে থাকি।'

'হুম্। তুমি সাধু বটে। তারা নায়েক তোমার চেয়েও বড় সাধু। গাঁজা সঙ্গে আছে?'

'না। ওতে আমার দরকার নেই।'

'তবে তুমি কি রকম সাধু? ওরে হুড়কো, বেটাকে তল্লাসী কর্। যে গাঁজা খায় না সে আবার সাধু কিসে?'

নায়েক বললে, 'আমি তো বলি নি, আমি সাধু।'

'আচ্ছা, যাও।'

নায়েক খানিক যেতে যেতেই আবার তারা ডাকলে, 'এই শোন—শোন।'

তারা নায়েক ফিরে এলো।

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে একসঙ্গে বললে, 'তোমায় আজ আমাদের সঙ্গে খেতে হবে। আমরা রোজ পাপ করি, আজ তোমায় খাইয়ে পুণ্যি করবো।'

'চলো। তোমাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের বিবেচনায় যে কাজ পাপ তা কর কেন?'

'পেটের দায়ে। তাই না রে খোঁচা?'

খোঁচা বললে, 'না করলে ভাল লাগে না, তাই করি। কি রে হুড়কো তাই নয়?'

হুড়কো বললে, 'খেতি-খোলা নেই, কেউ মুনীস খাটায় না, কাজ-কারবার জানি নে। খাওয়া জুটবে কোথেকে? তাই লুট-পাট, ঠ্যাঙা-ঠেঙি। তা সাধুবাবা, আমাদের জন্যে তোমার এত দরদ যে?'

নায়েক বললে, 'তোমরা সিপাইয়ের কাজ করবে?'

'কোম্পানির না নবাবের?'

'না রূপোগড়ের?'

'না মহেশ্বরের?'

নায়েক বললে, 'পরে বলবো। যেখানে নিয়ে যাচ্ছো সেখানে গিয়ে

খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে কথা কইবো। আচ্ছা, তোমাদের ঘর-সংসার আছে?'

পাঁচজনই বললে, 'নেই আবার? বউ, ছেলে, বুড়ো বাপ-মা, খুড়ি, পিসি—'

নায়েক নীরবে চলতে চলতে তাদের সঙ্গে একটা অনেককালের পুরোনো ভাঙা মন্দিরে এসে পৌঁছলো!

॥ নয় ॥
জীবন-মরণ দোলায়

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে ও নায়েক মন্দিরে পৌঁছতেই তাদের কারা ঘিরে ধরে বললে, 'খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবি।'

অন্ধকারেও পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে ও তারা নায়েক দেখলে, লোকগুলো পাঠান সৈন্য। তবে তাদের সংখ্যা বুঝতে পারলে না। লোকগুলো সমস্বরে বলে উঠলো, 'এই সেই পণ্ডিত।'

তাদের একজন ফস্ করে তলোয়ার খুলে তারা নায়েকের ঘাড়ে বসাবার উদ্যোগ করতেই একজন হাত তুলে বললে, 'সবুর!' তারপর তারা নায়েককে উদ্দেশ করে সে বললে, 'পণ্ডিত! এবার কি হয়? আমাদের সর্দারকে তো কোতোল করেছো। এবার তোমায় কোতোল করবোই।'

তারা নায়েক নিমেষে বুঝতে পারলে, সর্দার নিহত হওয়ার ফলে যে পাঠান-ফৌজ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে এরা তারই একটি অংশ। রূপনারায়ণের দিকে না গিয়ে এরা গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হয়তো গ্রামে গিয়ে অত্যাচারও করেছে।

নায়েক বললে, 'আমি পণ্ডিত নই।'

'জরুর তুমি পণ্ডিত। তোমার সাথীরা সিপাহী। ওদেরও কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। এই! ধর ওদের।'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে তাই শুনে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো; বললে 'আমরা সেপাই নই। আমরা গরিব লোক। এই লোকটা আমাদের সেপাইর কাজ দেবে বলে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা ছেলেমানুষ। আমাদের ছেড়ে দাও বাবা!'

'খবরদার! একটু নড়লেই ফতে!' বলেই লোকটা তলোয়ারে ঝনাৎ করে শব্দ করলে, তারপর নায়েককে বললে, 'তুমি পণ্ডিত নও তো কে?'

নায়েক বললে, 'ফকির।'

আর একজন বললে, 'এত ঝামেলায় কি দরকার? সব কটাকে কেটে ফেলা যাক।'

আর একজন বললে, 'লোকটা ফকির হলেও হতে পারে। ওর সাজ-পোশাক ফকিরের মতোই। ওকে রেখে ওই পাঁচটাকে কেটে ফেলা যাক।'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো; বললে, 'সাহেব বাবারা, আমরা গরিব লোক। খেতে পাই নে। ঐ লোকটা আমাদের ছেলেমানুষ দেখে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ছেড়ে দাও।'

নায়েক বললে, 'সাহেব! বৃথা রক্তপাত কর কেন? আমরা কেউই তোমাদের ক্ষতি করি নি। তোমরা কি চাও?'

'খাবার।'

নায়েক বললে, 'আমি ফকির। আর এরা গাঁয়ের লোক। পথে এদের সঙ্গে দেখা। এরা কোথায় থাকে জানি না। আমার পথের সঙ্গীমাত্র। খাবার কোথায় পাবো?'

'ওরা যে বললে, তুমি ওদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলে?'

'ঐ জোয়ান মরদগুলোকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখেও কি বুঝতে পারছো না, ওদের গায়ে জোর থাকলেও মনে একটুকুও বল নেই? ওদের দিয়ে সিপাইগিরি হয়? তোমরা সূর্যপণ্ডিতকে জানো। তিনি বুদ্ধিমান, সাহসী, রাজমন্ত্রী। ওদের মতো লোক দিয়ে তাঁরই বা কি কাজ হবে? প্রাণের ভয়ে ওদের সবটুকু বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। কি বলতে কি বলছে। বল তো সাহেব, তোমাদের সর্দার কে?'

পাঠানগুলো এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। প্রশ্নে তারা সকলেই কিন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠলো, প্রায় একসঙ্গেই কয়েকজন বললে, 'তাতে তোমার কি দরকার?'

'দরকার আছে। তার সঙ্গে গোপনে একটি কাজের কথা ছিল। কথাটা যেমন জরুরি, তেমনি লাভের।'

তাই শুনে দলের সকলেই বলে উঠলো, 'আমি সর্দার।'

'ধেৎ! আমি সর্দার।'

'এই! খবরদার!'

'হুশিয়ার!'

'তফাৎ যাও। ভীরু!'

'কী!'

সর্দারি নিয়ে দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, ধ্বস্তাধ্বস্তি, অসি-ঝনৎকার. গালা-গালি আরম্ভ হলো। সেই সুযোগে ও অন্ধকারে নায়েক ও পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে উধাও।

ছ'জনেই একদিকে ছুটতে লাগলো। বেশ খানিকদূর যাবার পর সামনে পড়লো মাঠ। মাঠের ধারে পৌঁছে ছ'জনেই হাঁফাতে লাগলো।

খোঁচা হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, 'বাব্বা, বড্ড বেঁচে গেছি।'

খেটে বললে, 'বাবার দয়ায়।'

ঠ্যাঙা বললে, 'ঠ্যাঙাড়েগিরিতে ঝকমারি।'

নায়েক বললে, 'তোরা এত বোকা, এত ভীরু! দুর্বলের ওপরে তোদের যত অত্যাচার!'

হুড়কো বললে, 'বাবা, তোমার চরণে গড় করি। তুমি মানুষ নও, দেবতা।'

নায়েক বললে, 'ছাড়্ ছাড়্, পা ছাড়্। তোদের গাঁয়ে আমায় নিয়ে চল।'

ঠ্যাঙা বললে, 'বাবা, তোমার মতো আমারও সন্ন্যাসী হবো।'

নায়েক না হেসে থাকতে পারলে না; বললে, 'কিসের দুঃখে?'

তিন-চারজনে একসঙ্গে বললে, 'এতে সুখ নেই। সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।'

'ভয় কিসের? দেশে এখন অরাজকতা। কে শাসন করবে, শান্তি বজায় রাখবে? লোক যে বেঁচে আছে, তাই আশ্চর্য! সন্ন্যাসী হওয়ার দুর্বুদ্ধি যেন তোদের না হয়। তোরা আমার শিষ্য হবি?'

'হবো, বাবা, হবো। তা হলে যা মনে করবো, তাই করতে পারবো তো? সে মন্তর দেবে তো?' বলে হুড়কো তারা নায়েকের মুখের দিকে ঝুঁকে তাকালো।

নায়েক বললে, 'ওটা হলো সাধনের ব্যাপার। আমি তোদের কেবল মন্তর দেবো। কিন্তু তার আগে একটা ভাল জায়গা দরকার। আর প্রাণপাখীকে খাঁচায় রাখতে গেলে তাকে একটু দানা-পানি দিতে হবে।'

'ঠিক, ঠিক। । সে-কথা তো ভুলেই গেছি। তুমি তো সবই জানতে পারো বাবা। খিদেয় পেটের খালি হাঁড়িতে ছুঁচো ঘুরপাক দিতে দিতে কিচির-মিচির করছে।' বলে খেটে পেটে থাবা মারলে।

নায়েক বললে, 'আমাকে খাবার নেমন্তন্ন করেছিলি সে-কথা ভুলে গেছিস?'

খোঁচা বললে, 'বাবা, ক্ষ্যামা দাও। একদম ভুলে গেছি। কিন্তু খাবার তো ছিল ঐ মন্দিরে। চাল-ডাল-তেল-নুন-লঙ্কা আর চার কলসী জল। সে তো এতক্ষণে সাফ। যে রাক্ষসের সামনে পড়েছিলাম। তুমি ছিলে তাই রক্ষে।'

নায়েক বললে, 'এখন কি হবে? সামনে কোন গাঁ আছে?'

খেটে বললে, 'আছে। তবে যেতে ভয় হয়।'

'কেন?'

'গাঁয়ে কোম্পানির চৌকি বসেছে।'

'কোম্পানি কি দেশের রাজা?'

পাঁচ জনেই বললে, 'না।'

'তবে তাকে ভয় কেন? তোদের ভয় ভাঙার মন্তর দেবো। চল্, গাঁয়ে চল্। আচ্ছা, তোদের সর্দার কে?'

হুড়কো বললে, 'সর্দার? মানে—ইয়ে—মাতব্বর—ইয়ে—কেউ নেই।'

খোঁচা বললে, 'কেউ নেই কি রকম?'

ঠ্যাঙা বললে, 'মিছে কথা কইলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।'

খেটে বললে; 'সেদিন কার কথায় ডাকাতি করেছিস্?'

গদা মোটা ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'আমি সেই সনুঢে ঠেকে রগড়টা ডেখ্‌ছি। একটা কঠাও কই নি। ডরকার কি? কিণ্টু এখন চুপচাপ ঠাকা কঠিন। সর্ডার হচ্ছে গিয়ে এই গডারাম। মানিস্ কি মানিস্ নে? এই ড্যাখ ডাণ্ডা।'

নায়েক বললে, 'তোরা যে গুরুর সামনেই দাঙ্গাফ্যাসাদ বাধালি। ঐ সেপাইগুলোর মতো নিজেদের মাথা ভাঙাভাঙি করবি নাকি? তবে তাই কর। আমি চললাম।'

সকলেই বললে, 'যেও না, বাবা, যেও না।'

'তবে গাঁয়ে চল্। সর্দার আমি ঠিক করে দেবো।'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে বললে, 'বেশ। তুমি কি আর সব দিক বিবেচনা না করেই কাজটা সারবে?'

গদারাম বললে, 'বাবা, আমার সাহস-শক্‌টি টো ডেখলে—'

'সকলেরই সাহস-শক্তি দেখেছি। রাত ঘোর হচ্ছে, ঠাণ্ডা বাড়ছে, ক্লান্তিতে—আরে! ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে না?'

সকলে থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো। মনে হচ্ছে, মাঠের ওপর দিয়ে অনেকগুলো ঘোড়া চলেছে।

খোঁচা বললে, 'কোম্পানির সিপাইরা খাজনার টাকা নিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়।'

গদারাম বললে, 'যদি লুঠতে পারটাম রে! ওডের হাটে যে সঙীনটোলা বন্ডুক। বেটারা বেজায় কড়া। কঠা কইবার আগেই ঢুম্ করে মেরে ডেয়।'

নায়েক বললে, 'ওরা বোধহয় গাঁয়ের চৌকিতে চলেছে।'

'উঁহু! যাবে সেই মেডিনীপুর—ওটা সডর কিনা।'

'বটে!'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে তারা নায়েককে নিয়ে গাঁয়ের দিকে চললো।

মাঠখানা বেশি বড় নয়। মাঠ পার হয়ে গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই চৌকি। চার-পাঁচটা তাঁবু পাশাপাশি পড়েছে। শান্ত্রী বন্দুকে সঙীন লাগিয়ে পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ দু-তিনটে কুকুর গম্ভীর স্বরে ডেকে উঠলো, হাউ-হাউ-হাউ।

খেটে বললে, 'কোম্পানীর কুকুর। এক একটা বাঘের মতো দেখতে। আমাদের গন্ধ পেয়েছে। বাঁ-দিক ধরে এগোও!'

তারা বাঁ-দিক ধরে খানিক গিয়ে গাঁয়ে ঢুকলো। তারপর বাঁশতলা দিয়ে, পুকুরপাড় দিয়ে, নারকোল গাছের পাশ দিয়ে একখানা মাটকোঠার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো।

ঠ্যাঙা আস্তে আস্তে বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে টোকা মারলে, টক-টক টক।

কোন সাড়া নেই।

আবার তিনটে টোকা মেরে কুকুরছানার মতো কুঁই-কুঁই করে বার দুই দরজা আঁচড়ালে।

একটু পরেই পাল্লার জোড়ে আলো দেখা গেল। ভিতর থেকে কে জিজ্ঞেস করলে, এত রাতে কে জ্বালায়?'

'পাঁচু।'

খুট্ করে দরজা খুলে গেল।

তারা নায়েককে নিয়ে পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আলোও নিভলো।

ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, কিন্তু গরম। বাইরের ঠাণ্ডা থেকে গিয়ে নায়েকের বেশ আরাম বোধ হলো। পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে সেই অন্ধকারে যে রকম স্বচ্ছন্দে চলতে লাগলো তাতে মনে হলো তারা সেখানে চলাফেরা

করতে অভ্যস্ত। যে লোকটা তাদের দরজা খুলে দিয়েছিল তার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নায়েক কোনই ধারণা করতে পারলে না। কিন্তু সমস্ত ঘটনা থেকে আন্দাজ করলে যে, পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে এখানে খুবই পরিচিত। হয়তো এই বাড়িটা ওদের আশ্রয়, গৃহস্বামী ওদেরই দলের। তবে নিজে লুঠপাঠ করে না, কোন কিছুর বিনিময়ে বখরা নেয়। কিছুক্ষণ পরে সব জানা যাবে, এই মনে করে সে ধৈর্য ধরে রইলো।

তাকে বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হলো না, সকলে একখানি ছোট কুঠরির মধ্যে ঢুকলো। ঘরখানা মাটির, ভেতরে একটা মাটির দেরকোর ওপর মেটে প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, মেঝেয় হোগলার চাটাই পাতা, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে একটি ছোট কাপড়ের পুঁটলি।

ছ'জনে প্রদীপের চারধারে গোল হয়ে বসলো। যে সামান্য বাতাস ঘরে ঢুকছিল তাইতে প্রদীপের শিখা ও দেয়ালের গায়ে ছটি ছায়া অল্প অল্প কাঁপছে। সকলে চুপ-চাপ।

গৃহস্বামী ঘরে ঢুকলো, হাতে একটা বড় ধামা। সে ধামাটা চাটাইয়ের ওপর নামিয়ে রেখে খ্যানখ্যানে গলায় বললে, 'রাত দুপুরে আর কোথায় কি পাবো ? এই গুড়-মুড়ি চিবোও। জল আনছি।'

নায়েক লোকটাকে দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনে হতে লাগলো, তাকে যেন কোথায় দেখেছে। লোকটার চেহারার বিশেষত্ব হচ্ছে, ওর ক্ষুদে আধবোজা চোখ দুটো। লোকটারশরীরটা ঢ্যাঙা, মাথায় খোঁচা খোঁচা চুল, মুখে খেজুর কাঁটার মতো গোঁফ, গায়ের রং মিস কালো যেন পালিশ করা, পরনে হাঁটু সমান ময়লা মোটা কাপড়, গায়ে আধময়লা ছেঁড়া চৌধুপী চাদর।

লোকটা জল আনতে চলে গেল।

গদারাম বললে, 'বাবা, পেসাড করে ডাও। পেটের মালসায় ক্ষিদের আগুন জ্বলছে।' বলে ধামাটা নায়েকের সামনে এগিয়ে দিলে।

নায়েক দেখলে, মোটা মোটা মুড়ি, মাঝখানে একতাল আখের গুড়। নায়েক খানিক মুড়ি আর গুড় আলখাল্লায় নিয়ে ধামা সরিয়ে দিয়ে বললে, 'খাও।'

পাঁচ জনে থাবা থাবা মুড়ি আর গুড় নিয়ে মস্‌মস্‌ করে চিবিয়ে কোঁৎ-কোঁৎ করে গিলতে লাগলো।

ক্ষুধা কিছুটা শান্ত হলে নায়েক বললে, 'এ কার বাড়ি ? লোকটা কে ?'

হুড়কো বললে, 'আমাদের স্যাঙাৎ।'

'তোমাদের মতো লুঠপাট করে?'

'উঁহুঃ! যে মাল আমরা সামলাতে পারি নে, ও সে ভার নেয়।'

'ব—টে। নাম কি?'

'বটেশ্বর।'

বটেশ্বর এক কলসী জল আর একটা ঘটি নিয়ে ঘরে ঢুকেই নায়েকের দিকে তাকিয়ে থ' হয়ে গেল। পরক্ষণেই সে ভাব কাটিয়ে ঘটি-কলসী নামিয়ে রেখে, গড় হয়ে প্রণাম করে নায়েকের পায়ের ধুলো জিভে-মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'কি আমার বরাত! বাবা, তুমি দয়া করে আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছো!'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে চমকে ওঠে, জিজ্ঞেস করল, 'কে রে? কে?'

বটেশ্বর বলে, 'নায়েকপুরের বাবা।'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললে, 'অপরাধ নিও না, বাবা, কত পাপ যে সন্ধ্যে থেকে করেছি! নরকে যেন না যাই।'

নায়েক বললে, 'তোরা খা। ভয় নেই। পেট ভরে খা।'

'তোমার চরণ দর্শনেই আমাদের পেট ভরেছে।'

কিন্তু এদিকে ধামাও খালি।

নায়েক বললে, 'তবে জল খা।'

'আগে তুমি খাও বাবা!

নায়েক প্রায় আধ ঘটি জল খেয়ে বললে, 'এখন বিশ্রাম। তোমরাও শুয়ে পড়। কাল সকালে কথাবার্তা হবে।'

পাঁচ ঠ্যাঙাড়ে বললে, 'আমরা তোমার ঘরের দরজায় পড়ে থাকবো। তুমি বিশ্রাম কর। তোমার সাধন-ভজনের ব্যাঘাত হবে।'

'কিন্তু বাইরে যে ঠাণ্ডা।'

'এ কিছু নয়। আমাদের অভ্যাস আছে।' বলে তারা সকলে দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা নায়েকও আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো।

॥ দশ ॥

মহেশ্বরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নায়েকের পরিণাম

সূর্যপণ্ডিত দেবেশ্বরকে নিয়ে কমলপুরের ঘাট অবধি পৌঁছবার আগে খবর পান, উন্মত্ত পাঠান-সেনা রূপনারায়ণের তীরে দু-একখানা গ্রামে এমন অত্যাচার করেছে যে গ্রামবাসীরা প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে

পালিয়েছে। সৈন্যেরা লুঠ-তরাজ, মারধোর করেছে, একখানা গ্রামও জ্বালিয়ে দিয়েছে। তারা বলছে, 'পণ্ডিত কোথায়? খাবার দাও।'

একজন ভীত গ্রামবাসীর মুখে এই ভয়ঙ্কর খবর শুনে সূর্যপণ্ডিত সেদিকে আর না এগিয়ে মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে এসেছেন। পথে আসতে আসতে কলিঙ্গ-সর্দারের খবরও তাঁর কানে এসেছে। সর্দার গড়ুরধ্বজের ওপর তো বটেই—মহেশ্বরের ওপরও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। অথচ সর্দারের নিজ নিবুর্দ্ধিতায় সে নিজ জালে জড়িয়ে পড়ে বিফল ও অপমানিত হয়েছে।

মহেশ্বরের চারধারের এখন শত্রু। তাই সূর্যপণ্ডিত দেবেশ্বরকে মহেশ্বরের উদ্দেশ্য আগে পাঠিয়ে তারা নায়েকের কাছে এসেছিলেন। তিনি জানতেন এবং বিশ্বাস করেন, রাজার শক্তি তাঁর প্রজাবর্গ, তাঁর অনুগত জনসাধারণ। তারা নায়েকও সে সম্বন্ধে সচেতন। তারার আরও এক মহৎ লক্ষ্য, বিদেশীর আধিপত্য স্বীকার না করা। বাংলা-দেশ থাকবে বাঙালীরই অধীন। এখানে আর কারো প্রভুত্ব বা স্বার্থ থাকবে না—এ কথাটা দেশের লোককে বুঝিয়ে বিদেশীদের হঠানো। কিন্তু বোঝানো, বুঝিয়ে একতাবদ্ধ, উদ্দীপিত ও অন্তরে সাহস সঞ্চার করা দরকার হলে তাদের পক্ষে প্রাণত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া, এই অবস্থার সৃষ্টি করা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময়েই মনে হয়, অসম্ভব।

সূর্যপণ্ডিত তারা নায়েকের কাছ থেকে যখন মহেশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন রাত্রি প্রায় শেষ। দেবেশ্বর তার দল নিয়ে আগেই পৌঁছেছিল। বলা বাহুল্য, ঘোড়ায় যাতায়াত না করলে তাঁদের আরও সময় লাগতো।

মহেশ্বর তখনও বিশ্রাম করতে যান নি, তাঁর সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করছেন। সূর্যপণ্ডিত তাঁর সামনে উপস্থিত হতেই তিনি আশ্চর্য হলেন, বললেন, 'আপনি? এখানে? এমন সময়ে? বসুন।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'রাজকার্যের সময়-অসময় নেই। আপনি সকল সংবাদ রাখেন কি?'

'কিসের?'

'দেশের।'

'মোটামুটি।'

'তা হলে তো আমার এখানে এমন সময়ে আসার কারণও বুঝতে পেরেছেন, দেবেশ্বরও কেন ফিরে এসেছে—'

মহেশ্বর আরও আশ্চর্য হলেন, বললেন, 'দেবেশ্বরও এসেছে? কৈ সে ?'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, সে আপনাকে বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক বলে, অন্যত্র অপেক্ষা করছে।'

'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

সূর্যপণ্ডিত উন্মত্ত পাঠান-সৈন্য ও কলিঙ্গ-সর্দারের বৃত্তান্ত জানালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন আপনার অভিপ্রায় কি ?'

মহেশ্বর সেনাপতির মুখের দিকে একবার তাকালেন এবং ক্ষণিক ইতস্ততঃ করে বললেন, 'ভুবনপুর আক্রমণ করা।'

এবার সূর্যপণ্ডিত আশ্চর্য হলেন, বললেন, 'এমন সংকল্পের কথা তো আগে কখন শুনি নি। মনে হচ্ছে, আমাকে আর আপনার প্রয়োজন নেই।'

'কেন এমন কথা বলছেন ?'

'আগে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে গ্রহণ করতেন না। এই কাজের পরিণাম চিন্তা করেছেন কি ? স্বীকার করি, অরক্ষিত ভুবনপুর আক্রমণ ও দখল করবার শক্তি আপনার আছে। কিন্তু ভুবনপুর কোম্পানির অধীন। তাকে পরাভূত করবার মতো শক্তি আপনার নেই, আপনি সে ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল। সুতরাং—'

'সুতরাং ভীরুর মতো নিজ অধিকার পরিত্যাগই কর্তব্য, এই আপনার পরামর্শ ? আপনার মুখ থেকে এমন উক্তি কোনদিন আশা করি নি।'

সূর্যপণ্ডিত অপমানে, দুঃখে, স্তম্ভিত হলেন ; বুঝলেন, মহেশ্বরের ধৈর্য ও বিচক্ষণতা নষ্ট হয়েছে। তাঁর আত্মবিশ্বাস এখন প্রবল। সেই বিশ্বাসে তিনি এমন অন্ধ যে নিজ শক্তিরও পরিমাপ করতে পারছেন না। এমন অবস্থায় তাঁকে বোঝাতে যাওয়ায় কোন ফল হবে না, উপরন্তু তাঁকে আরও উত্তেজিত করে তোলা হবে। কেবল বললেন, 'পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি কি ?'

'আমি বড় ক্লান্ত। সেনাপতির মুখে শুনুন।' বলে মহেশ্বর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে উঠে গেলেন।

সূর্যপণ্ডিত সেনাপতিকে বললেন, 'যদি কাল সকালে আপনার সময় হয়, বিষয়টি সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো। কাজটির পরিণাম ভয়ঙ্কর বলেই আমার ধারণা। কোম্পানি সামরিক বলে বলীয়ান। নবাবও তারও পক্ষে। গড়্ রঘ্বজ এখন হতবল হলেও মহেশ্বরের ধ্বংস তার কাম্য। সেও ওদের সঙ্গে যোগ দেবে। ফল হবে সাংঘাতিক।'

'এ ধারণা অমূলক। নবাব কোম্পানির ওপর বিরক্ত। গড়্‌রধ্বজই বা কেন এই গোলযোগে আসবে? সংবাদ পেয়েছি, সে এখন নিজের ঘর গোছাতেই ব্যস্ত।'

'আচ্ছা, কাল এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে।'

সূর্যপণ্ডিত অন্যত্র গেলেন।

ওদিকে বটেশ্বরের বাড়িতে শেষরাত্রে এক কাণ্ড ঘটলো। বটেশ্বরের দল নিতান্ত ছোট নয়। লোকটা সাধু-সন্ন্যাসীতে ভক্তিমান, আবার চোর-ডাকাতেরও বন্ধু। তার ঘরে মাটি খুঁড়লে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে বিস্তর। কিন্তু সংসারে তর খাবার লোক মাত্র দুটি—নিজে ও একটি বছর সতেরো-আঠারোর কালা-বোবা ছেলে। ছেলেটা ঘরে থাকে না, পাগলের মতো এদিকে-সেদিকে ঘুরে বেড়ায়। বটেশ্বরের ধনদৌলতের প্রতি দারুণ মোহ। মোহের বশে সে ধনদৌলত সৎ অসৎ দু পথেই জমায়। সে মরে গেলে কে তা ভোগ করবে, সে চিন্তা করে না। তার ধারণা, যেমন চোর-ডাকাতের দোসর হলে টাকা পয়সা পাওয়া যায় তেমনি ঠাকুর-দেবতা, সাধু-সন্ন্যাসীদের ভক্তি করলেও ধনদৌলত আসে। তার ওপর আরও লাভ হয় এই যে, ওতে সকল পাপ ক্ষয়ে পুণ্য সঞ্চয় করা যায় যার ফলে স্বর্গবাস। কিন্তু যে রাত্রে নায়েকপুরের স্বয়ং বাবা আশ্রয় নিলেন সে রাত্রে এক বিপত্তি ঘটলো।

টাকার লোভ বড় লোভ। বটেশ্বরের দোসর আরও যে কয়েকটি ডাকাতের দল তাদের মধ্যে একটি গিয়েছিল কোম্পানির আদায়ী খাজনা লুঠ করতে। দলটা ছিল বেশ ভারী। তারা কোম্পানির রক্ষীদের প্রায় কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত, সুশৃঙ্খল যোদ্ধা ও উন্নত হাতিয়ারের সঙ্গে অশিক্ষিত যোদ্ধা ও নিকৃষ্ট হাতিয়ারে কতক্ষণ যুঝবে? তবু তারা কয়েকজন সাদা-কালো রক্ষীকে হতাহত করে এবং নিজেদেরও কয়েকজনকে হারায়। তারপর গুলির ঝাঁকের মধ্য দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালায়। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে এসে বটেশ্বরের বাড়িতে আশ্রয় নিলে। তারা মনে করলে ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল। কিন্তু ভোর না হতেই বাড়িখানি কোম্পানির সিপাইরা ঘিরে ফেললে। দরজায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে দমাদম ঘা দিতে লাগলো। বিপদ বুঝে বটেশ্বর ও দলের কয়েক জন বড় বড় কয়েকটা গাছের গুঁড়ি এনে তাই দিয়ে দরজা আটকালে।

দরজায় আঘাতের শব্দে ও বাইরের গোলমালে তারা নায়েকের ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখে, সকলে

খুব উত্তেজিত এবং এধারে-ওধারে ছুটছে। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করায় বটেশ্বর বললে, 'বাবা বাঁচাও। কোম্পানির সিপাইরা আমার বাড়ি ঘিরে ধরেছে।'

'কেন ? এরা কারা ?'

'এরা আমার চেনা লোক। সিপাইরা এমন কাজ কেন করলে জানি নে। একটা মন্তরে ওদের ভস্ম করে দাও বাবা।'

কিন্তু বাবা ভস্ম করবার আগে কোম্পানির সিপাইরা তাদের ভস্ম করবার উদ্দেশ্যে ঘরে আগুন দিলে। দেখতে দেখতে আগুন চালে লাফিয়ে উঠলো, খড়ের গাদায় দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগলো। আর রক্ষা নেই দেখে প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সকলে ছুটে বেরিয়ে পড়লো এবং সামনে দিয়ে পালাতে গিয়ে তাদের হাতে বন্দী হলো। বটেশ্বরের ছেলেটা কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে গেল কেউ বুঝতে পারলে না।

সিপাইরা সকলকে বেঁধে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলো এবং খাজনা লুঠ করতে এসেছিল বলে পরদিন সদরে নিয়ে চললো। বটেশ্বরের বাড়ি ও তার ধনদৌলত ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

পোড়া বাড়ির পাশ দিয়ে বন্দী অবস্থায় যেতে যেতে সেদিকে তাকিয়ে বটেশ্বরের চোখে জল এলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তারা নায়েককে বললে, 'সবই তোমার ইচ্ছা। দেখো যেন প্রাণে বাঁচি। তা হলে আবার সব হবে।'

তারা নায়েক মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নীরবে চলতে লাগলো।

॥ এগার ॥

চতুরে চতুরে

যে স্থানটিকে কেন্দ্র করে আমাদের কাহিনী সেই গড়-জঙ্গল থেকে আমরা ঘটনাচক্রে অনেক দূরে এসে পড়েছি। কোম্পানি সেখানে তাদের মনোনীত জনার্দন সর্দার নামে একটি লোককে খাজনা আদায়কারীরূপে বসিয়েছিল এ কথা গোড়ার দিকে বলা হয়েছে, তবে নামটি তখন বলা হয় নি। গড়-জঙ্গলের কোন শাসনকর্তা ছিল না। সুতরাং সেখানে অরাজকতার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আর, হয়েছিল তাই-ই। সেই অরাজকতার মধ্যে খাজনা আদায় করা সহজ নয়। কিন্তু আদায়কারী লোকটি ছিল চতুর। সে কোম্পানির পাইক-পেয়াদার সাহায্য তো নিয়েই

ছিল, সেই সঙ্গে কতকগুলো গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক নিয়ে একটি দল গড়ে তুলেছিল। তাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ এতখানি উত্যক্ত হয়েছিল যে, তারাও দলবদ্ধ হয়ে জনার্দন সমেত সমস্ত দলটাকে উৎখাতের পরিকল্পনা করেছিল। তাদের সর্দার হয়েছিল ভুঁইয়া নামে একটি খুব জোয়ান লোক।

ভূঁইয়ার একটি চোখ ছিল কানা, মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল, গায়ের রং মিস কালো। জাতিতে সে ছিল বাগ্‌দী। ঐ অঞ্চলে তখন চোয়াড়, বাগ্‌দী, রাজবংশী ও সাঁওতালদের বাস ছিল অনেক। তাদের জীবিকা চাষ-আবাদ, বন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করা, গোরুর গাড়ি চালানো, পাল্‌কি বওয়া, পাইক-পেয়াদাগিরি এবং চুরি-ডাকাতি। আবার জনার্দনও চেষ্টায় ছিল গড়-জঙ্গলের অধিকারী হয়ে বসার। সেও ভূঁইয়ার মতলব জানতে পেরেছিল। তাই তাকে খতমের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল। এই অরাজকতা ও দ্বন্দ্বের ফলে খাজনা আদায়ের বাধা ঘটছিল।

ওদিকে কম খাজনা আদায় হওয়ায় কোম্পানি জনার্দনকে কড়া হুকুম দিয়ে বলেছিল, যদি এই রকম চলে তাকে সরিয়ে একজন সুযোগ্য লোককে সেখানে বসানো হবে।

জনার্দন কোম্পানি ও নবাবকে জানালো, গড়-জঙ্গলের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ভূঁইয়া নামে একটা লোককে গদিতে বসাবার মতলব করেছে। এই কারণে খাজনা আদায় করা খুবই কঠিন হয়েছে। ভূঁইয়ার দল তাদের সকলকে কেটে ফেলবার জন্য দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর প্রকাশ্যে বলছে, কোম্পানি আর নবাবের এক্তিয়ার এ অঞ্চলে আর নেই। এমন অবস্থায়, তার পাইকপেয়াদার সংখ্যা বাড়ানো দরকার। তাকে সেজন্য অনুমতি দেওয়া হোক। ভূঁইয়ার দলকে কাবু করতে বর্তমানে সিপাইদের দরকার নেই, বেশি সংখ্যক পাইক-পেয়াদা হলেই চলবে। কিন্তু জনার্দনের এই চিঠি সদরে আর পৌঁছতে পারলো না, মাঝপথে ভূঁইয়ার দলের হাতে পড়লো! ফলে ভুঁইয়া জনার্দনের প্রকাশ্য শত্রুতা করতে লাগলো।

মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত ওদিকে ঘটনার টানে এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, সেখানকার এই অবস্থার কথা জানতে পারেন নি, যা জানা তাঁদের উচিত ছিল। কারণ, গড়-জঙ্গল মহেশ্বর ও দেবেশ্বরের জন্মভূমি, ভুবনেশ্বরের হাতে গড়া বসতি ও তাঁর রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। তবে কথা এই, অবস্থার ফেরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাবধানীরও ভুল হয়। কিন্তু গড় মধ্বজ গড়-

জঙ্গলের এই অবস্থার খবর জানতেন। জেনেও তাঁর কিছুই করবার উপায় ছিল না।

এত কথা বলছি এই কারণে যে, মহেশ্বরের পরিকল্পনায় ঐ গড়-জঙ্গল হঠাৎ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো। তিনি দোটানায় পড়লেন। ব্যাপারটা কি হলো, বলি।

সূর্যপণ্ডিত সকালে মহেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন। এমন সময়ে এক সাধু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং পরক্ষণেই বললেন, 'নির্জনে দু-একটি কথা বলার ইচ্ছা।'

সূর্যপণ্ডিত প্রথমে মনে করলেন, লোকটি চর। কিন্তু অবিলম্বে তাঁর সে ভুল ভাঙলো।

সূর্যপণ্ডিত তাকে ইসারায় খানিক দূরে একটি ছাতিমগাছ দেখিয়ে নিজে সেদিকে চললেন। সেখানে পৌঁছে তিনি বললেন, 'কোন্ আশ্রমী সাধু?'

সাধু বললেন, 'সংসারাশ্রমী। এটা এমন এক সময় যখন নিঃসম্বল সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া আর কেউই নিরাপদে পথ চলতে পারে না।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'বুঝলাম। ভেখধারী। তুমি কে? কি চাও?'

'গড়-জঙ্গলের খবর রাখেন কি?'

সূর্যপণ্ডিত চমকে উঠলেন; বললেন, 'গড়-জঙ্গল? না। কি ব্যাপার?'

সাধু বললেন, সংক্ষেপে বলি। 'আমি গড়-জঙ্গলবাসী, নাম চন্দ্রকুমার। আমার স্বর্গীয় পিতা ভুবনেশ্বরের সরকারে চাকরি করতেন। আমিও ওখানেই সরকারী সেরেস্তায় চাকরি করি।'

'তারপর?'

লোকটি গড়-জঙ্গলের সকল বৃত্তান্ত সূর্যপণ্ডিতকে জানালে তিনি বললেন, 'তুমি এই সংবাদই দিতে এসেছো অথবা আর কোন্ উদ্দেশ্যে এ পথে চলেছো?'

'অন্য উদ্দেশ্য নেই।'

সূর্যপণ্ডিত এমন ভাব দেখালেন যেন গড়-জঙ্গলের সংবাদে তিনি আদৌ বিচলিত হন নি এবং গড়-জঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। তিনি লোকটিকে বিদায় দিয়ে নিজ গন্তব্য স্থানের দিকে চললেন।

পথে আবার বাধা পড়লো। সেনাপতির দূত তাঁকে বললে, 'সেনাপতি মশাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক।'

'তিনি কোথায়?'

'তাঁর শিবিরে।'

'চল।'

অদূরে সেনাপতির শিবির। সম্মুখে দুজন রক্ষী। তারা সূর্যপণ্ডিতের জন্য পথ ছেড়ে দিলে। সূর্যপণ্ডিত ভেতরে যেতেই সেনাপতি তাঁকে বসবার আসন দেখিয়ে বললেন, 'মহারাজের ইচ্ছা আপনি আমার শিবিরে কয়েকদিন থাকুন।'

সূর্যপণ্ডিত বিস্মিত ও অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো, সেনাপতি মহারাজের মঙ্গল অথবা ধ্বংস কামনা করে। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সহজেই একটি বিষয় ধরা পড়লো যে, তিনি যখন অনুপস্থিত ছিলেন সেই অবসরে ষড়যন্ত্রের একখানি জাল পাতা হয়েছে। আর, তাতে ধরা পড়েছেন, স্থূলবুদ্ধি মহেশ্বর এবং দেবেশ্বরও। কিন্তু সূর্যপণ্ডিত বিষয়টি নিয়ে তখন আর বেশি চিন্তা করলেন না। তাঁর প্রধান চিন্তা হলো, আত্মরক্ষা ও মহেশ্বরকে ও দেবেশ্বরকে নিরাপদে মুক্ত করা। কাজ দুটি অতি কঠিন। তিনি বললেন, 'কিন্তু মহারাজের ইচ্ছা তিনি আপনার মারফত প্রকাশ করলেন কেন বুঝতে পারছি না।'

'তাঁর ইচ্ছা।'

'কিন্তু আমি তাঁর মুখ থেকে কথাটি শুনতে চাই। একটি জরুরি সংবাদ পেয়ে তাঁর সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।'

'তিনি বলেছেন সকল বিষয় এখন থেকে আমার সঙ্গেই আলোচনা করতে হবে। কাজেই কি সংবাদ আমায় বলুন। প্রয়োজন হলে আমি তাঁকে জানাবো।'

পণ্ডিত বললেন, 'রূপনারায়ণ দিয়ে কোম্পানি আর নবাবের দশখানি ছিপ এসে ভুবনপুরের ঘাটে ভিড়েছে। আপনাদের ভুবনপুর আক্রমণের অভিসন্ধি কে যেন সদরে ফাঁস করে দিয়েছে। সে নাকি এ কথাও বলেছে, মহেশ্বরের সেনাপতি এই অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তা!'

সেনাপতি বললেন, 'মিথ্যা কথা! কে এই সংবাদ এনেছে? কোথায় সে?'

'নবাব-সরকারের এক কর্মচারি, এই পথে এসে আমাদের গতি-বিধির সংবাদ সংগ্রহ করছিল। সেই সময় তাকে বন্দী করা হয়। কিন্তু সে নিজ পরিচয় দিয়ে চলে গেছে। লোকটা কিছুটা ছদ্মবেশে ছিল। তার গায়ে ছিল গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, অনেকটা সাধুর বেশ। সকলেই তাকে দেখেছে। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম। লোকটি আমার কাছে উপকৃত। সে যে সব কথা সংগ্রহ করেছে তার কিছু কিছু

আমায় বলেছে। তা থেকে বুঝলাম, আপনার বিরুদ্ধে একটি গভীর চক্রান্ত চলছে। আর তার মধ্যে আছে আপনার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকারী। এমন অবস্থায়—'

সেনাপতি আসন ছেড়ে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন।

সূর্যপণ্ডিত বলে চললেন, 'আপনার ভুবনপুর আক্রমণের পরিকল্পনা আমি সমর্থন করি। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সহকারীদের উপর নির্ভর করে কি যুদ্ধজয় সম্ভব? এই সাংঘাতিক সংবাদ প্রথমে মহেশ্বর, পরে আপনাকে জানাবার উদ্দেশ্যেই বার হয়েছিলাম। কিন্তু দেখছি, ষড়যন্ত্রের ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু হয়েছে। আচ্ছা, সেনাপতিমশাই, এই তলোয়ার-খানি দিয়ে আপনি বহু যুদ্ধ জয় করেছেন?'

সেনাপতি হঠাৎ সচেতন হয়ে তলোয়ারখানি সূর্যপণ্ডিতের হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আপনি আর কি জানেন?'

'আর? আর যা জানি তা কেবল মহেশ্বরেরই জানা দরকার। সুতরাং—'

'সুতরাং আমায় বলবেন না। এই তো?'

'ঠিক তা নয়। আমি আপনার বন্দী। আমাকে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কিন্তু যে কথা মহেশ্বরের এখনই জানা প্রয়োজন তা তাঁর জানা হবে না; ফলে আপনাদের মঙ্গলের আশা অতি ক্ষীণ।'

'কিন্তু মহারাজের আদেশ আপনাকে—'

'বন্দী করা?'

'তা নয়। এখন মন্ত্রী ও সেনাপতি আমি।'

'সেনাপতিও রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসে! অবশ্য এ ঐতিহাসিক ঘটনা!'

'মন্ত্রীও বসে নাকি?'

'হাঁ! উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী হলে। কিন্তু আমাদের রাজার রাজ্য নেই। কাজেই আমি ভূতপূর্ব মন্ত্রী, আপনি বর্তমান মন্ত্রী ও সেনাপতি। সে অপরাধে অপরাধী আমি হতে পারি না। তা ঐ সংবাদটি দেবার জন্যই আপনি আমাকে এখানে এনেছেন? এখন অনুমতি দিন আমি তীর্থ-দর্শনে যাত্রা করি। মন্ত্রিত্বে আমার লোভ নেই। তবে স্বয়ং রাজার মুখ থেকে আদেশটি পেলে—'

'আপনি যে ষড়যন্ত্রের কথা বললেন তার বাস্তব প্রমাণ আপনার কাছে আছে?'

'ধৈর্য ধরে থাকুন। শীঘ্রই বুঝতে পারবেন।'

সেনাপতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সূর্যপণ্ডিতের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আমি সংবাদ আনাচ্ছি, মহারাজ শয্যা ত্যাগ করেছেন কি না। এই কে আছিস ?'

'প্রয়োজন নেই। বরং আমিই মহেশ্বরের সংবাদ আনছি। যতক্ষণ এখানে থাকবো ততক্ষণ আপনাদের আজ্ঞাবহনের অনুমতি নিলে বাধিত হবো।'

'না। আপনি এখানে থাকুন। সত্যই বলছেন, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছে ? ভুবনপুরে কোম্পানি আর নবাবের ফৌজ পৌঁচেছে ?'

'আবার বলছি, শীঘ্রই বুঝতে পারবেন।'

সেনাপতি আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেল, 'আপনি যে মন্ত্রী হয়েছেন একথা সকলেই জানে কি ?'

'জানাবার প্রয়োজন নেই। ও কি ? আবার আমার তলোয়ার হাতে নিয়েছেন ?'

'হাঁ! সূর্যপণ্ডিত তলোয়ার চালাতে জানে। বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণধার তলোয়ার এই দুইটি আমার সম্বল। আপনি এখন আমার বন্দী। চীৎকার করলে বা চঞ্চল হলে আপনার মাথা কাঁধে থাকবে না।—এই কে আছিস ?'

একজন সশস্ত্র রক্ষী শিবিরে ঢুকতেই পণ্ডিত বললেন, 'এই রাজ-দ্রোহীকে বন্দী কর।'

রক্ষী শিস দিতেই আর একজন রক্ষী এলো এবং দুজনে সেনাপতির দুহাত ধরতে সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'বন্দীকে নিয়ে আমার সঙ্গে চল, রাজার কাছে।'

সেনাপতি বললেন, 'আমি রাজদ্রোহী ?'

'সে বিচার করবেন রাজা। এই চল,—'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূর্যপণ্ডিত বন্দী সেনাপতিকে নিয়ে বিজয়গর্বে চললেন মহেশ্বরের কাছে।

॥ বারো ॥

ষড়যন্ত্র ও সেনাপতির দণ্ড

পণ্ডিত মহেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সংবাদ পাঠালেন এবং দেখে আশ্চর্য হলেন, সাধুবেশী চন্দ্রকুমার রাজদর্শন করে বেরিয়ে আসছে। চন্দ্রকুমারের ভাব দেখে তাঁর মনে হলো, সে তাঁকে এড়িয়ে যেতে চায়। এতে তাঁর মনে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় জাগলো। কিন্তু তখন কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, দূত এসে সূর্যপণ্ডিতকে ভেতরে যেতে যেতে ইঙ্গিত করলে।

পণ্ডিত চন্দ্রকুমারকে বললেন, 'এইখানেই আমার জন্য অপেক্ষা কর।'

চন্দ্রকুমার যেন এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। আবার সূর্যপণ্ডিতের কথা অমান্য করতেও সাহস হলো না। সে শুষ্কমুখে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলো। রাজার মঙ্গল-অমঙ্গল এ দুটির যে কোনটি করার ঝঞ্ঝাট বিস্তর, বিশেষ করে রাজ্যে এই ধরনের গণ্ডগোলের সময়ে।

পণ্ডিত রক্ষীদের বললেন, 'তোমরা সেনাপতি মশাইকে এইখানেই পাহারা দাও। এঁর শত্রু নিকটেই।'

তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

সেনাপতির মনের অবস্থা তখন খাঁচায় বন্দী বন্য বাঘের মতো। তাঁর হঠাৎ নজর পড়লো গেরুয়াধারী চন্দ্রকুমারের ওপর। সদ্য ধরে আনা বুনো বাঘের খাঁচার সামনে কেউ দাঁড়ালে বাঘের চোখে-মুখে যে হিংস্রতা ফুটে ওঠে, হাব-ভাবে যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়, সেনাপতি মশাইয়েরও অবস্থা হলো সেই রকম। সূর্যপণ্ডিত-কথিত সেই ছদ্মবেশী চর তাঁর সম্মুখেই উপস্থিত। তিনি রাগে দাঁত কড়মড় করতে লাগলেন, কিন্তু নিরুপায়। চন্দ্রকুমারও সেনাপতির ভাবগতিক ও মূর্তি দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে সারা হতে লাগলো। সে বুঝতেই পারলো না, লোকটি কেন ঐ ভাবে তার দিকে তাকাচ্ছে? ও কি গড়-জঙ্গলের দুই দলের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত? সে তো লোকটিকে কখন দেখে নি। স্বদেশের এবং রাজার মঙ্গল করতে এসে কী বিপদেই পড়েছে! ভালয় ভালয় সরে পড়তে পারলে বাঁচে।

ওদিকে তখন ভিতরে মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত সামনাসামনি বসে। মহেশ্বর সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। দুশ্চিন্তায় ও অনিদ্রায় তাঁর চোখ দুটি রক্তজবার মতো, মেজাজ রুক্ষ, পিছনে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে দেবেশ্বর।

সূর্যপণ্ডিত বলছিলেন, 'একটি বিষয় সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা হওয়া

দরকার! আর, আপনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যিনি তাতে আলোক পাত করতে পারেন।'

মহেশ্বর জিজ্ঞাসু চোখে সূর্য পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকালেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'আপনার রাজ্য ও মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য আজকের সঙ্কটে কি আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে? তা যদি হয়, তবে সে কথা অপরের মুখ থেকে শুনতে না হলেই—'

মহেশ্বর বললেন, 'কি বলছেন?'

'বলছি, আজই সকালে সেনাপতির মুখে শুনলাম, আপনি তাঁকে মন্ত্রীর পদে বসিয়েছেন, আপনার কাছে আমার সরাসরি আসবার অধিকার নেই। প্রকৃতপক্ষে আমায় তিনি বন্দী করেছিলেন। কিন্তু—'

'থামুন। এ অন্যায়ের মূলে তাঁর উচ্চাভিলাষ। অতঃপর তাঁর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।'

'সে দৃষ্টি কার, মহারাজ?'

মহেশ্বর নিরুত্তর।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'রাজা যদি দৃষ্টিহীন হন, তবে তাঁর প্রতিনিধির—

'ঠিক বলেছেন, তাঁর প্রতিনিধির দৃষ্টি সজাগ হওয়া দরকার। কিন্তু এজন্য কি নিজে আপনি কিছুটা দায়ী নন?'

'আমি?' সূর্যপণ্ডিত ঈষৎ হাস্য করলেন। তারপর বললেন, 'শুনতে পারি কি কি ভাবে আমি দায়ী?'

মহেশ্বর বললেন, 'কথায় কথা বাড়িয়ে লাভ কি? গতকাল আমি বলেছি, আমি ক্লান্ত। কথা সত্য।'

'আমার ক্লান্তি নেই মহারাজ। কিন্তু যিনি স্বাধীনতার জন্য জীবন পর্যন্ত পণ করেন, তাঁর কি ক্লান্ত হওয়ার, বিশ্রামের অবসর আছে? আমি কোম্পানি বা নবাব কাউকেই পছন্দ করি না। শৈশব থেকেই আমি স্বাধীনতাপ্রিয়। আপনার স্বাধীনতাকে আমি দেশের, রাজ্যের স্বাধীনতা মেনে আপনার সঙ্গে আমার ভাগ্যকে জড়িয়েছি। আমার সকল কর্ম ও চিন্তার লক্ষ্য, স্বাধীনতা। স্বাধীনতাসংগ্রামে কেবল সৈন্যবল, সাহস, ত্যাগই সব নয়, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করি, ভুবনপুর আক্রমণ ও সাময়িকভাবে অধিকারে রাখার সার্থকতা কি? এ পরামর্শ আপনাকে কে দিলে?'

মহেশ্বর ক্ষণিক নিরুত্তর থেকে বললেন, 'সেনাপতি।'

'সে সত্যই আপনার মঙ্গল কামনা করে?'

'কেন এ কথা বলছেন ?'

'তা হলে আমাকে পদচ্যুত করবার তার আগ্রহ কেন ? আজ পর্যন্ত আমার সকল কর্মের হিসাব করে বলুন, কোনো দিন আমার আনুগত্যের অভাব ঘটেছে কি না ?'

মহেশ্বর বললেন, 'সকল বিপদে আপনি আমার সহায় ছিলেন।'

'অর্থাৎ আপনারই পাশে আছি। এই অবস্থা তার স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে প্রতিকূল।'

'কি তার স্বার্থ ?'

"ভুবনপুর আক্রমণের গোলমালে আপনাকে হত্যা।'

দেবেশ্বরের কোষবদ্ধ তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো। সে বললে, 'মহারাজ, আজ্ঞা দিন। তার ছিন্ন মুণ্ড আপনাকে উপহার দেব।'

মহেশ্বর তাকে হাতের ইসারায় নিরস্ত করে সূর্যপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রমাণ ?'

'প্রমাণ ? এই যে।' বলে সূর্যপণ্ডিত আঙরাখার মধ্যে থেকে একখানি চিঠি বার করে মহেশ্বরের হাতে দিলেন। তারপর আবার বললেন, 'গত পরশু এই পত্র আমার হাতে এসেছে। এই সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে আসছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাই নি। আবার আজ সকালে আসছিলাম। কিন্তু পথে সেনাপতি আমাকে বন্দী করেন। তবে বেশিক্ষণ আমায় ধরে রাখতে পারেন নি। এখন তিনিই আমার বন্দী। দ্বারে প্রহরীর জিম্মায় আছেন। আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।'

ততক্ষণে মহেশ্বরের চিঠিপড়া শেষ। তাঁর চোখ-মুখের ভাব এমন হলো যেন মনে ঝড় বইছে।

চিঠিখানি সংক্ষেপে লেখা, কিন্তু লেখকের নাম নেই, প্রাপকের নাম উহ্য। চিঠিতে লেখা আছে, 'ভুবনপুর আক্রমণকালে যেন আততায়ীর হাতে মহেশ্বরের শেষ হয়। ভুবনপুরকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করা হইবে। বিনিময়ে বাৎসরিক দুই হাজার তঙ্কা রাজস্ব সদরে কোম্পানির খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতে হইবে। সেনাপতির সিংহাসন প্রাপ্তিতে আপত্তি নাই।'

মহেশ্বর উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, আপনার চারধারে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। দেবাদিদেবকে ধন্যবাদ যে তিনি আপনাকে রক্ষা করেছেন।

পত্রবাহক এ অঞ্চলে অপরিচিত। আর সেই কারণেই আপনার এক চরের হাতে ধরা পড়েছে।'

'সে কোথায় ?'

'তার মৃতদেহ দীঘির ধারে ছিল। এতক্ষণে হয়তো শিয়াল-কুকুর-শকুনি-গৃধিনীতে সৎকার করছে। সে নিজ দোষেই প্রাণ হারিয়েছে। আপানার চরটিকে সে আক্রমণ করেছিল। চিঠিখানি তার দেহ তল্লাস করে পাওয়া গেছে।'

'সেনাপতিকে—না না, শয়তানটাকে আমার সামনে আনতে বলুন।'

দেবেশ্বর বললে, 'আমি তার ছিন্ন মুণ্ড—'

মহেশ্বর বললেন, 'ক্ষান্ত হও, ভাই।'

সূর্যপণ্ডিতের ইঙ্গিতে কয়েকজন রক্ষী সেনাপতিকে মহেশ্বরের সম্মুখে আনতেই সেনাপতি সামরিক কায়দায় মহেশ্বরকে অভিবাদন করে বললেন, 'মহারাজ, আপনার কাছে আমার অভিযোগ।'

মহেশ্বর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। তোমাকে মন্ত্রিত্ব দান করেছি কবে ?'

'মহারাজ, এমন কথা কার কাছে শুনলেন, জানতে পারি কি ?'

'সে কৈফিয়ৎ তোমায় দেবো না। তুমি একাধারে মন্ত্রী ও সেনাপতি কি ?'

'মহারাজের কাছে আমার বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা অভিযোগ করেছে।'

'অভিযোগ মিথ্যা অথবা উত্তর মিথ্যা ? আজ সকালে মন্ত্রীমশাই যখন একটি জরুরি বিষয় সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে আসছিলেন তখন তুমি তাঁকে বন্দী করেছিলে ? তখনকার সকল বৃত্তান্ত জানতে চাই। বল।'

সেনাপতি নিরুত্তর।

মহেশ্বর আবার বললেন, 'এই চিঠিখানি পড়।'

সেনাপতি চিঠিখানি সাগ্রহে হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে এলো। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এ চিঠির মানে তো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছি, লোকের প্ররোচনায় মহারাজ আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে আমাকে পদচ্যুত—'

'পদচ্যুত নয় তোমার শির স্কন্ধচ্যুত করবো', বলে দেবেশ্বর ঝনাৎ করে তলোয়ার কোষমুক্ত করলো।

সূর্যপণ্ডিত ত্রস্তে উঠে হাত চেপে ধরে বললেন, 'রাজার সম্মুখে এমন

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ অনুচিত। শাস্তি বা ক্ষমায় যাঁর অধিকার তিনিই বিচার করবেন। শান্ত হও বালক। তাঁর অবমাননা ঘটিও না।'

দেবেশ্বর বাইরে শান্ত হলো।

মহেশ্বর বললেন, 'আজ থেকে সেনাবাহিনীর ভার আমার। আর, রাজা ও রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে তোমার মৃত্যুদণ্ড হওয়াই উচিত। কিন্তু তা করবো না, কয়েকজন রক্ষী তোমাকে সুন্দরবনের মধ্যে পরিত্যাগ করে আসবে।....এই কে আছ, আজ্ঞা পালন কর।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, শাস্ত্রে বলে শত্রু আর আগুনের শেষ রাখা উচিত নয়। তবে আপনার যা অভিরুচি।'

কয়েকজন রক্ষী ভেতরে এলো। তাদের দলপতির চোখের দিকে তাকিয়ে সূর্যপণ্ডিত কি ইঙ্গিত করলেন। সে একটু মাথা নুইয়ে বন্দীকে নিয়ে চলে গেল। মহেশ্বর অন্যমনস্ক, দেবেশ্বর বিফল রাগে ফুলছে।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'মহারাজ, বোধ হয় গড়-জঙ্গলের কোন সংবাদ শুনেছেন ?'

মহেশ্বর চমকে উঠলেন ; বললেন, 'আপনি কি করে জানলেন ?'

'একই ব্যক্তি আমাদের উভয়কেই সংবাদটি দিয়েছে।'

'আপনার পরামর্শ কি ?'

'ভুবনপুর অভিযান স্থগিত রেখে গড়-জঙ্গল বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। কারণ, ভুবনপুরের নদীপথে নওয়ারার (নবাবের নৌবহর) একাংশ অগ্রসর হচ্ছে। স্থলপথেও যে কোম্পানির কিছু ফৌজও আসবে না, তারও নিশ্চয়তা নেই। অবশ্য গড়-জঙ্গলও জটিল সমস্যা।'

'তবে ?'

'চন্দ্রকুমার নামে লোকটির কথা কতদূর সত্য তা যাচাই করতে আমি চর পাঠাচ্ছি।'

'পাঠানদের আর কলিঙ্গ সর্দারের খবর কি ?'

'দুপুরের মধ্যেই বিস্তারিত জানাবো।'

অতঃপর সভাভঙ্গ হলো। সূর্যপণ্ডিত বাইরে এসে দেখেন, চন্দ্রকুমার সরে পড়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ গড়-জঙ্গলে চর পাঠালেন।

॥ তেরো ॥

সংগ্রামের প্রস্তুতি

ইংরেজরা তখন মেদিনীপুর জেলায় প্রবল হয়ে উঠলেও সমস্ত জেলায় শান্তি স্থাপন করতে পারেনি। আগেই বলেছি, জেলাটির প্রায় বেশির ভাগ জায়গায় ছিল দুর্গম অরণ্য। তারই মাঝে মাঝে ছিল যেমন ছোট ছোট 'স্বাধীন' এলাকা, তেমনি ছিল আদিবাসীদের বসতি। আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে আলিবর্দির ফৌজে চাকরি করতো; পরে কোম্পানির পাইকের কাজে যোগ দেয়। এরা চোয়াড় নামে পরিচিত। চাষের জমি নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে এদের বিবাদ বাধে এবং কোম্পানির রাজত্ব খতম করতে এরা উঠে-পড়ে লাগে। সেই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে 'চোয়াড় বিদ্রোহ।' কিন্তু বিদ্রোহ সফল হয় না। কোম্পানির ইংরেজ সৈন্য ও দেশীয় সিপাইরা এদের সাময়িক ভাবে দমন করে। সেকালে কোম্পানির সৈন্যদলে দেশীয় সিপাইদের সংখ্যাই ছিল বেশি। সেই স্বাধীনতা-প্রিয় বিদ্রোহী চোয়াড়দের বংশধরেরা আজও মেদিনীপুর জেলার বিরাট অঞ্চল জুড়ে বসবাস করছে। তাদের শিরায় শিরায় পুর্বপুরুষদের সেই রক্তধারা বইছে।

এই ইতিহাসটুকু বলছি এই কারণে যে, তারা নায়েক পথ থেকেই সিপাহীদের চোখে ধুলো দিয়ে চম্পট দেয় এবং চোয়াড়-বসতিতে গিয়ে আত্মগোপন করে। জন দুই পাইক তার পিছু নেয়। কিন্তু তারা সেই যে যায় আর ফেরে না। এই ঘটনাটির কিছুদিন পরেই কোম্পানির পাইকদের মধ্যে দু-একজন ফকির, বাউল আনাগোনা করতে থাকে! তারা বাউলগানের মধ্য দিয়ে পাইকদের কোম্পানির কাজ ছেড়ে চাষ-বাসে মন দিতে, দরকার হলে দেশী রাজার পক্ষ হয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে উত্তেজিত করতে থাকে। সে সব গানের রচয়িতা কে জানি না, গায়কদের মধ্যেও আমাদের কালের যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাসের মতো কেউ যে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল এমনও প্রমাণ নেই, সে সব গানও লোকে ভুলে গেছে কেবল কাহিনীর কিছু কিছু আছে।

সূর্যপণ্ডিত চরমুখে এ খবর পেয়েছিলেন। রূপাগড়ও .জানতো কোম্পানি ও নবাব সরকারও এর ফলে সতর্ক হয়েছিল।

সূর্যপণ্ডিত এই ঘটনাকে গড়-জঙ্গল উদ্ধারের মস্ত সুযোগ মনে করে আদিবাসীরা যাতে আরও উত্তেজিত হয়, পাইকরা দলে দলে কোম্পানির কাজ ছেড়ে দেয় তার জন্যে উঠে-পড়ে লাগলেন। মহেশ্বরকেও এই সুযোগের কথা জানালেন। শুনে মহেশ্বরের মনে আশা হলো গড়-জঙ্গল

উদ্ধার করা যাবে। গড়-জঙ্গল উদ্ধার করতে পারলে ভুবনপুরও হাতের মুঠোয় আসবে।

সূর্যপণ্ডিত আরও খবর পেলেন, ছত্রভঙ্গ পাঠান ফৌজ হিজলির দিকে চলেছে, কলিঙ্গ-সর্দারও ফিরে যাচ্ছে কটকের দিকে। যাবার পথে বাংলার গ্রামগুলোকে লুঠ করছে, জ্বালাচ্ছে, ধ্বংস করছে। মাঝে মাঝে সে যে বাধা পাচ্ছে না তা নয়। কিন্তু সে বাধা সুসংগঠিত নয়। কাজেই বাধা-দানকারীরা হঠে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তবু কলিঙ্গ-সর্দারকে ফিরবার পথে অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় সূর্যপণ্ডিত দেখলেন, দেশের লোক ছাড়া প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁদের পাশে আর কোন শক্তি নেই! তাঁর নিজের মনেও সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিতে লাগলো; কিন্তু সে কথা প্রকাশ করলেন না। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে হার স্বীকার করার, নিরুৎসাহ হবার, যে কাজ আরম্ভ করেছেন, তা মাঝখানে ছেড়ে দেবার ভাব ছিল না। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন একগুঁয়ে। গড়-জঙ্গলের ও দেশের অবস্থা তাঁকে আরও উৎসাহিত করতে লাগলো। তিনি গোপনে তারা নায়েকের সন্ধান করতে লাগলেন আর সেনাবাহিনীকে গুছিয়ে, কয়েকটি দলে বিভক্ত করলেন। কিন্তু কেউ তো একা এসব কাজ করতে পারে না, তাকে অপরের সাহায্য নিতেই হয়। তবে যাদের নিতে হবে, তাদের বিশ্বস্ত ও কাজের লোক হওয়া দরকার। কিন্তু বিশ্বস্ত লোকের, কাজের মানুষের এবং প্রভুর জন্যে ত্যাগ স্বীকার করবার মতো ব্যক্তির সংখ্যা তো বেশি নয়! মানুষের কত রকমের স্বার্থ। সে সব পূরণের জন্যে তারা এক একটি পথ ধরে চলে। মহেশ্বর, গরুড়ধ্বজ, নবাব ও কোম্পানি সকলের দলেই এরকম লোক ছিল বিস্তর। তাই এঁরা পরস্পরের গোপন সংবাদ জানতে পারতেন।

গরুড়ধ্বজ, নবাব ও কোম্পানি সূর্যপণ্ডিতের মতলব ও কাজকর্মের কিছু খবর এদের মারফৎ পেয়ে তৈরী হতে লাগলেন। গরুড়ধ্বজের গড়-জঙ্গলের ওপর আগের সেই লোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এই সুযোগে যাতে জায়গাটি দখল করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কলিঙ্গ-সর্দারের হাতে মার খেয়ে তিনি তখনও দুর্বল। মহেশ্বরের মতো শক্তিমান যোদ্ধার সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা তাঁর নেই। তবু যদি কোম্পানির সাহায্যে কাজ হাসিল করতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

সূর্যপণ্ডিত মহেশ্বরকে সকল কথা জানিয়ে একটি দলকে দেবেশ্বরের অধীনে পাঠালেন ভুবনপুরের দিকে। সঙ্গে দিলেন ত্রিশূলেশ্বর নামে এক প্রবীণ বাঙ্গালী যোদ্ধাকে। তাদের পরামর্শ দিলেন, তারা ভুবনপুর আক্রমণ করবে। আর, আক্রান্ত হলে শত্রুর সম্মুখে থেকে সরে গিয়ে তাদের পিছনে আঘাত হানবে। কাজটি অবশ্য আদৌ সহজ নয়। দেবেশ্বর কিশোর, অনভিজ্ঞ কিন্তু অসীম সাহসী যোদ্ধা। আর পক্ষে এত বড় দায়িত্ব বহন করা সহজ নয়। তবে কিশোররাও যুদ্ধে কখন কখন এমন দক্ষতা দেখিয়েছে যে, তাদের কথা ইতিহাসেও আছে, যাদের একজন জালিম সিংহ। আর আমাদের মহাকাব্য রামায়ণে রাম-লক্ষ্মণ ও লব-কুশের শৌর্য-বীর্যের কথা কে না জানে?

যাত্রার আগে মহেশ্বর দেবেশ্বরকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভাই, মনে রেখো এ হচ্ছে আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার সংগ্রাম। আমরা সেজন্য প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করবো। শেষ কি জানি না। বুদ্ধি আর বাহু-বল যুক্ত হলে শক্তি বৃদ্ধি হয়। যেখানে বাহুবলে কাজ হয়-না সেখানে বুদ্ধি সফল করে।'

দেবেশ্বর কিশোর হলেও গুরুভার দায়িত্ব পেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। তার মনে উৎসাহ, আনন্দ ও সাহস জেগে উঠলো। সে মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিতের পায়ের ধুলো নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে এলো। তার জন্য ত্রিশূলেশ্বর ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে ঘোড়ায় উঠে ত্রিশূলেশ্বরের সঙ্গে ভুবনপুরের পথে অগ্রসর হলো, তবে সোজা পথে নয়। তার দলবলও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন সন্ন্যাসী এলেন, মহেশ্বরকে আশীর্বাদ করতে। কিন্তু প্রহরী তাঁকে পথ ছেড়ে দিল না, বললে, 'মহারাজ, এখন ব্যস্ত।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'যত ব্যস্তই থাকুন সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ তিনি মাথা পেতে নেবেন। তুমি এখনই যাও।' কথাগুলি তিনি এমন জোর দিয়ে বললেন যে, লোকটি আর তাঁর কথা অমান্য করতে পারলো না। সে ভেতরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এলো, সঙ্গে সূর্যপণ্ডিত।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'এমন অসময়ে কোথা থেকে আগমন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'অসময়টাই আমাদের সময়।'

'মহারাজ যে এখানে আছেন সে খবর কোথায় সংগ্রহ করলেন?'

'অগ্নিকে গোপন রাখা যায় না। পথে যেতে যেতে বুঝলাম। কিন্তু আমার চলার পথ দুর্গম। অপেক্ষা করতে পারি না।'

'বেশ আসুন আমার সঙ্গে।'

সন্ন্যাসীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলে গেল। কিন্তু সূর্যপণ্ডিত তাঁকে নিজের শিবিরে আদর-যত্ন করে বসিয়ে বললেন, 'আপনি মহারাজকে কি উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ করতে ইচ্ছুক?'

'তাঁর শত্রুরও আপনি মঙ্গল কামনা করেন তো?'

'আমি সন্ন্যাসী। আমার কাছে শত্রু-মিত্র কেউ নেই। তবে রাজ-দরবারে আমার গতিবিধি বিরল। আমার পথ জনতার মধ্যে।'

'তবে এখানে এলেন যে?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'মন্ত্রিমশাই, আমার হাতে এতো সময় নেই যে এখানে বসে বসে আপনার কুট-প্রশ্নের উত্তর দি।'

পণ্ডিত বললেন, 'আপনি সন্ন্যাসী। কিন্তু অসহিষ্ণু, ক্রোধেরও বশীভূত!

'সন্ন্যাসী হলেও আমি মানুষ। মানুষের চরিত্রে দোষ-গুণ দুই-ই আছে, স্বীকার করেন তো?'

'তা বটে। যদি মহারাজের সাক্ষাতের সুযোগ না ঘটে?'

'ফিরে যাবো। আর আপনাকে বলবো, চোখ মেলে দেখুন।'

'কতদূর পর্যন্ত?'

'মেদিনীপুরের যতদুর চোখ যায়।'

'তার ওধারে?'

'একটি উপমা দি; শৃঙ্খল ভাঙতে হলে একটি জায়গাতেই আঘাত করতে হয়, অবশ্য জায়গাটি দুর্বল হওয়া দরকার।'

'বুঝলাম। মেদিনীপুরের অবস্থা কি তাই?'

'বললাম তো চোখ মেলে দেখুন।'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'আমার দৃষ্টি আজকাল ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে। তাই চেনা মানুষকেও চিনতে পারি না।'

'ঝাপসা চোখের দৃষ্টি সংকুচিত না করলে দেখতে পাওয়া যায় না।'

'স্বীকার করছি। না হলে সন্ন্যাসীর পিছনে যে আর এক সন্ন্যাসী—'

'সংযত হন। একার দ্বারা বড় বড় কাজ হয় না।' বলে সন্ন্যাসী একটু নড়ে-চড়ে বসলেন।

'তাও মানছি। সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করি, আপনি তো নানা জায়গায় ঘোরেন, তারা নায়েকের—'

'লোকমুখে শুনছি, সে পলাতক—'

'আপনারও বিশ্বাস তাই?' বলে সূর্যপণ্ডিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর

মুখের দিকে তাকালেন। এই সন্ন্যাসী রহস্যময়। তাঁর ধারণা হচ্ছিল, এই সন্ন্যাসীই তারা নায়েক। কারণ, সন্ন্যাসীর দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরে তারা নায়েকের দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বর প্রকাশ পাচ্ছিল, যদিও সন্ন্যাসী বিকৃতস্বরে কথা বলছিলেন, দৃষ্টিকে যথাসম্ভব উদাস করে তুলছিলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, 'আজকাল লোকে সন্ন্যাসীকেও সন্দেহ করে। যাহোক, রাজার উদ্দেশ্যে আমি আশীর্বাদ রেখে যাচ্ছি।'

'আর আমার উদ্দেশ্যে?'

'সাফল্য কামনা। যে কাজে অগ্রসর হচ্ছেন সে কাজ ছাড়বেন না। শীঘ্রই সহায় পাবেন।' বলে সন্ন্যাসী কিছু তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। সূর্যপণ্ডিত তাঁর পিছনে লোক পাঠালেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তার চোখে ধুলো দিয়ে অদৃশ্য হলেন। পরদিনই সূর্যপণ্ডিত খবর পেলেন, ভুবনপুর আর বেদেনীর হাটের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে। তারা বলছে, 'আমরা কাউকেই খাজনা দেব না।' ভুবনপুরের খাজাঞ্চিখানা লুঠ হয়েছে, বেদেনীর হাটের দশাও তাই। বিকালের দিকে তাঁর চর ফিরে এসে খবর দিল, 'গড়-জঙ্গল, রূপাগড় কোথাও শান্তি নেই। কেউ কাউকে মানছে না।'

সূর্যপণ্ডিত দেখলেন, উত্তম সুযোগ। এই বিদ্রোহ দমন করা কোম্পানি ও নবাবের সাধ্য নয় যদি না তারা দেশীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্য পায়। এই অবসরে গড়-জঙ্গল আক্রমণ করাই উচিত। নবাব আর কোম্পানির কাছে এই চাল দেওয়া যাক যে, তাঁরা বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে যাচ্ছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য শান্তি স্থাপন করা। তাঁদের কাজে নবাব বা কোম্পানির সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

মহেশ্বরকে সূর্যপণ্ডিত এ কথা জানাতে তিনিও সম্মত হলেন।

সূর্যপণ্ডিত দুই সরকারের কাছে পত্র পাঠালেন এবং একটি দলকে নিজ অধীনে রূপাগড়ের দিকে পরিচালনা করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য রূপাগড়কে বাধা দেওয়া। অপর দলটি নিয়ে স্বয়ং মহেশ্বর চললেন গড়-জঙ্গলের দিকে।

কিন্তু রূপাগড়ের চতুর মন্ত্রী চতুর্মুখও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। তিনি কোম্পানিকে জানালেন, 'শীঘ্র তিন শত সিপাহী ও দশটি কামান পেলে বিদ্রোহীদের আসল নেতা মহেশ্বর আর তার সহকারী মারাঠা সূর্যপণ্ডিকে গড়-জঙ্গলের ঘন বনে ইঁদুরের মতো ফাঁদে ফেলা যাবে। সংবাদও পেয়েছি তারা নায়েকও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।'

চতুর্মুখের চিঠি নিয়ে দুটি বিশ্বস্ত লোক ঘোড়ায় চললো মেদিনীপুর সদরের দিকে। তখন নিশীথ রাত।

॥ চৌদ্দ ॥

কোম্পানীর কালেকটার ও তার আরদালির বৃত্তান্ত

নবাব ও কোম্পানি দুই সরকারই মহেশ্বরের চিঠি পেলেন। চতুর্মুখের চিঠিও যথাসময়ে তাঁদের কাছে পৌঁছল। আর তাঁরা বুঝতেও পারলেন, কার কি মতলব।

সেদিন সদরে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী গদিতে হেলান দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে গড়গড়া টানতে টানতে দেওয়ানকে বললেন, 'হামি লোক কুছু করবে না। বান্‌ডিট্‌ আর চাটুরমুখ fight করবে। ডোনো মরবে। That is for our gain. ডোনো বড্‌মাশ।'

দেওয়ান বললেন, 'কিন্তু হুজুর, দেশে যে শান্তি থাকছে না। খাজনা-পত্র আদায় হওয়া আরও কঠিন হবে।'

সাহেব রেগে উঠে বললেন, 'শান্‌টি, শান্‌টি করছে। টুমি লোক ট্রাবল বাড়াচ্ছে। তুমি লোক একডম ষ্টুপিড্‌ আছে। মহেশ্বর আউর ঢুজেশ্বর (সাহেব গরুড়ধ্বজ শব্দটি উচ্চারণ করতে পারেন না) ডোনো বড্‌মাশ। Let them break their necks. হামি লোক কিসিকি নেই মাংটা। ফিনিশ।' সাহেব হাত নেড়ে দেওয়ানকে চলে যেতে বললেন।

সাহেবের কথায় ও আচরণে ক্ষুণ্ণ হয়ে দেওয়ান চলে গেলেন। তাঁর ইচ্ছা উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ না হয় এবং উভয়েই নিজ নিজ এলাকায় শান্তিতে বসবাস করেন।

এখন, সাহেবের মৃত্যুঞ্জয় নামে এক আধপাগলা আরদালি ছিল। লোকটির বাড়ি ছিল তমলুক অঞ্চলে। খুব ছোটবেলায় সে অনাথ হলে তার পিসি তাকে মানুষ করতে থাকে। মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স যখন দশ বছর তখন তার পিসিও মারা যায়। মৃত্যুঞ্জয় সেই থেকে অনেকদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার বাবার ও পিসির যেটুকু জমি-জায়গা ছিল সেটুকু চাষ-আবাদ করলে যে তার খাওয়া-পরার অভাব ঘুচতো একথা সত্য হলেও তার পক্ষে কাজটি করা একরকম অসম্ভব ছিল। তাই জায়গা-জমি, এমন কি ঘরবাড়িও বেহাত হয়ে যায়।

মৃত্যুঞ্জয়ের মুখখানি ছিল সুন্দর, গানের গলাও ছিল চমৎকার। তার সুন্দর মুখখানি দেখে, তার গান শুনে কোন কোন গৃহস্থ তাকে আদর করে খেতে দিত। বউ-ঝি-গিন্নীরা তাকে ঘিরে বসে বেহুলার গান শুনতো।

আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামে একবার এক পাঁচালিওয়ালা বেহুলার গান শুনিয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় দলটার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। শুনে শুনে গানগুলো তার মুখস্থ হয়ে যায়। বেহুলার বুকভাঙা দুঃখের গানগুলো বালক যখন গাইতো তখন শ্রোতারা চোখের জল রাখতে পারতো না। একে অনাথ, তার ওপর সুন্দর মুখ, সরল স্বভাব, তারও ওপর সুমিষ্ট গানের গলা—বউ-ঝি-গৃহিণীদের স্নেহ টেনে নিত। দু-একজন তাকে ছেলের মতো পালন করবারও চেষ্টা করে। কিন্তু বালক কারো কাছেই ধরা দেয় না। একটু বড় হলে সে এক যাত্রার দলে যোগ দেয়। সে কখন সাজতো রাধা, কখন সাজতো উত্তরা, কখন রুক্মিণী, কখন দুর্গা, কখন বা সরস্বতী। এমনি করে বহু পালায় বহু মেয়ের ভূমিকা অভিনয় করে, গান শুনিয়ে আসর মাৎ ক'র দেয়। গ্রামে গ্রামে তার নাম বনফুল-সৌরভের মতো ছড়িয়ে পড়ে! কিন্তু মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে একবার এক গ্রামে গিয়ে প্রথম দিন পালা পাইবার পর, দ্বিতীয় দিন দুপুরে অধিকারীকে কলেরায় ধরে। সন্ধ্যায় সে মারা যায়। সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয়ের দেহেও কলেরার লক্ষণ প্রকাশ পেলে দলের সকলে তাকে ফেলে পালায়। গ্রামের লোকও ভয়ে তার কাছে ঘেঁষে না। কিন্তু গাঁয়ে ছিল অনেককালের পুরনো এক গোপীনাথ মন্দির। একটি স্ত্রীলোক সেই মন্দির ঝাঁট দিত, পুজারীর ফায়-ফরমাশ খাটতো। সে এগিয়ে এসে মৃত্যুঞ্জয়ের সেবা-শুশ্রূষা করে, কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে এনে খাওয়ায়। কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় সুস্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধবার আগেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

তারপর নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে মেদিনীপুরের কাছাকাছি যখন এসে পড়ে তখন তার জীবনের গতি আবার মোড় ঘোরে। বেলা তখন দুপুর। সে একটি গাছতলায় বসে আছে। সকাল থেকে অভুক্ত। গ্রীষ্মকাল, পথ চলায় ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। চারধারে মাঠ, মাঠের পর মাঠ যেন ঝিমচ্চে। তার বুকের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা পথ চলে গেছে দূরে সদরের দিকে। কেবল একদিকে আধক্রোশটাক দূরে একখানি ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পায় এবং একটু পরেই দেখে এক ইংরেজ ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। মৃত্যুঞ্জয় সেকালের সাধারণ কিশোরের মতো ছিল না। সাহেব দেখলে তার মনে ভয়মিশ্রিত কৌতুহল জাগতো না, সে নির্ভয়ে তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতো।

মুসলমান রাজাদের আমলে যেমন হিন্দী আর আরবী-ফারসীর মিশ্রণে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়েছিল, ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকেও আমাদের বাংলাদেশে ইংরেজরা হিন্দী-বাংলা-ইংরেজী শব্দ মিশিয়ে এক অদ্ভুত ভাষা তৈরি করে কিম্ভুত উচ্চারণে এ দেশের লোকের সঙ্গে কথা কইতো। তবে উর্দু ভাষা সুন্দর, এ ভাষা কুৎসিত। আর, ইংরেজরা ভিন্ন সাধারণে এ ভাষা কখন ব্যবহার করতো না কেবল নিজেদের মধ্যে ইংরেজদের বিদ্রূপ করার সময়টুকু ছাড়া।

মৃত্যুঞ্জয় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সকৌতূহলে সাহেব-ঘোড়-সওয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে দেখে অবাক হয়, সাহেবের পোশাক রক্তাক্ত, চুল উস্কোখুস্কো, কপাল ও দুটি রগ বেয়ে ঘাম ঝরছে। সাহেবের ঘোড়াটারও শরীর দু-এক জায়গায় ক্ষত-বিক্ষত। সাহেব তার সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে চারধারে তাকিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে জিগ্যেস করেন, 'এ কোন্ গাঁও আছে?'

মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি বলে, 'তুমি কি কানা? গাঁ কোথায় দেখলে?'

সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের কথা বুঝতে না পারলেও ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং মৃত্যুঞ্জয়কে বলেন, 'পানি। **Water.**'

মৃত্যুঞ্জয় বলে, 'পানি বিনে আমারই গলা শুকিয়ে তিরপুরণির মাঠ। বোস, দেখছি। বল তো তোমার এ দশা কিসে হলো?'

সাহেবের বাচ্চা, মরতে মরতেও চাঁট মারে; বলেন, 'চুপ রও—শাট্ আপ। জলদি পানি লাও।'

'অমন তেরিয়ে হলে এই আমি চলেছি। তোমার কাঁধে বন্দুকও নেই যে গুলি করবে। গাঁয়ের লোক এখনি এসে পিটিয়ে পাঁপর করে দেবে।'

সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের সব কথা বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করেন যে, সে চটেছে। বলেন, 'বকশিশ মিলবে। হাম ভেরি থার্সটি। ডেখো, ঘোড়ে ভি মর যাতা।'

মৃত্যুঞ্জয়ের মনে দয়া হয়। সে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে গিয়ে দু কলসী জল আর একটা ভাঁড় নিয়ে আসে। গাঁশুদ্ধ লোক সাহেব দেখতে সেখানে জড় হয়। কিন্তু তাদের কারো সাহেবের কাছে আসতে সাহস হয় না। তফাৎ থেকে সব লক্ষ্য করে। মৃত্যুঞ্জয় ও তার গ্রামের সঙ্গীটি সাহেবকে জল খাওয়ায়, বলে, 'চোখে-মুখে জল দাও।'

সাহেব বাধ্য শিশুর মতো সে উপদেশ পালন করে। তারপর তারা একটা কলসীর গলা ভেঙে ফেলে। ঘোড়াটা সেই কলসী থেকে জল

খায়। সাহেব ও ঘোড়া জল খেয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করে সুস্থ হয়ে দশটি টাকা পকেট থেকে বার-করে মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিতে গেলে সে বলে, 'একে দাও! এই কলসী দুটো এর, জলও এর কুয়োর।'

সাহেব তাই করেন। আর ঘোড়ায় উঠতে উঠতে বলেন, 'সডর কালেক্টারের অফিসে মোলাকাট কোরবে। টোমার নাম কি আছে?'

'মৃত্যুঞ্জয়।"

'গুড্ বাই মিটান্জে।'

মৃত্যুঞ্জয় তার একটু পরেই সদরের পথ ধরে। সদরে এসে সে সাহেবের খোঁজ করে না, আর একটা যাত্রাদলের খোঁজে থাকে। সেই সময়ে শোনে, কালেক্টার সাহেব স্বয়ং খাজনা আদায়কারীদের সঙ্গে এক গাঁয়ে গিয়ে অবাধ্য প্রজাদের হাতে এমন মার খান যে, প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচেন! তাঁর সঙ্গের পাইক-পেয়াদারা কে কোথায় পালায় তার ঠিক থাকে না। সেই ঘটনার পরই মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে পথের ধারে গাছতলায় সাহেবের দেখা।

মৃত্যুঞ্জয় ইতিমধ্যে এক বেহালাদার সঙ্গী জুটিয়েছে। দু'জনেরই মনে আশা তারা একটি ছোটোখাটো যাত্রার দল খুলবে। একদিন সকালে এক চৌমাথায় ময়রার দোকানের সাম্‌নে বসে মৃত্যুঞ্জয় গান ধরেছে, তার প্রিয় বেহুলার গান। আষাঢ় মাস হলেও আকাশে, আলোয়, মেঘে, গাছপালায়, বাতাসে শরতের ছোঁয়া লেগেছে। মৃত্যুঞ্জয় গাইছে, আর সঙ্গী বেহালার ওপর ঘাড় কাৎ করে ছড় টানছে। গানখানি জমেছে বেশ। জায়গাটায় শ্রোতার এমন ভিড় জমেছে যে পথচলা অসম্ভব। সেই সময়ে কালেক্টার সাহেবকে নিয়ে পাল্‌কি চলেছে কাছারির দিকে।

পেয়াদারা যত বলে, 'হট্ যাও' শ্রোতারা তত যেন জমে যায়, নড়বার লক্ষণ দেখায় না।

সাহেব পাল্‌কির ভেতর থেকে গর্জন করে, 'হোয়াটস্ দি ম্যাটার? চালাও। ইউ ফুল্‌স্!'

পেয়াদা দরজার কাছে এসে বলে, 'হুজুর, ভিখারী গান গাইছে। লোকে পথ আগলে দাঁড়িয়ে শুনছে। সরতে বললেও সরছে না। দু'তিন শো লোক হবে।'

সাহেবের মনে কৌতূহল জাগে। কালেক্টার সাহেবের পাল্‌কির পথ আগলে দাঁড়িয়ে কালা আদমিরা যে গান শোনে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অসাধারণত্ব আছে। গানের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে সাহেবের একটু-

আধটু খবর ইস্কুলে পড়া ছিল। তারপর আর বই ছোঁন নি। সাহেব পাল্‌কি থেকে নেমে 'হোয়াটস্ দি ফান?' বলতে বলতে ভিড়ের ভেতর ঢুকতেই শ্রোতারা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দেয়। সাহেব মৃত্যুঞ্জয়ের সাম্‌নে গিয়ে বলেন, 'ওয়েল! মিটান্‌জে, ইউ! টুমি গান জানে? গুড্। কাম অন।'

কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ওঠে না!

সাহেব পেয়াদাকে বলেন, 'ডোনোকো লে চলো।'

পেয়াদারা গায়ক-বাদক দু'জনকেই ধরে নিয়ে যায়।

এই ঘটনায় শহরে রটে যায় যে, দেশী গান গাওয়া চলবে না, গাইলে পেয়াদা ধরবে। এবার থেকে ইংরেজী কয়েদায় ইংরেজী গানবাজনা করতে হবে। কিন্তু শীঘ্রই ভুলটা ভেঙে যায়। লোকে শোনে মৃত্যুঞ্জয় হয়েছে সাহেবের খাস আবদালি আর তার সঙ্গী হয়েছে আদালতের পেয়াদা।

মৃত্যুঞ্জয় সাহেবকে মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট কথা শোনাতো।

সেদিন দেওয়ান চলে যাবার পরই মৃত্যুঞ্জয় সাহেবকে বললে, 'এদেশের লোক বদমায়েশ, আর সাহেবেরা সবাই ভাল? বদমায়েশদের দেশে ভাল লোকগুলো এলো কেন? এখানে থাকবার কি দরকার? খারাপের সঙ্গে থাকলে ভালও খারাপ হয়। তাই সাহেবরাও খারাপ হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে ভাল কেউ নেই।'

সাহেব বললেন, 'আই সি! টুমি রাগ করিয়াছে। হামি টুমার মনিব। বি কেয়ারফুল।'

মৃত্যুঞ্জয় বললে, 'সাহেব, আমি আর চাকরি করবো না। আমার দেশের লোক বদমায়েশ, এ গালাগাল আমায় প্রায়ই শুনতে হয়। আমি সইতে পারি না।'

সাহেব বললেন, 'অল রাইট! অল রাইট! আভি যাও।'

এই ছোট ঘটনার ফল হলো এই যে, সাহেব কথাবার্তায় সংযত হলেন, মৃত্যুঞ্জয়ও রয়ে গেল।

ওদিকে নবাব মহেশ্বরের চিঠি পেয়ে মৃদু হাসলেন, চতুর্মুখের চিঠিকে তিনি আমল দিলেন না। গরুড়ধ্বজ তাঁদের অনুগত হলেও তাকে তিনি পছন্দ করতেন না। মহেশ্বরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কিছু সদয় ছিল। কারণ, তিনি কোম্পানির শত্রু। তিনি নিজেও মনে মনে কোম্পানির আমলের বিরোধী ছিলেন। এই অবস্থায় যা ঘটবার তাই ঘটলো।

চতুর্মুখ মহেশ্বরকে বাধা দিতে গিয়ে পরাস্ত হলেন। মহেশ্বরের বাহিনী গড়-জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললো।

কিন্তু দেবেশ্বর পড়লো দারুণ বিপাকে।

॥ পনেরো ॥

মীর আলি ও দেবেশ্বরের সংগ্রাম

নবাবের নওয়ারার সাতখানা ছিপ বেরিয়েছিল কুচ্ করতে। বহরটির অধ্যক্ষ ছিল মীর আলি। লোকটি ছিল অতি নিষ্ঠুর কিন্তু খুব দক্ষ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তার জীবনের একটু ইতিহাস ছিল। সে ছিল মেদিনীপুরের এক চোয়াড়ের ছেলে। দশ-বারো বছর বয়সের সময় তাদের গ্রামে এক রাত্রে একদল ডাকাত হানা দেয়। গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দিতে গেলে খণ্ডযুদ্ধ বাধে।

মীর আলি বাবার কাছে থেকে তীর-ধনুক আর গুল্‌তি বা বাঁটুল চালাতে শিখেছিল। তখন তার নাম ছিল বাঁটুল। তার সন্ধান ছিল অব্যর্থ। সে সারাদিন বনে বনে পাখী মেরে বেড়াতো। তাতে তার বাবা একদিন বলেছিল, 'খবরদার, তীরে হাত দিস্ নে।'

সে বলে, 'কেন?'

'বারণ করলাম, ব্যস্।'

কিন্তু ঐ নিষেধেই তাকে উৎসাহিত করে তোলে। সে কঞ্চি ও সরু বাখারির মাথায় চোখা লোহার ফলা বসিয়ে তীর তৈরি করে বানর, হরিণ, শিয়াল তো মারেই, এমন কি বাঘও শিকারের চেষ্টা করে। তার শরীরের তুলনায় হাত দুখানা ছিল বড় আর বলিষ্ঠ, চোখ দুটো ছোট, মাথার চুল কোঁকড়া, গায়ের রং ভুসোর মতো কালো। সে কয়েকটি পাখি ও জন্তুর গলার স্বর নকল করতে পারতো। যাহোক, গ্রামবাসীদের সঙ্গে ডাকাত-দের খণ্ডযুদ্ধে সে নির্ভয়ে যোগ দেয় এবং অব্যর্থ সন্ধানে তীর চালিয়ে দু'জন ডাকাতকে জখম করে। তবু তারা ডাকাতদের সঙ্গে পারে না। কারণ, ডাকাতরা ছিল সুসংগঠিত ও অস্ত্রবলে গ্রামবাসীদের চেয়ে বলীয়ান। তারাও গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে মারাত্মক ভাবে জখম করে। কিন্তু লুঠপাটে সুবিধা করতে পারে না। গ্রামের কয়েকখানা বাড়িতে আগুন লাগিয়ে বাঁটুলকে ধরে নিয়ে যায়।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে বাঁটুলের কোন সন্ধান না পেয়ে সকলের ধারণা হয়, ডাকাতরা তাকে মেরে ফেলেছে।

তারপর দিন যায়। ঐ ডাকাতদলের একবার দুর্মতি হয়। তারা সুতাহাটা অঞ্চলে এক মুসলমান জমিদারের বাড়ি আক্রমণ করে বসে। তারা জমিদারের কয়েকজন পাইকের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে মনে করেছিল,

কাজটা খুব সহজ হবে। কিন্তু সেই পাইকদের মধ্যে একজন ষড়যন্ত্রটা তার মনিবের কাছে ফাঁস করে দেয়। মনিবও আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হন। গোপনে কয়েকজন বন্দুকবাজ ও তীরন্দাজ নিয়ে আসেন। ঐ ডাকাতদলের সর্দারের নাম ছিল ভোমা। ভোমা ডাকাতের ভয়ে লোকে কাঁপতো। সেকালে কোন কোন ডাকাত টাকা-পয়সা বা খাবার দিয়ে গরিবকে সাহায্য করতো। তাদের শিকার ছিল ধনী ও অবস্থাপন্ন লোকেরা। কিন্তু ভোমা সে প্রকৃতির ছিল না। তার কাজই ছিল লুঠপাট আর মানুষ মারা। তা' ভোমা বাঁটুলের চেহারা, অব্যর্থ শর-সন্ধান ও নিষ্ঠুরতা দেখে দলের সকলকে বলতো, 'আমার পর এই হবে দলের সর্দার।'

কথাগুলো শুনে বাঁটুলের মনেও সর্দার হবার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। সে দলের আর সকলকে তার চেয়ে হীন মনে করতে থাকে। ফলে দলের মধ্যে তার শত্রু সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ভোমার সহকারী প্যালা তার ওপর বিরূপ হয়ে ওঠে। সে বাঁটুলকে সাবাড় করে দেবার ফিকিরে থাকে। কিন্তু তার সুযোগ হয় না। এই অবস্থায় ভোমার দল যায় সেই জমিদার-বাড়ি ডাকাতি করতে। সেখানে গিয়ে তারা তো নাজেহাল হয়ই, ভোমা আর বাঁটুল ধরা পড়ে, কয়েকজন বিষম ঘায়েল হয়। আর, প্যালারা কয়েকজন পালিয়ে বাঁচে।

জমিদার নিজেই বন্দীদের বিচার করে ভোমাকে শূলে চড়ায় আর বাঁটুলকে হাত-পা বেঁধে ফৌজদারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাঁটুলের বয়স তখন ষোলো বছর। শরীর আরও মজবুত হয়েছে। ফৌজদার তাকে শাস্তি না দিয়ে ফৌজে ভর্তি করে নেয়। সেখান থেকে বাঁটুলের ভাগ্য ফেরে। সে নিজেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, ফৌজদারের এক আত্মীয়ার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তারপর সাধারণ ফৌজ থেকে সে নওয়ারার দক্ষিণ বহরের অধ্যক্ষের পদ লাভ করে। সে কয়েকটা জল-ডাকাতের দলকে এমন শায়েস্তা করেছিল যে, গেঁওখালি, কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপ অঞ্চলে কিছুকাল জল-ডাকাতি একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! সে ডাকাতদের ধরে নবাব-সরকারে হাজির করতো না, নিজেই তাদের নিষ্ঠুর শাস্তি দিত। সে কথা লিখতেও কলম শিউরে ওঠে। সেই মীর আলি এসেছিল দেবেশ্বরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

সে তিনখানা ছিপ কাঁসুড়ের খালের মুখে রেখে চারখানা নিয়ে গোপনে ভুবনপুরের কাছাকাছি জঙ্গলের ধারে এক জায়গায় ওৎ পেতে থাকে।

আর ভুবনপুরে যে সামান্য ফৌজ ছিল তারাও ফৌজদারকে গোপনে সংবাদ পাঠায়, সে যেন দেবেশ্বরকে সামনা-সামনি বাধা না দিয়ে ভুলিয়ে ভুবনপুরের ভেতর আনে। তারপর নিজের সৈন্যদের মধ্য থেকে বাছা বাছা পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে দেবেশ্বরের আসবার পথে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখে।

দেবেশ্বর তার চরমুখে সংবাদ পায়, ভুবনপুর প্রায় অরক্ষিত। কেবল তাই নয়, যে লোকটি নবাব-সরকারের ও কোম্পানির তরফ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, সেও বলেছে, দেবেশ্বর এলেই তার হাতে ভুবনপুর তুলে দেবে এবং ভুবনপুরের আসল মালিকের অধীনে কাজ করবে। এই সব খবরে দেবেশ্বর উৎফুল্ল হয়, কিন্তু জটেশ্বরের মনে সন্দেহ জাগে। সে দেবেশ্বরকে বলে, সাবধানের মার নেই। আমাদের মতলবের কথা কি সদরে না পৌছেছে? কে জানে আমাদের পিছনে কোন ফৌজ আসছে কিনা। ফাঁস্নড়ের খালের অবস্থাই বা কি? ভুবনপুরে যে সামান্য ফৌজ আছে তারা যদি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে? ঐ খাজনা-আদায়কারীর কথায় বিশ্বাস কি?'

দেবেশ্বর জিগ্যেস করে, 'তা হলে কি করতে বল?'

'আর না এগিয়ে এখানেই এমন ভাবে থাকা যাক যাতে ভুবনপুর অবরোধ করার মতো অবস্থায় পড়ে। সামনে জঙ্গল। ও জায়গাটা পার হলেই আমরা এক রকম ভুবনপুর পৌছব, কিন্তু জঙ্গলটার মাঝ দিয়ে পথ। জায়গাটা নিরাপদ না হতেও পারে।'

'কিন্তু এটা ভেবে দেখেছো কি, অবরোধ কেবল একদিকে হয় না, চারদিকে হওয়া চাই। দক্ষিণে ফাঁস্নড়ের খাল—সেটা মনে আছে কি?'

'আছে। ওদিক থেকে খুব বিপদের আশঙ্কা নেই যতক্ষণ আমরা খালে না ঢুকছি। খালে ঢোকার পরিকল্পনা আমাদের নেই।'

'আমার মতে ভুবনপুর দখল করে চেপে বসা যাক। প্রজারা আমাদের দিকে।'

'প্রজাদের বিশ্বাস নেই। ওরা তোমার জন্যে প্রাণ দিতে যাবে কেন? নবাবী আমলে ওরা এমন কি খারাপ অবস্থায় আছে?'

কিন্তু দেবেশ্বর জটেশ্বরের পরামর্শ উপেক্ষা করে ছোট একটি সৈন্য-দলকে জঙ্গলের অবস্থা কি জানতে পাঠালো। তারা নির্বিঘ্নে খানিক দূর অগ্রসরও হলো। এক জায়গায় পৌছতেই হঠাৎ চারধারে কয়েকটা ফিঙে শিষ দিলে। আর কয়েকটা তীরে এসে কয়েকজনের শরীরে বিঁধে গেল। বাকি যারা ছিল তারা তাই দেখে ছুট দিল।

কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক অক্ষত শরীরে বন থেকে বেরিয়ে দেবেশ্বরকে বিপদের সংবাদ দিতে ছুটলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ দেবেশ্বরও তখন বিপদের মুখে পড়েছে। তার পশ্চাৎভাগে কোম্পানির একদল সিপাই কামান-বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করেছে। এমন অতর্কিত আক্রমণের জন্য দেবেশ্বর একটুও প্রস্তুত ছিল না। সিপাইরাও জানতো না যে, তারা এক প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হবে। ব্যাপারটা ঘটে এই ভাবে—

এক রাত্রে খাজনালুঠের ব্যাপার ঘটে—যার ফলে তারা নায়েক প্রভৃতিকে সদরে চালান দেওয়া হয়। তারপর একদিন স্বয়ং কালেক্টার সাহেব প্রহৃত হন। তারও পরে চারধারে অরাজকতা দেখা দেয়। এসব কথা আগেই বলেছি। এর ফলে নবাব ও কোম্পানি, বিশেষ করে কোম্পানি সাবধানতা অবলম্বন করে যাতে বাংলার এই অঞ্চলটা হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই জেলার মানুষগুলো যেমন স্বাধীনতাপ্রিয়, তেমনি রুক্ষ। চারধারে ঘন বন-জঙ্গল। ওদিকে মহেশ্বর প্রবল হয়ে উঠেছে। লোকে প্রবলেরই বশ্যতা স্বীকার করে, জয়গান গায়। এই অবস্থায় কখন কি ঘটে তার ঠিক কি? কোম্পানি তাই চারটি কামান সহ একদল সিপাইকে ভুবনপুরের দিকে পাঠায়! কারণ, ভুবনপুর গুরুত্বপুর্ণ জায়গা; একটি বন্দর বিশেষও বটে! সিপাইদলকে পাঠিয়ে তাদের অধ্যক্ষ এক রাজপুতকে নির্দেশ দেয়, 'কোন দয়া নয়!' এ কথা নবাবকেও জানায়। কারণ, মেদিনীপুর জেলার শাসক তখন প্রকৃতপক্ষে নবাব মীর কাসেম আলি।

নবাব-সরকারও জানায়, তার একটি ছোট নৌবহর মীর আলির অধীনে রূপনারাণপথে ভুবনপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছে। সরকার কারও বেয়াদপি বরদাস্ত করবেন না।

সেই সিপাইদল অগ্রসর হতে হতে দেবেশ্বরের সন্ধান পায়, তার মতলবও বুঝতে পারে। কিন্তু দলে তারা ভারি ছিল না। তবে সঙ্গে কামান-বন্দুক ছিল, এই এক পরম ভরসা। তারা অপরদিকে মীর আলির অস্তিত্বের কথা তখনও জানতে পারে নি। তাই দেবেশ্বরকে আক্রমণ করতে প্রথমটা ইতস্ততঃ করতে লাগলো। দেবেশ্বরও তার পশ্চাদ্ভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। হঠাৎ চরমুখে সিপাইদের সংবাদ পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো!

ওদিকে চতুর মীর আলি চরমুখে দেবেশ্বরের অবস্থা ও সিপাইদের খবর সংগ্রহ করে তাদের অধ্যক্ষকে পরামর্শ দিলে, দেবেশ্বরকে প্রচণ্ড আঘাত

হানতে আর ভুবনপুরের দিকে তাড়িয়ে আনতে। তা হলে 'কুত্তাটা' ফাঁদে পড়বে। তখন ওর গলায় শিকল পরিয়ে নবাবকে ভেট পাঠাবে।

মীর আলির কথা জানতে না পারলেও দেবেশ্বর ও জটেশ্বর পরিষ্কার বুঝতে পারলো, তাদের সামনে-পিছনে শত্রু এবং এই ফাঁদ থেকে নিস্তার পাওয়া সহজ নয়।

সে সেনা ও প্রধানদের ডেকে বললে, 'ভাই সব, তোমরা বীর। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জান দিতে এসেছো। আমাদের সামনে-পিছনে শত্রু। ওরা আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে দেশকে অধীনে রাখতে চায়। একদিকে স্বাধীনতা, সম্মান, অপরদিকে পরাধীনতা, অপমান—এই দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেবার দিন আজ এসেছে। যারা দেশের স্বাধীনতা, সম্মান চাও তারা এগিয়ে এসো। যারা নিজ প্রাণ, নিজের সুখ রক্ষা করে পরাধীনতা, অপমানের পক্ষে তারা অস্ত্রত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাও।'

অমনি হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, 'স্বাধীনতা-স্বাধীনতা। জান দেবো তবু মান দেবো না।'

দেবেশ্বর উৎফুল্ল হয়ে উঠলো, বললে, 'তাই হোক। ওরা বুঝুক, বাঙালির বাহুতে শক্তি কত। জয় গড়-জঙ্গল! জয় মহারাজ মহেশ্বর! জয় ভুবনপুর!'

অমনি হাজার কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠে রণভূমি কাঁপতে লাগলো।

সিপাইরাও অমনি কামান দাগতে লাগলো। দেবেশ্বরের সঙ্গে যে দুটি কামান ছিল তা থেকে প্রত্যুত্তর গর্জে উঠলো।

জটেশ্বর একদল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলো শত্রুর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করতে। আর, ধনা সর্দার নামে এক জনের অধীনে কয়েকজনকে পাঠানো হলো জঙ্গলে আগুন দিতে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা মাঝপথেই ব্যর্থ হলো। মীর আলি স্বয়ং তার দলের বেশির ভাগকে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলো।

দেখতে দেখতে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। দেবেশ্বরের কামান দুটি আগেই অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সিপাইরা সংখ্যায় ছিল অল্প। অনেকে মারা গেল, অনেকে আহত হলো। বাকি যারা অনাহত ছিল তারা কামান ফেলে পালালো। দেবেশ্বরের পক্ষে বহু সৈন্য মারা গেল। আর সে স্বয়ং হলো মারত্মক ভাবে আহত।

এদিকে পশ্চিম দিগন্ত রাঙা করে সূর্য ডুবে গেল, ম্লান সন্ধ্যা নামলো। মীর আলি জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলে। তার আশা, পরদিন এই যুদ্ধের ফয়সালা সে করবেই।

॥ ষোলো ॥

মীর আলি ও দেবেশ্বরের অন্তিম

মোগল ও পাঠান এক ধর্মাবলম্বী হলেও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ছিল, দা-কুড়লের মতো। হিজলী অঞ্চলের পাঠানদের শক্তি তখন এমন কিছু নয় যাতে তারা কোম্পানি ও নবাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারে—এ কথাও আগে বলেছি! কিন্তু ছোটখাট সৈন্যদলকে অতর্কিতে আক্রমণ বা সাধারণ মানুষদের ওপর দৌরাত্ম্যে তারা ছিল নিপুণ। যারা জল ডাকাতি করতো তাদের সঙ্গেও যে তাদের যোগাযোগ ছিল না, এমন নয়। ওরাও ছিপ নিয়ে দক্ষিণ বাংলার ঐ অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করতো। মহেশ্বরের সঙ্গে তাদের বিবাদ কি কারণে দেখা দেয় এবং তার ফলে কি ঘটনা ঘটে এসব কথা পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণে আছে, মনে হয়। একে পাঠানেরা মোগলদের দ্বারা রাজ্যচ্যুত তার ওপর মহেশ্বরের কাছে অপমান—এই দুই কারণে তারা খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। হিজলীতে তাদের সর্দার মহেশ্বরের ওপর প্রতিশোধ নেবার ফিকিরে থাকে। কিন্তু মহেশ্বর তাঁর দলবল নিয়ে তার নাগালের বাইরে ছিল। সে খবর পায়, নবাবের সাতখানা ছিপ সেই অঞ্চলে এসেছে। সেও অমনি তার একজন নায়কের অধীনে মাত্র চারখানা ছিপ পাঠায় নবাবী নওয়ারার বিরুদ্ধে।

নায়ক সমসের খাঁ লোকটা ছিল ভারি চতুর। যে-সব জল-ডাকাত তখনও মীর আলির ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে নদীতে, খাড়িতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে মাত্র কয়েকদিনের চেষ্টায় তাদের সংগঠিত করে বারোখানা ছোট বড় ছিপ নিয়ে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে ফাঁস্‌ড়ের খালের দিকে এগোতে থাকে। জল-ডাকাতেরা মীর আলির ওপর গোপনে অথচ দ্রুত প্রতিশোধ নিতে মরীয়া হয়ে ওঠে।

ওদিকে মীর আলি জয়ের নেশায় মশ্‌গুল। সে নিশ্চিত হয়ে আছে যে, পরদিন দেবেশ্বরকে বন্দী করে নবাবকে ভেট পাঠাবে। তারপর ওর বড় ভাইটাকে গড়ের জঙ্গলে কতল করে মাথাটা ডাল কুত্তাকে খেতে দেবে। এ জাঁহানে নবাবই হবে একমাত্র সুলতান! কিন্তু মহেশ্বর যে তার নাগালের বাইরে আর উল্টো ফলও হতে পারে সে খেয়াল তার নেই।

সেদিনের যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির পরাজয় হয়েছিল। দেবেশ্বর নিজে আহত হয়ে, বহু সৈন্য হারিয়েও জয়ী হয়, একথা বলা যায়। আর, মীর আলির অবস্থাটা হয়েছিল বাঘ-সিংহের লড়াইয়ের ধারে রক্ত-মাংস-প্রত্যাশী চতুর শিয়ালের মতো। তাই বলে সে ভীরু ছিল না।

ওদিকে তারা নায়েক কৌশলে মুক্ত হয়ে এই যুদ্ধের ফলাফলের খবর পেয়ে একদল সশস্ত্র পাইক নিয়ে এগিয়ে আসছিল। সে চর মারফৎ মীর আলিরও অবস্থান জানতে পেরেছিল। আবার, মীর আলিও তার সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছিল। তার চরেরাও কম দক্ষ ছিল না। কিন্তু তারা নায়েকের একটা মস্ত অসুবিধা ছিল, তার পাইকেরা যোদ্ধা হলেও তাদের যোগ্য সেনাপতি কেউ ছিল না। কারণ তারা নায়েক যুদ্ধের কিছুই জানতো না। তবে মীর আলি একথা জানতো না। নায়েকের শক্তি সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব নানা গল্প তার কানে যাওয়ায় মনে করেছিল সে খুবই শক্তিমান। সে নায়েকের জন্যে জঙ্গলের ধারে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

নায়েক যে পথে আসছিল সেটা দিয়ে ভুবনপুর পৌঁছানো যায়। সে ঠিকই অনুমান করেছিল, জটেশ্বর ও আহত দেবেশ্বর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোনো নিরাপদ স্থানের দিকে সরে গেছে। সুতরাং তার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বরং ভুবনপুরের দিক দিয়ে মীর আলিকে ধ্বংসের চেষ্টা করাই উচিত। এই ধর্মত্যাগীটা যেমন মনুষ্যত্বহীন, তেমনি শয়তান। অথচ সে ভেবে দেখলো না, স্বধর্মে থেকেও ঐ ধরনের মানুষের অভাব নেই। যাহোক, সে অগ্রসর হতে হতে এমন জায়গায় গিয়ে পড়লো যেখান থেকে তার যুদ্ধ করা অসুবিধার। মীর আলি সেই সুযোগ নিয়ে বাঘের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বলা বাহুল্য লড়াই হলো খুব জোর। এক সময় এমন হলো, মীর আলির পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু চতুর মীর আলি সেই দুর্যোগ কাটিয়ে তারা নায়েককে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানলো, যার এলে নায়কের পাইকেরা হতাহত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। মীর আলির উদ্দেশ্য ছিল, তারা নায়েককে জীবিতাবস্থায় বন্দী করা। কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হলো না, সংবাদ এলো 'পাঠানেরা নবাবী নওয়ারা আক্রমণ করেছে।'

মীর আলির অবস্থা তখন সঙান। সে তারা নায়েককে বন্দীর চেষ্টা না করে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। তারা নায়েককে সে বন্দী করতে পারলো না সত্য, নায়েকও সেই থেকে কোথায় যে অদৃশ্য হলো, কেউ হদিস পেলো না। কিন্তু সে যে গানগুলো লোককে শিখিয়েছিল সেগুলো লোকমুখে ফিরতে ফিরতে ক্রমে ক্রমে বাউল-ফকিরের ভিক্ষার উপায় হয়ে দাঁড়ালো। অবশ্য এক দিনে বা এক মাসে হলো না, অনেক বেশি সময় লাগলো। তবে এ পরের কথা। আমাদের এ গল্পের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আমরা কেবল বলবো, কয়েক

শ' বছর আগে একটি মানুষ লোকের মনে দেশপ্রেম জাগাতে লোক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, যার কথা লোকে আজ বিস্মৃত !

পাঠানেরা প্রথমে ফাঁসুড়েয় খালের মুখে মীর আলির ছিপ তিনখানি দখল করে সৈন্যদের মধ্যে কতক বন্দী, কতক হত্যা করলো। কেউ কেউ প্রাণ নিয়ে পালালো। তারপর বিজয়ী পাঠানদের এক অংশ খালের মুখ আটকে থাকলো, অপর অংশের কতক জলপথে ছিপে, কতক তীর ধরে স্থলপথে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভুবনপুরের দিকে খুব তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলো এবং ভুবনপুর থেকে কিছু তফাতে থাকতেই মীর আলি তাদের বাধা দিলে, কিন্তু দুটি যুদ্ধের ফলে মীর আলি তখন দুর্বল। জল-ডাকাত ও পাঠানদের সম্মিলিত আঘাতে তার সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আর সে নিজে ফকিরের ছদ্মবেশে পালালো।

বিজয়ী জল-ডাকাত ও পাঠানেরা ভুবনপুরে ঢুকে লুঠ-তরাজ করে, যাদের সামনে পেলো তাদের মেরে কেটে, ফিরে যাবার সময় নগরে আগুন দিয়ে চলে গেল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলো, উলুখড় জ্বলতে লাগলো। ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে উঠলো। বহুদূর থেকে সে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া চোখে পড়তে লাগলো।

কার ? মুমূর্ষু দেবেশ্বরের, তার দলের, আশেপাশেব গ্রামের লোকদের।

জটেশ্বর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলেছিল গড়-জঙ্গলের দিকে। সে গত রাত্রেই একজন ঘোড়-সওয়ার মারফৎ দুঃসংবাদটি পাঠিয়েছিল।

এদিকে বেলা শেষ হয়ে আসছে। দেবেশ্বরের বাহকেরা একখানি ছোট মাঠে একটি ঝাঁকড়া ছাতিমতলায় তাকে শুইয়ে রেখে বিশ্রাম করতে লাগলো! এ স্থানটি লোকালয় থেকে অনেক দূরে এবং নিরাপদ। দেবেশ্বর শুয়ে শুয়ে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে জটেশ্বরকে জিগ্যেস করলে, 'ওটা কি ? মেঘ ?'

জটেশ্বর সেদিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'ধোঁয়া। সম্ভবতঃ কোন গ্রামে আগুন লেগেছে। তুমি কেমন বোধ করছো ?'

'মরি তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু ভুবনপুরকে উদ্ধার করতে পারলাম না। মনে হয়, তোমরা আমায় গড়-জঙ্গলে নিয়ে যেতে যেতেই পথে আমার মৃত্যু হবে। আমি যদি সতর্ক হতাম—'

'এখন ও কথা থাক্। যুদ্ধে এমন ঘটে থাকে। তুমি সুস্থ হয়ে উঠে, আবার দেশকে উদ্ধারে ব্রতী হবে।'

'না জটেশ্বরদা। মনে হয়, এই আমার শেষ যুদ্ধ।' বলে সে জটেশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে। গভীর যন্ত্রণায় তার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত হলো।

জ্বর-তপ্ত হাত। জটেশ্বর সস্নেহে তা চেপে ধরেই চমকে উঠলো। দেবেশ্বরের শরীরে কয়েক জায়গায় গুরুতর আঘাত। কয়েকটি থেকে তখনও রক্তস্রাব হচ্ছে। বাহিনীর সঙ্গে যে দু'জন বৈদ্য ছিল তারা পালিয়েছে বা নিহত হয়েছে তার ঠিক নেই। সাংঘাতিকরূপে আহত সেনাপতি বুঝি বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। পূর্বে তার শরীরে জ্বর ছিল না, এখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। শীঘ্র চিকিৎসা না হলে ক্ষতগুলো পচতে আরম্ভ করবে। তখন? লৌহকঠিনহৃদয় জটেশ্বরের চোখে জল এলো। কিন্তু সে গোপনে চোখের জল মুছে একজন পাইককে বললে, 'শীঘ্র যাও। কাছে যদি কোন গ্রাম থাকে, সেখানে কোন বৈদ্য থাকলে তাকে স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে এখানে আনবে।'

'যদি না থাকে?'

জটেশ্বর শিরে করাঘাত করলে।

দেবেশ্বর কাতরকণ্ঠে বললে, 'জল।'

মশকে জল ছিল, জটেশ্বর তা থেকে একটু জল তার মুখে ঢেলে দিলে। দেবেশ্বর যেন একটু সুস্থ বোধ করে চোখ বন্ধ করলো।

জটেশ্বর স্থির করেছিল, সন্ধ্যার পরও চলবে। কারণ, চাঁদনী রাত, সঙ্গে পথ-প্রদর্শকটিও দক্ষ ও বিশ্বস্ত। কিন্তু দেবেশ্বরের অবস্থা দেখে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয় ভেবে জটেশ্বর রাত্রিটুকু সেখানেই কাটাবার ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলে। সঙ্গে তার তখনও জন ত্রিশেক বিশ্বস্ত পাইক অবশিষ্ট। তারা দেবেশ্বরের চারধারে একটি ব্যূহ রচনা করে রইলো।

সেদিন শুক্লা একাদশী। নিস্তব্ধ বনভূমি জ্যোৎস্নায় বুঝি ভেসে যায়। পাখীদেরও বার বার ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তারা দিনের আলো মনে করে এক একবার কলরব করে উঠছে। দেবেশ্বরের তরুণ সুন্দর মুখে জ্যোৎস্না মাখিয়ে গেছে। তার চোখ দুটি বন্ধ, যন্ত্রণায় এক একবার মুখ বিকৃত হচ্ছে। জটেশ্বর তার কপালের দীর্ঘ কেশ সস্নেহে সরিয়ে এক একবার তার মুখের ওপর ঝুঁকে দেখছে আর মনে মনে বলছে, 'হায় বীরকিশোর! তুমি কেন এ মৃত্যু-যজ্ঞে এলে?'

রাত তখন গভীর। এমন সময়ে দূরের একটি অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরে সে

সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়ালো। প্রহরীরাও সতর্ক, অস্ত্র প্রস্তুত। বাহকেরাও ইঙ্গিতমাত্রে উদ্যত।

ক্ষণিক পরেই সঙ্কেতবাক্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর হলো। সেই পাইক ফিরে এলো, সঙ্গে একজন ফকির।

পাইক বললে, 'আড়াই ক্রোশের মাথায় এক গাঁ। কিন্তু সেখানে বৈদ্য নেই, ওঝা আছে। ফিরে আসছি এমন সময়ে এই ফকিরের সঙ্গে দেখা। একে যুদ্ধের সব ঘটনা বলেছি। শুনে বললে, চল তো দেখি, কেমন রোগী। আমার কাছে অনেক রকমের দাওয়াই—'

জটেশ্বর ধমক দিয়ে উঠলো, 'হতচ্ছাড়া আহাম্মক! তোকে যুদ্ধের—আচ্ছা, পরে হবে! কৈ সে ফকির?'

ফকির নেই।

তৎক্ষণাৎ দশ-বারোজন ছুটলো ফকিরকে ধরতে এবং খানিক পরেই ধরে নিয়ে এলো আধাফকিরবেশী মীর আলিকে।

জটেশ্বর তাকে ভাল করেই চিনতো। বললে, 'ওকে গাছের সঙ্গে বাঁধ। এ এদেশের লোক হয়েও নিজেকে মনে করে বাদশার জাত। কিন্তু তুই এ বেশ ধরেছিস কেন? ফকির-দরবেশের বেশ মহতের বেশ। তুই—'

শয়তান মীর আলি বললে, 'তুমি কাকে কি বলছো ভাই? নবাবের নওয়ারার মীর আলি তো ভুবনপুরে মৌজ করছে। তার মতো নসীব ক'জনের?'

জটেশ্বর তার কথা শুনে চমকে গেল। তবে কি তার ভুল হলো?

একদিকে এই নাটক, অপরদিকে মুমূর্ষু দেবেশ্বরের কাতরানি—'জল—জল—জ্বলে গেল।'

জটেশ্বর বললে, 'ওকে শক্ত করে বেঁধে রাখ্। দেখছি।'

সে দেবেশ্বরের মুখে জল দিয়ে তাকে একটু সুস্থ করে আবার মীর আলির কাছে আসতেই হঠাৎ চার-পাঁচটি নবাবী পাইক সেখানে উপস্থিত। তারা সকলেই অল্প-বিস্তর আহত। জটেশ্বরের দলকে তারা সেখানে দেখতে পাবে এমন আশা করে নি। আবার পালাবার আগেই বন্দী হলো।

জটেশ্বরের মনে বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় জেগে উঠলো। তার লোকেরাও অবাক। কেবল দেবেশ্বর নির্বিকার।

সেই লোকগুলো সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে গাছের গুঁড়িতে বাঁধা মীর আলিকে দেখেই সসম্ভ্রমে বলে উঠলো, 'বন্দেগী।'

জটেশ্বর এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আরোও অবাক হলো।

তার মনে প্রশ্ন জাগলো, 'দুর্ধর্ষ মীর আলির এমন দশা কেন? ও বাঘ হয়েও ভীরু শিয়ালের মতো পালাচ্ছে! দেখা যাক ব্যাপার কি?'

সে একে একে সমস্ত কথা এক বন্দী পাইকের মুখ থেকে বার করে নিয়ে মীর আলিকে বললে, 'আমাদের মহারাজ এখনও অনেক দূরে। ঐ তাঁর ছোটভাই। ওর এ দশার জন্য কতকটা তুমি দায়ী। সুতরাং আমিই তোমার বিচার করবো। তীরন্দাজেরা তোমাকে তীরবিদ্ধ করে মারবে।'

চতুর মীর আলি বললে, 'যুদ্ধে হার জিত, মরা-বাঁচা আছে। মরবো তাতে দুঃখ কি? কিন্তু তোমাদের রাজার ভাইয়ের জীবন এখন যেতে বসেছে। সেজন্যে কতকটা আমি দায়ী! আমিও আর বাঁচতে চাই না। পরের গোলামী করার আগে আমি তোমাদের রাজকুমারের কিছু উপকার করে যেতে চাই।

'কি উপকার?'

'আমি কয়েকটা হাকিমী গাছ-গাছড়া জানি। তার রসে কয়েক দিনের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে যায়। আমার শরীরে যে কয়েকটা বড় বড় কাটার চিহ্ন আছে সেগুলো ঐ গাছ-গাছড়ার গুণেই আরাম হয়েছে এই বনে সে গাছ-গাছড়া আছে। চাঁদের আলোয় আমি খুঁজে পাবো। তবে ফকিরের নির্দেশ, আমায় একা যেতে হবে।'

জটেশ্বর বললে, 'ব—টে। তোমার কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলেও হবে না?'

'না।'

'সাপ মরতে মরতেও ছোবল মারার চেষ্টা করে। এই! ওকে শেষ কর। তারপর এই কটা—'

সে শিষ দিতেই সাত-আটটা তীক্ষ্ণ তীর গিয়ে মীর আলিকে বিদ্ধ করলে। তার মাথা বুকের ওপর ঢলে পড়লো।

এদিকে দেবেশ্বর এক একবার অচেতন হয়ে পড়ছে। একবার সে মহেশ্বরের নামোচ্চারণ করলে, একবার সূর্যপণ্ডিকে ডাকলে। আর এক বার অস্ফুটস্বরে ডাকলে, 'মা, মা!'

শৈশবে মাতৃহীন কিশোরের আজ মনে পড়লো তার মাকে। কতকাল সে তাঁর স্নেহবঞ্চিত! তারপর এক সময়ে তার প্রাণপাখী নিঃশব্দে ক্ষত-বিক্ষত দেহ-খাঁচাটিকে ছেড়ে উড়ে গেল।

জটেশ্বর তার বুকে কান পেতে শুনলে, সব স্তব্ধ, স্থির। সে লৌহ-মূর্তির মতো স্থির হয়ে নির্জন বনভূমির দিকে তাকিয়ে বসে রইলো।

॥ সতেরো ॥

গড় জঙ্গলের মুক্তি

যে লোকটি দেবেশ্বরের শোচনীয় অবস্থার সংবাদ নিয়ে মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল সে তাঁদের নাগাল পেল না। মহেশ্বর দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছেন গড়-জঙ্গলের দিকে।

এ অঞ্চলটা তাঁর খুবই চেনা। সেই বনভূমি, সেই দূর আকাশ-পটে যেন হাল্‌কা রঙে আঁকা ছোট-বড় পাহাড়, সেই পাহাড়ে নদী, ঝির-ঝিরে, জলধারা। মাঝে মাঝে ধানক্ষেত। এই সব দেখে মহেশ্বরের মনে যেমন আনন্দ হতে লাগলো তেমনি দুঃখও হলো এই মনে করে, এই দেশ বিদেশীদের করতলগত হতে চলেছে। বাংলায় স্বাধীন আর কেউ থাকবে না, এমন কি নবাবও না।

তাঁর বাহিনী বর্শাফলকের মতো খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে।

পথে আসতে আসতে চোয়াড়দের মধ্যেও অনেকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সূর্যপণ্ডিত অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন।

কোথাও কোন বাধা নেই। গড়-জঙ্গলকে দুর্ভেদ্য করতে আগে যে-সব বাধা রচনা করা হয়েছিল সেগুলো কারা যেন সরিয়ে নিয়েছে। সেই ঘন বাঁশঝাড় অনেকটা পাতলা, বড় বড় কাঁটাগাছ কারা যেন কেটে নিয়ে গেছে। মাটিতে যে অসংখ্য ত্রিশূল পোঁতা ছিল, অনেক জায়গাতেই সেগুলো নেই। সুতরাং মহেশ্বরের বাহিনী এক রকম স্বচ্ছন্দে গড়-জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলেছে। গড়-জঙ্গল দখল করা যে এতখানি সহজ হবে, এ ধারণা মহেশ্বরের মনেই হয় নি। তাই যেমন আনন্দ হলো, তেমনি দুশ্চিন্তাও দেখা দিলে এই মনে করে যে, একে কি তিনি দখলে রাখতে পারবেন? বাংলার এই অংশে কি স্বাধীন-রাজ্যের গর্বিত নিশান উড়বে? কোন সার্বভৌম রাজশক্তি তার রাজ্য-সীমানার মধ্যে কোনো দিন কোন রাজাকে স্বাধীনভাবে থাকতে দেয় নি। এ ইতিহাস মহেশ্বরের ভাল করেই জানা ছিল। রাজস্থানের রাণা প্রতাপ, বাংলার প্রতাপাদিত্য, পাঠান ঈশা খাঁর কাহিনী কে না জানে? আজ নবাবের অবস্থা কি? বিদেশী ইংরেজ ক্রমে এদেশের সবটুকু গ্রাস করেছে। নবাবের সৈন্যসামন্ত, অর্থ, বন্ধু-বান্ধব থাকতেও আজ তিনি অনেকটা অসহায়। দেশে এখন নবাবের আর কোম্পানির শাসন চলছে। এদের কাছে মহেশ্বর কি? তাঁর শক্তিই বা কতটুকু?

তবু—তবু তিনি কিছুতেই পরাধীনতা স্বীকার করবেন না। বাংলার এই অংশকে স্বাধীন রাখবেনই। এজন্য যদি প্রাণ যায় যাক। পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল। দাসের মর্যাদা কোথাও নেই। তিনি না পারেন। দেবেশ্বরকে স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে যাবেন।

এমনি নানা কথা ভাবছেন, এমন সময়ে একজন বললে, 'মহারাজ, ঐ দেখুন গড়-জঙ্গলের রাজবাড়ির চুড়া। ঐ—ঐ—রোদে ঝকঝক করছে।'

মহেশ্বর চমকে উঠলেন, বললেন, 'রাজবাড়ি? সে তো ধ্বংস হয়ে গেছে। ও আর কারো অট্টালিকা। কিন্তু ও কার নিশান? ও আমার নিশান নয়। ঐ নিশানকে নামিয়ে ছিন্ন—'

তাঁর কথায় বাধা পড়লো।

তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এলেন সূর্যপণ্ডিত। তিনি মহেশ্বরকে বললেন, 'ভুবনপুরের সংবাদ অত্যন্ত অশুভ।'

মহেশ্বর উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'ভুবনপুর পাঠান আর জল-ডাকাতরা লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে।'

'দেবেশ্বর রক্ষা করতে পারলো না?'

'যুদ্ধে বীরের যে সদ্‌গতি লাভ হয় দেবেশ্বর তাই লাভ করেছে। সে আমাদের আগেই স্বর্গে পৌঁচেছে।'

'দেবেশ্বর—'মহেশ্বরের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

'মহারাজ! এ শোকের সময় নয়। সে কোম্পানির ফৌজকে পরাস্ত, বিতাড়িত করে আহত হয়ে চণ্ডীপুরের জঙ্গলে প্রাণত্যাগ করেছে।'

'তার দেহ?'

'সম্ভবতঃ ভস্মীভূত। আর—'

'আর কি?'

'নবাবের রূপনারাণি নৌয়ারা বিধ্বস্ত, অধ্যক্ষ মীর আলি জটেশ্বরের হাতে বন্দী, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে।'

'এই সংবাদকে কি বলবো?'

'কিছুই বলার দরকার নেই। আমরা স্বাধীনতা-যুদ্ধের যোদ্ধা। নির্ভয়ে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবো। ঐ দেখা দেখা যায় গড়-জঙ্গল। ও কি? কামানগর্জন নয়? হ্যাঁ, তাই তো—'

মহেশ্বর বললেন, 'কার কামান? কোম্পানির না নবাবের?

পণ্ডিত বললেন, 'যারই হোক, কামানটা ধ্বংস অথবা দখল করতে হবে।'

যে লোকটি কোম্পানির তরফে ভারপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে ছিল সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এ কথা আগেই বলেছি। তার মতলব ছিল কোম্পানির অধীনে করদ রাজার মতো রাজত্ব করার। প্রবলের বিরোধিতা না করে তার সঙ্গে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে, দরকার হলে, তার অধীনতা স্বীকার করেও রাজা হয়ে বসা বুদ্ধিমানের কাজ। সে কেম্পানির একটা অকেজো কামানকে কাজ চালানো গোছের করে নিয়েছিল। জঙ্গলের অনেক ত্রিশূল তুলে সেগুলো গালিয়ে নানা রকমের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করেছিল। ভুবনেশ্বরের আমলের যে কয়েক ঘর নিপুণ লোহকার তখনও গড়-জঙ্গলে ছিল, তাদের বংশধরদের লোহার অস্ত্রশস্ত্র গড়ার কাজে সে নিযুক্ত করে শিল্পটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল।

যাহোক, মহেশ্বর বুঝলেন, গড়-জঙ্গল অধিকার করা যতটা সহজ মনে করেছিলেন ততটা সহজ নয়। তবে এ বাধা ততটা প্রবল হবে বলে মনে হচ্ছে না। গরুড়ধ্বজের ধ্বজা যখন তিনি ছিন্নভিন্ন ও পদদলিত করেছেন তখন এটাকেও ধূলিসাৎ করবেন, এবং হলোও তাই।

যুদ্ধ হলো নাম মাত্র। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি কোন্ পথে কোথায় পালালো কেউ বুঝতে পারলো না, পড়ে রইলো তার অসহায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা।

মহেশ্বর বিজয়গর্বে নগরে প্রবেশ করে তাঁর বিজয়-পতাকা উড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর বিজয়ী বাহিনীকে হুকুম দিলেন, নগরের কারো ওপর যে কিছুমাত্র অত্যাচার করবে, তার শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু তিনি পুরানো প্রাসাদে গেলেন না, এক চত্বরে তাঁবু খাটিয়ে সেখানে দরবার বসালেন।

প্রথমেই তাঁর সম্মুখে আনা হলো কর্মচারীটির বন্দী স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে।

তাদের সকলেরই চোখে জল, মুখে ভয়ের চিহ্ন।

মহেশ্বর বললেন 'এদের শৃঙ্খল খুলে দাও। এরা নির্দোষ। যেখানে যেতে চায়, সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।' এবং অন্যান্য বন্দীদের প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের আদেশ দিয়ে সভা ভঙ্গকরলেন।

ওদিকে কোম্পানি ও নবাবের কাছে ভুবনপুর ও গড়-জঙ্গলের দুঃসংবাদ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। উভয়েই জ্বলে উঠেছেন।

॥ আঠারো ॥

স্বাধীন রাজা মহেশ্বর, মন্ত্রী সূর্যপণ্ডিত

মহেশ্বর রাজত্ব করছেন। সূর্যপণ্ডিত তাঁর মন্ত্রী।

রাজ্যজয়ের সাত দিন পরে এক সন্ধ্যায় তিনি সূর্যপণ্ডিতকে ডেকে পাঠালেন। বড় সুন্দর সন্ধ্যা। পূর্বদিগন্তে তরুসারির মাথায় পূর্ণিমার

ভরা চাঁদ। মাধবী ও বকুল ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। অদূরে এক ঝোপের আলো-আঁধারে বসে একটি বুলবুল গান গাইছে।

মহারাজ মহেশ্বরের প্রাসাদে বিলাস-সামগ্রী কিছুই নেই। বাড়িখানি অথবা থাকবার জায়গা যা বলা যাক, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে একটি অস্থায়ী শিবির! মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত দু'জনেই ভাল করে জানেন, তাঁরা শত্রুবেষ্টিত। গড়-জঙ্গলের বিরুদ্ধে কখন নবাবী ফৌজ বা ইংরেজ সৈন্য আসে ঠিক কি? সুতরাং প্রস্তুত থাকাই উচিত। তাঁরা প্রস্তুত আছেন, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করছেন। কিন্তু দেশের লোক যদি উৎসাহী না হয় চরম ত্যাগ স্বীকার না করে, তবে স্বাধীনতা রক্ষা করাও যায় না। স্বাধীনতার মর্ম কি তাই যেন লোকে বুঝতে পারে না।

সূর্যপণ্ডিত সন্ধ্যাহ্নিক সেরে মহেশ্বরের কাছে এলেন। মহেশ্বর তাঁকে আসন গ্রহণ করতে বললেন। সূর্যপণ্ডিতের চোখে কৌতূহল।

মহেশ্বর বললেন, 'ডেকেছি একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করতে।'

'কোন্ বিষয়?'

'আমার বাড়ির সকলকে কটক থেকে আনবার ব্যবস্থা করা আপনার মতে কি অবিবেচনার কাজ হবে?'

'মহারাজ, আমাদের অবস্থা অস্থির, নিরাপদ নয়। সংগ্রামীর জীবনে সুখ-শান্তি দুর্লভ।'

মহেশ্বর ক্ষণিক চিন্তা করে বললেন, 'তবে তো রাজ্যের উন্নতিচিন্তাও অর্থহীন। আপনার কথায় মনে হয়, আপনি বলতে চাইছেন, আমার স্বাধীন গড়-জঙ্গল স্বাধীন থাকবে না।'

'আপনি নিজেই তো বিষয়টা বুঝতে পারছেন। বুঝতে পারছেন, আমরা এবার দুই প্রবল শক্তির সামনাসামনি দাঁড়িয়েছি। হয় তাদের অধীনতা স্বীকার করে রাজ্য পরিচালনা করতে হবে অথবা স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা বহন করে অনিশ্চয়ের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। প্রথমটিতে সুখ-শান্তি। কিন্তু তা হচ্ছে, মর্যাদাহীন দাসের জীবন। দ্বিতীয়টিতে সংগ্রাম, গভীর দুঃখ। তবে সে জীবন স্বাধীন মানুষের, বীরের, সম্মানের!'

মহেশ্বর আসনে সোজা হয়ে বসলেন, দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি স্বাধীন। বাংলার এই অংশকে স্বাধীন করেছি। গোটা বাংলাকে স্বাধীন করা আমার স্বপ্ন। তা সফল করতে যদি জীবনপাত হয় তো ক্ষতি কি?'

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'সাধু সাধু!'

মহেশ্বর বললেন, 'কি সুন্দর সন্ধ্যা! কি মনোরম আমার দেশ!'

'মহারাজ! দেশ কি শুধুই মাটি? কিন্তু যাক সে কথা। আমি রাজ্যের উন্নতির জন্য কতকগুলো পরিকল্পনা করেছি। কাল যথাসময়ে সেগুলো উপস্থিত করবো।'

'ভাল কথা। এই কে আছিস? সেই গায়ককে পাঠিয়ে দে।'

সূর্যপণ্ডিত অবাক হলেন মহেশ্বরকে তিনি কোনদিন গান শুনতে দেখেন নি! তাঁর সভায় কোন গায়ক-বাদক ছিল না। মনে মনে বললেন, 'দেখা যাক লোকটা কে।'

প্রহরী দুটি অল্পবয়স্ক লোককে নিয়ে এলো। তাদের পরনে গেরুয়ারঙের আলখাল্লা, মুখে অল্প দাড়ি, মাথায় লম্বা চুলগুলো চূড়া করে বাঁধা। তারা এসে সসম্ভ্রমে মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিতকে নমস্কার করলে। সূর্যপণ্ডিতের মনে হলো, এরা তারা নায়েকের সাকরেদ। রাজস্থানে একসময়ে যে চারণ কবিরা গান রচনা করে ও গেয়ে লোকের মনে দেশপ্রেম জাগিয়েছেন নায়কের সাকরেদরা বুঝি তাই করে বেড়াচ্ছে।

মহেশ্বর ও তিনি তাদের না চিনলেও আমরা তাদের চিনি। দু'জনে তারা নায়কের সাকরেদও নয়, চারণও নয়, তারা হচ্ছে মৃত্যুঞ্জয় ও তার বন্ধু। এবার মৃত্যুঞ্জয়ের এক হাতে ডুগডুগি, অপর হাতে একতারা। তার বন্ধুর হাতে সেই পুরনো বেহালাটি।

মৃত্যুঞ্জয় বললে, 'মহারাজ, আদেশ করুন।'

'কি গান তোমরা জান?'

'পাঁচালি, ছড়া, আর—'

'আর কি?'

'মহারাজের সম্বন্ধে।'

'আমার সম্বন্ধে? কি রকম? এ গান কে বেঁধেছে?'

'মহারাজ, আমরা দু'জনে। ছিলাম সদরে। সেখানে কালেক্টারের চাকর ছিলাম। অহরহ আমার দেশের লোকের নিন্দা শুনেছি। আপনার নাম লোকের মুখে মুখে। সবাই বলে, আপনি শিবের ত্রিশূল পেয়েছেন। তার তেজে নবাব আর ইংরেজ আপনার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। আপনি ধর্মরাজ্য গড়ছেন। কিন্তু মহারাজ—' মৃত্যুঞ্জয় চুপ করলো।

'যা বলতে চাও নির্ভয়ে বল।'

'দুষমনের ক্ষমতাও অনেক। তারাও এলো বলে।'

মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত মনে মনে চঞ্চল হলেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'কি করে জানলে ?'

মৃত্যুঞ্জয় বললে, 'আমি কালেক্টারের খাস আরদালি ছিলাম।'

'আর কি জান ?'

'শুনেছি নৌয়ারা আসছে ভুবনপুরের দিকে। রূপনারায়ণের বুক ছেয়ে গেছে। আর সদর থেকে আসছে দেশী-বিদেশী ফৌজ।'

মহেশ্বর বললেন, 'তোমরা আজ বিশ্রাম কর গে। সময়মতো তোমাদের গান শুনবো!'

মৃত্যুঞ্জয় ও তার বন্ধু সেখান থেকে বেরিয়ে অতিথিশালার পথ ধরলো এবং সেখানে গিয়ে গান ধরলে, 'ও মহেশ্বর কে তোমারে পারে ধরিতে।' ইত্যাদি। তাদের গান শুনতে অতিথিশালায় বহু লোক জড় হলো।

এদিকে মহেশ্বর ও সূর্যপণ্ডিত মন্ত্রণায় বসলেন। ওদিকে নবাবী নওয়ারা ও ইংরেজ-ফৌজ ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

ফৌজ আসছে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে তাদের উদ্দেশ্য গড়-জঙ্গলকে বেষ্টন করা। কিন্তু তাদের পথে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ালো আদিবাসী, চোয়াড়েরা আর কর্মচ্যুত পাইকেরা। অবশ্য এর মধ্যে সূর্যপণ্ডিতের ও হাত ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, দেশের লোক সহায় না হলে রাজশক্তির সাধ্য নেই বিদেশীকে পরাভূত করে স্বাধীনতা রক্ষা করা।

দেশী লোকদের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে ফৌজের শক্তি ক্ষয় হতে লাগলো বটে, সেই সঙ্গে বিরোধীদেরও যথেষ্ট মূল্য দিতে হলো। ফৌজ তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, লুঠ-তরাজ করে চরম প্রতিশোধ নিতে লাগলো। এর ওপর টাকা দিয়ে দেশী লোকের দল ভাঙতে শুরু করলো। তারা কয়েকজন সর্দারকে হাত করে ফেললে। ফলে প্রতিরোধ কমে আসতে লাগলো এবং ইংরেজের ফৌজ গড়-জঙ্গলের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় ছাউনি ফেলে আরও ফৌজের অপেক্ষায় রইলো। তাদের বিপর্যয়ের খবর সদরে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে একজন দেশী ফৌজদার ও কালেক্টর সাহেব স্বয়ং নতুন ফৌজ নিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে লাগলেন।

রূপনারায়ণের পথে নবাবী নওয়ারা বিনা বাধায় কাঁসুড়ের খালের মুখে এসে পৌঁছে নোঙর করে রইলো। তারা আর অগ্রসর হলো না। সেনাপতি, স্থলপথে একজন চর পাঠালেন, অবস্থা জানবার জন্যে।

এই সময়ে এই অঞ্চলে এক ভূতপূর্ব পাইকের অধীনে ডাকাতের একটা দল গড়ে উঠেছিল। তাদের কাজই ছিল, ধনীর ধন দৌলত লুঠ আর নবাব ও কোম্পানির ক্ষতি করা। লুঠের মাল যে তারা গরীবদের বিলি করতো

তা নয়। সে সব যতটা পারতো নিজেরা ভোগ করতো, বাকি সব জঙ্গলে এক জায়গায় পুঁতে রাখতো। তারা নওয়ারার খবর পেয়ে খালের ধারে জায়গায় জায়গায় বড় বড় গাছ কেটে জলে ফেলে দিয়েছিল। নওয়ারার অধ্যক্ষ কিন্তু এ ব্যাপার জানতো না। তার প্রেরিত চর ডাকাতদের হাতে পড়ে প্রাণ দিলে। ডাকাতরাও নওয়ারার খবর পেয়ে তাদের ক্ষতি করবার মতলবে ছুটলো।

।। উনিশ ।।

স্বাধীনতার শেষ শিখা নিভে যায়

নবাবী নৌয়ারার আর এক শত্রু ছিল পাঠানেরা। কিন্তু তাদের শক্তি নবাবী নৌয়ারার সঙ্গে লড়বার মতো যথেষ্ট শক্তি ছিল না। তবু তারা উত্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে সাবধানে ও গোপনে ফাঁসুড়ের খালের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ডাঙায় তাদের চর ছিল। তারা দরবেশ বা মুসাফিরের বেশে ঘুরে বেড়াতো। কেউ কেউ ছোট ডিঙি নিয়ে নদীতে মাছ ধরতো আর সুবিধা পেলেই তীরের গ্রামে নেমে চুরি-ডাকাতি করে সুন্দরবন বা হিজলীর দিকে পালাতো। পাঠানেরা এদেরই কাছে খবর পেল, ফঁসুড়ের খাল-অঞ্চল ডাকাতদের অধিকারে। তারা নৌয়ারাকে ভুবনপুরের দিকে এগোতো দেবে না! আবার, তারাই ডাকাতদের খবর দিলে, নৌয়ারার পিছনে ফিঙে লেগেছে। কিন্তু পাঠান বা ডাকাত কারো উদ্দেশ্যই ভুবনপুর রক্ষা নয়, তারা মহেশ্বরেরও বন্ধু নয়। তারা নবাব বা ইংরেজ এদের কাউকেই পছন্দ করে না, এই মাত্র। নৌয়ারাকে দুই দল জলে ও ডাঙায় উত্যক্ত করতে লাগলো। নৌ-অধ্যক্ষ এই দুই ক্ষুদে শত্রুকে নিয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেখলেন, জলপথে ভুবনপুরের দিকে এগোনো সম্ভব নয়। কারণ তাঁর সৈন্যেরা জল-যুদ্ধে পটু, স্থল-যুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়তে পারবে না। ঐ দুই শত্রুকে শায়েস্তা করে ভুবনপুর পৌঁছতে হলে আরও সৈন্য ও খান দশেক রণতরী দরকার। তিনি নবাব-সরকারে একথা জানিয়ে জলপথে ও স্থলপথে দূত পাঠালেন।

ওদিকে গড়-জঙ্গলের বাইরে শেষ রাতে হঠাৎ মেঘগর্জনের মতো একবার গম্ভীর শব্দ হলো। তাতে অনেকের ঘুম ভেঙে গেল। নগরের সকলেই জানতো কোম্পানির ফৌজ কাছেই ওৎপেতে আছে। সুতরাং সকলেরই মনে দারুণ দুশ্চিন্তা, হয়তো প্রাণে মরবে, নয় তো যথাসর্বস্ব

হারাবে। কোম্পানির সঙ্গে আজ পর্যন্ত কেউই লড়াইয়ে জিততে পারেনি, তাদের মহারাজের কি জিতবার শক্তি আছে? কিন্তু শব্দটা একেবার হয়েই থেমে যাওয়ায় সকলের মন হালকা হয়ে আসতে আসতেই দেখা গেল, নগরের পথে পথে মহেশ্বরের সৈন্যেরা টহল দিচ্ছে, কাউকে নগরের বাইরে যেতে, কোথাও জটলা পাকাতে দিচ্ছে না। নগরের বাইরের অবস্থা কি তা তারা জানতে পারলেও আন্দাজ করে নিলে যে একটা বিপদের কিছু ঘটেছে। কাজেই মনের ভার হাল্‌কা হতে হতেই আবার দ্বিগুণ ভারী হয়ে উঠলো। ঠিক সেই সময়ে আবার মেঘগর্জন হলো, এবার যেন কিছু কাছে কোথাও। তারপর আবার, কিন্তু উত্তর দিকে। তারপরই পুব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অল্পক্ষণ পর পর শব্দ হতে লাগলো। এবার সকলেই বুঝতে পারলে কোম্পানির ফৌজ নগরের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। যে সব সৈন্য টহল দিচ্ছিল তারা কি একটা আদেশ পেয়ে বাইরেব দিকে ছুটলো। তিনদিক থেকে কামান-বন্দুকের আওয়াজ, বহু লোকের চীৎকার কানে আসতে লাগলো। ঘোর যুদ্ধ যে হচ্ছে এতে আর সন্দেহ নেই।

নগরবাসীদের মনোবল ভেঙে পড়বার মতো হলো। এমন সময়ে নগরের মাঝখানে যেখানে মহেশ্বরের শিবির ছিল তার ওপর একটি গোলা এসে পড়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। এর ফলে নগরে আর শৃঙ্খলা থাকলো না। চীৎকার, কান্নাকাটি, ছুটোছুটি আরম্ভ হলো। যে দিকটা নীরব ছিল সেইদিকে কেউ কেউ পালাতে লাগলো। শিবিরের আগুনটা নিবানোর কথা কারোই মনে পড়লো না, সে আগুন রাক্ষসের মতো লম্বা জিভ বার করে একখানি খড়ের চালে লাগলো এবং সেখান থেকে বাতাসে অন্য চালে লাফিয়ে পড়ে এগিয়ে.চললো। আকাশে উঠলো ধেঁায়া।

নগরের তিন দিকে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। পুব দিকে মহেশ্বর, মধ্যখানে সূর্যপণ্ডিত, উত্তরে জটেশ্বর যুদ্ধ-পরিচালনা করছেন। কোম্পানির সৈন্যেরা বিলাতী রণ-কৌশলে সুশিক্ষিত, তাদের অস্ত্রশস্ত্রও উৎকৃষ্ট। সুতরাং যুদ্ধে তাদের সুবিধা হতে লাগলো। তার ওপর নূতন সৈন্য এসে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। কোম্পানির পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করছে কয়েকজন ইংরেজ সেনাপতি। কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী ইংরেজ কর্মচারীও তাদের সঙ্গে আছে।

উভয়পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। কোম্পানির ফৌজের একাংশ নগরের একেবারে কাছে পৌঁছতেই তাদের সঙ্গে মহেশ্বরের দলের হাতাহাতি সংগ্রাম শুরু হলো। মহেশ্বরকে চকিতে একবার দেখা গেল।

রক্তমাখা তলোয়ার হাতে, শরীরের কয়েক জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে, চীৎকার করে বলছেন, 'কাটো—কাটো। পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যু ভাল।' এই সময় একটি গোলা এসে পড়লো তাঁর পাশে। তারপরই তিনি অদৃশ্য হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ইংরেজসৈন্য তলোয়ার ও সঙিন-চড়ানো বন্দুকহাতে ছুটে এসে বলতে লাগলো, 'রাজা—রাজা—পাকড়ো—পাকড়ো।' মহেশ্বর যেদিকে গেলেন তারাও সেদিকে ছুটলো।

সূর্যপণ্ডিত ও জটেশ্বর প্রথম দিকে কিছুটা সুবিধা করতে পারলেও তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে গুজব রটে গেল, মহেশ্বর আর যুদ্ধ করবেন না। কোম্পানির হাতে তাঁর সমস্ত ফৌজ সমর্পণ করেছেন। গুজবটার সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে অনেকে রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো। সূর্য-পণ্ডিত ও জটেশ্বর বহু চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারলেন না। এই সময়ে জটেশ্বর একটি গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করলে। সূর্যপণ্ডিত সে কথা জানতে পারলেন না, কেবল দেখলেন, উত্তরদিক স্তব্ধ, তাঁর সৈন্য-সংখ্যাও অল্পই অবশিষ্ট আছে। জয়ের আর আশা নেই, যুদ্ধ বৃথা! কিন্তু মহেশ্বর কোথায়, কি অবস্থায় আছেন? পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, গড়-জঙ্গল জ্বলছে, কোম্পানির ফৌজ সেদিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে।

এদিকে তখন দিন-শেষের ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। সূর্য অস্ত যেতে আর বিলম্ব নেই, রণ-ভূমি প্রায় নীরব। এখানে-সেখানে কিছু কিছু যুদ্ধ হচ্ছে। এরই মধ্যে এক জায়গায় হঠাৎ ঘোর রোল উঠলো। মহেশ্বর সেদিকে আছেন মনে করে সূর্যপণ্ডিত সেদিকে ছুটলেন। পথ হত-আহত ও ভাঙা অস্ত্রশস্ত্রে দুর্গম। সুতরাং পৌঁছতে দেরি হলো এবং যখন পৌঁছলেন, তখন সূর্য অস্তমিত, রণভূমি স্তব্ধ। তার মধ্যে আহতের কাতরধ্বনি। মৃতদেহের লোভে শিয়াল-কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সূর্যপণ্ডিত বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, দূরে একটি আলো জ্বলছে। মনে পড়লো সেদিকে একটি সংকীর্ণ নদী আছে। তবে বারোমাস তাতে জল থাকে না। তার ওপারে গ্রাম ও শস্যক্ষেত। আলোটা যেন সেদিকেই জ্বলছে। তিনি আলো লক্ষ্য করে চললেন। কিন্তু খানিক পরেই আলোটা নিভে গেল। চারধারে গাঢ় অন্ধকার। যুদ্ধ ততদূর ছড়িয়ে পড়েনি। তাই মাঠখানি প্রায় বাধাহীন। তবু সন্তর্পণে মাঠ পার হয়ে চললেন। আবার আলোটি দেখা যেতে বুঝলেন, কেউ আলোটি আড়াল করে বসে বা দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটির কাছে পৌঁছতেই মানুষের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে

এলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন না,' যে চার-পাঁচটি বড় বড় গাছ সেখানে ছিল তার একটির আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন, একটি দেহ মাটিতে পড়ে আছে আর দুটি লোক তার মুখের ওপর ঝুঁকে কি দিচ্ছে, বোধ হয় জল। তাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াতেই তার বেশ-ভূষা সূর্যপণ্ডিতের চোখে পড়লো। মনে মনে বললেন, 'লোকটা বাউল। কাকে নিয়ে কি করছে ওরা?'

তিনি খোলা তলোয়ার হাতে তাদের কাছে গিয়ে মশালের আলোয় শায়িত লোকটিকে দেখেই বলে উঠলেন, 'মহারাজ—মহেশ্বর—' এবং তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের ওপর ঝুঁকে, বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলেন, তিনি জীবিত। সূর্যপণ্ডিত লোকদুটির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কে? ওহো মনে পড়ছে, তোমরা গান শোনাতে গিয়েছিলে। এঁকে কোথায় পেলে?'

তারা উত্তর দেবার আগেই মহেশ্বর কাতরধ্বনি করে উঠলেন, বললেন, 'জল।'

বাউলদের একজন নদীতে কাপড় ভিজিয়ে এনে মহেশ্বরের মুখে জল দিলে।

মহেশ্বর বললেন, 'আঃ!' তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ঘন অন্ধকার—পরাধীনতা—'

'শান্ত হোন, মহারাজ। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তো শেষ রক্তবিন্দু দান করলেন।' বলে সূর্যপণ্ডিত গভীর নিঃশ্বাস ফেললেন।

'তাই তৃপ্তি।' কিন্তু মহেশ্বরের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। তিনি আবার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

সূর্যপণ্ডিত বললেন, 'চল ভাই, আমাদের রাজাকে এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাই। তারপর জীবন-মৃত্যু যাঁর হাতে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।'

তিনজনে সযত্নে, সন্তর্পণে মহেশ্বরের অচেতন, আহত দেহটিকে বয়ে নিয়ে চললেন নদীপারে। তারপর কি ঘটেছিল সেকাহিনী রহস্যাবৃত। কেউ বলতো, 'মহেশ্বর বেঁচে আছেন। সৈন্যসংগ্রহ করে আবার আসবেন।' 'কেউ বলতো, তিনি সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেছেন।'

কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেন নি। তবে এই কাহিনী নিয়ে দুটি বাউল, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ঘটনাটির অনেক দিন পরেও অনেক দিন ধরে গান গেয়ে লোকের চোখে অশ্রু ঝরিয়ে গেছে।

ভোম্বল সর্দার

(১ম ও ২য় ভাগ)

কয়েকটি বিদেশী ভাষায় অনুদিত

ভোম্বোল সর্দার

(প্রথম পর্ব)

॥ এক ॥

পলাতক

অনেকদিন আগের কথা—

আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন, ছেলেদের নিয়ে পাড়ায় মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। কথাটা যে শোনে সে-ই প্রথমে অবাক হয়, তারপর ভয়ংকর রেগে ওঠে; বলে—'ছেলেগুলোর কঠিন শাস্তির দরকার; দেশসুদ্ধ জ্বালালে।'

কর্তারা তাই ছেলেদের বিচারে বসেছেন। বিচার-সভা বসেছে, পাড়ার নিধু চক্রবর্তীমশাইয়ের কাছারি-ঘরের বারান্দায়।

মস্ত খড়ের ঘর; সামনে ফাঁকা উঠোন। তার ও-দিকে বেলতলা, এ-দিকে সজনে গাছ, রাংচিত্রার বেড়ার কোলে কোলে সুপুরি-গাছের সারি। তার মধ্যে একটা গাছ ন্যাড়া। টানা বাতাসে সেও অন্যগুলোর সঙ্গে এক-একবার মাথা দোলাচ্ছে।

চক্রবর্তীমশাই পাড়ার মোড়ল। সকলে তাঁকে সমীহ করে। গোল ভুঁড়িটি বা'র ক'রে একখানা বড় জলচৌকি জুড়ে তিনি বসে আছেন। —হাতে হুঁকো। তাঁর পাশে তক্তাপোষে মাদুরের ওপর পাড়ার ভদ্রেরা সকলে বসেছেন। আর, তাঁদের সামনে বারান্দার নিচে, উঠোনে, বাদী ও আসামী দুই-ই হাজির। কেবল আসামীদের সর্দার ভোম্বোল পলাতক।

বাদী হলো বাজারের কাঠগোলার মজুরেরা।

এমনিতেই চক্রবর্তীমশাইয়ের গলার স্বর মোটা। তা আরও মোটা করে ছেলেদের মধ্যে একজনকে তিনি বললেন,—'এই টগ্‌রা, ইদিকে আয়।'

সকলেই জানে টগ্‌রা ভাল ছেলে, দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না; এক জায়গায় বসে থাকতে ভালোবাসে। সে চক্রবর্তীমশাইয়ের কাছে ভয়ে ভয়ে সরে এলো। চক্রবর্তীমশাইয়ের ঠিক পাশটিতে বসেছিলেন, টগ্‌রার বাবা। তিনি বাঘের মতো রুক্ষ চোখে তার দিকে তাকালেন।

মজুরদের দেখিয়ে চক্রবর্তীমশাই জিগ্যেস করলেন—'ঠিক করে বল, তোরা ওদের একখানা ডিঙি ডুবিয়ে দিয়েছিস্?'

টগরা একবার আড়চোখে তার বাবার দিকে তাকালে। তারপর ঢোক গিলে বললে,—'না—হাঁ—মানে ডিঙিখান আপনিই ডুবে গেছে—'

চক্রবর্তীমশাই একটু রসিকতার সুরে জিগ্যেস করলেন,—'ডিঙি কুমীর না কচ্ছপ যে কূল থেকে মাঝ গাঙে সাঁতরে গিয়ে ভুস্ করে ডুবে গেল?'

টগ্‌রার বাবা ধমক দিলেন,—'মিছে কথা বলা হচ্ছে? ভোম্‌লার সঙ্গে মিশে একেবারে গোল্লায় গেছ!'

চক্রবর্তীমশাই বললেন,—'আচ্ছা, কথাটা বার করছি।' তারপর বড় বড় চোখ করে ডাকলেন,—'এই ফেকু, ইদিকে আয়।'

ফেকু তাঁর ভাগ্নে। একরত্তি ছেলে সে। তা'র গলার আওয়াজ এক পয়সার মট্‌রা বাঁশির মতো। সেও ভোম্বোলদের দলে ছিল। চক্রবর্তীমশাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই সে পিঁক্ করে কেঁদে ফেললে, কাঁদতে কাঁদতে বললে,—'আর করবো না মামা।'

চক্রবর্তীমশাই বললেন—'সে তো পরের কথা। কী হয়েছে বল্ দেখি।'

—'কী হয়েছে? ডিঙি ডুবে গেছে।'

—'কী করে?'

—'কী করে? ভুস্ করে।'

—'বটে-এ! তার আগে কী হয়েছিল?'

—'তার আগে কী হয়েছিল?' সে কাপড় চিবুতে চিবুতে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে,—'এই, ভোম্বলদা—না, ভোম্‌লা—সিদিন আমরা বাজারে বায়স্কোপে রুশ-জাপানের জলযুদ্ধের ছবি দেখে এলে, সকলকে বললে, 'কাল আমরাও ঐ রকম জলযুদ্ধ করবো।' রাখাল বললে, 'জাহাজ পাবে কোথা?' ভোম্বোলদা বললে, 'জাহাজের আবার ভাবনা? কাঠগোলার মজুরদের ডিঙি চড়ে যুদ্ধ হবে।' তাই আজ সকালে মজুরদের দু'খানা ডিঙি খুলে নিয়ে তাতে চড়ে মাঝগাঙে গিয়ে আমরা দু'দলে যুদ্ধ করছিলাম। যুদ্ধ করতে করতে—বলেই ফেকু ফিক করে হেসে ফেললো। ছেলের দলও খুক্ খুক্ করে হাসতে লাগলো।

তাদের হাসিতে চক্রবর্তীমশাইরা আরও গম্ভীর। দত্তমশাই লাঠি উঁচিয়ে ভাঙা গলায় হুঙ্কার দিলেন—'সব চুপ্। জানো, কত বড় অপকম্ম করেছো?'

চক্রবর্তীমশাই জিগ্যেস করলেন,—'তারপর ?'

ফেকু বললে,—'তারপর ? ভোম্বোলদা—না, ভোম্‌লা—আমাদের ডিঙি থেকে টগ্‌রাদের ডিঙিতে মানকেকে লগি দিয়ে খোঁচা দিতেই বোদে লগি ধ'রে একটানে ডিঙিসুদ্ধ্‌ কাত করে দিলে। ডিঙিখানা অমনি উল্টে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে গেল—'

—'সেই ডিঙিতে যারা ছিল, তাদের কী হলো ?'

—'তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডিঙির চারধারে সাঁতার কাটতে লাগলো—। কেউ কেউ সাঁতরে মানকেদের ডিঙিতে উঠলাম।'

—'ভোম্‌লা ?'

—'সে উঠলো না। চেঁচিয়ে বললে, 'আমি সেনাপতি। আমার দলের সকলে রক্ষা না পেলে আমি উঠবো না।' সে লালু আর মোংলার সঙ্গে সাঁতরে গিয়ে মালোপাড়ার ঘাটে উঠলো—'

হারান চাকীমশাই বলে উঠলেন—'এঁঃ। ব্যাটা একেবারে জাপানী অ্যাডমিরাল তোগো। উঠবেন না! বর্ষার জল থৈ থৈ ভরা নদী। কুমীর-বেঁশেলে নদীটা এখন বোঝাই—তিনি উঠবেন না! কী ভয়ানক পাজী! আজ আসুক একবার বাড়ি। মেরে—' বলেই তিনি ভোম্বোলের উদ্দেশ্যে হাওয়ায় খুব জোরে এক চড় মারলেন।

ভোম্বোল তাঁর ভাইপো। তার মা-বাবা কেউ নেই।

সেদিন বিচার আর এগোলো না। চক্রবর্তীমশাই মজুরদের বললেন, —'তোরা কাল আসিস্‌ রে। আসল দোষী যে সে-ই পালিয়েছে। তাকে ধরি আগে।' তারপর ছেলেদের দিকে চোখ বড় করে তাকিয়ে বললেন, —'যা সব অঙ্ক কষ গে। প্রত্যেকে দেড়শ'টা করে বুদ্ধির অঙ্ক কষবি।'

বেলা তখন চারটে। রেললাইনের ধারে যুগীপাড়ার মাঠে সেদিন তাদের বড় এক ফুটবল ম্যাচ হবার কথা। প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে, থানা-পাড়ার টীম। কসাই-বাড়ি থেকে খাসির চর্বি কিনে বলটাতে বেশ করে মাখানো হয়েছে ; ব্লাডারের 'লিক' তিনটেও 'সলিউসান' দিয়ে সারা গেছে—এখন সব মাটি !

ছেলের দল শান্ত সুবোধের মতো যে যার বাড়ি চলে গেল। এক রক্ষা যে, অঙ্কের বইয়ে দেড়শ'টা বুদ্ধির অঙ্ক নেই! তাদের রাগ হলো সর্দারের ওপর। তার জন্যেই সকলের এমন শাস্তি। তিনি বেশ মজা করে সরে পড়েছেন!

কিন্তু দোষ করলে শাস্তি ভোগ করতেই হবে।

জায়গাটি ছোট শহর—উত্তরে নদী, দক্ষিণে রেল-লাইন। কিন্তু শহরের মধ্যে গ্রামের মতো এখানে-সেখানে ঝোপ-ঝাড়, বাঁশবন ও বড় বড় গাছ। সন্ধ্যা হলেই এদিক-ওদিক থেকে শিয়ালের পাল হেঁকে ওঠে, ঝিঁঝিঁগুলো ঝাঁ ঝাঁ করে, জোনাকীর ঝাঁক যেন লণ্ঠন দুলিয়ে আঁধারে শূন্যপথে চলে-ফিরে বেড়ায়।

তবে বাজারটা বেশ বড়। সেখানে মাড়োয়াড়ীদের কাপড়ের দোকান ও বড় বড় কাঠগোলা আছে। নদী-পারে গ্রামগুলো থেকে মজুরেরা রোজ ডিঙিতে চড়ে কাঠগোলায় কাজ করতে আসে। তাদের ডিঙিগুলো তখন থাকে ঘাটে বাঁধা। আবার সন্ধ্যায় কাজ সেরে ডিঙিগুলোতে চড়ে সারি গেয়ে তারা নদীপারে ঘরে ফিরে যায়। তারা গায়—

'কেঁদে গৌরীকয়, মাগো।
শখো প-অ-রি-ই-তে ইচ্ছা হয়—'
আর, বৈঠা পড়ে তালে তালে—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্।

॥ দুই ॥

অন্ধকারে

বিচার-সভা ভাঙবার পর প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেছে। সেদিন ফুটবল ম্যাচ আর হয়নি।

সন্ধ্যাও ঘোর হয়ে এসেছে। গোপীনাথ-বাড়িতে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা ঢঙা-ঢঙ বেজে উঠলো। শব্দটা অনেক দূর ভেসে যায়। নদী-পারে গাঁয়ের লোকেরা ও সে শব্দ শোনে। আরতির পর বাতাসা দেবার পালা। সেজন্যে পাড়ার ছেলেদের কেউ কেউ পড়া কামাই করে সেখানে আসে। পূজারী-ঠাকুরের সঙ্গে ভাব থাকলে দু-একখানা বাতাসা বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু ঠাকুর ভারি চালাক ; সকলের সঙ্গে ভাব করে না।

দত্তদের বাড়ির-মানকে বাতাসার লোভে পড়া কামাই করে তখন মন্দিরে এলো। সে মন্দিরে দর-দালানে উঠে দেখে, অনেক লোক ব'সে। মন্দিরের ভিতরে একটা মস্ত পিতলের পিলসুজের মাথায় রেড়ীর তেলের একটা বড় প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু দর-দালানটায় আবছায়া অন্ধকার। অন্ধকারে সকলকে ঠিক চেনা যায় না। তবে চেনা মানুষকে চিনতে ভুল হয় না।

মানকে দালানের এদিক-ওদিক ঘুরে দেখলে, ডানদিকের মোটা থামটার পাশে শাদা-মতো একটা যেন কী। জিনিষটা সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলো। তবুও বুঝতে পারলো না কী সেটা। সে আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখে, একটা মানুষ কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে আছে। মানুষটাও যেন তাকে দেখেই জড়সড় হয়ে বসলো।

এবার মানকে হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো ; বললে ;—'কী রে ভোম্‌লা, এখানে পালিয়েছিস্ ?'

উত্তর হলো,—'চুপ।'

—'কেন ? কেউ নেই এখানে। তুই সারাদিন কোথায় ছিলি রে ? আমরা কত খুঁজেছি—'

—'নীলকুঠীতে।'

নীলকুঠীটা একেবারে শহরের শেষে নদীর ধারে। অনেক—অনেক কাল আগে সেখানে নীলের কারখানা ছিল। এখন কেবল প্রকাণ্ড একটা ভাঙা পাকাবাড়ি। নীল পচানো মস্ত মস্ত চৌবাচ্চা ও একখানা ভাঙা ইন্‌জিন্ সারা গায়ে মরচে ও ধুলো-মাটি নিয়ে পড়ে আছে।

জায়গাটা খুব নির্জন। তার ওপর গোটা দুই বড় বড় কয়েতবেল ও একটা ঝাঁক্‌ড়া অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় মনে হয় সেটা ভূতের রাজ্য। ঠিক দুপুরেও সেখান দিয়ে গেলে গা ছম্ ছম্ করে। লোকে বলে, নীলকুঠীটার বড়কর্তা বুল্ সাহেব নাকি জায়গাটার মায়া ছাড়তে না পেরে রাতের বেলা কবর থেকে উঠে সেই ভাঙা দালানের ফাটা ছাদের আলসেয় লম্বা লম্বা পা ঝুলিয়ে বসে খুব মোটা গলায় ইংরেজী গান গায়। আবার, কোন কোন রাতে শাদা প্যান্টলুম্ পরে চৌবাচ্চাগুলোর ধারের শিয়ালকাঁটা, কালকাশুন্দী ও ভাঁটজঙ্গলে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ায় !

মানকে বললে,—'তোর ভয় করে নি ?'

—'ভয় আবার কী ?'

তখন আরতি শেষ করে, শাঁখ বাজিয়ে ঠাকুর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিলে। ভেতরে বাতাসা-ভোগ হচ্ছে।

মানকে জিগ্যেস করলে,—বাড়ি যাবি নে ?'

—'না। কিন্তু তোরা আমায় খুঁজেছিলি কেন ?'

—'নিধু চক্রবর্তী মশাই আর তোর কাকা আমাদের পাঠিয়েছিলেন।'

ভোম্বল তার কাকাকে খুব ভয় করে। তিনি সা-বাবুদের চরমাদারিপুরের নায়েব। কিছুদিন হলো ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছেন। কালই

আবার চলে যাবেন। পুজোর সময়ে এবার মাদারিপুরে না থাকলে চলবে না। ভোম্বোলকে সেদিন কাঁচা কঞ্চিপেটা করে বার বাড়িতে আমতলায় শুইয়ে ফেলেছিলেন। অনেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে মার দেখেছিল। ভোম্বোলের গায়ে সে মারের ব্যথা আর নেই; কিন্তু তার লজ্জা আজও সে ভুলতে পারলো না। আবার সেই বাঘের মুখে!

সে বললে,—মানকে, তুই সরে যা আমার কাছ থেকে। এক্ষুনি সকলে টের পাবে আমি এখানে।'

—'কেউ টের পাবে না।'

ভোম্বোল রুক্ষ স্বরে বললে,—'পাবে! সরে যা—'

মানকে ভয়ে ভয়ে সরে গেল। ভোম্বোলের কথার অবাধ্য হ'লে হয়তো এখনি পেটে একটা ঘুসি খেতে হবে।

ভোম্বল আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে বসলো।

ঠাকুরও মন্দিরের দরজা খুলে ধামা হাতে দালানে বেরিয়ে এলো। ধামায় বাতাসা। ঠাকুর ধামা থেকে বাতাসা তুলে সকলের হাতে হাতে দিতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে সে এলো ভোম্বোলের কাছে। তাকে সেই অবস্থায় দেখে মনে করলো, কোন ভক্ত একমনে গোপীনাথের নাম জপ করছে। একসঙ্গে খানছয়েক বাতাসা তুলে বললে,—'নিঅ।'

ঠাকুরের বাড়ি ওড়িশার পুরী জেলায়।

ভোম্বোল হাত বাড়িয়ে বাতাসাগুলো নিয়ে আনন্দে নড়ে চড়ে বসলো। একসঙ্গে এতগুলো বাতাসা সে কোনদিনও পায় নি।

'ঠাকুর সেখান থেকে স'রে যেতেই মানকে এসে জিজ্ঞেস করলো,—এই, ক'খানা বাতাসা পেলিরে?'

—'এক মুঠো।'

—'কৈ দেখি।'

—'আর দেখে না।'

মানকে চট্ করে সরে গিয়ে বললে,—'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

—'খবরদার! আমার কথা কাউকে বলিস্ নে।'

মানকে একখানা বাতাসা মুখে পুরে বললে—'বলবো?' ব'লেই সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভোম্বলও আর সেখানে থাকলো না।

গোপীনাথ মন্দিরের উত্তরে খালি দোলমঞ্চ। মন্দিরের দালান থেকে

নেমে ফুল-বাগানের পাশ দিয়ে দোলমঞ্চের বেদীর আড়ালে গিয়ে বসে ভোম্বোল নিশ্চিন্ত মনে বাতাসা খেতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্দিরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। ভক্তরা সকলে বাতাসা নিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেছে। চারধার অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জোনাকী উড়ছে, দত্তদের ডোবা-বোঝাই ব্যাঙগুলো পাল্লা দিয়ে ডাকছে—ক্যাঁ—কোঁ—রুটি—রুটি—রুটি—রুটি—।

ভোম্বোল অন্ধকারে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দেখলো, মানকেদের বাড়ির দিক থেকে একটা আলো আসছে। ওদের বাড়ির খান তিনেক বাড়ি পরেই ভোম্বোলদের বাড়ি।

ভোম্বোল আলোটার দিকে তাকিয়ে রইলো। তার কাকা কী? ভোম্বোল ভাবলো, মানকেটা নিশ্চয়ই বাড়ি গিয়ে ব'লে দিয়েছে। 'ভূত—উল্লুক—ভোঁদড়—!'

ঐ তো আলোটা ক্রমে মন্দিরের দিকেই আসছে। তার কাকার গলাও শোনা গেল। তিনিই ডাক দিলেন,—'ভোম্বো—ও—ও—ল! ভোমলা—আ—আ—'

তাঁরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

ভোম্বোল তাড়াতাড়ি উঠে কোমর বাঁধলো। তারপর মঞ্চটার নিচে নেমে রেল-লাইনের দিকে দিলে চোঁচা দৌড়।

॥ তিন ॥
পথে

সামনেই গোয়ালা-পাড়া।

মাঝে মাঝে ঘি, মাখন আর গোবরের গন্ধে পাড়াটা বেশ মশগুল হয়ে ওঠে। রেল-লাইনটা গোয়ালাদের বাড়ি-ঘরগুলোর ওধারে। ফুলু গোয়ালার বাড়ির কোল দিয়ে গেলে লাইনে পৌঁছনোর পথটা কম হয়।

ভোম্বোল যেতে যেতে দেখলো, ফুলুর বাড়ির বা'র-উঠোনে লটকানো গাছের তলায় ফুলু আর তার ভাই হনি মস্ত একটা হাঁড়িতে ঘোল মইছে—ঘস্ ঘস্। মেটে ঘরখানার বারান্দায় প্রচুর কালো ধোঁয়া ছেড়ে কেরোসিনের একটা চিব্‌নি জ্বলছে। আরে! ঐ যে আলোর কাছে ব'সে ফুলুর ছেলে যদু। সে ভোম্বোলদের ক্লাসে পড়ে। একদিনও পড়া পারে না, কেবল কানমলা খায় আর নীল-ডাউন হয়। 'যোদোটা' যেন কী করছে। সে বেড়ার ধারে সরে গিয়ে, বাঁশের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলো,

ঘোদো একখানা বাঁকের মাথায় দড়ি পরাচ্ছে। তার ইচ্ছে হলো, 'ঘোদোকে' একবার ডাকে। ও সেদিন তাকে এক ডেলা মাখন খেতে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ওর বাবা আছে। লোকটা ভারী শয়তান! তাকে মাখন তো খেতে দেবেই না, বরং চেপে ধ'রবে। দরকার নেই মাখন খেয়ে।

সে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তার শেষেই গুমটি। গুমটির লম্বা লোহার গেটের ওপর একটা আলো জ্বলছে, টকটকে লাল। গেট বন্ধ। বোধ হয় কোন গাড়ি আসছে। কিন্তু এখন আবার কী গাড়ি আসবে? হয়তো মালগাড়ি। সে গিয়ে গেটের একটা রেলিংয়ে উঠে দাঁড়ালো।

দু'পাশে তারের বেড়া; মাঝ দিয়ে লাইন। লাইনের দু'পাশে কুশ-খড়। তার মধ্যে চামরের মতো কাশফুল ফুটেছে। এখন সেগুলো দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু দিনের বেলা দেখায় সুন্দর। বাতাসে হেলে-দোলে, ঢেউ খেলে।

ভোম্বোল একবার ভাবলো, লাইনের ওপর দিয়ে ষ্টেশনে যাবে। ষ্টেশনটা তো বেশি দূরে নয়। ঐ যে সিগন্যালের আলো দেখা যায়, যেন গোটা কয়েক লাল, সবুজ তারা পৃথিবীতে নেমে এসেছে। কিন্তু রাত্রে লাইনের ওপর সাপ শুয়ে থাকে। সেদিন মস্ত একটা গোখরো সাপ গাড়িতে কাটা পড়েছিল।

হঠাৎ সে শুনলো, গেটের কাছে ভাঁট জঙ্গলে শব্দ হচ্ছে, হিস্ হিস্। সাপ নাকি? সে তাড়াতাড়ি গেটের একেবারে মাথায় উঠে রেলিংয়ের দু'পাশে পা ঝুলিয়ে ব'সে ভাঁট জঙ্গলটার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না! তবে শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না; কেবল চারধারে ব্যাঙ ও ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে।

তবু তার নিচে নামতে সাহস হলো না—যদি সাপটা গেটের তলায় এসে থাকে!

সে সাপটাকে তাড়াবার জন্যে বার কয়েক হাততালি দিলে। শব্দ করলে সাপ পালায়। তারপর কান পেতে শুনতে লাগলো। না—আর শোনা যাচ্ছে না। সাপটা হয়তো সরে গেছে। কিন্তু আবার ঐ ক্যাঁচ-কোঁচ ও ফোঁস-ফোঁসানি শব্দ কিসের?

সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, গেটের ওধারে একখানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়ালো, যেন ভূতের গাড়ি। গরু দুটোর চোখগুলো অস্পস্ট আলোর একবার চক্‌চক্ করে উঠ্‌লো। গাড়োয়ান হাঁক দিলে—গুমটি খুলে দাও গো—ও—ও—'

গুমটি ঘর তখন বন্ধ। গুমটিওয়ালা বোধ হয় বাড়িতে ভাত খেতে গেছে। কে তাকে গুমটি খুলে দেবে? লাইন-পারে বাঁশবন। তার তলায় জোলা-পাড়া। গুমটিওয়ালা হলো ছিরু জোলার বাবা চয়নদ্দি। লোকটার ডান হাত কনুই অবধি কাটা। সে ভোম্বোলকে চেনে।

গাড়ি দেখে ভোম্বোলের মনে সাহস হলো। আবার ভয়ও হলো। ছিরুর বাবা তাকে দেখে এখনই হয়তো বাড়িতে খবর দেবে। সে গেট থেকে নেমে লাইন পার হয়ে কাঁচা রাস্তায় পড়লো।

দুপুরে বৃষ্টি হয়েছিল। সেই জল রাস্তাটার মাঝে মাঝে জমা হয়ে আছে। ভোম্বোল চলেছে স্টেশনের দিকে। চলতে চলতে তার পা জলকাদায় বসে যায়। একবার একটা শিয়াল তার প্রায় গায়ের ওপর দিয়েই ছুটে পালালো। শিয়ালটাকে জোলাদের দুটো কুকুর তাড়া করেছে। শিয়ালটা পালাতেই তা'রা ভোম্বোলকে তেড়ে এলো। কী বিপদ! কিন্তু নেড়ী কুকুরের রোখ শিকারের বিশ হাত তফাৎ অবধি। কুকুর দুটো কেবল ডাকতেই লাগলো। ভোম্বোল সেখান থেকে এগিয়ে পাকা রাস্তায় উঠলো। রাস্তার ধারে মাঝে মাঝে মিটমিটে কেরোসিনের আলো। তবে স্টেশন আর বেশিদূর নয়। ঐ যে তা'র বাইরে রাস্তার একধারে খাবারের দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে—আলো জ্বলছে। লোক চলা-ফেরা করছে।

ভোম্বোল স্টেশনে পৌঁছে প্ল্যাটফরমের এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালো। তখন কোন গাড়ি নেই। প্ল্যাটফরম প্রায় অন্ধকার। আলো জ্বালাবে গাড়ি আসবার কিছু আগে। দু-একজন যাত্রী কাপড় পেতে পোঁটলা মাথায় দিয়ে এদিক-ওদিক শুয়ে আছে। কেউ কেউ বসে বিড়ি ফুঁকছে, গল্প করছে।

একটা ছোকরা পানওয়ালা ভোম্বোলকে জিগ্যেস করলো,—'তুই কে রে?'

ভোম্বোল চোখ-মুখ রাঙা করে বললে,—'তুই কে রে?'

—'তুই কে আগে বল্।'

—'চুপ্। এক ঘুসিতে দাঁত ভেঙে দেবো—'

লড়াইটা বাধে আর কী। ভোম্বোলের চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। সে ঘুসি পাকিয়ে দাঁড়ালো।

ছোঁড়াটা বেগতিক দেখে 'ও দাদা, মেরে ফেললো' বলে চীৎকার করতে করতে ষ্টেশনের বাইরের দিকে দিলে ছুট।

রণক্ষেত্রের কিছুদূরে ডাক রাখবার কাঠের একটা খুব বড় সিন্দুক ছিল। ভোম্বল গিয়ে তার ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসলো।

সে আর বাড়ী যাবে না। রাত দুটোয় একখানা গাড়ি আছে। গাড়িখানা যায় কলকাতায়। সেই গাড়িতে সে কোলকাতায় যাবে। তারপর সেখান থেকে চলে যাবে টাটানগর। সেখানে তার সঙ্গী জিতেন থাকে।

জিতেন গতবছর স্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে তার বাবার সঙ্গে সেখানে চলে গেছে। তার মুখে সে টাটানগরের কারখানার অনেক গল্প শুনেছে। ভোম্বোল কোনো একটা কাজে লেগে পড়বে। তার গায়ে খুব জোর; সে ধমাধম হাতুরি পিটবে, লোহা-লক্কড় ঠেলবে—একদিন হয়তো একখানা মোটরগাড়ি, ডুবোজাহাজ বা এরোপ্লেনও তৈরি করে ফেলতে পারে। ইনজিনীয়ার আর কারিগরেরাই তো বিশ্বকর্মা!

তার আগে এখন কিছু খাবার পেলে ভালো হোত। খেয়েছে সেই কোন সকালে। তাও কাকার ভয়ে পেট ভরেনি। পয়সা থাকলে কয়েকটা চম্‌চম্‌ খাওয়া যেত। গায়ে শুকনো ক্ষীরের গুঁড়ো মাখানো চমচম্‌গুলো খেতে যা গ্র্যানড্‌!

সে সিন্দুকটার ওপর থেকে নেমে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো। ষ্টেশনটা ক্রমে নিঝুম হয়ে পড়েছে। রেলের বাবুদের কেউ কেউ অফিস ঘরের ছার-পোকাগুলোর ওপর বিছানা বিছিয়ে ঘুম দিচ্ছেন। মাঝখানে জ্বলছে মস্ত চৌকো লণ্ঠন। কোথাও বিশেষ কোন সাড়া নেই। কারুকে চলা-ফেরা করতেও দেখা যাচ্ছে না। কেবল ষ্টেশনে ঢোকবার মুখে বড় রাস্তার ধার থেকে সেতারের আওয়াজ আসছে।

ভোম্বোল ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখে, ছাদেক ব্যাপারীর পাটের আড়তের এপাশে অশ্বত্থতলায় ধুনী জ্বলছে। ধুনীর ওধারে বসে দু'জন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী, এধারে জন কয়েক লোক—বোধহয় সন্ন্যাসীদের চেলা। ধুনির আগুনের আভায় মনে হচ্ছে, যেন কয়েকটা ভূত বসে।

সন্ন্যাসী দুজনের একজন সেতার বাজাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল দিয়ে চিমটে বাজাচ্ছে অপর জন। সেতারের সুরটা ভোম্বোলের চেনা। সে তার স্কুলের খোট্টা মালির মুখে বার কয়েক এ সুর শুনেচে।

ভোম্বোল রাস্তা পার হয়ে গুটি গুটি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। সুরটা মিঠে ও ভাল, কিন্তু লোকগুলোর চেহারা ভাল নয়। দেখলেই মনে হয়, তা'রা গুণ্ডা। তবে গুণ্ডা হলেই বা তা'র কী? তা'র কাছে পয়সা-কড়ি তো কিছু নেই।

সে তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই একজন তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালো। মুখে কিছু বললে না। ভোম্বোল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনতে লাগলো। প্রায় আধঘণ্টা পরে সেতার থামলো। ভোম্বোলের মাথায় তবুও সে সুরের ঝঙ্কার থামলো না; কেবলই বাজতে লাগলো—রিম্-ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা, রিম্ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা—!

যে সন্ন্যাসীটা চিমটে বাজিয়ে তাল দিচ্ছিল, সে তার পিছন থেকে দুটো পাকা নাসপাতি নিয়ে ভোম্বোলকে বললো—'এ লে কে ভাগো বেটা!'

লোকগুলোর একজন ধুনি থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কয়লা একটা লম্বা কলকের মাথায় তুলতে তুলতে রুক্ষ ভাঙা গলায় বললে—'ভাগ্ বে!

ভোম্বোলও আর সেখানে দাঁড়াতে চায় না। লোকগুলো যে খুনে বদমাইশ তাতে আর ভুল নাই। সে সন্ন্যাসীর হাত থেকে নাসপাতি দুটো নিয়ে ষ্টেশনের ভেতরে চলে গেল।

তারপর সেই সিন্দুকটার মাথায় উঠে বসে গন্ধ শুঁকে দেখলো—চমৎকার। আকারেও বেশ বড়। সে একবার সেতারের সুর নকল করে—'রিম্-ঝিম্ কাঁটা-কাঁটা' বলেই একটা নাসপাতিতে কামড় দিলে! সেটা খাওয়া হয়ে গেলে বাকিটাও খাবার লোভ হল। কিন্তু তাহলে কাল খাবে কী? তুলেই রাখা যাক। সেটাকে কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে বেঁধে দেখে এলো কটা বাজে।

রাত তখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। গাড়ি আসবার দু'ঘণ্টা দেরী। এই দুঘণ্টা খানিকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তবে যদি ঘুমটা গাঢ় হয়ে যায়। সেই ফাঁকে গাড়িখানা চলে গেলে কী হবে? কিন্তু ঘুম গাঢ় বা হবে কেন? লোকজনের চীৎকারে, গাড়ির দরজা বন্ধ করবার ধপ-ধপানি আর ইনজিনের ফোঁস-ফোঁসানিতে কী ঘুম ভাঙবে না? নিশ্চয় ভাঙবে। সে পড়েছে নেপোলিয়ঁান ঘোড়ার পিঠে বসে দু'দশ মিনিট ঘুমিয়ে নিতেন। লড়াইয়ে মাঝেও তাঁর গাঢ় ঘুম হোত এতো বইয়ে পড়া। সে চোখেও দেখেছে, তাদের ভূগোলের মাস্টারমশাই জগতবাবু ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হাতলহীন ভাঙা চেয়ারটায় বসে কেমন নাক ডাকিয়ে ঘুমোন। আবার পিরিয়াড শেষ হবার ঘণ্টা বাজবার আগেই উঠে পড়েন। তবে সেই বা বেশী ঘুমোবে কেনো? সে বাক্সটার ওপর সটান শুয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো।

কিন্তু মশার উৎপাতে প্রথমটা ঘুম হলো না। মশার ঝাঁক কানের

কাছে পিঁ-পিঁ করে হাতে পায়ে কামড়ায়। একটা তার নাকের ডগায় বসে এমন কামড় দিয়েছে যে নাকটা জ্বলে যাচ্ছে। সে তাদের কামড় থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আগাগোড়া কাপড় মুড়ি দিয়ে মরা চিংড়ির মতো হাঁটু ভেঙে কুঁকড়ে শুয়ে রইলো। তাতেও কী রক্ষা আছে? তবুও সেই ভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর হঠাৎ ঘুম ভাঙলে দেখে, চারধারে লোকজন ছুটোছুটি ও চীৎকার করছে—সামনে একখানা ট্রেন দাঁড়িয়ে। তার ইঞ্জিনখানা করছে—সোঁ—সোঁ—ও-ও!

সে ধড়মড় করে উঠে সিন্দুক থেকে একলাফে নেমে ছুটে গিয়ে একটা কামরায় উঠে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হুইসল দিয়ে গাড়িও দিলে ছেড়ে।

॥ চার ॥

দেশছাড়া

ছোট কামরা—যাত্রীও বেশি নেই। যারা ছিল, তাদের জন কয়েক বেঞ্চি দখল করে শুয়ে আছে। একজন এক কোণে জানলার ধারে ব'সে বিড়ি ফুঁকছে। যারা শুয়েছিল, তাদের একজন জিগ্যেস করলো,—'ছামনে কোন ইস্টেশন গো?'

যে লোকটা বিড়ি ফুঁকছিল, সে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে,—'সাতকোদালে।'

'ও চাচা—চাচা—ওঠো গো'—বলতে বলতে লোকটা উঠে বসলো।

ভোম্বোল এতক্ষণ স্টেশনের দিকে মুখ বাড়িয়ে ছিল। গাড়ি প্ল্যাট-ফরম ছাড়িয়ে মাঠে এসে পড়লো। অমনি হুহু করে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে এলো। একি! চারধার ফর্সা! রাত দুটোর গাড়িখানা চলে গেছে? সে এত ঘুমিয়েছিল?

এ গাড়িখানা তো কোলকাতায় যায় না, কোলকাতা থেকে আসে। সে তাহলে গোয়ালন্দর দিকে চলেছে? যাঃ! সব গোলমাল হয়ে গেল।

এই গাড়ির শব্দে এক-একদিন তার ঘুম ভেঙে গেছে। সে শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে দেখেছে। চালের আড়ার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। তাদের চাঁপা গাছের ডালে বসে কাক ডাকছে। লেবুতলায় দোয়েল শিস দিয়ে উঠলো; আর, পাশের বাড়িতে নীলমণি উকিলের

মহুরী সুরেন ঢালী কাছারি ঘরের ফরাসে শুয়ে শুয়েই হাই তুলতে তুলতে বলছে,—'দুর্গা। দুর্গা।'

ভোম্বোল জানলা থেকে সরে এসে বেঞ্চিতে বস্‌লো। একটু শীত শীত করছে। সে কোঁচার কাপড়টা কোমর থেকে খুলে গায়ে দিলে। খুঁটে বাঁধা নাসপাতিটা তার পিঠের একপাশে রইলো যেন একটা আম।

যে লোকটা এতক্ষণ বিড়ি ফুঁকছিল, সে বার দুই ভোম্বোলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো,—'তুমি কোথা যাবা গো ?'

ভোম্বোল বললে,—'টাটানগর।'

লোকটা টাটানগরের নামই শোনেনি; চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলে,—'সে কুন দিক ?'

দিকটা ভোম্বোলেরই ভুল হয়ে গেছে! সে বললে।—'ঐদিক।'

—'ত'লি ইদিক যাচ্ছো যে ?'

ভোম্বোল উত্তর দিলে না।

লোকটা জিগ্যেস করলে,—'তুমি ইস্কুলির ছাত্তর ?'

ভোম্বোল ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে বললে—হ্যাঁ—

লোকটা এবার বেশ ভাল ক'রে ভোম্বোলের পা থেকে মাথা অবধি দেখলো; তারপর বললে,—'বাড়ি থেকে পালিয়ে এয়েছো বুঝি ?'

ভোম্বোল চুপ করে রইলো। গাড়ি তখন 'ধর না কেন—ধর না কেন' করতে করতে বেশ জোরে ছুটছে। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। পূর্বদিক লাল; রোদ ওঠে ওঠে। সাতকোদালে পিছনে অনেক দূরে পড়ে আছে। সেখানে গাড়ি দাঁড়ায় না। সামনে ট্যাংরামারি। ঐ তার বিল দেখা যায়। বিলের ওপর দিয়ে বক উড়ে যাচ্ছে; গাং-চিলেরা ঘুরপাক দিচ্ছে; লম্বা, সরু পা ফেলে পদ্ম পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে, ডাহুক। এখন বর্ষার শেষ; এসেছে শরৎ। বিলে জল থৈ থৈ করছে। দেখাচ্ছে, যেন একটা সমুদ্র। বিলটার নাম, মকর। মকর বিল মাছে ভরা। এ সময়টা জেলেরা দক্ষিণ কোণের খাল দিয়ে মাছ ধরতে আসে। ঐ যে তাদের ডিঙিগুলো দেখা যায়; সার বেঁধে আসছে।

সেবার ভোম্বোলরা সাত-আটজন মিলে ওখানে হেঁটে এসেছিল। সাত-কোদালে থেকে মকর বিল তিন-ক্রোশ। রতনপুরের মাঝ দিয়ে আসা-যাওয়ার পথ। পথের দুধারে বড় বড় ক্ষেত—ধানে ভরা। পাকা ধান-

গুলোর ওপর যখন হাওয়া বয়ে যায়, শব্দ ওঠে ঝম্ ঝম্, ঝুমুর ঝুমুর, যেন মা-লক্ষ্মী নুপুর পায়ে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। বিলের কোলে পদ্ম ও শালুক বন। লতাগুলোর রাঙা ও শাদা ফুলে, মস্ত মস্ত সবুজ পাতায় জল দেখা যায় না। গন্ধে বাতাস ভারি। ফোটা পদ্মবনে মৌমাছি ও সাপের ভয়। তার বন্ধু জগা, পদ্ম তুলতে গিয়ে আর একটু হ'লেই সাপের কামড়ে মরতো। সাপটা পদ্ম-মৃণালের গা জড়িয়ে ফোটা পদ্মটার ওপর মাথা রেখে চুপ করে ছিল। জগা যেই পদ্মটা ছিঁড়বার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, অমনি—'ফোঁ-ও-স্।' সাপটার কত বড় ফণা! ভোম্বোলরা সেবার মাছ ধরেছিল অনেক। কিন্তু বাড়ী ফিরে সে তার খুড়োর মার খেয়েছিল, অনেক বেশি। ভোম্বোলের ইচ্ছে হ'লো, ঐ বিলের পাড়ে ভোরের হাওয়ার দোদুল কাশবনে গিয়ে ছুটোছুটি করে।

লোকটা ভোম্বোলকে বললে—'শুনছো গো খোকাবাবু, এখনই বাড়ি ফিরে যাও। তোমার কাছে 'টিকিস্' আছে?'

ভোম্বোল জবাব দিলে—'না।'

—'তবে তো মুশকিল! তিন ইসটিশেন পরে টিকিস্-সাহেব আসবে—'

ভোম্বোল দেখেছে, চেকারে টিকিট চেক করে। লোকগুলো বেজায় কড়া। সে ঠিক করলো, তার আগেই কোথাও নেমে পড়বে। সেখান থেকে গাঁয়ের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবে—সেই টাটানগর।

এমন সময়ে গাড়িখানা ট্যাংরামারী এসে হুস্ করে থামলো। যাত্রীদের কয়েকজন নেমে গেল। এরপর আলমপুর। ভোম্বোল আলমপুরও চেনে।

মিনিট দুই থেমেই গাড়ী একটা হেঁচকা টান দিয়ে আবার চলতে লাগলো। ধানভরা ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালি রোদ লুটিয়ে পড়েছে। রাখাল গরু চরাচ্ছে, কৃষাণ ক্ষেতে কাজ করছে। দেখতে দেখতে গাড়ি আলমপুরও ছাড়িয়ে গেল। কামারটা এখন একদম খালি। যে লোকটা বিড়ি ফুঁকছিল সেও আলমপুর নেমে গেছে।

খালি কামরায় ভোম্বোলের বড় আনন্দ হলো। সে গাড়ীর চাকার শব্দের তালে তালে গান ধ'রে দিলে। গানের মাঝে জানলা দিয়ে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলো। দেখেই তার বুক কেঁপে উঠলো—পাশে কামরায় চেকার! লোকটা ফিরিঙ্গী, কী, পাঞ্জাবী বোঝা গেল না—কিন্তু চাউনি বড় বিশ্রী। এবার তার দিকেও কট্‌মট করে তাকিয়ে দরজা

খুলে ও-পাশের কামরায় ঢুকলো। এখনই হয়তো তার কামরায় এসে পড়বে। সে একবার ভাবলো, গাড়ী থেকে লাফ দেবে; কিন্তু তাতে বিপদ যথেষ্ট। সে মরেও যেতে পারে; না মরলে হয়তো হাত-পা জখম হবে। তার ওপর পুলিশে ধরবে। তার চেয়ে বরং—কিন্তু এ কামরাটায় তো তাও নেই। তবে কী বেঞ্চীর নিচে লুকোবে? তাতেও কী রক্ষা আছে? চেকারের চোখ সব জায়গায় যায়। বিনা টিকিটে রেলে চড়া সত্যিই ভারি অন্যায়। এবারটা যদি কোন রকমে সে রক্ষা পায়। সে জানালা দিয়ে দেখলো, পরের ষ্টেশন কতদূর? কিন্তু সামনে কিছুই তো দেখা যায় না। দু'পাশে তারের বেড়া, মাঝে রেল-লাইন চলে গেছে সোজা। ইনজিনের কালো ধোঁয়ায় সামনেটা অন্ধকার। ভোম্বোল ভাবলো, লাফই দেবে। সে বেশ শক্ত কোরে কোমর বাঁধলো; হাঁটুর নিচের কাপড় তুলে তার ওপর দিকের খানিকটা কোমরে গুঁজলো।

সে দরজা খুলবার জন্যে মুখ বাড়াতেই দেখলো, সামনে ঐ যে সিগ্‌ন্যাল দেখা যায়। সিগ্‌ন্যালটা যেন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে মুচকে হাসছে। আর, ষ্টেশন আসবারও দেরি নেই। কিন্তু গাড়িখানা তো তেমন জোরে চলছে না। ইনজিন-ড্রাইভারের ওপর তার খুব রাগ হলো! লোকটা অ-কর্মা। জানে না, কিছুই জানে না। খুব সম্ভব ড্রাইভার পাঁউরুটি খাচ্ছে; আর, ফায়ারম্যান গাড়ি চাবাচ্ছে। এ সব লোকের শাস্তি হওয়া উচিত।

ভোম্বোল আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল। সর্বনাশ! চেকারটাও যে বাঘের মতো মুখ বাড়িয়ে আছে। তবে কী হবে? যদি এখনই তার কামরাটায় আসে! ইনজিন-ড্রাইভারকে ধ'রে তার মারতে ইচ্ছে হ'লো! জোর চালাও—জোরে—আঃ! এ কী? গাড়ি ক্রমে থেমে যাচ্ছে যে! ভোম্বোল এবার বিপরীত দিকের জানালার কাছে ছুটে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখলো—ঐ যে ষ্টেশন এগিয়ে আসছে। সে চট্ করে দরজা খুলে ফেললো। তারপর গাড়ি থামতে না থামতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে, প্ল্যাটফরমে নেমে, ছুটে তারের বেড়া গলিয়ে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তাকে ধরে কে? গাড়িখানাও মিনিটখানেক পরেই হুইস্‌ল দিয়ে 'ব্যাশ ব্যাশ শব্দে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

॥ পাঁচ ॥

শালুকডাঙ্গায়

ছোট স্টেশন।

প্ল্যাটফরমের প্রায় মাঝামাঝি একখানা ছোট খড়ের ঘর তার বেড়া চাটাইয়ের। গায়ে ছোট একটি জানলা। তার তলার দিকে কাঠের ঘুল-ঘুলির ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে যাত্রীরা টিকিট কেনে। বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে ও প্ল্যাটফরমের দুই মাথায় বোর্ডে ইংরেজী ও বাঙলায় বড় বড় কালো হরফে লেখা—শালুকডাঙ্গা।

ততক্ষণে রোদের তেজ বেশ বেড়েছে!

ভোম্বোল চারধারে তাকিয়ে দেখলো শালুক ফুলতো দূরের কথা, কোথাও একটা পুকুরও নেই। কেবল দিকে দিকে জলে ভরা আমনের ক্ষেত, ধানের কচি শিষ ও পাতাগুলো বাতাসে খেলা করছে। মধ্যখানে একটি উঁচু জায়গায় একখানা গাঁ; জল থেকে পা গুটিয়ে যেন জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। ষ্টেশন থেকে একটা কাঁচাপাকা রাস্তা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে গাঁয়ের মাঝে দিয়ে চলে গেছে সেই পুবে—অনেক দূরে। রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ, ঠিক যেন এক একটা ছাতা বসানো।

ষ্টেশন থেকে ছইয়ে ঢাকা একখানা গরুর গাড়ি যাচ্ছিল গাঁয়ের দিকে। ছইয়ের পিছন দিকটা একখানা ডোরাকাটা আধময়লা চাদরে ঢাকা—মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হচ্ছে। বোধহয়, ভেতরে কোন বউ আছে।

হঠাৎ একখানা বাইসিকল গাঁয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। যে বাইসিক্‌ল চালাচ্ছে, তার মাথায় শাদা পাগড়ি, গায়ে কালো কোট। সে গরুর গাড়িখানার সামনে এসেই ঘণ্টা বাজালো—টিঙ্‌-টিঙ্‌, টিঙ্‌-টিঙ্‌।

গরু দুটো বাইসিক্‌ল দেখে হঠাৎ ভড়্‌কে গিয়ে বড় বড় চোখ বা'র করে রাস্তা থেকে ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে দিলে দৌড়। ভোম্বোল হাসি আর চাপতে পারে না। গরু দুটো লেজ তুলে ছুটতে ছুটতে এক একবার মাথা নিচু ক'রে জোয়াল খোলার চেষ্টা ক'রে; কিন্তু লম্বা শিঙ জোড়ায় আটকে যায়—পারে না। শেষে অনেক চেষ্টা ও কষ্টের পর গরু দুটো বাগে এলো; গাড়িখানা ক্ষেতের জলকাদার মধ্য দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার রাস্তায় উঠে চলতে লাগলো।

ষ্টেশনের ও-ধারে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ গাছ। তার তলায় একখানা ময়রার দোকান।

ভোম্বোল রেল-লাইন পার হয়ে দোকানের সামনে গিয়ে দেখে ময়রার পো মাথা নিচু করে মেঝেয় পাতা চাটাইয়ে বাতাসা কাটছে। সে ভোম্বোলের দিকে ফিরেও তাকালো না। ভোম্বোলের পেট তখন ক্ষিদেয় জ্বলছে। গরম গুড়ের গন্ধে তার জিভে জল এলো; কিন্তু রাস্তার দিকে তাকিয়েই তার আক্কেল গুড়ুম! বাইসিক্‌ল-আরোহী ততক্ষণে তার কাছে এসে পড়েছে। আরে! এ যে চক্রবর্তী-মশায়ের ছোট ভাই—ষষ্ঠি খুড়ো। ষষ্ঠি খুড়ো ঠিকাদারি করে বেড়ান। খুড়ো নিশ্চয় তাকে দেখেছেন। তবু সে ছুটে দোকানের পিছন দিকে পালালো। ভয়ে তার বুক টিপ্‌ টিপ্‌ করছে।

দোকানের পিছনে ঘন ভাঁটজঙ্গল ও কচুবন। তার মধ্যে গোটা কয়েক জলবিছুটির গাছও ছিল। একটার পাতা ভোম্বোলের পায়ে লেগে গেল। ইঃ! পা-খানা বেজায় কুট্‌কুট্‌ করছে। সে জায়গাটা চুলকোতে চুলকোতে দোকানের বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালো।

পিছনে জলে ভরা আমনের ক্ষেত—দোকানের সামনে দিয়ে রাস্তা ফাঁকা। পালাবারও উপায় নেই। তবুও সে একবার ভাবলো ক্ষেতের মধ্যে নেমে যায়। কিন্তু জলে মযে-জোঁকও থাকতে পারে। একটা যদি পায়ে লাগে তো রক্ষা নেই। তার চেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই দেখা যাক, খুড়ো কী করেন!

সে আঙুল দিয়ে চাটাইয়ের বেড়া একটু ফাঁক করে সেই ফাঁকে একটা চোখ রেখে দেখলো—খুড়ো বাইসিক্‌লখানা দোকানের সামনে ঝাঁপের তলায় পাতা বেঞ্চির গায়ে হেলান দিয়ে রাখলেন।

দোকানি এবার মাথা তুলে দেখলো; দেখেই বললে,—'পেন্নাম হই, দা' ঠাকুর।'

ষষ্ঠী খুড়ো বেঞ্চির একধারে বসে বললেন,—'মাখোন, এক ছিলিম তামুক খাওয়া তো—'

দোকানি অমনি হাঁক দিলে—'ও রে! মাদোব—মাদো—ও—ও—ব্! ছোঁড়াটা থাকে থাকে, আর পালায়। কেবল ইষ্টিশনে গিয়ে বসে থাকে—'

খুড়ো বললেন,—'আরে! এই তো এখানে দাঁড়িয়েছিল দেখলাম।'

ভোম্বোল খিল্ খিল্ করে হাসলো। খুড়ো তাকে মাধব ঠাওরেছেন।

মাখন বললে,—'আমিও যেন দেখলাম। আচ্ছা, আমিই হাত ধুয়ে দিচ্ছি।'

খুড়ো 'আচ্ছা' ব'লে কোটের পকেট থেকে একখানা কালো ডাইরি আর তার পুটে আটকানো মাথায় নিকেলের টুপি-পরা একটি কপিং পেনসিল টেনে নিয়ে ডাইরির পাতা ওলটাতে লাগলেন।

তাঁর মুখ অন্যদিকে। ভোম্বোল দেখলো, এই সুযোগ। সে ঘরের পিছন থেকে সরে গিয়ে রাস্তায় উঠেই গাঁয়ের দিকে দিলে ছুট্।

ছুট্—ছুট্। ভোম্বোল ছোটে আর পিছন ফিরে তাকায়। দেখে, ষষ্ঠীখুড়ো কী করছেন। খুড়ো তখনও তেমনি ভাবে বসে আছেন। কিন্তু যদি হঠাৎ ঘাড় তুলে, মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকান! একবার ঐ পথের বাঁকে বড় ঝোপটার আড়ালে গিয়ে পড়তে পারলে হয়। কিন্তু বাঁকটাও কাছে নয়। ছুটতে ছুটতে তার দম বন্ধ হবার মতো হলো। আর কয়েক কদম।

ব্যাস্! সে এসে পড়েছে।

ঝোপটার হাত কতক তফাতে একটা কাঁঠাল গাছ। ভোম্বোল তা'র তলায় ব'সে হাঁফাতে লাগলো। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল পেলে ভাল হোত। কিন্তু কোথায় খাবার জল? দু'পাশে ধান-ক্ষেতে যে রয়েছে তা খেলে নিশ্চয় অসুখ করবে। গাঁখানা সেখান থেকে তখনও আধ-মাইলটাক তফাতে। তবে তার এধারে যেন পথের পাশে একখানা ঘর দেখা যায়। ঘরখানার খড়ের চাল দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে।

ততক্ষণে রোদ বেশ খরখরে হয়ে উঠেছে। শরতের রোদ গায়ে বেঁধে, মাথা পোড়ায়, আবার তাতে মনও কেমন করে। ভোম্বোল ওপর পানে তাকিয়ে দেখলো, আকাশে শাদা-কালো মেঘ, যেন পাল পাল রাজহাঁস ডানা ছড়িয়ে দূরে কোথায় উড়ে চলেছে। গাঁয়ের ওপর দিয়ে, ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে পথে তার গায়ে-মাথায়ও তাদের কোমল সচল ছায়া আরাম বুলিয়ে যাচ্ছে।

সে ষষ্ঠীখুড়োর ভয়ে ঝোপের কোলে কোলে সেই ঘরখানার দিকে এগোতে লাগলো।

সেখানে পৌঁছে দেখে, সেটা একটা কামারশালা। হঠ্র, ভর্র ভর্র —হঠর্ ভরর্ ভরর্ করে হাপর চলছে; আর, চুল্লীর আগুন সাপের মতো চার-পাঁচটা লকলকে লাল ফণা তুলে শব্দ করছে—সোঁ, সোঁ। কর্মকার লাঙলের ফলা, কাস্তে ও হেঁসে গড়ছে। তার কাছাকাছি দু-তিনটি চাষী উবু হয়ে বসে দেখছে। ভোম্বোলের অনেক দিনের ইচ্ছে, সে একখানা বেশ বড় ছুরি তৈরি করে। ছুরিখানা এমন ধারালো হবে যে, আঙুল

ঠেকালেই কুচ্ করে কেটে যাবে। কিন্তু সে কর্মকারকে ছুরির কথা না বলে, বললে,—'একটু জল খাওয়াবে গো?'

লোকটার মাথায় একখানা ময়লা, তেলচিটে ন্যাকড়া টুপির মতো জড়িয়ে পিছনে ছোট খোঁপার মতো পুট্‌লি পাকানো। পরণের কাপড়খানা ময়লা, কালো ঝুল, গায়ের রঙও পোড়া লোহার মতো—কিন্তু শরীর বেশ বলিষ্ঠ। লোকটা একখানা কাস্তে সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আগুনে পোড়াতে পোড়াতে চোখ তুলে দেখলো। সে ভোম্বোলকে কোনদিনও দেখেনি। তার খুব আশ্চর্য বোধ হলো; জিগ্যেস করলে,—'তোমার বাড়ি কোথায়?'

ভোম্বোল বললে,—'দুর্গাপুর।'

—'দুগ্‌গোপুর? সে আবার কোথায়?'

ভোম্বোল পিছন দিকে আঙুল তুলে বললে,—'ওই দিকে। বড় তেষ্টা পেয়েছে। আগে একটু জল দাও।'

'জল?' বলে কর্মকার বার দুই এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর কাস্তেখানা 'আগুনের ওপর রেখে চাষীদের একজনকে বললে,—'হাপর টানো। তিষ্টার জল দিতেই হয়।' এবং ঘরের কোণে ওঠে গিয়ে, একটা মেটে কলসী থেকে ছোট ঘটিতে জল গড়াতে লাগলো। কলসী, ঘটি আর তার মালিকের চেহারা দেখলে, সে জল খেতে আর ইচ্ছে হয় না। কিন্তু তৃষ্ণার সময়ে সেই জলেই বরফ দেওয়া জলের মতো তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। জল খেয়ে ভোম্বোল আর দাঁড়ালো না, গাঁয়ের দিকে চলতে লাগলো।

॥ ছয় ॥

অদ্ভুত কীর্তি

দূরে—পিছনে—ষ্টেশন; সামনে ঐ যে গাঁ।

গাঁখানি বেশ বড়। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকতেই দেখলো, বাঁ-দিকে কুমোর বাড়ি। দুর্গাপুজোর আর দেরী নেই। কুমোরের পো একখানা দুর্গা-ঠাকুর গড়ছে।

ভোম্বোলের ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। সে কাপড়ের খুঁট থেকে নাস-পাতিটা খুলে কামড়ে কচ্ কচ্ করে খেতে লাগলো। খেতে খেতে দেখলো, কুমোর-বাড়ির পিছন দিকে বেড়ার ধারে একটা মস্ত বাতাবী লেবুর গাছ।

গাছটা লেবুতে ভরা। লেবুগুলো পেকে সোনার তালের মতো দেখাচ্ছে। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, কেউ নেই। সে কাপড়খানা গুছিয়ে পরে কাঠ-বেড়ালীর মতো তর্ তর্ করে গাছে উঠে গেল। গাছটা ঘন ঘন দুলছে। ডাল-পালার সর্ সল্ শব্দ হচ্ছে। ভোম্বোল পট করে একটা লেবু ছিড়তেই বাড়ির ভেতর থেকে একটা মেয়েলী গলা চেঁচিয়ে উঠলো— 'গাছে কে রে?'

ভোম্বোল সাড়া দিলে না। লেবুটা এক হাতের বগলে চেপে ধরে সে সড়্ সড়্ করে গাছ থেকে নামতে লাগলো। কুমোরের বউ রান্না চড়িয়েছিল। সে বাড়ির ভেতরের উঠোনে দাঁড়িয়ে ভোম্বোলকে লেবু বগলে গাছ থেকে নামতে দেখে গরম খুন্তি হাতে ছুটে এসে চীৎকার করতে লাগলো, —'চোর—'চোর—। লেবু চুরি করে পালাচ্ছে।'

তার চীৎকার শুনে কুমোর ওদিক থেকে কোঁৎকা হাতে ছুটে এসে একেবারে গাছের গোড়ায় দাঁড়ালো। ভোম্বোল তখনও গাছে। আর হাত দুই নামলেই উঁচু বেড়ার মাথায় পা রাখতে পারে।

কুমোরের বউ গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে কোৎকা ও খুন্তি উঁচিয়ে বলতে লাগলো,—'আয় নেমে। নাম্ শিগ্‌গির্—'

ভোম্বোল দেখলো, নামলে আর রক্ষা নেই! না নামলেও ওরা লোকজন জড় করে তাকে গাছ থেকে টেনে নামাবে। তখন পালাবার পথ বন্ধ! সে বললে,—'নামছি বাপু। ক্ষিদের সময় একটা লেবু নিয়েছি—'

কুমোর বললে,—'ক্ষিদে পেয়েছে তো আমার গাছে চড়েছিস্ কেন? বাড়ি গিয়ে ভাত খা। কার ছেলে তুই?'

ভোম্বোল বললে,—'চাকী মশাইয়ের।

'কোথাকার চাকী? তোকে তো কোনদিন দেখিনি।'

কুমোরের বউ বললে,—'ও সব মিছে কথা। ছোঁড়া চোর—'

এ কথায় ভোম্বোলের খুব রাগ আর অপমান বোধ হলো। ভাবলো, লেবুটা ছুঁড়ে ফেলে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরে পড়ে চলে যায়।

কুমোর হুমকি দিয়ে বললে,—'কৈ নামলি নে? উঠবো গাছে?'

ভোম্বোল বললে,—'উঠেই এস না।'

'তবে রে'!' বলেই কুমোর গাছে উঠতে লাগলো। গাছটার দক্ষিণে কুমোরের রান্নাঘর। গাছের কয়েকটা ডাল একেবারে চালের সঙ্গে লেগে আছে।

কুমোরকে গাছে চড়তে দেখে, সে আবার ওপরে উঠতে লাগলো।

দুজনেই গাছে চড়তে ওস্তাদ। তবে ভোম্বোলের এক সুবিধা, সে ছোট, শরীর হালকা। কুমোরের চেয়ে কিছু তাড়াতাড়িই উঠছে।

কুমোর-গিন্নী তলা থেকে খুন্তি দুলিয়ে বলছে,—'ধর—ধর। ছোঁড়ার ঠ্যাং চেপে ধর।'

গোলমাল শুনে পাড়ার কয়েকটা ছেলে সেখানে ছুটে এলো। তারা ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে যে লেবুগাছটার উঁচু ডালে কুমোর-পো আর একটা অচেনা ছেলে। গাছটা খুব দুলছে। তারা চীৎকার করে উঠলো।

ভোম্বোল দেখলে, সর্বনাশ! আর বোধহয় পালানো যাবে না। কুমোর তাকে ধরে ধরে। তবুও পালাবার চেষ্টা করা যাক্। দেখলে, সামনেই রান্নাঘরের চাল। সে সর্ সর্ করে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে চালে লাফিয়ে পড়ে, সেখানে থেকে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরে মাটিতে নেমেই দিলে ছুট। বগলে বাতাবী লেবুটা তেমনি রয়েছে।

কুমোর-পো-ও 'ধর্ ধর্' বলতে বলতে বলতে চালে নেমে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে হাত-কয়েক ছুটেই গোবরে পা হড়কে হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

ছেলেগুলো চীৎকার করতে করতে হাততালি দিতে লাগলো। তারা ভারি খুশী। লোকটা তাদেরও লেবু খেতে দেয় না!

সামনে বাঁশ-ঝাড়। তারপর ডোবা। ডোবার ধারে ঘন ঝোপঝাড়। তার ওধারে ঐ যে সড়ক দেখা যায়। ভোম্বোল বাঁশ-তলা দিয়ে সেদিকে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে দেখলে—কেউ নেই! কেবল কুমোর-গিন্নীর খ্যান্-খেনে গলা শোনা যাচ্ছে—'ডাকাত—পাজী—ছুঁচো-ও—ও— !'

॥ সাত ॥

বুড়ীর বাড়ি

ভোম্বোল হাঁফাতে হাঁফাতে চলেছে।

পথের দু-ধারে খড়ের বাড়ি-ঘর। চালে চালে চাল কুমড়ো আর লাউয়ের গাছ। চাল-কুমড়ো গাছগুলোর কোন কোনটায় চাকা-চাকা হলদে ফুল ধরেছে, জালি পড়েছে। ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে। কোন

কোন বাড়ির বার-উঠোনের শেষে ধানের মরাই, কারুর বাড়ির বাইরের দিকে গোয়াল।

রাস্তার ধারে এক জায়গায় আমতলায় কতকগুলো ছেলে জটলা করছিল। কয়েকজন একটা কুকুরের লেজের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে একটা কানেস্তারা বাঁধছে। কুকুরটা বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভোম্বোলও দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

ছেলেগুলো দড়ি বেঁধে কুকুরটাকে ছেড়ে দিলে। কুকুরটাও অমনি দিলে ছুট। সে যত ছোটে ততই টিনের ধমাধম আওয়াজ হয়। ছেলেগুলো হাসতে হাসতে হাততালি দিতে দিতে তার পিছনে ছুটতে লাগলো। ভোম্বোল হেসেই সারা।

সে আবার চলতে লাগলো। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে দেখলো, কুকুরটা মাঠ দিয়ে লেজ তুলে ছুটছে। লেজে দড়িটা বাঁধা, কিন্তু কানেস্তারাটা নেই!

ভোম্বোল আরও কিছুদূর গিয়ে পথের ধারে একটা বেত-ঝোপের-কোলে বসে পড়লো। রাস্তাটার ওপারে খান দুই ছোট খড়ের ঘর। একটা চাল কুমড়ো গাছ লম্বা কঞ্চি বেয়ে একটার চালে লতিয়ে উঠেছে। বাড়িটার চারধারে অড়হর কাঠির বেড়া। সামনে একটু উঠোন—পরিষ্কার, তকতকে। আর, সেখান থেকে কিছু তফাতে অনেককালের একটা পুকুর—দাম-কলমী-হিন্‌চে ভরা। তার পাড়ে কয়েকটা নারকোল গাছ। ঐ যে পুকুরটার ভাঙা ঘাট দেখা যায়।

বেশ ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। কপালে তার ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছে। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে ভোম্বোলের দুচোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। সে বাতাবী লেবুটা কোলে রেখে হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে দেখলে, ঘর দু'খানার ঐ কোণ থেকে এক বুড়ী কাকে যেন বকতে বকতে বেরিয়ে এলো। বুড়ীর চুলগুলো পাটের মতো শাদা, মুখে একটাও দাঁত নেই।

বুড়ী চেঁচিয়ে বললে,—'শুনছিস্ হতভাগী, এটুকু খেয়ে যা. সারাদিন এর-ওর বেড়ার ধারে ঘুরবি, মার-ধোর খাবি। লোকে কয়, আমি তোরে খেতে দিই'নে। কৈ? এলি? ও সুরো—সুরো! আর মুখপুড়ীর সাড়া নেই! এতক্ষণ পাড়া মাথায় করছিলি যে—'

ভোম্বোল মনে করলে, বুড়ী বুঝি তার নাতনীকে বকছে। বুড়ী গুটি গুটি এসে পথের ওপর দাঁড়ালো,—'ও সুরী-সৈরভী ধন—'

এবার সাড়া পেলো—'হাম্ বা-আ—আ।' সঙ্গে সঙ্গে ও পাশের

ঝোপ-জঙ্গল থেকে হুড়্‌মুড়্ করে বেরিয়ে এলো। একটা শাদা রঙের গাই, তার পিছনে লাল রঙের বাছুর।

ওরই নাম সৈরভী? ভোম্বোল আপন মনে হাসতে লাগলো।

বুড়ী বললে, 'ওরে, এই ফ্যানটুক খেয়ে যা—আয়—'

সৈরভী বুড়ীর দিকে বড় বড় চোখে একবার ফিরে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে, কান ঘুরিয়ে লেজ তুলে ওধারে ঝিঙে ক্ষেতের দিকে দিলে দৌড়।

বুড়ী কাঁসির ফেন পথের ধারে ঘাসের উপর ঢেলে দিতে দিতে বকর্-বকর্ করতে লাগলো।

বুড়ী এতক্ষণ ভোম্বোলকে দেখতে পায় নি। চোখ ও ভ্রূ কুঁচকে ভোম্বোলকে কিছুক্ষণ দেখলো। তারপর বললে,—ওখানে বসে কে রে?'

ভোম্বোল বললে,—'আমি।'

—'নাম কী?'

—'ভোম্বোল।'

বুড়ী কানে হাত দিয়ে ঘাড় কাৎ করে জিগ্যেস করলে,—'কী বললি? টম্বোল?'

ভোম্বোলের রাগ হলো, চেঁচিয়ে বললে,—'না—না—না—ভো-ও-ম বোল।'

বুড়ী বললে,—'তা যাই হোক। তুই ওখানে বসে কেন? সরে আয়—সরে আয়। ওখান থেকে সিদিন মস্ত এক কেউটে বেরিয়েছিল। রেধো মালোর ব্যাটা ছিমন্তটা আর একটু হলেই গিয়েছিল আর কী।'

ভোম্বোল এক লাফে সেখান থেকে উঠে বুড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর ঝোপটার দিকে সভয়ে তাকালো।

বুড়ী বললে—'কাদের ছেলে রে তুই?

—'চাকী মশাইয়ের।'

—'চাকী মশাইয়ের? এ গাঁয়ে তো চাকী নেই। বাড়ি কোথায়?'

ভোম্বোল বললে,—'সে তুমি চিনবে না।'

—'বল্‌ই না দেখি চিনতে পারি কী না—'

ভোম্বোল বললে,—'সে-ই দুর্গাপুর।'

—'দুগ্‌গোপুর? দুগ্‌গোপুর আর চিনি নে? রেলে যেতে হয়। আমার মেয়ের শ্বশুর-বাড়ি ছিল ওখানে—'বলতে বলতে বুড়ীর শুকনো চোখ দুটো ছল্-ছল্ করে উঠলো। তারপর বললে,—'তারা আর কে-উ

নেই। নাতিটাও চলে গেছে। তা তুই যে এ গাঁয়ে এসছিস্? এখানে কেউ আছে নাকি?

—'না।'

—'তবে?'

ভোম্বোল উত্তর দিলে না।

বুড়ী বললে,—'বুজিছি। আমার নাতিটাও এমনি করতো—ঘরে থাকতে চাইতো না। তোরা সব বুনো—বাঁদর—ঘরে মন বসে না। তোর বাপ আছে?'

ভোম্বোল মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'মা?'

—'না।'

বুড়ী বলে উঠলো—'আ পোড়া কপালে! সব খেয়েছো? তবে আর তোরে ধরে রাখবে কে?'

তারপর ভোম্বোলের খুব কাছে সরে গিয়ে তার থুৎনিতে হাত দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বললে,—'কিছুই খাস নি বুঝি? মুখখানা শুকিয়ে গেছে দেখছি। সেটাও এমনি না খেয়ে বনে-বাদাড়ে, পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। চল্—ঐ আমার ঘর। যাহোক্ চাড্ডি জলপান মুখে দিবি। চল্—চল্—'

ভোম্বোল কিন্তু সেখান থেকে নড়লো না।

বুড়ী বললে,—'নজ্জা করিস নি। চল্-চল্—বলতে বলতে ভোম্বোলের হাত ধরে টানতে টানতে তার বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

বুড়ীর ঘরের দাওয়াটি বেশ নিকানো। এক কোণে রান্না হয়। হাঁড়ি-কুঁড়ি সব তখন তে-কাঠায় তোলা। খালি উনুনের পাশে এক বোঝা বাঁশ-কাঠ। তার পাশে একটা ছাই রঙের রেড়াল তপস্বীর মতো চোখ বুজে বসে ছিল। সে তাদের পায়ের শব্দে যেন অতিকষ্টে চোখ মেলে তাকিয়ে মিহিসুরে একবার ডাকলো'—'ম্যাও—'

বুড়ী বললে—'তোমার আবার কী? একটু সবুর করো।' বলে দাওয়ায় উঠে দরজার শিকল খুলে ঘরে ঢুকলো। তারপর একখানা নলের চাটাই এনে দাওয়ায় পেতে ভোম্বোলকে বললে,—'নে—উঠে এসে বোস্।'

ভোম্বোল তখনও ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়ীর কথায় আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে চাটাইয়ের ওপর বসলো।

বুড়ী আবার ঘরে ঢুকে একটা হাঁড়ি থেকে দু'কুনকে টাটকা মুড়ি একটা ধামীতে ঢাললো। তারপর শিকের হাঁড়ি থেকে বড় বড় দুটো নারকোল নাড়ু বার করে মুড়িগুলোর ওপর রেখে বাইরে এসে ভোম্বোলের হাতে দিয়ে বললে—'খা মণি।'

ভোম্বোল বুড়ীর হাত থেকে ধামীটা নিতে নিতে বললে,—'এই বাতাবীটা কী করবো, আজীমা?'

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। এক গাল হেসে বললে,—'কী বলে ডাকলি?'

—'আজীমা।'

বুড়ীর আনন্দ আর ধরে না। সে ভোম্বোলের সামনে উবু হয়ে বসে পড়লো। হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলে....'ও লেবু তুই পেলি কোথায়?'

—কুমোর-বাড়ির গাছে।'

—'মতে কুমোরের গাছের লেবু? খাস্ নে বাছা। সইবে না। তোরে আমি ভাল লেবু খাওয়াবো। ওটা ফেলে দে। অমন হাড়-কিপটে আমার সাড়ে তিনকুড়ি বছর বয়সেও দেখিনি।'

ভোম্বোল লেবুটা কিন্তু ফেললো না, পাশে রেখে দিয়ে মুড়ি-লাড়ু খেতে লাগলো। বুড়ী তাকে একটি ছোট কাঁসার ঘটিতে জল এনে দিলে। ঘটিটি রুপোর মতো ঝক্ ঝক্ করছে। তারপর বললে,—ব'সে ব'সে খা। আমি চারটে কলমী শাক তুলে আনি। আর দেখি গে যদি এক-আধটে ন্যাটা-পুঁটি পাই....'

ভোম্বোলকে সে দুপুরে খেতে দিলে আউস-চালের রাঙা ভাত, ঘন কলায়ের ডাল ও কাঁচা লংকা ফোড়ন দিয়ে কলমী শাক ভাজা। সে ন্যাটা বা পুঁটি কিছুই ধরতে পারে নি। ভাতের সঙ্গে একবাটি ঘন দুধও সে ভোম্বোলকে দিলে। তার সরখানা ঠিক কাঁথার মতো পুরু....ওপরে গর্ত গর্ত। ভোম্বোল দুধের সর খেতে খুব ভালবাসে। দুধটা সৈরভীর। পেট ভরে খেয়ে সে দুপুরে বেশ এক ঘুম দিলে। উঠলো যখন, বাঁশবনের মাথায় বেলা গড়িয়ে গেছে

বুড়ী বললে,—'মণি, তুই আমার কাছেই থাক্! এই ঘর-বাড়ি, ঐ পুষ্করণী-বাঁশঝাড়টা আমার। বিঘে সাড়ে তিন খেনো জমিও আছে। সব তোরে দেবো, বুঝলি?'

কিন্তু ভোম্বোল এ সব নিয়ে কী করবে? সে যাবে সে—ই টাটানগর।

সেখানে গিয়ে কত কাজ শিখবে। এখানে এই গাঁয়ে, ঐ মাঠে কী আছে? এখানে সবাই যেন ঘুমোচ্ছে। ধ্যেৎ।

সে বুড়ীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ঠিক করতে লাগলো, কলকাতা কোন দিকে। ঐ দিকে! ঐ যেদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে? সে মনে মনে ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে। —হাঁ তাই-ই। একবার কলকাতায় গেলে টাটানগর যাওয়া কিছুই কঠিন নয়। এখান থেকে রেলেও কলকাতা যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাহলে সে খুড়ো-মশাইয়ের লোকজনের হাতে ধরা পড়বে। তিনি নিশ্চয় চারধারে লোক পাঠিয়েছেন। কোলকাতা কতদূরই বা? তাদের দুর্গাপুর থেকে মোটে একশ দশ মাইল। এখান থেকে না হয় একশ ত্রিশ মাইল হবে। সে হিসেব কোরে দেখলে রোজ যদি দশ মাইল করে হাঁটে, তাহলে তেরো দিনে কোলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে। তবে আর ভয় কী?

ওদিকে মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার করে এসেছিল। ঝড় ওঠে ওঠে। বুড়ী বললে—'কোথাও যাসনে। ভীষণ দেয়া নামবে।'

সৈরভী হাম্বা হাম্বা করতে করতে বাড়ি ছুটে এলো। বুড়ী তাকে ও বাছুরটাকে গোয়ালে পুরে মাটির গামলায় জাবন দিলে। সেদিন আর গোয়ালে সাঁজাল দিলে না। যে হাওয়া! এখনই হয়তো দাউ দাউ করে আগুন জলে উঠবে।

ভোম্বল একটু এদিক-ওদিক ঘুরে এসে দাওয়ায় উঠে বসল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা উত্তরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ডাকতে লাগলো বিদ্যুত চোখ-ধাঁধানো ঝিলিক হানছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো, এলোমোলো বাতাস বইতে লাগলো।

বুড়ী সে রাতে আর রাঁধলে না। ক্ষীরের মতো ঘন লাল দুধে মুড়ি, মর্তমান কলা ও আখের গুড় দিয়ে দুজনে ফলার করলে।

রাতে শুয়ে শুয়ে বুড়ী গল্প জুড়ে দিলে—'এক যে ছিল রাজা—তার সাত রানী।' কিন্তু গল্পটি বেশিদূর এগোলোনা, পাটরানীর ঘরের দরজায় পৌঁছতে পৌঁছতেই বুড়ীর নাক ডাকতে লাগলো। কিন্তু ভোম্বোলের চোখে ঘুম আর আসে না।

ঘর অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, ঝর্ ঝর্ সন্ সন্। পুকুরের ব্যাঙ-গুলো ডাকছে—ক্যাঁ-কোঁ, কট্‌র্-কট্‌র্। তাদের সঙ্গে দাম-কলমী-হিঞ্চে বনে এক জোড়া ডাহুক- ডাহুকী যোগ দিলে—দেই-দেই। সারা রাতের মধ্যে তাদের হাঁকাহাঁকি ও ডাকাডাকির বিরাম রইল না। তারা সকলে

যেন পরামর্শ করে ভোম্বোলের চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। তার মন ছুটে গেল তাদের দুর্গাপুরে নদীতীরে।

সে—ই ও-পারে বন-ঝাউয়ে ঢাকা বিশাল বালুচর। তার শেষে আকাশের কোলবরাবর গাঁ। এ-পারে তাদের বাড়ি। পুব-দুয়ারী ঘর খানার জানালার ধারে এমনি বর্ষায় বসে সে যেন গান ধরেছে। ঝাউ-বনে, নদীর বুকে বাতাস লুটোপুটি করছে আর কি যেন কইছে····

ভোরের দিকে সব শান্ত হতে ভোম্বোল ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর চুপিচুপি সকাল হলো! বুড়ি দেখলো ভোম্বোল ঘুমোচ্ছে। সে পুকুর ধারে চলে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখে, চাটাই খালি, ভোম্বোল নেই। মনে করলো, এখনই আসবে। কিন্তু ক্রমে রোদ উঠলো, মেঘ সরে গেল, ভোম্বোল তবু ফিরে এল না। সে বেরিয়ে গিয়ে ফাঁকা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় ডাকলো—'টম্বো-ও-ল। ওরে টম্‌বলা—আয় রে দাদা—ফিরে আয়—'

কিন্তু কোথায় তার 'টম্বোল'? সে তখন আধ ক্রোশ দূরে মানিক-পুরের পাকা সড়ক ধরে বরাবর পশ্চিম দিকে চলেছে। তার হাতে কঞ্চি, বগলে বাতাবী লেবু।

॥ আট ॥

যুদ্ধ

শালুকভাঙা থেকে মানিকপুর পাকা দু'ক্রোশ। রাস্তার দু'ধারে কেবল ধান ও পাট-ক্ষেত। ভোম্বোল দেখতে দেখতে চলেছে। পাট-গাছের মাথায় এক ঝাঁক গঙ্গাফড়িং উড়ছে। একটা টুনটুনি উড়ে এসে একটা পাটগাছের আগায় বসলো। কচি-ডগা অমনি নুয়ে পড়ল; কিন্তু টুনটুনিটা উড়লো না, বসে বসে দোল খেতে লাগলে। ভোম্বোল রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে টুনটুনিটাকে ছুঁড়ে মারলো। টুনটুনিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে গেল।

সকাল থেকেই ভোম্বোলের মনটা খারাপ। সত্যিই বুড়ী বড় ভাল। তার সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছে, দুধের সরের কথা ভেবে। বেশ পুরু সর! এখনও যেন মুখে লেগে আছে। থাকলে বুড়ী রোজ খাওয়াতো! কিন্তু সর খাবার লোভে সেকি টাটানগর নাবে না? আচ্ছা! কাজ-কর্ম শিখে আবার সে বুড়ীর বাড়ি ফিরে আসবে।

এদিকে বেশ বেলা উঠেছে। রোদে গা-মাথা পুড়ে যাচ্ছে। তবে মানিকপুর আর বেশি দূর নয়। ঐ যে গাছপালার কোলে ঘর-বাড়িগুলো দেখা যায়। গাঁয়ের বাইরে গরু-বাছুর লেজ তুলিয়ে চরে বেড়াচ্ছে। একটা রাখাল লকড়ি হাতে একটা গরুর পিছনে ছুটছে আর মুখে শব্দ করছে—'তুপুর্ হৈ ঃ।'

ভোম্বোল হন্ হন্ ক'রে হাঁটতে হাঁটতে গাঁয়ে গিয়ে ঢুকলো।

গাঁয়ের মুখেই এক গৃহস্থ-বাড়ি। এক ভিখারী তার বার-উঠোনে লাউ-মাচার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় গান ধরেছে—

'কবে যাবে হে গিরিরাজ,
আনিতে মোর উমাধনে?
না হেরিয়া সে মুখ-শশী,—
আমি যে গো প্রাণে বাঁচি নে।'

সেই সঙ্গে তার একতারাটি বাজছে—বঙ্ বঙা বঙ্—বঙ্ বঙ্ ; বঙ্ বঙা বঙ্—বঙ্ বঙ্।

এ গান ভোম্বলও জানে। সে বগলের বাতাবী লেবুটাতে টোকা দিতে গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে চলতে লাগলো,—'কবে যাবে হে গিরিরাজ—আ আ-আ-নিতে মোর উ—মা ধনে—এ—এ—'

পারতে এ গানের সুরে সুরে ভোরের আকাশ ছেয়ে যায়।

ভোম্বোল গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তার গোড়াটা কোনকালে বাঁধানো হয়েছিল। এখন সান ফেটে-ফুটে ইটগুলো দাঁত বার করে আছে। গাছটার মোটা মোটা ডাল থেকে চারধারে সাপের মতো অসংখ্য ঝুরি ঝুলছে।

ওধারে একটা মস্ত পুকুর। তার এককোণে শালুক-বন। পুকুরটাও খুব পুরনো। তার সান-বাঁধানো ঘাটও ফেটে চৌ-চির। একপাল ছেলে পুকুরে স্নান করছে। কী তাদের আনন্দ! তারা বটের ঝুরি ধরে তুলতে তুলতে জলে ঝপ্ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে; আবার সাঁতরে এসে ঝুরি ধরে দোল খাচ্ছে; কেউ কেউ গাছের ডালে উঠে যাচ্ছে! চীৎকারে, ডাকা-ডাকিতে, জল-শব্দে জম-জমাট।

ভোম্বোলের ইচ্ছে হলো, সেও একটা ডুব দিয়ে নেয়। গরমে গা-মাথা জ্বলছে; ঘাম ঝরছে। কিন্তু আর তো কাপড় নেই। নেয়ে উঠে সে এরই এক মুড়ো পরে থাকবে, আর এক মুড়ো শুকোবে। কত মজুরকে সে তাই করতে দেখেছে।

সে কঞ্চিখানা ও লেবুটা বটগাছটার খোঁদলে লুকিয়ে রাখলো। তারপর কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বটগাছের ওপরে উঠে গেল। ছেলেরা তা'র দিকে তাকিয়ে অবাক। এ আবার কে রে? ভোম্বোল কিন্তু তাদের দিকে সোজাসুজি তাকালো না। সে ডাল দিয়ে একেবারে পুকুরের ওপর চলে গেল। তারপর একটা লম্বা ঝুরি বেয়ে নিচে নেমে, ঘন ঘন দোল খেতে খেতে দিলে এক লাফ। অমনি গিয়ে পড়লো একেবারে মাঝ পুকুরে। পড়েই তলিয়ে গেল—জলে বুড়বুড়ি ছাড়ছে, কিন্তু সে উঠলো না।

ছেলেরা দেখলো, সে ডুবে গেছে। তারা ভয়ে চীৎকার করে উঠলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাত দশেক তফাতে ভোম্বোলের মাথা দেখা গেল। সে হুস্ করে ভেসে উঠলো। আবার ডুব দিলে, আবার উঠলো। তারপর কিছুক্ষণ চীৎ হয়ে, কাৎ হয়ে. উপুড় হয়ে সাঁতার কাটলো।

ছেলের দল সাঁতার ভুলে, কেউ ঘাটে, কেউ কোমর জলে, কেউ বা গাছের ঝুরি ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভোম্বোলের মনে খুব গর্ব হলো। ছেলেগুলো তাকে দেখ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেউ সাঁতার কাটতে সাহস করছে না। সে তাদের কারুর সঙ্গে কোন কথা না ব'লে, গম্ভীর ভাবে ডাঙায় উঠলো। তারপর কাপড়ের মুড়োয় গা-মাথা মুছে এ-মুড়ো ও-মুড়ো নিঙড়ে নিলে। ক্ষিদেয় তার পেটে যেন এক ঝাঁক চড়ুই কিচির-মিচির করছে। এ সময়ে এক থালা গরম ভাত—তরকারি না পেলেও চলে। কেবল একটু নুন, কিন্তু গরম ভাত এক থালা চাই-ই। কিন্তু কে তাকে ভাত দেবে? বাতাবীটা খেয়েই কাটানো যাক্।

সে খোঁদলটার কাছে এগিয়ে গেল। নিশ্চিন্ত আছে যে, ওর মধ্যে লেবুটা আছেই। কিন্তু খোঁদলটার মধ্যে হাত দিয়ে দেখে, লেবুটা নেই কঞ্চিখানা আছে! কে নিলে? সে তাড়াতাড়ি আবার হাত ঢুকিয়ে দিলে। না—নেই তো! বাঃ! বেশ মজা।

ভোম্বোল এ-দিক, ও-দিক তাকাতেই দেখে, একটা ছেলে লেবুটা নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। 'আমার জিনিস চুরি? ধর্—ধর্—ধর্।' ভোম্বোল চোরের পিছনে ছুটলো। অন্য ছেলেরা এতক্ষণ ব্যাপারটা কী ঠিক করতে পারে নি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে। এবার দেখলো, তাদের নেলো পুকুর-পাড় দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটছে—তার বগলে একটা পাকা বাতাবী লেবু—আর নেলোর পিছনে ছুটছে অচেনা ছেলেটা। তারাও হৈ-হৈ করতে করতে ছুটলো।

ছুটতে ছুটতে সকলে পুকুর পার হয়ে গেল। সামনে লাহিড়ীদের লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরনো মন্দির। তার পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পথ। পথের ওধারে ঝোপ-জঙ্গল-কচুবন। সকলে ছুটতে ছুটতে মন্দিরের চত্বর পার হয়ে গেল।

এবার ভোম্বোল ছেলেটাকে ধরে ধরে। ছেলেটাও একবার পিছন ফিরে দেখলো। দেখেই বুঝলো, আর রক্ষা নেই। সে বগলের লেবুটা হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে গেল। অমনি ভোম্বোল ছুটে এসে খপ্ করে তার হাত চেপে ধরলো। দুজনেই হাঁফাচ্ছে। ছেলেটা হাঁফাতে হাঁফাতে বললে,—'হাত ছাড়ো!'

ভোম্বোল তার হাত থেকে লেবুটা কেড়ে নিয়ে নড়া ধবে জোর এক ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—'চোর! আমার লেবু চুরি করে পালাচ্ছিস্।'

তারও দম আটকে যাচ্ছে। মুখ দিয়ে আর কথা বা'র হলো না। কিন্তু রাগে বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে কোটর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে।

পিছনের ছেলেগুলোও ইতিমধ্যে সেখানে এসে পড়েছে। তা'রা ভোম্বোলদের দু'জনকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলেই হাঁফাচ্ছে। একজন জিগ্যেস করলে,—'কী হয়েছে? কে তুমি?'

ভোম্বোল তার কথার কোন জবাব না দিয়ে সেই ছেলেটার নড়া ধরে আবার এক ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—'কেন আমার লেবু চুরি করেছিলি?'

ছেলেগুলো এক সঙ্গে ব'লে উঠলো—'তোমার লেবু? তোমার নাম লেখা আছে ওতে? ছেড়ে দাও ওকে—'

ভোম্বোল বললে,—'যা—যা। তোদের আর সর্দারি করতে হবে না! এ—ক চ—ড়ে—'

একটা ছেলে অমনি কাঁদ কাঁদ হয়ে ভোম্বোলের মুখের কাছে মুখ এনে বলতে লাগলো,—ওঁরে বাঁবাঁরে—কোঁথা যাঁব—ওঁ—ওঁ—ওঁ—? এঁকটা পিঁপড়ের গঁ—অ—র্ত—ও—উঁ—হুঁঃ—হুঁঃ।' তারপরই ধমক দিয়ে বললে,—'এখনই ছাড়্ বলছি। না ছাড়লে'—বলেই সে ভোম্বোলকে এক ঠেলা মারলো।

ভোম্বোলও সঙ্গে সঙ্গে তার গালে এক চড় কষে দিলে। গালটা লাল হয়ে উঠলো।

ছেলের দল তখন রাগে, অপমানে পাগলের মতো হয়ে গেল। তা'রা চারধার থেকে ভোম্বোলকে আক্রমণ করলো। কেউ কিল মারে,

কেউ চড় মারে, কেউ খামচি দেয়, কেউ কাপড় ধরে টানে, কেউ লেংগি মারে।

ছেলেদের মার খেয়ে ভোম্বোলের চেহারা হয়ে উঠলো ভয়ংকর। তার কাকা আর স্কুলের মাস্টার-মশাই ছাড়া আর কেউ আজ অবধি তাকে মারতে সাহস করে নি। এ গাঁয়ের ছোঁড়াদের মার সে হজম করবে? সে একহাতে বেপরোয়া ঘুশি ও লাথি চালাতে লাগলো। কারো পেটে লাগে, সে কোঁক ক'রে ওঠে; কারো পিঠে লাগে ধম্ করে শব্দ হয়; কেউ নাক ধরে বসে পড়ে।

বেগতিক দেখে একজন বলে উঠলো—'এই হেবো, যা তো; বাড়ি থেকে সড়কিখান নিয়ে আয়।....জানিস শুয়োর! এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর?'

পথের পাশে হাত দুই লম্বা একখানা বাঁশের আগা পড়েছিল। ভোম্বল চট্ করে সেটা তুলে নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে বলতে লাগলো —'তা'র আগে তোদের মাথা ফাটাবো। চলে আয় সব মানিকপুরী —ই—ই।'

বাঁশ দেখে ছেলেগুলো আর দাঁড়ালো না; দেখতে দেখতে চারধারের ঝোপ-জঙ্গল-গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেল। ভোম্বোল দেখলে, আর থাকা ঠিক নয়। যুদ্ধে তো তারই জিত হয়েছে। সে বাঁশের আগাখানা কাঁধে নিয়ে যে-পথে এসেছিল সে-পথে তাড়াতাড়ি ফিরে চললো। তার বুক-পিঠ জ্বালা করছে। একটা ছেলে খামচে একেবারে রক্ত বার করে দিয়েছে। ইঃ।

॥ নয় ॥

পাঠশালায়

গাঁয়ের পথে রোদ পড়ে না, কেবল ছায়া—

ভোম্বোল একটা নতুন পথে ছায়ায় ছায়ায় যেতে লাগলো। গাঁ যেখানে শেষ, সেখান থেকে আবার ক্ষেত-খামার শুরু। তার শেষে যে গাঁ তা একেবারে আকাশে মিশে আছে। মানিকপুর থেকে কতদূর হবে, কে জানে? পথটা যেন একখানা বিশাল ধনুক! ভোম্বোল একবার সেদিক পানে তাকালো। উঃ! কী রোদ। চোখ মে'লে তাকানো যায় না!

সে একটা গাছতলায় বসে কাপড়ের এক মুড়ো ছায়ার বাইরে রোদে

মেলে দিলে। চারধারে তাকিয়ে দেখলে, কেউ কোথাও নেই—কেবল কিছু তফাতে একখানা প্রকাণ্ড টিনের আটচালা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে শব্দ আসছে—'একের পিঠে এক—এ—গা—রো—ও—।' ভোম্বোল বুঝলো, ওটা একটা পাঠশালা। ছেলেগুলো গাঁ মাথায় করে শতকে পড়ছে।

ভোম্বোল পাঠশালাটার দিকে মুখ করে লেবুটা ছাড়িয়ে খেতে লাগলো। ভারি মিষ্টি লেবু। এই জন্যেই মতে কুমোর কাউকে খেতে দেয় না। এর সঙ্গে যদি একটু নুন্ হতো!, তা'হলে কেয়া মজা!

লেবু খেতে খেতে রোদে কাপড়ের মুড়োটা শুকিয়ে এলো। ভোম্বোল সে মুড়ো পরে আর এক মুড়ো তেমনি ক'রে রোদে দিলে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটাও শুকিয়ে গেল। এবার আর কোমর না বেঁধে মুড়োটা সে গায়ে দিলে। ক্ষিধেয় পেট তখনও জ্বলছে। একটা বাতাবী লেবুতে অমন ষণ্ডা ছেলের কী হবে? সে চারধারে তাকিয়ে দেখলো, কোথাও কোন ফলের গাছ আছে কিনা? বছরের এ সময়ে বাতাবী ছাড়া আর কোন ফল পাওয়া যায়? তবে কয়েকটা ভাল ফল, এ সময়ে ফলে—কলা, নারকোল, পেয়ারা, আতা। ঐ যে পাঠশালার ওধারে কয়েকটা নারকোলগাছ ও কলার ঝাড় দেখা যাচ্ছে। এক কাঁদি কলাও পড়েছে যেন!

ভোম্বোল আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল। বেশ বড় বড় কলা। সে আরও কাছে গিয়ে দেখলে—কাঁদিটা পাকা কলার নয়, কাঁচকলার। আর, নারকোলগাছে নারকোল আছে বটে কিন্তু পাড়বে কে? সে নারকোলগাছে চড়তে পারে না।

যাক্। কলা-নারকোল খেয়ে দরকার নেই। একবেলা না খেলে কী হয়? ছেলেরা তখন নামতা পড়ছে—'সাতনম্ তেষট্টী—ই—ই।'

তা'র ইচ্ছে হ'লো, একবার পাঠশালাটা দেখে যায়। সে বড় ইস্কুলের ছাত্র। পড়ে ফোরথ ক্লাসে (ক্লাস সেভেনে)। ফোরথ ক্লাসের ছেলের সঙ্গে চালাকি নয়! তাদের অনেক বই। অ্যালজেব্রা আর সংস্কৃত ঋজুপাঠের নাম শুনলেই পাঠশালার পোড়োদের চক্ষু রসগোল্লা। ওরা ইংরেজীরও কিছুই জানে না। কেবল জানে বাঙলা আর শুভঙ্করী। বাঙলা আবার কেউ পড়ে নাকি? তবে হাঁ, শুভঙ্করীটা—কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে পাঠশালার সামনে এসে পড়লো।

তাকিয়ে দেখলে একঘর ছেলে। ছেলেগুলো ধাড়ী ধাড়ী, কারো

কারো গোঁফ বেরিয়েছে। তাদের মাঝে পণ্ডিতমশাই একটা পুরনো টেবিলের সামনে, একখানা হাতলভাঙা চেয়ারে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন। তাঁর নাকের ডগায় কালো ফ্রেমের স্টীলের বাঁকা ডাল ভাঙা চশমা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা। গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবীর ওপর একখানি আধময়লা উড়ুনি আলোয়ানের মতো করে জড়ানো। টেবিলের নিচে তার বহুদিনের পুরনো মাথা বাঁকা চটি জোড়া দেখা যাচ্ছে। তাদের গোড়ালি অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে।

ছেলেদের নামতা পড়া শেষ হ'লো। কিন্তু বেজায় হট্টগোল হচ্ছে। পণ্ডিতমশাই শ্লেটের একখানা ফ্রেমভাঙা হাতে নিয়ে টেবিলের ওপর খটাখট্ করে ঠুকলেন। অমনি গোলমাল কিছু থামলো, যেন এক ঝাঁক মৌমাছি গুন্ গুন্ করতে করতে দূরে উড়ে গেল।

আরে ঐ যে! ভোম্বোল এতক্ষণ দেখে নি, একটা ছেলে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে। ওর দু'হাতে দুখানা ইট। ছোঁড়াটা কী শয়তান! অমনি করে দাঁড়িয়ে ও কা'কে যেন জিভ ভ্যাংচাচ্ছে।

ঐ কোণে ওটা আবার কে? হাঃ—হাঃ—হাঃ! নাডুগোপাল। ছেলেটা মাটিতে তিন হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে নাড়ু-গোপাল হয়ে আছে। হাতে নাড়ুর বদলে আধখানা ইট।

ভোম্বোল আরও মজা দেখতে পাঠশালার বারান্দায় খুঁটি ধরে দাঁড়ালো। ঘরের মধ্যে সেই কোণ থেকে একটা ছেলে নালিশ করলে,— 'পোন্শাই, গোপ্লা আমার বগলে কাতুকুতু দিচ্ছে—এ—এ—।'

আবার পণ্ডিতমশাই খটাখট্ টেবিল ঠুকতে ঠুকতে বলে উঠলেন,— 'এই! সব চুপ!'

সেই ছেলেটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'পোনশাই আমার বগলে —এ—এ—।'

পণ্ডিতমশাই হাঁক দিলেন,—'নিয়ে আয় গোপ্লার কান চেপে ধরে—এ—।'

অমনি চার-পাঁচটা ধাড়ী ছেলে চারধার থেকে ছুটে গেল গোপ্লার কান ধরতে। যে ছেলেটা দু'হাতে কান ঢাকলো, ওরই নাম গোপ্লা? হাঃ—হাঃ—হাঃ! ছেলেগুলো গোপালের হাত সরিয়ে দিয়ে তার দুকান চেপে ধ'রে টানতে টানতে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে নিয়ে এলো। পণ্ডিতমশাই গোপালের ঘাড় ধরে ধমক দিলেন,—'বাঁদরটা! কেবল খুনশুড়ি!' বলেই পিঠে থপ্ করে মারলেন এক চড়।

এদিক থেকে একটা ছেলে বললে,—'পোন্‌পাইয়ের থাবা! এই! কাঁদ্ কাঁদ্। না কাঁদলে আরও থাবাবেন।'

গোপালও অমনি 'ওঁরে বাঁবারে' বলে কাঁদতে কাঁদতে পিঠ বেঁকিয়ে ছুটে পালালো।

ঠিক তখনই ভোম্বোলের মনে হলো পিছনে একটা প্রকাণ্ড শুয়োর চেঁচাচ্ছে। কিন্তু ফিরে দেখে, শুয়োর নয়, একটা ছেলে! চার-পাঁচটা ধাড়ী ছেলে ছেলেটাকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে আসছে। আর, ছেলেটা হাত-পা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে। সে কিছুতেই আসবে না। ঐ ছেলেটাকে আনতে চার-পাঁচ জনেও পারছে না? হোঃ—হোঃ! ভোম্বোল তো একাই পারে। যুযুৎসুর একটি প্যাঁচে বাছাধন কাঁচপোকার মুখে উইচিংড়ির মতো হয়ে সুড়্ সুড়্ ক'রে চ'লে আসবে।

ছেলেরা তাকে এনে পাঠশালার বারান্দায় তুললো। ছেলেটা এবার এমন চীৎকার ও কান্না আরম্ভ করলে যেন তার ভয়ানক পেট ব্যথা করছে, কান কট্ কট্ করছে, দাঁতগুলোর গোড়ায় আট-দশটা পোকা কামড়াচ্ছে। কী যন্ত্রণা রে বাপ! সে কেবলই বলছে,—'আমায় ছেড়ে দেরে! ওরে বাবারে! আমি পাঠশালায় যাবো না'রে—ওরে আমায় মেরে ফেললে রে—ও মা—আ—আ—হা—হা—'

পণ্ডিতমশাই বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। ছেলেরাও তাঁর পিছু পিছু হুড়্ হুড়্ করে বেরিয়ে এলো।

পণ্ডিতমশাই বললেন,—'নিয়ে আয় এদিকে। শুয়োরটা রোজ পালাবে—গাছে চড়ে থাকবে—'

ছেলেটা পণ্ডিতমশাইকে দেখেই কান্না গিলে ফেললে—এখন ফোঁপাচ্ছে।

পণ্ডিতমশাই তার হাত চেপে ধরে বললেন,—'চল্ ভেতরে। তোর পড়ার এত ভয় কিসের? এরা পড়ছে কী ক'রে?—চল্'—

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে তাঁর সঙ্গে চললো। তার দুটি গাল চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে; কয়েক ফোঁটা বুকেও পড়েছে। তার অবস্থা দেখে অন্য ছেলেগুলোর কী স্ফূর্তি!

ভোম্বোলও হাসি চাপতে পারলে না—হাসতে হাসতে পরের গাঁয়ের দিকে চললো।

॥ দশ ॥

কাছিমদহর হাটে

মাঝ পথে যেতেই বেলা দুপুর—

পুব-পশ্চিম থেকে এসে আরও দুটো পথ সেই পথটার সঙ্গে মিশেছে। পথ তিনটের ধারে ধারে বাবলাগাছ। আর কোন বড় গাছ নেই। পথের ওপর তাদের কাঁটা, ছোট ছোট পাতা সেই সঙ্গে একটু একটু ছায়াও পড়েছে।

সেদিন ছিল হাটবার। পথে যেতে যেতে হাটুরেদের সঙ্গে ভোম্বোলের দেখা হ'লো। তারা বেসাতি নিয়ে চলেছে—কারুর মাথায় পাট, কারুর মাথায় গামছা, কেউ নিয়েছে এক ঝাঁকা বেগুন, কেউ বা নিয়ে চলেছে এক ধামা পেঁয়াজ। আবার, কেউ বা দুটো মড়াখেকো পাঁঠাকে দড়ি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে; খাসি দুটো যায় আর ডাকে—'ম্যা—অ্যা—অ্যা—।' কারো কারো মাথায় পাঁঠা ধামা ও পাটকরা বস্তা অথবা হাতে খালি বোতল।

ভোম্বোল একজনকে জিজ্ঞেস করলে,—'পথটা কোন্ গাঁয়ে গেছে গো?'

লোকটা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে জিগ্যেস করলে,—'তুমি যাবা কোথা?'

ভোম্বোল বললে,—'রেলরাস্তা—'

—'রেলরাস্তায়। তা' এ পথ দিয়ে যাওয়া যাবে। ঐ যে ছামনে কাছিমদয়ের হাট—ওরই ওধারে খান দুই গাঁ পরে রেলের রাস্তা। কোথা থেকে আসছো?'

—'মানিকপুর।'

—'মানিকপুর থেকে? ইদিকে কেন?'

—'ঐ রেলরাস্তার ধারে এক গাঁয়ে যাব।'

—গাঁয়ের নাম কী?'

ভোম্বোল কোন জবাব দিলে না; লোকটাকে ছাড়িয়ে গেল। লোকটা আপন মনেই বললে,—'ছোঁড়াটা সেয়ানা!'

পথও ফুরিয়ে আসছে, বেলাও গড়িয়ে গেল। ঐ যে সামনে হাট। চারধারে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। এখান থেকে হাটের মহা কোলাহলকে মনে হচ্ছে যেন বন্যার জলস্রোতের শব্দ—কল কল, কল কল।

ভোম্বোল হাটের ধারে এলো। পথের পাশেই জমিদার-কাছারি। মস্ত টিনের আটচালা। তার পাকা বারান্দায় পিয়াদা-বরকন্দাজেরা ও জন কয়েক লোক—কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে; কেউ কলকেতে তামাক খাচ্ছে, কেউ গল্প করছে। ঘরের ভেতর চৌকির ওপর ফরাসে কয়েকজন মুহুরী বসে। প্রত্যেকের সামনে একটা করে কাঠের বাক্স। তারা ঘাড় গুঁজে কী যেন লিখ্‌ছে। আর ঐ যে খালি গায়ে চশমা চোখে' বসে গড়গড়া টানছেন, উনিই বোধহয় কাছারির নায়েবমশাই। নায়েবমশাইয়ের ভুঁড়িটা বেশ—যেন জয়ঢাক!

ভোম্বোল আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠলো। নায়েবমশাইয়ের ভুঁড়িটা দেখতে বেশ মজা লাগে। হাসি পায়। সে ভুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে নায়েবমশাইয়ের মুখের দিকে চোখ তুলতেই ভোম্বোলের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখি হ'লো, অমনি মনে হলো, তাঁকে যেন সে কোথায় দেখেছে। কোথায়? কোথায়? নায়েবমশাইও এবার যেন ভোম্বোলকে চশমার ওপর দিয়ে ভাল করে দেখছেন। মিনিট খানেক লক্ষ্য ক'রেই বলে উঠলেন,—'আরে ঐ তো আমাদের হারাণবাবুর ভাইপো ভূপেন। ওর ডাকনাম ভোম্বোল। ছোঁড়াটা বাড়ি থেকে পালিয়েছে। এই ইংরেজের বাপ, এই বিলাতালি, ওরে ফট্‌কে—ছোঁড়াটাকে ধর্‌—' বলতে বলতে নায়েবমশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে ফরাস থেকে নামলেন।

ভোম্বোলও এবার তাঁকে চিনতে পেরেছে। নায়েবমশাই তার কাকার বন্ধু, ব্রজ ভটচার্য। সেবার তাদের বাড়ি দু'দিন ছিলেন। যখন হাসেন তখন মনে হয়, একটা হিপোপটেমাস্‌ হাঁ করে আছে। ওঁর হাসির আওয়াজ সারা-পাড়ার লোক শুনতে পায়। নায়েবমশাই ফরাস থেকে নামতে নামতেই ভোম্বোল একলাফে নিচে নেমে হাটে মিশে গেল।

সে কারুর বগলের তলা দিয়ে, কারুর পেটের কাছ দিয়ে, কারুকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে হাটের মধ্য দিয়ে একরকম ছুটতে লাগলো। নায়েবমশাইয়ের পিয়াদা-বরকন্দাজে হাট ভরা। এখনই তাদের হাতে ধরা প'ড়তে হ'বে। ওদিকে ইংরেজের বাপ, বিলাতালি, ফট্‌কে, কমরুদ্দি, রত্‌না প্রভৃতি পিয়াদা-বরকন্দাজেরা বড় বড় লাঠি নিয়ে হাট ঘিরে ফেললে। ব্যাপারটা যে কী কেউ বুঝতে পারছে না। চারধারে গোলমাল, চঞ্চলতা আরও বাড়লো। ভোম্বোল যেতে যেতে শুনলো একজন বললে,—'নায়েবমশায়ের বেটা চুরি হয়েছে—'

ভোম্বোলের হাসি এলো। সে সামনের একজনকে ধাক্কা দিয়েই

তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, লোকটি ষষ্ঠী খুড়ো। খুড়ো হুমড়ি দিয়ে মুড়ি কিনছিলেন। ভোম্বোলের ধাক্কায় কতকগুলো মুড়ি ছিটিয়ে গেল। তিনি হুংকার দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই দেখেন, সামনে ভোম্বোল। ঐ দেখাই সার। ভোম্বোল ততক্ষণে দশটা লোক পার হয়ে গেছে। ষষ্ঠী খুড়ো হাঁক দিলেন,'—ধর—ধর—ঐ যায়—'

তাঁর কথা শুনে আশ-পাশের সকলে বলতে লাগলো—'ধর—ধর—ঐ যায়!'

কিন্তু কে যায়, কোথা যায়, কেউ বুঝতে পারে না। ভোম্বোলের বুক ঢিপ ঢিপ্ করছে। এবার আর রক্ষা নেই। ধরা পড়তেই হবে।

সে যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে একখানা প্রকাণ্ড বাগান দেখা যাচ্ছে। লোকজনও সেদিকে পাতলা। খান কয়েক গরুর গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নাকে দড়ি বেঁধা গরুগুলো শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ভোম্বোল ভীড় ঠেলে বেরিয়ে—বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে বাগানের মধ্যে পড়লো। পড়েই আর দাঁড়ালো না—ছুটতে লাগলো—সারাদিনের পথচলায় শরীর ক্লান্ত। তার ওপর সকাল থেকে এক রকম উপবাসী। ছুটতে কষ্ট হচ্ছে। তাহোক। তবু সে ধরা দেবে না।

বাগানখানার ওধারে সড়ক। হাটুরেরা আসা-যাওয়া করছে। ভোম্বোল বেড়া গলিয়ে বাগান পার হয়ে সড়কে উঠলো। দম বন্ধ হয়ে আসছে; তবুও বসে জিরতে সাহস হলো না। সে পথ ধরে চললো।

॥ এগারো ॥

পুঁটিমারীর পথে

ভোম্বোল যায় আর পিছন ফিরে তাকায়। এবার যদি কেউ তাকে তাড়া ক'রে তা'হলে সে আর ছুটতে পারবে না। অথচ ব্রজবাবুর এলাকা ছাড়িয়ে যাওয়া চাই।

কিন্তু জমিদারের পিয়াদা সব জায়গায় ঘোরে। এই রাস্তা ধ'রে কিছুদুর গিয়ে কোথাও ব'সে জিরবে। ব্রজবাবু তা'কে চিনলেও পিয়াদারা তো তা'কে চেনে না। তবে একবার দিকটা ঠিক ক'রে দেখা যাক। ঐ তো তা'র সামনে সূর্য ঢলে পড়েছে। সে ঠিক পথেই যাচ্ছে।

পথের দু'ধারে ঘন বাঁশবন। বাতাসে বাঁশপাতাগুলো থরথর করে কাঁপছে, ওলট-পালট খাচ্ছে। বাঁশগাছগুলো গায়ে গায়ে ঢলে পড়ছে। আর শব্দ হচ্ছে—'ট্যাঁস্ ট্যাঁস্।'

একটা চাষীর ছেলে হাট থেকে ফিরছিল। তা'র মাথায় সওদা। ভোম্বোল তা'কে জিগ্যেস করলে,—'এপথ কোথায় গেছে রে?'

ছেলেটা ভোম্বোলের দিকে একবার আড়চোখে তা'কালো। তা'র কথার কোনো জবাব দিলে না।

ভোম্বোল আবার জিগ্যেস করলে,—'এই, পথটা কোন দিকে গেছে?'

ছেলেটা আস্তে আস্তে বললে,—'পুঁটিমারী।'

—'তোর বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটা এবার চট্ ক'রে পিছন ফিরে হাটের দিকে মুখ করে চাৎকার ক'রে ডাকলো,—'ও আব্বা—আ—'

ভোম্বোলের হাসি এলো। ছোঁড়াটা ভয় পেয়েছে। তাকে দেখাচ্ছে সত্যি যেন ওর বাবা পিছন পিছন আসছে। ভোম্বোল বললে,—'ভয় কী রে? আমি পুঁটিমারী যাবো। এখান থেকে কদ্দুর বল্ না?'

ছেলেটা তা'র কথায় সাহস পাওয়া দূরে থাক্, হাটের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ভোম্বোলের ইচ্ছে হ'লো, বোকা ছোঁড়াটার গালে দেয় দুটো চড় বসিয়ে।

সেই সময় জনকয়েক লোক তাড়াতাড়ি হাটের দিকে আসছিল। ভোম্বোল তাদের একজনকে জিগ্যেস করলে.—'পুঁটিমারী কতদূর গো?'

লোকটা ঘাড় না ফিরিয়ে পিছন দিকে হাতটা একটু বেঁকিয়ে বললে, —'এই ছামনে।'

—"সামনে কদ্দুর?'

'ঐ খাল-পার' বলতে বলতেই লোকটা চলে গেল।

কী বিপদ! গাঁয়ের মানুষ কিছুতেই দূরত্বের কথা ঠিক বলবে না। ওদের কাছে চারক্রোশ দূরের গাঁ-ও,—'ঐ যে!'

এদিকটায় পথের ধারে ধারে লোকের বসতি। কোথা থেকে যেন এসে ভোম্বোলের সমুখ দিয়ে নাকে দড়ি গাঁথা একটা মোষ উটের মতো মুখ তুলে বড় বড় চোখ বার ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলতে লাগলো। ভোম্বোল মোষের ডাক নকল করতে পারে। সে একবার পিছন ফিরে তাকালো। সর্বনাশ! লাঠি হাতে বাবরি চুলো ঐ লোকটা ছুটে আসছে কে? পিয়াদা নাকি? সে এক দৌড়ে পথ থেকে একখানা বাড়ির ঘরের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো।

ঘরখানা ঢেঁকি-শাল। গৃহস্থ-বউ তখন ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। ঢেঁকির শব্দ হচ্ছে—'ক্যাঁচোর খপ্। ক্যাঁচোর খপ।' বউ বোধ হয় চিড়ে কুটছে।

ভোম্বোল ঘরখানার বেড়ার পাশ থেকে একটা চোখ বা'র করে দেখলে, লোকটা ছুটতে ছুটতে মোষটার সামনে এসে তাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে তা'র পিঠে নির্দয়ভাবে লাঠি চালাতে লাগলো। মার খেয়ে মোষটা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে হাটের দিকে ফিরলো। ভোম্বোলের বুকটা হালকা হলো। লোকটা পিয়াদা নয়, গাড়োয়ান। গাড়োয়ান না হ'লে মোষটাকে অমন ক'রে ঠ্যাঙায় ?

সে আবার পথে উঠে চলতে লাগলো। বাঁশবনের শেষে ক্ষেত; বেশি বড় নয়। তার মধ্যে একটা খাল দেখা যাচ্ছে। খালের ওপারে একখানা গাঁ। গাঁ থেকে ঢোল-কাঁসির আওয়াজ ও সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে, অল্প অল্প।

ভোম্বোল খালের ধারে পৌঁছবার আগেই দেখলো, ও-পার থেকে একখানা ডুলি আসছে। ডুলিখানা শাদা কাপড়ে ঘেরা। ওর মধ্যে নিশ্চয় কোন বউ আছে। পুজো এলো। বউ বোধহয় বাপের বাড়ি যাচ্ছে! পুজোর সময়ে তার খুড়তুতো বোন রানী-দিদিও বাড়ি আসবে! রানী-দিদিও পাল্‌কিতে আসে। অনেক দূর থেকে বেহারাদের 'হুম্ হুম্ হো-ও; হুম্ হুম্ হো-ও' শোনা যায়! আর সেই সুর শুনে সকলে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পালকি এসে বা'র-বাড়ির উঠোনে নামতেই দিদি দরজা খুলে তার মধ্য থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে।

রানী-দিদির ছেলে খোকনটা ভারী দুষ্টু। সকলে বলে—সে ভোম্বোল-মামার মতো দুষ্টু হয়েছে। ভোম্বোল খোকনকে খুব ভালোবাসে। খোকনটা রোজ তার কালির দোয়াত উল্‌টে ফেলবে; ইংরেজী বইখানা তো ছিঁড়ে-কুটে তার একখানা পাতাও আস্ত রাখেনি। বই দেখলেই সেখানা তা'র চাই-ই। বই খুলে পা ছড়িয়ে বসে বলবে—'অ'। রানী-দিদি বলে,—'কেড়ে নে না—একটা থাপ্পড় মার্ না।'

কিন্তু অতটুকু ছেলেকে কী মারা যায়? খোকনের জন্যে ভোম্বোলের মন কেমন করে উঠলো। সে এসে তাকে এ-ঘর, ও-ঘর নিশ্চয় খুঁজবে। খুঁজুক—ভোম্বোল অনেক দিন পরে তা'র জন্যে অনেক রকমের খেলনা নিয়ে যাবে।

ডুলিখানা 'হুঁ হুঁ' করতে করতে তা'র পাশ দিয়ে চলে গেল!

সরু খাল; অল্প জল। ভোম্বোল স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেল। ও-পারে উঠে কিছুদূর গিয়েই ঢোল-কাঁসি ও সানাইয়ের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শুনতে পেল—ওরা যেন বলছে—'দুম্বা ছাগল ঠ্যাং ঠ্যাং—উঁহু—হুঁ—উ—উ—।'

এখন আবার কী রে বাপু? পুজোর তো এখনও চারদিন বাকী। কিন্তু এ কী? সে যে দক্ষিণ দিকে চলেছে। তা' হোক রাতখানা ঐখানে কোথাও কাটিয়ে সকালে পশ্চিমের পথ ধরবে।

সে গাঁয়ে ঢুকে খান কয়েক বাড়ি ছাড়িয়েই দেখে সামনে একখানা বাড়ির বাইরের উঠোনে মস্ত সামিয়ানা খাটানো। তার নিচে লোকজন চলা-ফেরা করছে; আর, তা'র এধারে আমতলায় চাটাইয়ে বসে ঢুলিরা বাজাচ্ছে। আর একটু এগোতেই গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার গন্ধ নাকে এলো। ভোম্বোল একজনকে জিগ্যেস্ করলে,—'কী হচ্ছে গো?'

লোকটি সেখান থেকে খেয়ে ফিরছিল। তা'র বাঁহাতে পান ও এক গেলাস পান্তুয়া; ডান হাত এঁটো—বাড়ি গিয়ে ধোবে; পেটা ভূষির বস্তার মতো। লোকটা বললে,—'রায়মশাইয়ের নাতির অন্নপেরাশন। যাও—যাও—ছেলেরা সব বসেছে—'

ভোম্বোলের খাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে সে কী ক'রে খাবে? তবু সে এক পা এক পা করে এগিয়ে সামিয়ানার তলায় গিয়ে দাঁড়াতেই তা'র পাশ থেকে কে যেন ব'লে উঠলেন,—'আরে ছোঁড়া! তুই এখানে দাঁড়িয়ে কেন —যা—যা। আচ্ছা, চল্ আমার সঙ্গে—'

ভোম্বোল ফিরে দেখে, মোটা-সোটা, ফর্সা, হাসি-হাসি মুখ একজন লোক! তাঁর মাথায় মস্ত টাক—টাকটা চক্‌চক্ করছে—হাতে নতুন ডাবা-হুঁকো, পায়ে বোলে লাগানো খড়ম। তিনি বললেন,—'ওরে নরহরি! এই ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দে। অন্নপ্রাশনে ছেলেদেরই পেট ভরে আগে খাওয়াতে হয়। কিন্তু তোমরা তো তা করছো না—'বলতে বলতে তিনি খট্ খট্ ক'রে দু'পা এগিয়ে গেলেন।

নরহরি বললে,—'আজ্ঞে—হাঁ—এই যে—মানে সব এক সঙ্গে ব'সে গেল কিনা, তাই জায়গার একটু টান পড়লো। চলো খোকা—'বলে নরহরি ভোম্বোলের হাত ধ'রে নিয়ে চললো। যেতে যেতে একটা চাকরকে বললে,—বেটা, শিগ্‌গির যা—কর্তার কলকেয় আগুন নেই—।'

চাকরটা ছুটলো। ভোম্বোলের মনে হলো উনিই রায়মশাই।

॥ বারো ॥

ভোজ

গায়ে জামা নেই, কাপড় ময়লা, খালি পা, নিমন্ত্রণ-বাড়ির লোকদের মাঝে যেতে ভোম্বোলের বড় লজ্জা করতে লাগলো। সে একবার ভাবলে

'ফিরে যাই।' কিন্তু নরহরি ততক্ষণে টানতে টানতে তাকে একেবারে খাবার জায়গায় এনেছে। জায়গাটা বাড়ির ভেতরের মস্ত উঠোন! ওপরে লাল সামিয়ানা ; চারধারে বড় বড় টিনের ঘর। ঘরগুলোর দেয়াল মাটির, মেঝে পাকা। ওধারে একখানা দালান। দালানটারই পাশে ভিয়েন হচ্ছে।

খাবারের জায়গায় একদিকে ছেলের আর একদিকে বড়র দল। ছেলের মহা হট্টগোল বাধিয়েছে। পাকা ফলার। তখন লুচি দেওয়া হচ্ছিল। সকলেই হাত বাড়িয়ে বলছে,—'আমায় আর একখানা।' যে লোকটি লুচি দিচ্ছে, সে লুচির ঝুড়িটা মাথার ওপর তুলে বলছে,—'আগে সব ঠিক হয়ে বোস্। খেতে পারলে একখানার জায়গায় দশখানা পাবি। ভারী তো সব খানেওলা! কেউ খাবি দেড়খানা ; কেউ খাবি দু'খানা। কেউবা আঁড়াইখানা খেয়েই কোমরের কষি খুলবি। বোস্—বোস্।'

একেবারে সকলের শেষে তখনও একটু জায়গা ছিল! সেখানে এক-জন বসতে পারে। দালানটার বারান্দায় কুশাসন, কলার পাতা ও মাটির গেলাস গাদা করা ছিল। নরহরি সেখান থেকে একখানা কুশাসন, খান দুই পাতা ও একটা গেলাস এনে ভোম্বোলের জায়গা করে দিয়ে বললে,—'বোস। তোমার নামটা কী বল তো!'

ভোম্বোল বললে,—'ভূপেন্দ্র নাথ চাকী।'

—'বটে! বোস।'

ছেলেগুলোর পোশাকের দিকে তাকিয়ে নিজের পোশাকের লজ্জা ভোম্বোলের মন থেকে চলে গেল! সে দেখলে, অর্ধেক ছেলের গায়েই জামা নেই, কাপড় আধময়লা। তাদের চেহারা দেখলেই মনে হয়, বুনো।

ভোম্বোল ব'সে পড়লো। তা'র পাশের ছেলেটা ভোম্বোলের দিকে একবার তাকিয়ে তা'র পাশের ছেলেটার কানে কানে কী যেন বললে। তারপর দুজনেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। ভোম্বোল একবার তার সামনে ও পাশের ছেলে দুটোর দিকে তাকালো। তারপর তাদের দিকে আর মনোযোগ দিলে না। কেননা তখন লুচি, শাকভাজা, বেগুনভাজা ও কুমড়োর ছোঁকা পাতে পড়ে গেছে ;—মুড়িঘন্ট আসে আসে, তার নাম শোনা যাচ্ছে।

ভোম্বোলের তখন খুব খিদে থাকলেও ঠিক করলে ওসব বাজে খাবার

খেয়ে পেট ভরাবে না। একেবারে শেষের দিকে চালাবে। সে মাত্র খান দুই লুচি খেলো, মাছটা বাদ দিলে না। রুই মাছ, রান্নাটাও হয়েছে মাংসের মতো। মাছটাও টাট্‌কা। রায়মশাইয়ের শীতলপুর মৌজা থেকে এসেছে। মাছের পরই এলো চাট্‌নি; তারপরই দই। ভোম্বোল দই তেমন ভালবাসে না। দই খেতে খেতেই এলো বোঁদে।

ভোম্বোলের পাশের ছেলেটা কোমরের কষি খুলে দিলে। তা'র সামনের সারির একটা ছোট ছেলে উঠে দাঁড়াতেই তার কোমর থেকে কাপড় খুলে গেল। ছেলেটার পেট গণেশের পেটের মতো ফুলে উঠেছে। সে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হাত চাট্‌তে লাগলো। বোধহয় ওর বাবাকে খুঁজছে; বলবে—'আর খেতে পারছি নে।'

বোকা! একদম বোকা! নিমন্ত্রণ খাওয়ার মজা তো চাট্‌নির পর থেকেই। ভোম্বোলের পাতে এক খাব্‌লা বোঁদে পড়লো। বোঁদেগুলো যেন এক একটা রসেভরা আঙুর। বোঁদেওলার পিছু পিছু আস্‌ছে ক্ষীরের হাঁড়ি। এইবার মজা! ছেলেরা হৈ-হৈ করে উঠলো,—'ক্ষীর—ক্ষীর।' হাঁড়িটার মাথায় মাথায় ক্ষীর।

ভোম্বোল বসেছিল একেবারে একধারে—সেদিক থেকে ফারস্‌টা। তা'র পাত থেকেই দেওয়া শুরু হলো। জমাট ক্ষীর, লাল রং, মিষ্টি গন্ধ। লোকটি খুরি দিয়ে ক্ষীরের মাথা ভাঙতে ভাঙতে ভোম্বোলের দিকে একবার তাকালো। ভোম্বোলকে চেনে না। তবু ভরা খুরিটার সব ক্ষীর ভোম্বোলের পাতে ঝাঁকি দিয়ে ঢেলে দিলে। ভোম্বোল ক্ষীর-বোঁদে এক সঙ্গে মেখে খেতে লাগলো। দেখতে দেখতে পাত খালি। ক্ষীরের হাঁড়ি আবার এলো, কিন্তু বোঁদের থালা নেই। না থাক্‌, সে লুচি দিয়েই ক্ষীর খেতে লাগলো। ক্ষীরওলা তার খাওয়া দেখে বললে—'বাঃ ভাই! আর দেবো?'

ভোম্বোল ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললে,—'দিন।'

কিন্তু হাঁড়ি তখন খালি। লোকটা হাঁড়ির গা ও তলা চাঁছলো। তাতে যা উঠলো, সামান্য। তাই ভোম্বোলের পাতে দিতে দিতে বললে,— 'আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।' কিন্তু তারপর কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা এসে গেল, সে ফিরে এলো না। যখন এলো, হাতে পান্তুয়ার হাঁড়ি।

ভোম্বোল পান্তুয়া খুব ভালবাসে। পান্তুয়াগুলো নাকি এসেছে মোল্লার হাট থেকে। লোকটি একসঙ্গে চারটে পান্তুয়া ভোম্বোলের পাতে দিয়ে বললে,—'খাও, ভাই।' পান্তুয়াগুলো বেশ বড় বড় আর ক্ষীরে

ভরা। তার ভেতরে দুটি-একটি এলাচদানা। খাবার সময় দাঁতের মাঝে পড়ে পুট্ ক'রে ভেঙে ক্ষীরের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে রায়-মশাই তামাক টানতে টানতে সেদিকে এলেন। আসতে আসতে সকলকে জিগ্যেস করছেন,—'তোর কী চাই রে?—তুই খাচ্ছিস নে কেন?—এই, তোর পেট ভরেছে?' বলতে বলতে তিনি ভোম্বোলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভোম্বোল তখন শেষ পান্তুয়াটি মুখে পুরেছে; তার গাল দুটো ফুলে উঠেছে।

রায়মশাই বললেন;—'এই ছেলেটি তো বেশ খায়। এই দ্বিজপদ! ওহে শুনছো? হাঁড়ি নিয়ে এদিকে এস।'

দ্বিজপদ রায়মশাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াতেই রায়মশাই ভোম্বোলকে দেখিয়ে বললেন—'দাও ঐ পাতে।'

লোকটি হাঁড়ি থেকে একজোড়া পান্তুয়া তুলে ভোম্বোলের পাতে দিলে। দেখতে দেখতে সে দুটো উড়ে গেল।

রায়মশাই হাসলেন। দ্বিজপদকে বললেন,—'তোমার কম্ম নয়।' বলে নিজেই হাঁড়ি থেকে গোটা ছয়েক পান্তুয়া তুলে ভোম্বালের পাতে দিয়ে বললেন,—'পেট ভরে খা। তোরা, ছেলেরা, খুশী হ'লে আমার নবদাদুর কল্যাণ হবে।' বলতে বলতে তিনি খড়ম পায়ে খট্ খট্ করে এগিয়ে গেলেন।

ভোম্বোল পান্তুয়াগুলো খেয়ে, জলের গেলাসটি এক নিঃশ্বাসে খালি ক'রে দিলে। তারপর বা হাতে পান নিয়ে সকলের সঙ্গে খিড়কির পুকুরে গেল হাত ধুতে।

পুকুরে হাত ধুতে ধুতে শুনলে, সন্ধ্যায় শশী বাগ্দীর যাত্রা হ'বে। সকালে তিন গরুর গাড়ি বাক্স-সিন্দুক ভরা সাজ-পোশাক এসেছে। পালা হ'বে, 'কংসবধ।' দুপুরেই হ'তো; যাত্রা-পার্টির খাওয়া হয় নি, তাই সময় বদলে গেছে।

যাত্রার নাম শুনে ভোম্বোলের বড় আনন্দ হলো। কংসবধ পালাটা ভাল; যুদ্ধ আছে। 'ম্যাড্সিনও' যেন একটা আছে। সে যুদ্ধের বাজনাটা একবার মনে মনে আউড়ে নিলে,—'ঘাজাঘাঁই—ধপড় ধপড়—ঘাজা ঘাঁই।'

পল্লীগ্রামের ভোজ, বসতে দুপুর গড়ায়, উঠতে সন্ধ্যা। যাত্রার আর কতই বা দেরি? সন্ধ্যা তো লাগলো ব'লে। দিনের আলো নিভে যাচ্ছে; গাছের তলা অন্ধকার হয়ে আসছে। সে পুকুর-পাড় ঘুরে ধানের গোলার

পাশ দিয়ে, বার বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ালো। আসবার সময় দেখলো, গোয়ালের ওধারে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তা'র একপাশ জুড়ে একসার ছেলে-বুড়ো বসে খাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ উবু হয়ে বসেছে। ওরাই বোধহয় যাত্রার দলের লোক। অনেকে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়া দেখছে। স্বয়ং রায়মশাই তদারক করছেন।

কিন্তু ভোম্বোল বা'র-বাড়িতে এসে দেখে কোথায় কী? যাত্রাগানের কোন লক্ষণই নেই। কেবল সামিয়ানার তলায় খানিকটা জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘেরা। হয়তো ঐটেই আসর হবে। সে সামিয়ানার বাইরে এ-দিক ও-দিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো। একবার সাজ-ঘরের দিকে গেল। সেখানে খুব ভীড়। ছেলে-বুড়ো দাঁড়িয়ে দেখছে, হট্টগোল করছে। ঐ যে তীর-ধনুক, তলোয়ার, অয়েলক্লথমোড়া গদা, টিনের বল্লম দেখা যাচ্ছে।

সেখান থেকে সরে এসে ভোম্বোল এ-ধার, ও-ধার ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলে, কয়েকটা ছেলে কলাপাতার বাঁশি তৈরি করে বাজাচ্ছে —'ফুঁককু ফুঁককু ফুঁ—উ—উ—।'

হঠাৎ তাদের মধ্যে দুটো ছেলের কলার পাতা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল। প্রথমে জোর কথা কাটাকাটি। তাই থেকে হাতাহাতি শুরু হলো। দু'জনে জড়াজড়ি ক'রে মাটিতে প'ড়ে গেল। পড়েই গড়াগড়ি দিতে লাগলো। গড়াতে গড়াতে দু'জনেই এ ওর বুকের ওপর উঠে বসবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো।

অন্য ছেলেরা তাদের দু'জনকে ছাড়িয়ে দেওয়া দূরের কথা চারধারে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে! কেউ কেউ আবার বলছে,—'নারদ—নারদ খ্যাংরাকাঠি, লেগে যা নারদ ঝটাপাটি!'

ভোম্বোল ছুটে গিয়ে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিলে, আর, অমনি ও-দিক থেকে ঢোলক বেজে উঠলো,—'গদা ঘাঁই—ধপড়্—ধপড়্—গদা ঘাঁই।' সকলে দুড় দুড় করে সেদিকে ছুটলো। যাত্রা বুঝি শুরু হয়ে গেছে।

ভোম্বোল গিয়ে দেখলে, যাত্রা তখনও শুরু হয়নি, কেবল আসর বসেছে। চারধারে গোলমাল, হুড়োহুড়ি। সকলেই আগে বসতে চায়। ঘেরা জায়গাটার বাইরে ছেলেরা কেউ কেউ বসে গেছে।

একজন ফরসাগোছের বাবু গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, মাথায় লম্বা টেড়ি, মুখে সিগ্‌রেট, আঙুলে আংটি, হাতে ছড়ি, বড়দের বলছেন,— 'এই, ছেলেদের আগে বসতে দাও।'

ভোম্বোল তাদের মাঝ দিয়ে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে বস্‌লো। তারপর

একটু একটু করে এগোতে এগোতে একেবারে বেড়ার ধারে হাজির। যাত্রার বাজিয়েরা তখন হারমোনিয়াম, বেহালা, ঢোলক, বাঁয়া-তবলা নিয়ে টুং টুং, পোঁ পোঁ, ঠক্ ঠক্ করছে। কেউ কেউ তামাক খাচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে। বাজিয়েদের তোড়জোড়ের আর শেষ নেই। কখন শুরু হবে রে ? বেজায় গরম লাগছে যে !

হঠাৎ কন্‌সারট বেজে উঠলো। ঢোলকের বোলগুলো যেন বুকের মধ্যে গিয়ে ঘা মারতে লাগলো—'ধুদ্ ধাক্, ধুদ্ ধাক্, ধপড়্ ধপড়্।'

॥ তেরো ॥
যাত্রা

কন্‌সারট পুরোদমে বেজেই চলেছে। ঢোলক-বাজনদার ঢোলকের ওপর ঝুঁকে পড়ে দু'হাতে ঢোলক থাব্‌ড়াচ্ছে। তা'র চোখ-মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, লোকটা আর বাজাতে পারছে না, হাত দুখানা ভাঙো-ভাঙো। শ্রোতারাও সকলে বিরক্ত হয়ে উঠলো। প্রথমে বেশ চুপচাপ ছিল। কন্‌সারটের ঠেলায় সকলে হট্টগোল শুরু করে দিলে। তার ওপর ভ্যাপ্‌সা গরম ও বিড়ি-সিগরেটের ধোঁয়ায় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। হঠাৎ কন্‌সারট থেমে গেল।

চারধারে চাপা গোলমাল। এইবার বোধ হয়, 'প্লেয়াররা' আসবে। ভোম্বোল 'প্লেয়ারা' আসবার পথের ভিড়ের দিকে তাকায়, যদি রাজার মুকুটের পালক, কী, তপস্বীর দাড়ি ও জটা দেখা যায়। একটা ছেলে বললে,—'ঐ যে নারদ আসছে।'

ছেলেরা সেদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। একজন জিগ্যেস করলে,—'কৈ রে ?'

—'ঐ যে শাদা দাড়ি ! মাথায় পাকাচুলের চুড়ো—'

—'যাঃ ! ও তো নিতাইয়ের পিসে—উদ্ধব হালাদার।'

ছেলেরা খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠলো। তারপর 'এই আসে, এই আসে' ক'রে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে গেল। আসরের দক্ষিণ দিকে ফরাস ও বেঞ্চির ওপর গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা বসেছেন। এবার শাদা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে রায়মশাই এসে তাদের মধ্যে বসলেন। আবার হুংকার দিয়ে কন্‌সারট বেজে উঠলো। ভোম্বোলের বাঁ ধারে কয়েকটা ধাড়ি ছেলে বসেছিল। তাদের একজন বললে,—'এইবার শুরু হ'বে।'

আর একজন জিগ্যেস করলে,—'কী করে বুঝলি ?'

—'রায়মশাই এসে বসলেন যে।'

তা'র কথাই ঠিক হ'লো। এবার কন্‌সার্ট আর বেশিক্ষণ বাজলো না। থামতে না থামতেই ভিড়ের মাঝ থেকে সার বেঁধে বেরিয়ে এলো। 'প্লেয়াররা'—নারদ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী আরও যেন কে—বোধহয় দৌবারিক।

তাদের দেখে গোলমাল আরও বেড়ে উঠলো। অধিকারী শশী বাগ্‌দী বসেছিল বেড়ার মধ্যে ভোম্বোলের সামনে। সে পাশের একজনকে বললে,—'চিয়ার চেয়ে নাও, বিষ্ণু বসবে।'

লোকটা গুঁড়ি মেরে হাত কয়েক এগিয়ে গেল। তারপর তিন হাত-পায়ে ভর দিয়ে ডান হাতখানা তুলে রায়মশাইয়ের সামনে দু-আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে বললে,—'কর্তা, চিয়ার—'

অমনি একজন বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠলো,—'চেয়ার—এই, এক-খানা চেয়ার—বিষ্টু বসবে—'

অধিকারী বললে,—'আর লক্ষ্মী কী দাঁড়িয়ে থাকবে, বাবু?'

—'ওহে, দু'খানা—দু'খানা চেয়ার।'

সকলের মাথার ওপর দিয়ে হাতে হাতে দুখানা চেয়ার চলে এলো। একখানার বসবার জায়গায় ছিল বেতের ছাউনী। বিষ্ণু ও লক্ষ্মী বসলো। সঙ্গে সঙ্গে নারদ অ্যাকটিং আরম্ভ করলে। কিন্তু চারধারে গোলমালে কিছুই শোনা যায় না। কেবল দেখা যায়—নারদের একখানা হাত ও দাড়ি নড়ছে।

সেই বাজখাঁই গলাটি চীৎকার ক'রে উঠলো,—'চুপ্—চুপ্—বড় গোল হচ্ছে—'

অমনি চারধার থেকে চীৎকার আরম্ভ হলো,—'চুপ্—চুপ্—বড় গোল হচ্ছে—!'

মিনিট দুই ধরে ধমকা-ধমকির পর গোলমাল থামলো। তবু নারদের গলা শোনা যায় না, কেবল দাড়ি নড়ে। গলাটা একেবারে বসে গেছে। সে ধরা গলায় বিষ্ণুকে বললে,—'প্রভো—'

একজন শ্রোতা সেই কোণের দিক থেকে বলে উঠলো,—'জোরে।' আর একজন এই কোণ থেকে বললে,—'লাউডার, প্লীজ্।'

অধিকারী বিরক্তির সঙ্গে নারদকে বললে,—'বেটাকে বারণ করলেম, দুই খাস্ নে। তোর গলা ধরে গেছে। এখন সাঁ—সাঁ করছে—'

লক্ষ্মী বসেছিল বেতের ছাউনি দেওয়া চেয়ারে। সে মিনিট দুই বসেই উস্‌খুস করতে লাগলো। একবার একখানা পা একটু তুলকে

ফেললে। ভোম্বোল বুঝলো, লক্ষ্মীকে ছারপোকা কামড়াচ্ছে। তখন নারদ পুরোদমে অ্যাকটিং করছে। লক্ষ্মীর স্থির হয়ে বসে থাকা দায় হলো। ছারপোকাগুলো কতকাল যে মানুষের রক্ত খায়নি! লক্ষ্মী বিষ্ণুর দিকে হেলে বললে,—'ছারপোকার কামড়ে পা দুখানা কাঁঠালের মতো হয়ে উঠলো যে! আর বসতে পারছি নে।'

বিষ্ণু বললে,—'উহুঁ হুঁ—বোসে থাক্।'

ভোম্বোল বসেছিল তাদের কাছেই। দু'জনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বললেও তা'র কানে আসছিল সব। লক্ষ্মী বললে,—'তুই বসে দেখ্ না, ঠেলা কেমন!'

—'তবে উঠে দাঁড়া।'

বিষ্ণু আর বলতে পারলে না। এবার তার 'অ্যাকটিং'। লক্ষ্মী মুখ কুঁচ্কে কোন রকমে ব'সে রইলো। সে মাঝে মাঝে বিড় বিড় ক'রে কী বকছে। ভোম্বোলের ভারি মজা লাগছে। শেষে তার 'অ্যাকটিংয়ের পালা এলো। সে ব'সে ব'সেই দু'চার কথা বলে চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। । তারপর সকলে চলে গেল।

এবার আর এক 'সিন'। 'প্লেয়ারদের' আসা-যাওয়াব পথের দিকে ভোম্বোল তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ভীড়ের একধারে ভয়ানক ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। চটাচট্ চড়-চাপড় চলছে। ভোম্বোল শুনলে' হাটের লোকেরা ফিরে এসেছে। তাদের মধ্যে আট-দশজন গোয়ালা আছে। তারা বসার জায়গা নিয়ে বাঁক হাতে ক্ষেপে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রায়মশাইয়ের বাড়ি বলেই রক্ষা। বারোয়ারিতলা হ'লে এতক্ষণে সামিয়ানায় আগুন ধ'রে যেতো। রায়মশাইয়ের লোকজনেরা সকলকে থামিয়ে দিলে।

সব চুপ্চাপ্, অ্যাকটিং শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পালাটা বেশ জমে উঠলো।

একটা 'সিন' এলো—'রাজা কংসের কারাগার'। দেবকী ও বসুদেব বন্দী হয়ে পড়ে আছেন। তাঁদের বুকে মস্ত মস্ত দু'খানা কালো পাথর চাপানো। তাঁরা শুয়ে শুয়েই অ্যাকটিং করছেন। গলা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু তাঁদের দেখা যাচ্ছে না! দু'জনকে দেখবার জন্যে ভোম্বোল ও আরও অনেকে হাঁটু গেড়ে বসে সারসের মতো গলা লম্বা করে দিলে। অমনি পিছনে যারা বসেছিল, তারা চীৎকার করে উঠলো,—'বোসে পড়ো —বোসে পড়ো—ও।' কিন্তু কে কা'র কথা শোনে? ঐ যে দেবকী আর বসুদেব শুয়ে। তাঁদের বুকে কালো পাথর। আগে ও দুটো সত্যিকারের

পাথর নয়, বেহালার বাক্স। দেবকী আর বসুদেবের যা চেহারা! সত্যিকারের পাথর হ'লে, দুটিতে এতক্ষণে চিঁড়ের মতো চেপ্‌টে পড়ে থাকতেন। কংসের ওপর ভোম্বোলের খুব রাগ হলো। কী শয়তান! কত ছেলেকে মেরে ফেলেছিল!

অধিকারী তামাক টানতে টানতে পাশের লোকটার পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বললে,—'ও গণেশ, জুড়ী তোল—'

গণেশের ইসারায় বেজে উঠলো. 'কন্‌সারট'; আর চারধার থেকে উকিল-মোকতারের মতো চোগা-চাপকান পরা জুড়ীর দল সরু-মোটা স্বরে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে উঠে দাঁড়ালো। তাদের পিছু পিছু উঠলো একপাল কালো কালো, রোগা রোগা ছোঁড়া। ছোঁড়াগুলোর মাথায় কালো পাথরের খোরার মতো জরিদার টুপি, গায়ে সলমা-চুমকি বসানো, লাল-কালো সাটিনের ঢিলে জামা। জামাগুলোর হাতা লম্বা, আঙুল ছাড়িয়ে ঝুলে পড়েছে। ছোঁড়াগুলো লম্বা হাতা ঝুলিয়ে গাইতে লাগলো—

'ওরে রাজা কংস,
হবি রে নির্বংশ।
তোর যে কৃতান্ত
জন্মিল ধরায়—এ—এ—এ—।

গায়কদলের মাঝে চোগা-চাপকান পরা দু'জন বেহালাদার—লম্বা, রোগা, একমুখ গোঁফ, যেন দুটো পেশকার দাঁড়িয়ে বেহালায় ঘাড় কাৎ ক'রে চোখ বুজে ছড় টানছে। আর বেহালা বাজছে—'ক্যাঁ-কোঁ, কোঁ-কোঁ কংক; কোঁ-কোঁ, কোঁ-কোঁ—কংক—হুঁম্—'

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন বাজখাঁই গলায় চীৎকার করে উঠলো—'ঝড় আসছে—ঝড় আসছে—সামাল সামাল—!'

সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড সামিয়ানাখানা ঝুলন্ত বাতিগুলো সমেত দড়ি-টানা ছিঁড়ে আকাশে উড়ে যাবার মতো হলো। আলোগুলোর শিখা চিমনির মধ্যে প্রচুর ভুষো ছেড়ে নেচে উঠলো। আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকালো; মেঘ ডাকলো, কড়্ কড়্, কড়াৎ, যেন আকাশের দরজা খুলে ফেললো।

ঐ এলো—ঐ এলো। ঠাণ্ডা বাতাসের একটা দমকা এসে গায়ে লাগলো। সেই ভ্যাপ্‌সা গরমে ভোম্বোলের ভারি আরাম বোধ হলো।

দেখতে দেখতে যাত্রার আসর ফাঁকা। সামিয়ানা হুম্ হাম্ শব্দে

লাফাচ্ছে, আলোগুলো গেছে নিভে। নামলো বৃষ্টি। ভোম্বোল ততক্ষণে রায়মশাইয়ের কাছারি-ঘরের বারান্দায় উঠে পড়েছে।

রাতে সে ফরাশের একধারে একটু শোবার জায়গা পেল। ঘুমও হলো বেশ।

॥ চোদ্দ ॥

পদ্মদিদির শ্বশুরবাড়ি

পরদিন—

তখন ঘরের চালে কাক ডাকছে, অনেকে ফরাসের ওপর উঠে বসেছে। কেউ কেউ শুয়ে শুয়েই হাই তুল্‌তে তুল্‌তে মুখে তুড়ি দিচ্ছে। ভোম্বোল উঠে বসলো।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখে, সব পরিষ্কার, কিন্তু ভিজে ভিজে, সারা আকাশে কোদাল কোদাল মেঘ, যেন মাটি ফেলা। সে বেরিয়ে পড়লো।

আগের দিন যে পথে এসেছিল আজও সে পথ ধরে ফিরে চললো। গাঁয়ের শেষে পৌঁছতেই এক চাষীর সঙ্গে তা'র দেখা। ভোম্বোল তাকে জিগ্যেস করলে :—'এ পথ দিয়ে রেল-রাস্তায় যাওয়া যাবে?'

চাষী বললে,—'রেলগাড়ি? ইদিকে রেলের গাড়ি কোথায়?'

—'তবে কোথায়?'

—'সেই শালুকডাঙায়। ইদিকে রেল-টেল চলে না।'

—'তবে কাল আমায় যে একজন বললে, এইদিকে রেল-রাস্তা আছে।'

—'ইদিকে? হাঁ—হাঁ। তা সে কান্তিনগরের ওধার দিয়ে। তুমি যাবা কোথা?

—'রেলরাস্তা—'

—'সেখানে কী আছে? সেই রেলের গাড়িতে চাপবা নাকি?'

ভোম্বোল বললে,—'হুঁ।'

—'সিদিক দিয়ে তো কেবল মালের গাড়ি চলে। তুমি মালের গাড়ি চাপবা?' তারপর বললে—'ছোঁড়াটা কল্লা।'

ভোম্বোল চুপ করে রইলো।

লোকটা বললে—'কার ছাওয়াল তুই? রাইমশাইয়ের বাড়ি এয়েছিলি বুঝি? যা ঘরে যা। কুটুমবাড়ি এয়েও কল্লামী? যা—'

ভোম্বোল দেখলে গতিক ভাল নয়। না গেলে হয়তো চাষার মার খেতে হবে। সে গাঁয়ে ফিরে গেল। তারপর গাঁয়ের ও-ধারে গিয়ে দেখে, একটা পাকা সড়ক দক্ষিণ-পশ্চিমমুখো চলে গেছে, যেন একটি উঁচু বাঁধ। ওর সে-ই শেষে একখানা গাঁ দেখা যায় নীল ধোঁয়ার মতো। ওরই নাম বোধ হয় কান্তিনগর। সড়ক ধরে তখন সার বেঁধে খান চারেক গরুর গাড়ি চলেছিল। গাড়িগুলো পাট বোঝাই।

একখানা গাড়ির গাঁঠের ওপর জন দুই লোক বসে আছে। তাদের একজন কানে হাত দিয়ে গলা ছেড়ে গান ধরেছে—'সু—উখের কথা—আ—আ—র বোলো—না—আ—আ—।'

ভোম্বোল গাড়িগুলোর পিছন পিছন চললো। সেও যদি একখানা গাড়ির গাঁঠের মাথায় চ'ড়ে ব'সতে পারতো! কিন্তু গাড়িগুলো আধ-ক্রোশটাক পথ ভেঙেই পুবের সড়ক ধরলো। ওদিকে কোন্ গাঁ কে জানে।

ভোম্বোল সেই আগের সড়ক ধরে চলতে লাগলো। ক্রোশ দেড়েক পরেই আবার এক খাল। খালটা গভীর ও কিছু চওড়া। তার ও পারে গাঁ বেশি দূর নয়।

খালের কোলে কোলে কাশ ফুল ফুটেছে; বাতাসে নুয়ে পড়ছে। তারপর বিশাল ধানক্ষেত। তিনটে মোষ খালের জলে গা ডুবিয়ে কেবল মাথা বার করে চোখ বুজে যেন মহা আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ছে—ফোঁস—ফোঁস। তার এধারে রাখাল ছেলেরা হৈ চৈ করতে করতে স্নান করছে, সাঁতার কাটছে। কেউ কেউ পরণের কাপড়খানা খুলে তাই দিয়ে মাছ ধরছে। তার একটু এধারে বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর নিচে জল কম। চাষী-বউরা জলে গা ডুবিয়ে বসে গা রগড়াচ্ছে, কেউ কেউ চোখ বুজে সাজিমাটি দিয়ে মাথা ঘষছে। কেউ বা এক রাশ ছেঁড়া ময়লা কাঁথা ও কাপড় নিয়ে কুলে বসে কাচছে, আর উঁচু গলায় ঘর-সংসারের গল্প করছে। সাঁকোর বাঁশের মাথায় একটা মাছরাঙা পাখি বসে আছে। তার কোনদিকে চোখ নেই; ভয়ানক গম্ভীর! বোধহয় মনে মনে একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর ঠিক করছে। হঠাৎ সে সোজা ঝপ করে খালের জলে পড়েই একটা ছোট মাছকে ঠোঁটে চেপে ধ'রে আবার উড়ে এসে বাঁশের মাথায় বসলো। তারপর মাছটাকে গিলে ফেলে আগের মতোই চিন্তিত হয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ভোম্বোল সাঁকোয় উঠে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো। লম্বা খাল—

পুব-পশ্চিমে বেঁকে বেছে। জলে স্রোত আছে। দুধারে ক্ষেত। এক জায়গায় বেশ বড় গোছের একটা দোয়াড় পাতা। তার বেড়া ঠেলে কুল কুলু করে জল বেরিয়ে আসছে। ঐ খরা জাল দেখা যায়। জালখানা উঠলো ;—ওর গায়ে কতকগুলো ছোট ছোট মাছ ধড়ফড় করছে যেন রুপোর টুক্‌রো। মাছগুলো বোধহয় খয়রা।

গাঁয়ের দিক থেকে একটা লোক ছুটতে ছুটতে আসছে। তার ছোটার তালে তালে শব্দ হচ্ছে—ঝুমুর-ঝুমুর ঝুমুর-ঝুমুর। কাছাকাছি এলে ভোম্বোল দেখলে, লোকটা 'রানার'। পিঠে তার ডাকের থলি, কোমরে চাপরাশ, চাপরাশের মাঝখানে পেতলের তক্তিকে বড় বড় ইংরেজি অক্ষরে কী লেখা। হাতে সে ধরে আছে ভোঁতা বল্লম। বল্লমের গলায় একজোড়া ঘুন্টি বাঁধা, পিছনে ডাকের থলি। 'গভরনমেন্টের, ডাক যাচ্ছে। ওকে পথ ছেড়ে দিতেই হবে। ওরা নাকি গণ্ডারের মতো সোজা চলে। পথ না ছাড়লে পেটে সোজা বল্লম ঢুকিয়ে দেয়। ভোম্বোল তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হয়ে নেমে দাঁড়ালো।

লোকটা একেবারে কাছে আসতেই তার সঙ্গে ভোম্বোলের কথা বলতে ইচ্ছে হলো। ভোম্বোল দেখাতে চায়, সে রানারদের বিষয় সব জানে। তাদের দেখে একটুও ভয় পায় না। সে 'রানারকে জিগ্যেস করলে'—এ গাঁয়ের নাম কী গো ? কান্তিনগর ?'

লোকটির বুকের ছাতিখানা বেশ চওড়া। সারা গা ঘামে ভিজে। সে বুকখানা আর একটু চিতিয়ে সাঁকোয় উঠ্‌তে উঠ্‌তে গম্ভীর মুখে বললে—'চিটে ঝুড়ি।

—'চিটেঝুড়ি ? সে কী ? তবে কান্তিনগর কদ্দূর ? কান্তিনগর কোথায় ?'

লোকটি তখন এগিয়ে গেছে। তবু জবাব দিলে—'ইয়ের পর।' বলেই তর্ তর্ করে সাঁকো পার হতে লাগলো। ওপারে গিয়ে সড়ক ধরে আবার ছুট দিলে—ঝুমুর ঝুমুর, ঝুমুর-ঝুমুর শব্দটা ধানক্ষেতে ছড়িয়ে ক্রমে মিলিয়ে গেল। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকতে ঢুকতে একবার পিছন ফিরে দেখলো। লোকটি সড়ক ধয়ে অ—নে—ক দূরে চলে গেছে। আর তাকে দেখা যায় না।

গাঁয়ে ঢোকবার মুখেই আমতলায় এক গৃহস্থ বাড়ি। তার বার দিককার ঘরের ছেঁচ থেকে একখানা পুরনো সাইনবোড়্ড ঝুলছে। তাতে বাঙলায় লেখা—'চিটেঝুড়ি পোস্ট আফিস্।' না—লোকটি ঠিকই বলেছে। হঠাৎ

ভোম্বোলের মনে হলো, নামটা যেন চেনা। কিন্তু চিটেঝুড়ি কী? ভোম্বোল ঠিক মনে করতে পারছে না। তবু মনে হচ্ছে নামটা সে শুনেছে। রোদে হেঁটে এসে তার গলা শুকিয়ে গেছে। কোথাও যদি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল—

ভোম্বোল পোস্ট অফিসের উঁচু পাকা বারান্দায় উঠে ছোট জানলাটার ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলে। ঘরে কেউ নেই। খাতাপত্র, ময়দার কাই ও তামাকের গন্ধ একসঙ্গে মিশে জানলা দিয়ে এসে ভক্ করে তার নাকে লাগলো। সেখান থেকে সরে এসে সে একটু এদিক-ওদিক করে পথে নেমে আবার এগিয়ে চললো। খান পাঁচ-ছয় বাড়ি ছাড়িয়েই দেখলে বাঁ ধারে একটা পুকুরের এক কোণা। পুকুরটা একখানা বাড়ির পিছন দিকে। রাস্তা থেকে একটা সরু পায়ে চলা পথ গেছে সেদিকে। পথটা বোধহয় পাড়ার বউ-ঝিদের পায়ে পায়ে তৈরী হয়েছে। ভোম্বোল জল খাবার জন্যে সে পথে পুকুরের দিকে চললো।

ঝোপ-জঙ্গল ও কচুবনের মাঝ দিয়ে পুকুর-ধারে গিয়ে দেখে, ডানদিকে পরিষ্কার বাঁধানো ঘাট। পুকুরের চারধারে হেলেপড়া বা সিধে নারকোল গাছ! একটি বউ তখন ঘাটের পৈঠা দিয়ে নিচে নামছে। ভোম্বোল গিয়ে ঘাটের ওপর দাঁড়ালো।

বউটির মাথায় ঘোমটা; পরণে টকটকে লাল পাড় শাড়ি, কাঁধে একখানা লাল রঙের গামছা। জলে নামবার আগে মাথার ঘোমটা খুলে সে একবার পিছনে ঘাটের ওপর তাকাতেই ভোম্বোল চম্‌কে উঠলো— পদ্মদিদি! বউটিও অবাক। ডাগর চোখ দুটো কপালে তুলে বললে,— 'ভোম্বোল তুই এই বেশে এখানে?'

পদ্মদিদি নিধু চক্রবর্তী মশাইয়ের বড় মেয়ে; তা'র রানীদিদির বন্ধু। দুটিতে ভারী ভাব, চিটেঝুড়ি গাঁয়ে পদ্মদিদির শ্বশুরবাড়ি। এতক্ষণে ভোম্বোল গাঁখানা চিনতে পারলো। বললে,—'আমি চলে যাচ্চি।'

'কোথায় যাচ্ছিস্?' বলতে বলতে পদ্ম পৈঠা বেয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলো। তারপর বললে,—'গায়ে জামা নেই, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, মাথায় চুল রুক্ষ। একী চেহারা? এই বেশে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? বাড়ি থেকে পালিয়েছিল্ বুঝি?'

ভোম্বোল চুপ্ করে রইলো। পদ্মদিদি তার হাত চেপে ধরে বললে 'চল্, ভেতরে চল্।'

ভোম্বোল তেমনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

পদ্মদিদি বললে,—'লক্ষ্মী ভাইটি। চল্ ভেতরে।'

ভোম্বোলের চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো। সে কান্নাটা গিলে ফেলে বললে,—'আমি কিন্তু আর বাড়ি ফিরে যাব না।'

—'কোথায় যাবি?'

—'টাটানগর।'

—'টাটানগর? সেখানে কী—বেশ, তাই-ই যাস্। আজকের দিনটা দিদির বাড়ি থেকে যা'—বলে পদ্মদিদি ভোম্বোলকে টেনে নিয়ে চল্‌লো। ভোম্বোল চলতে লাগলো খুব অনিচ্ছায়।

ভেতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওধার থেকে কে এক বুড়ী জিগ্যেস করলেন,—'ও বউমা' কাকে টানতে টানতে আনছো?'

পদ্মদিদি উত্তর দিলে,—'হারাণকাকাকে জানেন তো?'

—'তা আর জানবো না?'

—'এ তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে।'

—'ও! সেই রানীর ভাই?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা', অমন বেশে কেনো—'

পদ্মদিদি ভোম্বোলের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে চোখ টিপলে। ভোম্বোল বুঝতে পারলে, উনি পদ্মদিদির শাশুড়ী। বুড়ী পদ্মদিদির মুখের দিকে তাকিয়েই যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। বললেন,—'তা বেশ—তা বেশ। ভাত তো হয়ে গেছে। পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসে দুটো খেয়ে নিক্'—বলে বুড়ী একখানা ছোট খড়ের ঘরের বারান্দায় উঠে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ওখানা বোধ হয় হবিষ্যির ঘর।

ভোম্বোল নেয়ে এসে কাপড় বদলে পেট ভরে খেলো। দুপুরে মাদুর পেতে পা ছড়িয়ে বসে, রোদে চুল এলিয়ে পদ্মদিদি ভোম্বোলের কাছ থেকে চক্রবর্তীবাড়ির অনেক খবর নিতে লাগলো। তারপর এক সময়ে জিগ্যেস করলে,—'তুই কী ক'রে টাটানগর যাবি?'

—'হেঁটে।'

—'পারবি?'

—'হুঁ।'

—'খুব বাহাদুর তো।' বলে দিদি মুখখানা অন্যদিকে ফেরালে।

ভোম্বোলের মনে হলো পদ্মদিদির শাদা কান দুটো রাঙা হয়ে গেছে, দিদি খিল্ খিল্ করে হাসছে। কিন্তু তার দিকে আবার মুখ ফেরাতেই দেখলে, তাতে হাসির কোন চিহ্ন নেই, সহজ মানুষ।

বিকেলে ভোম্বোল বললে,—'আমি আজই চলে যাবো।'

—'এই রাতে? পরশু পুজো। পুজোর কটা দিন দিদির বাড়ি থেকে যা—'

—'না।'

'—তবে কাল সকালেই যাস্।'

পদ্মদিদির বর বাড়ি ছিলেন না; সন্ধ্যায় ফিরলেন। ভোম্বোল সেই বিয়ের সময় তাঁকে দেখেছে। তখন ছিলেন রোগা, এখন মোটা-সোটা পালোয়ান গোছের চেহারা হয়েছে।

ভোম্বোলের পরিচয় পেয়ে ও পথচলার বৃত্তান্ত শুনে বললেন—'বটে! বাড়িতে সুবিধে হ'লো না, টাটানগরের পথে বেরিয়ে পড়েছো?'

—'হুঁ।'

—'আচ্ছা। তা'র ভাবনা কী? আমিও কাল কোলকাতার পথ ধরবো। তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দেবো।' লোকটির চোখ দুটো যেন হাসছে। চাউনিটা ভোম্বোলের ভালো লাগলো না; কথাগুলো কাঠ কাঠ।

রাতে তিনি ভোম্বোলকে পাশে নিয়ে খেতে খেতে বললেন,—'মাছখানা খেয়ে ফেল। টাটানগরের খাটুনি বড় কঠিন; গায়ে জোরের দরকার।'

পদ্মদিদিও ঘোমটার ভেতর থেকে একটু চাপা গলায় বললে,—'এই, খা!'

শাশুড়ী তখন বারান্দায় বসে মালা জপছেন।

ভোম্বোলের লজ্জা করতে লাগলো। সে কিছু কমই খেলো।

রাতে তার শোবার জায়গা হলো, পদ্মদিদির শাশুড়ীর ঘরে। তা'র বিছানা হলো একটা প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুকের ওপর। সিন্দুকটা সেকালের—একখানা চৌকি বললেই চলে। কিন্তু শুয়ে কিছুতেই তার চোখে ঘুম এলো না। কেবলই পদ্মদিদির বরের চোখ দুটো ও কথাবার্তা মনে পড়তে লাগলো। ভোরের দিকে মনে এলোমেলো ছবির সঙ্গে একটু ঘুম এলো বটে, কিন্তু বুড়ীর কাশির শব্দে ঘুম ছুটে গেল।

শুনতে পেল বাইরে কোথায় কাক ডাকছে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে খুব সন্তর্পণে দরজার খিল খুললো। তখন খুট্ ক'রে শব্দ

হলো। বুড়ীর ঘুম ভারী পাতলা। বুড়ী অমনি জিগ্যেস করলেন,—'কে?'

—'আমি।'

—'বাইরে যাবে?'

—'হুঁ' বলে ভোম্বোল উঠোনে নামলো। তখনও আবছা অন্ধকার আছে। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে রাস্তায় গিয়ে উঠলো।

॥ পনেরো ॥

কান্তিনগরে

বেশ বেলা উঠেছে। ভোম্বোল জোরে হাঁটছে। এক একবার পিছন ফিরে দেখছে, পদ্মদিদির বর ধাওয়া করেছেন কিনা।—না, কেউ নেই।

কিছুদুর গিয়ে আবার পিছন ফিরে দেখলে। ঐ যে দূরে একখানা বাইসিক্ল্ আসছে না? পদ্মদিদির বরেরও তো বাইসিক্ল্ দেখেছে। তিনি আসছেন কী?

ভোম্বোলের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো। কিন্তু লুকোবে কোথায়? দু'ধারে ক্ষেত। তার ধানগুলো কাটা হয়ে গেছে। পাটও নেই। কেবল ক্ষেতের ওপর ধান ও পাটের কাটা গোড়াগুলো একটু একটু বেরিয়ে আছে। খান কয়েক অখক্ষত দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ক্ষেতগুলো তার কাছ থেকে এত দূরে যে, সেখানে পৌঁছতে না-পৌঁছতেই বাইসিক্ল্ এসে পড়বে।

পথের ধারে একটা খেজুর গাছ রয়েছে। তার গোড়ায় চারধারে ভাঁট, কালকাশুন্দি, চারা শেওড়া ও ঘন কচুর ঝোপ। ভোম্বোল তাড়াতাড়ি ঝোপে ঢুকে পড়লো। ঝোপটা তার গায়ের ধাক্কায় দুলছে। ভোম্বোল দু'চারটে গাছকে দু'হাতে চেপে ধরে থামিয়ে দিলে। তবু তারা অবাধ্যের মতো মাথা দোলাতে লাগলো।

তারপর বোধহয়, মাত্র মিনিট তিনেক কাটলো। কিন্তু ভোম্বোলের মনে হলো সময়টা অনেকক্ষণ। তবুও বাইসিক্ল্ আসে না! এদিকে গা বেয়ে কাঠ-পিঁপড়ে উঠছে, কাঁধে একটা শুঁয়োপোকা পড়লো, একটা বুনো মাকড়শা তা'র সামনে তাড়াতাড়ি জালবোনা শুরু করে দিলে। পিঠে মশা কামড়াচ্ছে, পায়ের নিচে কেঁচো শুড়শুড়ি দিচ্ছে, আর তো বসা যায় না!

হঠাৎ খটাং সেঁা সেঁা শব্দ কানে এলো। তারপরই একখানা বাইসিক্ল

সাঁ করে চলে গেল। যে চালাচ্ছিল ভোম্বোল তাকে দেখতে পেল না, চিনতেও পারলো না। তবু সে কষ্ট সয়ে ঝোপে লুকিয়ে রইলো! মিনিট কতক কেটে গেলে বেরিয়ে এলো। সাইকিল্ যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে চেনবার চেষ্টা করলো, লোকটা কে? পথটা গেছে বাঁ দিকে বেঁকে। দুধারে বড় বড় গাছ। মোটা মোটা গুঁড়ির আড়ালে চলন্ত গাড়ির ওপর মানুষটিকে চেনা সহজ নয়। পদ্মদিদির বর কী?

ভোম্বোল আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো।

সামনে গাঁ। গাঁয়ে পৌছতে পৌঁছতেই বেলা গেল। এই গাঁয়ের নামই বোধহয় কান্তিনগর! মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ কানে আসছে। তাহলে এ গাঁয়েও পুজো হয়? বাড়ির জন্যে তার মন কেমন করে উঠলো। সে যদি এ সময়ে বাড়িতে থাকতো! তার ওপর সারাদিন পথ চলেছে; ক্ষিদের আগুনে পেট জ্বালা করছে। তবু সয়ে গেল। না—না, আর বাড়ি নয়। যত দূরেই হোক, একেবারে সেই টাটানগর।

গাঁয়ে ঢুকে দেখে, ছেলে-মেয়েরা নানা রঙের নতুন পোশাক পরে বোধ হয় ঠাকুর দেখতে চলেছে। ঐদিকে বোধহয় পুজো-মণ্ডপ। ভোম্বোল তাদের পিছন পিছন চললো।

ছেলে-মেয়েগুলোর সাজের কী বাহার! এদিকে গায়ের রঙ মিশ কালো, মাথার তেল কপাল ও রগ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তা'র ওপরই সিঁথে কাটা হয়েছে! দু'একজনের চুল আবার সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। ছেলেগুলোর গায়ে লাল, হলদে, বেগুনি রঙের সাটিনের কোট বা ছিটের কামিজ। কোট আর কামিজের হাতাগুলো বড়, ধুতির কোঁচা পেটের ওপর পোঁটলার মতো ঠেলে উঠেছে। সকলেরই পায়ে বাদামী রঙের গোড়-তোলা ফিতে বাঁধা জুতো। কারুর জুতো পায়ের চেয়ে বড়। খুলে যাবার ভয়ে সে পা ঘষটাতে ঘষটাতে চলেছে। কারুর জুতো ছোট। সে গোড়ালিতে কাগজ গুঁজে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় মুখ বেঁকিয়ে হাসছে; সঙ্গীদের দেখাচ্ছে, জুতো জোড়া ঠিকই হয়েছে—পায়ে লাগছে না। কেউ আবার উল্টো করে জুতো পরেছে।

মেয়েগুলোর নাকে নোলক, কানে মাকড়ি, গায়ে লাল, নীল, হলদে ঘাগরা; খালি পা। তারা তেল-জব্‌জবে চুলগুলোর অ্যালবার্ট কেটে, কেউ বেণী ঝুলিয়েছে, কেউ খোঁপা বেঁধেছে। কোন কোন মেয়ের পরনে রাঙা ডুরে—চারধারে ঘাঘরার মতো ফুল আছে। সকলের মুখেই হাসি।

ভোম্বোলেরও নতুন জামা-কাপড় পরতে ইচ্ছা হলো। বাড়ি থাকলে সেও আজ সাজগোছ ক'রে ঠাকুর দেখতে যেতো!

সামনেই একখানা আম-কাঁঠালের বাগান। গাছগুলোর গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে একটা মস্ত চণ্ডীমণ্ডপ যেন দেখা যাচ্ছে। তা'র সামনে লোকজন চলা-ফেরা করছে। বাগানের বাইরে দিয়ে পথ। তবুও বাগানের ভেতর দিয়ে কয়েকটা ছেলে-মেয়ে চললো চণ্ডীমণ্ডপের দিকে। ভোম্বোল চললো পথ দিয়ে। যেতে যেতে দেখলে, একখানা বাড়ির বাইরের দিকে একটি তিন-চার বছরের পেট মোটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বগলে একখানা ডুরে। মেয়েটা কী যেন হাতের মুঠো থেকে চেটে চেটে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাতাসা। ঐ যে কবজি থেকে রস গড়াচ্ছে। মেয়েটার সামনে হাত দুই তফাতে একটা শাদা-কালো রঙের কুকুর তার মুখের দিকে হ্যাংলার মতো তাকিয়ে জিভ বার করে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে মুখ চাটছে আর লেজ নাড়ছে।

ভোম্বোল কুকুরটাকে তাড়া দিলে। তাতে কুকুরটা লেজ নামালো মাত্র। কিন্তু মেয়েটা বাড়ির ভেতর দিলে ছুট্। ছুটোতে ছুটতে তা'র বগলের ডুরেখানার একটা আঁচল খুলে গিয়ে ধুলোয় লুটোতে লাগলো। ভোম্বোলের ভারি মজা বোধ হলো।

ভোম্বোল চণ্ডীমণ্ডপের সামনে গিয়ে দেখলে, অনেক লোক জড় হয়েছে। প্রতিমা সিংহাসনে উঠেছে। সে মনে মনে ঠিক করলে রাতখানা সেখানে কাটাবে। কিন্তু এখন যা ক্ষিদে। সে ঢাকীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় কর্মকর্তার ভুলে আর তার বরাতগুণে এক কোঁচড় মুড়ি-নারকোল জুটে গেল। সেই সঙ্গে পেয়ে গেল খান আষ্টেক বাতাসা! কর্তা বোধহয় ভাবলেন, ভোম্বোল বুঝি বাজনদারদের লোক—কাঁসি বাজায়। তা'দের মুড়ি-নারকোল দিতে দিতে ভোম্বোলকেও বললেন,—'কোঁচড় পাত্ ছোঁড়া।'

ভোম্বোলও কোঁচড় পাততেই তিনি তাতে মুড়মুড় ক'রে মুড়ি-নারকোল ঢেলে দিলেন।

মুড়িগুলো আউশের, বেশ টাট্কা। দেখতে বেঁটে বেঁটে, গায়ে লাল ছিলে, খেতে মিষ্টি ও মুচমুচে। ভোম্বোল চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দাঁড়িয়ে মুড়ি-নারকোল চিবুতে লাগলো!

॥ ষোলো ॥

চরমাদারিপুরের বারোয়ারিতলায়

সেই গাঁয়েই তার রাতখানা কেটে গেল।

শরতের সকাল। সোনালি রোদে চণ্ডীমণ্ডপের সারা আঙিনা মাখিয়ে গেছে। তা'র এককোণে শিশির ভেজা শিউলীতলার পাশে চেনা সুরে সানাই বাজছিল—'গা তোল, গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল—'

ছেলেরা নতুন পোশাক পরে বাজনদারদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভোম্বোলও তা'দের মাঝে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জায়গাটি ছেড়ে তা'র কোথাও যেতে মন চাইছে না।

সে মনে মনে ঠিক করলে, পুজো শেষ হ'য়ে গেলে আবার টাটা-নগরের পথ ধ'রবে। এই তো রাস্তা। এ ক'টা দিন এখানেই কাটাবে।

দুপুরে সে একমুঠো ভাত খেতে পেলো। আঁচিয়ে কাপড়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে এসে দেখে, ওধারের পদ্মদিদির বর দাঁড়িয়ে। তাঁর পিছনে তকমা আঁটা এক পিয়াদা। তিনি কর্মকর্তার সঙ্গে কী বিষয়ে যেন কথা কইছেন। ভোম্বোলের মনে হলো তা'রই কথা। সে চট্ ক'রে চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে সরে গেল।

তারপর এক গৃহস্থবাড়ির কলাবাগানের বেড়া ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে প'ড়ে—এক ছুটে বাগান পার হ'য়ে গেল। সামনে গোয়াল। তারপর একখানা খড়ের চালা। তা'র পিছনে ধানের গোলা। ভোম্বোল এসবও পার হলো। ঐ যে রাস্তা, রাস্তায় উঠে সে দিলে ছুট।

ছুটতে ছুটতে গাঁয়ের বাইরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখলে, কেউ আসছে কিনা। যা'রা আসছিল, তা'র সব অচেনা। ভোম্বোলকে ছুটতে দেখে অবাক।

এদিককার পথটা ভাল নয়—কাঁচা-পাকা। গরুরগাড়ি চলাচলে দু'পাশে খাল, মাঝে উঁচু হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জুলি—এক্ষেতে ওক্ষেতে জল যাবার জন্যে চাষীরা বোধহয় কেটেছে। এখন সব শুকনো। কেবল রাস্তার নিচে দু'পাশে মাটিকাটা খালে জল। তাতে কলমী-হিঞ্চের বন, দু-চারটি শালুকও আছে। কুলবরাবর শাতি-শুষনি ও থানকুনী বিছিয়ে আছে। এখানে ওখানে বক ব'সে। জলে পানকৌড়ি ডুব-সাঁতার কাটছে। খালের পাড়ে একটা বেলগাছের মাথায় একটা নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসে বসলো। ভোম্বোল হাতজোড় ক'রে পাখিটাকে নমস্কার করতে

করতে মনে মনে বললে,—'যেন ধরা না পড়ি।' পাখিটা কিন্তু হঠাৎ ক্যাররর্ ক'রে ডেকে উঠেই উড়ে গেল।

তা'তে ভোম্বোলের ভয় হলো সে পিছন ফিরে দেখলে, পদ্মদিদির বর আসছেন কিনা। তা'কেই ধরবার জন্যে তিনি বোধহয় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর ভোম্বোলকে ধরেছেন! তা'র খোঁজ পাবেন সেই টাটানগরের লোহার কারখানায়।

এর পরই তো রেললাইন। কিন্তু সামনে একখানা গাঁ দেখা যাচ্ছে না? হাওড় কোথায়? চারধারে তাকিয়ে দেখলে। হাওড় তো দূরের কথা একটা পুকুরও দেখা যাচ্ছে না? কেবল ক্ষেতগুলো ছড়িয়ে আছে। ওগুলোর শেষে ঐ গাঁ। বোধহয় ঐ গাঁয়েরই ওধারে হাওড়; তারপর রেললাইন।

এদিকে বেলা পড়ে এলো। পশ্চিম দিকটায় আকাশকোলে সোনা ছড়িয়ে যাচ্ছে! ক্ষেতের মধ্য দিয়ে একপাল গরু লেজ নাড়তে নাড়তে গাঁয়ের দিকে চলেছে। পালের পিছনে চলেছে কয়েকটা রাখাল। পাখিরা বাসার দিকে উড়ে চলেছে। একটু পরেই নামবে সন্ধ্যা। পথে দু'চারজনের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু ভোম্বোল তাদের কারুকে আর রেল-লাইন বা সামনের গাঁয়ের নাম জিগ্যেস করলে না।

সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। তবু সন্ধ্যার আগে গাঁয়ে পৌঁছতে পারলে না। পথেই সাঁঝের তারাটি ফুটলো, চাঁদ উঠলো। সপ্তমীর চাঁদ; অল্প জ্যোৎস্না—খালের বুকে পড়ে চিক্ চিক্ করছে। পথের ওপর গাছের লম্বা ও ছেঁড়া ছেঁড়া ছায়া। সামনে ছায়ের আলো দেখা যাচ্ছে। যেন ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে না! তাই। তো এ গাঁয়েও তবে পুজো হয়?

ভোম্বোল এবার ছুটলো। নিশ্চয় আরতি হচ্ছে। আওয়াজটা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাক বাজছে। হাঁ, ঐ তো বাজছে,—'লাক চড়াচচড়, লাক চড়াচচড় গিদা গিদা—'

আর বেশি দূর নয়—পথ ফুরিয়ে এলো। ভোম্বোল গাঁয়ে ঢুকলো।

বাঁ দিক থেকে ঢাকের আওয়াজ আসছে—আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটি বউ, গোটা কয়েক ছেলে-মেয়ে কলরব করতে করতে ঐদিকেই যাচ্ছে। ভোম্বোল তাদের পিছন পিছন চললো।

সে ঠিকই চলেছে। ঐ তো মণ্ডপ। আলোর আলো—গ্যাসের আলো জ্বলছে; জ্বলছে ঝুলন্ত আলো। বাঃ। মস্ত প্রতিমা। আরতি

আরম্ভ হয়ে গেছে। পুরুত দু'হাতে দুটো বড় বড় ধুনুচি নিয়ে আরতি করছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সব ধোঁয়া—প্রতিমা ঢাকা পড়েছে। ভোম্বোল ছুটতে ছুটতে ভীড় ঠেলে প্রতিমার একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ইচ্ছে ছিল আরও কাছে যায়। কিন্তু সামনেটা মোটা বাঁশ দিয়ে আটকানো। ঐ যে ঐদিকটা ফাঁকা। সেখান থেকে সরে এসে চত্বর ঘুরে, সে যেই সেদিকে যেতে যাবে অমনি সামনে থেকে কে যেন খপ্ করে তা'র হাত দুটো চেপে ধরলে, ধরেই বললে,—'ভোম্‌লা—ভোম্বোল!'

ভোম্বোল চমকে উঠে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—তা'র কাকা!

তা'র কাকা এবার তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন। আর তা'র পালাবার উপায় নেই। সে টাটানগর যেতে যেতে চরামাদারিপুরের কাছারি-বাড়িতে এসে পড়েছে!

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল—নায়েবমশাইয়ের ভাই-পোকে পাওয়া গেছে।

পিয়াদারা ঢাকীদের বললে,—'জোরে বাজা, পাবি খাজা, হ'বে মজা—'

ঢাকীরা অমনি মহানন্দে তাঁদের দু'জনের চারধারে ঘুরে ঘুরে, দুলে দুলে বাজাতে শুরু ক'রে দিলে—'টাট্রা টানা টট্রে—টাট্রা টানা টট্রে টাক্—

ভোম্বোলের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। সে শুনতে লাগলো ঢাকগুলো যেন বলছে,—'টট্রা নগর ফস্কে গেল—টাট্রা নগর ফস্কে গেল—' আর কাঁসিটা তাদের পিছন পিছন খ্যানখেনে গলায় বলছে,—'টম্বোল দাদা, টম্বোল টম্বোল দাদা—'

তারপর?

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।